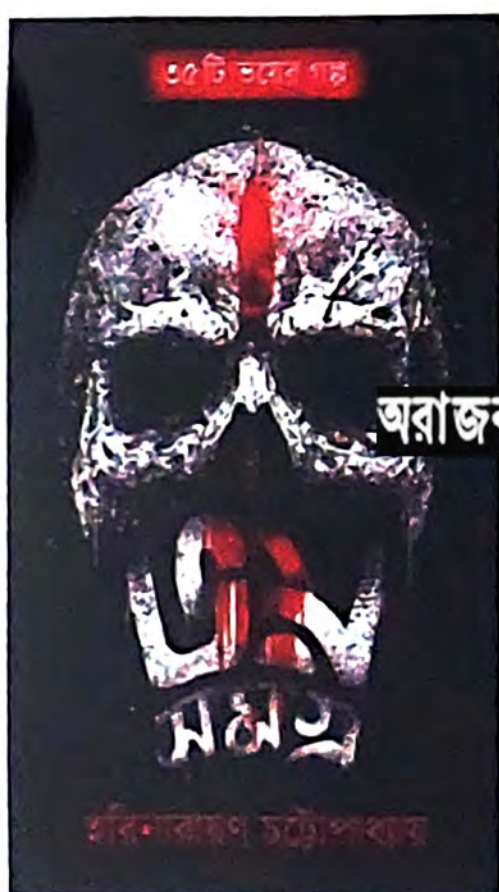


অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

‘বুক ফার্ম’ প্রকাশিত ‘ভয় সমগ্র’ সিরিজ :



প্রান্ত সমগ্র

মহিলা ভূতের গল্প সংকলন

সংকলক ও সম্পাদক
অমিতাভ চক্রবর্তী





Petni Samagra

ISBN : 978-93-92722-75-2

*No part of this work can be reproduced in any form
without the written permission of the author and the publisher*

এই সংগ্রহে যাঁদের কাহিনিগুলি মুদ্রিত হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সঙ্গে অথবা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সকলের সন্ধান না পাওয়ায় অনুমতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানো হল। বিষয়টি তাঁদের নজরে এলে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হল যাতে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হয়।

কাহিনি © লেখক

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৫

প্রচ্ছদ : অর্ক চক্রবর্তী

গ্রন্থ পরিকল্পনা: সৌম্যেন পাল

মূল্য : ৪৯৯ টাকা

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

ভূমিকা

‘ভূত’ অর্থাৎ অতীত; মানে যা ঘটে গিয়েছে। আবার, ভূত মানে অশরীরীও। সাধারণত এমন কোনো প্রাণী, যে এককালে জীবিত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পরও তার অস্তিত্ব কোনো-না-কোনোভাবে রয়ে গিয়েছে, ‘ভূত’ শব্দটা শুনলে তাদের কথাই সর্বপ্রথম আমাদের মস্তিষ্কে আসে। সেই প্রাণীকে যে মানুষই হতে হবে, এমনটা কিন্তু নয়। এ বিষয়ে যাঁরা পড়াশোনা ও গবেষণা করে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁদের কথা অনুযায়ী, যেকোনো প্রাণী মৃত্যুর পর ‘অশরীরী’ হয়ে দেখা দিতে পারে; বা, বলা ভালো ‘অশরীরী’ হয়ে নানানভাবে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে পারে। আজকের এই আধুনিক সমাজেও সারা বিশ্বজুড়ে এমন কোটি কোটি মানুষ আছেন যাঁরা ভূতের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। আবার এমনও বহু মানুষ আছেন যাঁরা পুরো বিষয়টিকেই ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। তাঁদের মতে পুরো ব্যাপারটাই নির্জলা মিথ্যা ও গাঁজাখুরি গল্পগাথা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই বলা যেতে পারে, ‘ভূত আছে’ আর ‘ভূত নেই’, এই দুই বিশ্বাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ আজ ভূতকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তা, ভূতের ব্যাপারটা সত্যি হোক বা না হোক, এ নিয়ে মানুষের আগ্রহ বা কৌতূহলের কিন্তু খামতি নেই। সেক্ষেত্রে এমন একটা বিষয়ের ছাপ বা প্রভাব যে সাহিত্য জগতের ওপরেও পড়বে, তা বলাই বাহুল্য। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বজুড়ে এই বিষয়ের ওপর সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং তা পাঠক-পাঠিকাদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যজগৎও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। গত প্রায় দেড়শো বছরে দিক্‌পাল সব সাহিত্যিকরা নানান ধরনের ভৌতিক রচনা লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় থেকে আরম্ভ করে মঞ্জিল সেন, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, গৌরী দে সকলেই আছেন। সত্যি বলতে, যদি ভালোভাবে দেখা যায়, তাহলে হয়তো এই ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে হবে যে, ভূতের গল্প লেখেনি এমন বাঙালি সাহিত্যিকের আবির্ভাব সম্ভবত এখনও পর্যন্ত হয়নি কারণ বর্তমান সাহিত্যিকরাও এই ধরনের রচনা লিখে চলেছেন। এই ধরনের রচনার প্রতি মানুষের আকর্ষণ আজও এতটুকু ম্লান হয়নি। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যত গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে সম্ভবত ভৌতিক-কাহিনির সংকলনই সবার শীর্ষে থাকবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, তাহলে আবার এই একই ধরনের গ্রন্থ নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা কোথায়!! এই বিষয়ে দুটো কথা বলে চেষ্টা

করব পাঠক-পাঠিকাদের এই জিজ্ঞাসার নিরসন করার। আমাদের এই গ্রন্থে আমরা শুধুমাত্র সেইসব রচনাই রেখেছি যা কোনো নারী অশরীরীকে কেন্দ্র করে লেখা অর্থাৎ সহজ ভাষায় যাদের আমরা পেতনি, শাঁকচুনি, ডাইনি ইত্যাদি নামে উল্লেখ করে থাকি। এই ধরনের কোনো গ্রন্থ বাংলা বইবাজারে আগে কখনো প্রকাশিত হয়েছে কি না জানা নেই। আর, দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থের বহু রচনা অগ্রস্থিত ও যেগুলো ইতিপূর্বে গ্রন্থিত সেগুলোও কিঞ্চিৎ দুষ্প্রাপ্য কারণ তা এক সময় কোনো-না-কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও আজ সেইসব গ্রন্থ দীর্ঘদিন ধরে বাজারজাত না-হয়ে রয়েছে। এ ছাড়াও, আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি যে, অনেক সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই এটা দেখা গিয়েছে যে, তাঁদের কোনো রচনা যখন কোনো পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে, সেই একই রচনা যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তার কিঞ্চিৎ বা বিস্তর ফারাক থাকতে। আমরা এই গ্রন্থে সেই সমস্ত রচনা, যেগুলোর প্রথম প্রকাশের স্থান ও কাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলোর প্রথম ভার্শনটিকেই রেখেছি। যেগুলোর প্রথম প্রকাশের স্থান ও কাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোর যে ভার্শনটি পাওয়া গিয়েছে সেটিকেই রাখা হয়েছে। চেষ্টা করেছি যতটা বিস্তৃত সময়কাল এই গ্রন্থে ধরে রাখা যায় তা করার। সেইজন্য লেখা বাছবার সময় গত এক-শো বছরের এই বিষয়ে লেখা রচনাগুলো নিয়ে বসেছিলাম। প্রায় প্রত্যেকটি লেখার শেষেই তার প্রথম প্রকাশের স্থান ও কালের উল্লেখ আছে।

বুক ফার্ম-এর অন্যতম কর্ণধার শ্রীশান্তনু ঘোষ মহাশয় প্রথম আমাকে এমন একটা গ্রন্থ নিয়ে আসার কথা বলেন। আইডিয়াটায় আমি বেশ নতুনত্ব দেখতে পাই ও সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করি। তিনি প্রথম দিন থেকেই সঙ্গে ছিলেন এবং সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করেছেন। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই শান্তনুদা ও বুক ফার্মের পুরো টিমকে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মা, বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের ও বন্ধুস্থানীয়দের, যাঁরা সর্বদাই আমায় বই পড়তে ও বই সংগ্রহ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধু শ্রীসমুদ্র বসুকে যিনি সর্বদাই আমায় এই ধরনের কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন ও বিভিন্নভাবে পথপ্রদর্শন করেছেন। সর্বশেষ এই গ্রন্থ যদি বাংলার পাঠকমহলে সমাদর লাভ করে তাহলেই আমার এই উদ্যোগকে সার্থক বলে মনে করব। প্রসঙ্গত, এই বইটি বাংলার যাবতীয় মহিলা ভূতের গল্পের অখণ্ড সমগ্র নয়, পাঠকমহলের সাড়া পেলে আমরা পরবর্তী খণ্ডের আয়োজন করবো।

বইটির নামকরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ‘পেত্নি’ শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, সংকলনের মধ্যে বর্তমান বানানবিধি (সংসদ অভিধান) অনুযায়ী ‘পেতনি’ রাখা হয়েছে।

অমিতাভ চক্রবর্তী

সূচিপত্র

শাঁকচুনির কারসাজি	(বাংলার লোককথা)	৭
মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী	হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৫
দিনে দুপুরে	বুদ্ধদেব বসু	২৬
ডাইনি	তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
কাশী কবিরাজের গল্প	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০
নিশির ডাক	শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)	৪৬
মড়া কাটতে ভয়	শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৩
তিন ভাই ও ডাইনি	নীহার ঘোষ	৬২
বড়োমা	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৬৭
এক রাত্রি	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৭১
জামাই	মনোজ বসু	৭৬
আবার রাসমণি	বাণী রায়	৮২
বেগম কুঠি	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৯৪
জঙ্গল বাড়ির বউরানি	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১০০
চিলেকোঠার রহস্য	মুরারিমোহন বিট	১০৭
পুরোনো বাড়ি	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	১১৬
হাজারির বউ	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	১২০
ছবি	শিশিরকুমার মজুমদার	১২৬
উত্তর সিকিমের ভূত বাংলো	সমরেশ বসু	১৩৬
গুপ্তধনের চাবি	কমল লাহিড়ী	১৪৩
কে?	আনন্দ বাগচী	১৫০
আতঙ্ক	মানবেন্দ্র পাল	১৫৯
রাঙাদিদা ও ফুলকুমারী	বিরাজ ভদ্র	১৬৮
রাতটা ছিল দুর্যোগের	সমরেশ মজুমদার	১৭৩
যমজ বোন	বরুণ দত্ত	১৭৯
পপি	সাধনা মুখোপাধ্যায়	১৮৫

জলজ্যাঙ্গো ভূত	হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১৯০
বাঁশবনের বামনি	মঞ্জিল সেন	১৯৫
আলোক ভাষা	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
ঋণ শোধ	গৌরী দে	২১০
ভূত বলে কিছু নেই	মনোজ সেন	২১৬
কিশোরী ভূতের বয়ফ্রেন্ড	শিবতোষ ঘোষ	২২২
তুতুলের মা	সুকুমার ভট্টাচার্য	২৩১
কী দেখলাম...	অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী	২৪১
বন্ধ দরজা	মণিলাল মুখোপাধ্যায়	২৪৯
চৌধুরীবাড়ির অয়েলপেন্টিং	অশোক বসু	২৫৬
পেতনি রহস্য ও কিটু লাহিড়ি	হিমালীশ গোস্বামী	২৬৫
আঁধারগ্রামের আলো	সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	২৭২
দেখা হবে মাঝরাতে	শুভমানস ঘোষ	২৮৪
এক মুঠো ছাই	হর্ষ দত্ত	২৯২
প্রসাদবাবুর ভয়	প্রচৈত গুপ্ত	৩০৪
স্নেহ	সুচিত্রা ভট্টাচার্য	৩১৪
মেদিনীপুরের বাড়ি	শতদল	৩২১
জ্ঞান হারালেন অর্চিতা সেন	সৈয়দ রেজাউল করিম	৩২৯
সুন্দরবনের শিখা	প্রবীর জানা	৩৩৩
ননীবালাদের পিকনিক	শ্যামল দত্তচৌধুরী	৩৪১
ছায়াবৃত্তা	সঞ্জীব কুমার দে	৩৪৬
পুতুলবাড়ির গুনাই বিবি	দীপ মুখোপাধ্যায়	৩৫৮
পেতনির নাতজামাই	উজ্জ্বলকুমার দাস	৩৬৩
হানাবাড়ির বেগম	বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৩৬৯

শাঁকচুনির কারসাজি

(বাংলার লোককথা)

বামাপদ কলকাতার এক মুদির দোকানে কাজ করত। লোকটা ছিল বড়ো ভালো। অতি বড়ো শত্রুও তার প্রশংসা না-করে থাকতে পারত না।

বছরের শেষে একবার করে বামাপদ দেশে আসত। যখন সে দেশের বাড়িতে পা দিত, তখন গাঁয়ের ছোটো-বড়ো সকলেই আনন্দিত হত খুব। সকলের সঙ্গেই খুব আমোদ-আহ্লাদ করত সে। তাই সকলেই খুব ভালোবাসত তাকে।

দিন কয়েক দেশে কাটিয়ে আবার সে কলকাতায় ফিরে যেত। বামাপদের মাকে একা একাই গাঁয়ে থাকতে হত। কিন্তু তবুও সে কখনো গাঁ ছেড়ে কলকাতায় যাবার কথা মুখে আনত না। স্বামীর ভিটের ওপর ছিল তাঁর এমনি টান।

সেবারও বছরের শেষে বামাপদ দেশে ফিরল।

বামাপদের মা তাকে বলল— ‘বাবা পদ, এবার শহরে যাওয়ার সময় কিন্তু বউমাকে স্বশুরবাড়ি থেকে এনে দিয়ে যেও। আমি আর একা একা এই ভিটেয় থাকতে পারছি না। আর আমার বয়সও হয়েছে অনেক। কবে আছি, কবে নেই। আর সংসারের এত কাজকর্মই বা করে কে?’

যাবার সময় এবার তুমি
বউকে দিয়ে যাও,
আর কতদিন বাঁচব আমি
যায় না বলা তাও।

বামাপদ বলল— ‘বেশ তো! তার জন্যে আর এত চিন্তার কি আছে? আমি কাল-পরশু নাগাদ যাচ্ছি স্বশুরবাড়ি।’

বামাপদের বাড়ি থেকে তার স্বশুরবাড়ি বিশ-পঁচিশ ক্রোশ। দুই-তিন দিনের পথ। রেলরাস্তার ধারে নয় বলে বামাপদকে অতটা পথ হেঁটেই যেতে হবে। কিন্তু হেঁটে যেতে মন সরল না বামাপদের। সে তাই পালকি, বেহারার বন্দোবস্ত করল। বউকে আনবার জন্য একজন ঝিকে নেওয়া হল সঙ্গে। দু-দিন পরে বামাপদ স্বশুরবাড়ি পৌঁছোল।

শশুরবাড়ি থেকে বউকে সেইদিনই সাজগোজ করিয়ে বামাপদ রওনা হল।
গরমের দিন। আম, জাম, লিচু পাকছে। ভীষণ গরমের মধ্যে পথ চলা
প্রায় অসম্ভব।

সকাল সকাল তারা রওনা হয়েছিল।

কিন্তু দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল। রোদের ভীষণ তেজে পথ চলাই যায়
না। সকলে হাঁপিয়ে উঠল।

গরমকালের দুপুর রোদে

আগুন যেন ধরে,

পথ চলতে সবাই যেন—

ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

পালকির বেহারারা যেটুকুও বা হাঁটতে পারছিল, ঝি তো তাও পারছিল না।
সে তখন বামাপদকে বলল— ‘বাবু, একটু হুকুম দেন তো আমরা খানিকটা
জিরিয়ে নিই।’

বামাপদ দেখল ঠিক কথা। সে বলল— ‘বেশ, তোমরা একটু জিরিয়ে নাও।
আমি বরং হাটে গিয়ে কিছু খাবার কিনে আনি।’

বেহারারা বলল— ‘বেশ বাবু, আমরা তাহলে উনুন খুঁড়ি, আপনি চাল ডাল
কিনে আনুন।’

ঝি বিশ্রাম করতে লাগল নিশ্চিত্তমনে। বেহারারা উনুন খুঁড়তে লাগল একটু দূরে।
বামাপদ বাজারে গেল জিনিস কিনে আনতে। নতুন বউ পালকির মধ্যেই বসে রইল।

এদিকে দারুণ গরমে বউ-এর খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল। সে এক সময় ঝিকে
বলল— ‘দূরের পুকুরটা থেকে একটু জল এনে দাও না। ভারি তেষ্ঠা পেয়েছে।

ওই যে দূরে পুকুর দেখি

টলটলে জল তার,

জল এনে দাও, তেষ্ঠাতে যে

প্রাণ বাঁচে না আর।’

ভীষণ গরমে ঝি এতটা পথ হেঁটে একেবারে মরার মতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।
সে তাই গজগজ করতে লাগল— ‘বামাপদের মাকে সেই তখনই বলেছি, এতদূর
দেশে ছেলের বিয়ে দিওনিকো। তা তখন গরিবের কথা গেরাহি করল না।’

বউ দেখল, ঝির সঙ্গে তর্ক করলে আর জল খাওয়া হবে না। সে তাই বলল—
‘তুমি একটু বসো ঝি, আমি নিজেই গিয়ে জল খেয়ে আসি।’

একথা শুনে ঝি তো মহাখুশি। সে বলল— ‘তাই করো মা, তাই করো। এই
তো কাছেই দীঘিটা।’

বউ আর কথা না-বলে পালকি থেকে নেমে দীঘির দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে সেই দীঘির ধারে ছিল বড়ো বড়ো কয়েকটা তালগাছ। সেই তালগাছগুলির কোটরে বাস করত কয়েকটি পেতনি।

সেই পেতনিদের মধ্যে একটি পেতনির ঠিক সেইসময়েই দারুণ জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। সে জল খাবার জন্যে ঘাটের দিকে আসছে এমন সময় বউয়ের সঙ্গে লাগল তার ধাক্কা।

আর যায় কোথায়!

পেতনি তো রেগে আগুন! কী, এতবড়ো আত্মপক্ষা যে আমার গায়ে ধাক্কা লাগায়!

আমার গায়ে ধাক্কা লাগায়—

স্পর্শা দেখি বড়ো,

আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি আজ,

একটু সবুর করো।

পেতনি তক্ষুনি নিজমূর্তি ধরে দাঁড়ায়।

উঃ, কী বিশাল তার চেহারা! মুলোর মতো দাঁত, তালগাছের মতো পা, লম্বা লম্বা হাত, কুলোর মতো কান।

বউ তো পেতনির মূর্তি দেখেই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

আর যায় কোথায়!

পেতনি তক্ষুনি বউকে তুলে নিয়ে উড়তে উড়তে গিয়ে হাজির হল একেবারে সেই তালগাছের মাথায়।

তারপর বউকে অজ্ঞান অবস্থায় সেখানে রেখে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল।

বউয়ের আর তালগাছ থেকে নামবার ক্ষমতা রইল না।

পেতনি তখন বউয়ের কাপড় নিয়ে নিজে সেইগুলো পরে ফেলল।

তারপর সুন্দরী বউটি সেজে সোজা গিয়ে হাজির হল সেই পালকির সামনে।

বউটি সেজে পেতনি তখন

পালকি ধারে যায়—

পেতনি বলে কেউ সেখানে

চিনলো নাকো তায়।

ঝি বলল— ‘কি গো বউ, জল খাওয়া হল?’

বউ হেসে বলল— ‘হ্যাঁ।’ এই বলেই সে পালকির মধ্যে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

একটু পরে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সকলে আবার পালকি নিয়ে রওনা হল।

বউ অজ্ঞান হয়ে সেই তালগাছের কোটরের মধ্যেই পড়ে রইল। কেউ জানতে পারল না।

এদিকে সেদিনই সন্ধ্যায় পালকি এসে থামল বামাপদর বাড়িতে।
বামাপদর মা তো মনের আনন্দে বউকে বরণ করে ঘরে তুললে।
দিন যায়।

বউয়ের কাজকর্ম দেখে বামাপদর মা খুবই খুশি। এর আগে সে দেখেছিল বউ
ভীষণ আলসে। কোনো কাজকর্ম করতে পারে না।

কিন্তু এবার দেখল কোনো কাজ করতে বলবার আগেই বউ সঙ্গে সঙ্গে তা
করে ফেলে।

তা ছাড়া আগে বউ বড়ো গম্ভীর ধরনের ছিল। সবসময় মুখ গোমড়া করে বসে
থাকত। কিন্তু এবার বউ খুব চটপটে। কিছু বলবার আগেই সে হাসতে হাসতে
কাজকর্ম শেষ করে হেসে-খেলে সময় কাটায়।

বউয়ের স্বভাব বদলে গেছে—

নয় সে কুঁড়ে আর,

হেসে খেলে কাজ করে সে;

মুখ করে না ভার।

শাশুড়িও বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে লাগল।

বামাপদও দেখল এবার বউ যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। কী করে
যে এমন হল তা সে ঠিক বুঝতে পারল না। তবে এতে সেও খুব খুশি হল।
এমনি করে দিন যায়।

দেখতে দেখতে কিছু দিন কেটে গেল।

বামাপদ একদিন মা-বউকে রেখে চলে গেল কলকাতায়। যাবার সময় মাকে
বলে গেল— ‘খুব সাবধানে থেকো।’

মা বলল— ‘তুই কাজে উন্নতি কর বাবা। আরও বেশি টাকা পেলে আমরা
সকলে মিলে শহরে গিয়ে থাকব।’

গাঁয়েতে আর মন বসে না—

হচ্ছে অভিলাষ—

শহরেতে সবাই মিলে

করব মোরা বাস।’

বামাপদর মা ভাবল যে বামাপদ চলে গেলে বউ হয়তো একটু মনমরা হয়ে
থাকবে। কিন্তু দেখা গেল ঠিক তার উলটো। কাজকর্মে বউ আরও বেশি মনোযোগী
হল। কথা শেষ করবার আগেই সে কাজ করে ফেলে।

একদিন বামাপদর মা দাওয়ায় বসে মশলা বাটছে।

বউকে বলল— ‘বউ, আরও কিছু মশলা এনে দাও তো ঘর থেকে।’

বউ সেখানে দাঁড়িয়েই বিরাট লম্বা একটা হাত বের করে দিল ঘরের দিকে।

বামাপদর মা প্রথমে তা দেখতে পায়নি।

সে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল যে বউ লম্বা এক হাত বের করে ঘরের মধ্য থেকে জিনিস আনছে।

ভয়ে বামাপদর মার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু মনের মধ্যে সেই যে ভয় ঢুকল, তারপর আর কোনো কাজ করতে পারল না সে।

বামাপদর মা দু-একজন পাড়াপড়শির কাছে চুপে চুপে কথাটা জানাল।

সে বলল—

‘আজ সকালে দেখতে আমি পেলাম অকস্মাৎ,
বউটি আমার মশলা আনে বাড়িয়ে তাহার হাত।
বাসরে সে কী লম্বা দু-হাত বাড়িয়ে দিল তার—
দৃশ্য দেখে ভয়েই আমার বুক কাঁপে বার বার।’

কিন্তু তারা বলল— ‘না না, তুমি ভুল দেখেছ। না-হয়, তোমার বায়ু চড়ে ছিল।
অমন লক্ষ্মী বউ, তার নামে এমন সব কথা বলছ!’

শাশুড়ি কী আর করে, মনের ভয় মনেই চেপে রইল।

...এমনি করে আরও দিন কয়েক কেটে গেল।

একদিন বউকে রান্না করতে বলে বামাপদর মা ঘাটে গেল কাপড় কাচতে।

একটু পরে কাপড় কাচা শেষ করে রান্নাঘরে গেল বউয়ের রান্না দেখতে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে সে যা দেখল তাতে তার চক্ষু স্থির হবার জো হল।

সে দেখল বউ উনুনের সামনে বসে। তার দুটি পা উনুনের মধ্যে ঢোকানো
আছে। সেই পা দুটো থেকে দাউদাউ করে আগুন বের হচ্ছে। আর সেই আগুনে
ভাত, ভাল ফুটছে টগবগ করে।

উনুনের মধ্যে কাঠ-খড় কিছু নেই।

অবাক কাণ্ড। নিশ্চয়ই এ বউ মানুষ নয়। পেতনি, না হয় শাঁকচুন্নি।

এ বউ মানুষ নয় দেখি অদ্ভুত—

মানুষের বেশে কোনো হবে প্রেত-ভূত।

কাঠ-খড় নাই কিছু, তবু কত গুণ—

পায়ের আগুনে শুধু জ্বলিছে উনুন।

কিন্তু কিছু বললেই বউ তো রেগে তাকেই শেষ করে ফেলবে। তাই চুপচাপ
থেকে সে ছেলের কাছে চিঠি লিখে ফেলল। তারপর একজন প্রতিবেশীকে দিয়ে
চিঠিটা ডাকঘরে পাঠিয়ে দিল।

চিঠি পেয়ে দু-দিনের মধ্যেই বামাপদ দেশে ফিরে এল। বউ তো এত
তাড়াতাড়ি বামাপদকে ফিরতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

অরাজকতা এককুসিদ্ধ

বামাপদর মা সব কথা তার ছেলেকে জানাল।

বামাপদ তো এসব কথা শুনে অবাক। এ কী করে সম্ভব হতে পারে। ঠিক তার বউয়ের মতোই তো চেহারা!

বামাপদর মা বলল— ‘আচ্ছা চোখে দেখলে বিশ্বাস করবি তো?’

বামাপদ বলল— ‘হ্যাঁ, চোখে দেখলে বিশ্বাস না করবার কি কারণ আছে?’

তখন শাশুড়ি বউকে বলল— ‘বউমা, আমি এদিকের কাজে যাচ্ছি, তুমি চট করে এই কাপড়গুলি ধুয়ে আনো তো দেখি।’

বউ কাপড়গুলি নিয়ে চলে গেল।

একটু পরে বামাপদর মা গোপনে বামাপদকে ঘাটের ধারে নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে তারা দেখে বিরাট দুটো লম্বা লম্বা হাত বের করে বউ দমাদম কাপড়গুলোকে আছাড় মারছে।

মায়ের সাথে বামাপদ

দেখল ঘাটের কাছে—

লম্বা বিরাট দুইটি হাতে

বউটি কাপড় কাচে।

বামাপদ কোনো কথা বলল না। সে বুঝতে পারল যে এ বউ তার আসল বউ নয়। নিশ্চয়ই এই পেতনি তার বউকে কোথাও লুকিয়ে রেখে নিজে বউ সেজে এসেছে।

মা-ছেলে দুইজনে তখন যুক্তি করে একজন ওঝাকে ডেকে আনল। ওঝা আর বামাপদ দু-জনে বাইরে বসে কথা বলছিল।

এদিকে পেতনি-বউ ঘরের মধ্যে শাশুড়িকে বলল— ‘মা, ও হতভাগা কে? তোমার ছেলের সঙ্গে গল্প করছে কেন? ওকে এন্ফুনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও!’

বলছি মাগো উচিত কথা

ভালোই যদি চাও,

ও লোকটারে বাড়ির থেকে

তাড়িয়ে তুমি দাও।’

মা বলল— ‘বউমা, কোথাকার কোন লোক বামাপদর সঙ্গে কথা বলছে, তাতে আমাদের কি বলো?’

বউ বলল— ‘না মা। ও লোকটিকে দেখেই মনে হচ্ছে যে ও লোকটা ভালো নয়।’

শাশুড়ি আর বউ কথাবার্তা বলছে, এমন সময় বামাপদ ওঝাকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বউ ওঝাকে দেখেই দূরে সরে যাচ্ছিল।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ওঝা বলল— ‘বউমা, একটু দাঁড়াতে হবে। যাচ্ছ কোথায় মা? তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে।’

বউ তখন ভীষণ রেগে নিজমূর্তি ধরে বলল— ‘কেন রে হতভাগা! তোর সঙ্গে আমার কি?’

ওঝা বলল— ‘এই যে কী তাই দেখাচ্ছি! পালাবে কোথায়? পালাবার উপায় কি রেখেছি নাকি। চারিদিকে গণ্ডি দিয়ে রেখেছি। এখনও নিজের মঙ্গল চাও তো বলো তুমি কে? আর ওদের বউকে কোথায় আটকে রেখেছ?’

বউ তখন ভীষণ মূর্তি ধারণ করে ওঝার দিকে ছুটে এল।

ওঝা কতকগুলি সরষেতে কী যেন মন্ত্র পড়ে তা বউয়ের দিকে ছুড়ে মারল।

সঙ্গে সঙ্গে বউয়ের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ওঝা তখন মন্ত্র পড়ে বউয়ের গায়ে ধুলোর বাণ মারতে লাগল।

বউ তখন প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল— ‘কে কোথায় আছ রক্ষা করো। আমাকে মেরে ফেলল!’

দৌড়ে এসো, দৌড়ে এসো

কোথায় আছ কে,

গৃহস্থদের বউ যে আমি—

মেরে ফেল যো।’

চিৎকার শুনে সারা গ্রামের লোক ছুটে এসে তাদের উঠোনে জড়ো হতে লাগল।

ওঝাও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে বলল— ‘এখনও বলছি ওদের বউকে ছেড়ে দাও। না হলে কিছুতেই তোমার নিস্তার নেই।’

পেতনি তখন ভয়ে ভয়ে বলল— ‘ওদের বউকে আমি গাছের কোটরে রেখে এসেছি।’

দীঘির ধারে তালের গাছে

তোমাদের সে বউটি আছে।’

ওঝা জিজ্ঞাসা করল— ‘কতদিন?’

পেতনি বলল— ‘যেদিন বাপের বাড়ি থেকে এখানে আসছিল ঠিক সেইদিন।’

ওঝা তখন জিজ্ঞাসা করল— ‘সে কি এখনও বেঁচে আছে?’

পেতনি বলল— ‘হ্যাঁ, আমি রোজ তাকে খাবার খাইয়ে আসি।’

ওঝা এবার জোর চিৎকার করে বলল— ‘এবার তাকে এক্ষুনি এখানে এনে দাও দেখি।’

পেতনি চুপ করে ছিল। ওঝা তার গায়ে আবার ধুলোর বাণ মারতে লাগল।

এবার আর উপায় না দেখে পেতনি বলল— ‘দাঁড়াও বাবা, আমি এখনই তোমাদের বউমাকে এনে দিচ্ছি।’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ওঝা বলল— ‘বেশ, সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরি নয়।’
পেতনি তখন সকলকে চোখ বুজতে বলল। সকলে চোখ বুজলে ‘শৌ শৌ’
শব্দ করতে করতে একঝলক ধোঁয়ার মতো পেতনি উড়ে চলে গেল। দেখতে
দেখতে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

আবার শোনা গেল ‘শৌ শৌ’ শব্দ। দেখা গেল বামাপদর আসল বউকে কোলে
করে নিয়ে আসছে পেতনি। পেতনিকে দেখাচ্ছে বিরাট একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো।
বামাপদর বউ তখন অচৈতন্য।

ওঝা তখন জিজ্ঞাসা করল— ‘তুই কি এক্ষুনি এদেশ ছেড়ে চলে যাবি, না
থাকবি? যদি থাকতে চাস তাহলে আবার কিন্তু তোকে বাণ মারব।’

পেতনি বলল— ‘না, আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাব।’

ওঝা বলল— ‘কিন্তু আর কখনো এদেশের দিকে আসতে পারবি না।’

পেতনি বলল— ‘আচ্ছা আমাকে এবার মুক্তি দাও।’

ওঝা বলল— ‘যাবার আগে এই বড়ো নিমগাছটা ভেঙে দিয়ে চলে যা।’

পেতনি বলল— ‘আচ্ছা।’

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ভীষণ একটা ঝড়ের মতো প্রচণ্ড শব্দে একঝলক
বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

সে কী ভীষণ শব্দ!

একটু পরেই মড় মড় করে বড়ো নিমগাছটা উপড়ে পড়ল। পেতনিকেও আর
দেখা গেল না।

হঠাৎ যেন প্রবল ঝড়ে
নিমগাছটা উপড়ে পড়ে;
গ্রামবাসীরা দেখল সবাই,
পেতনি গেছে, আর ভয় নাই।

বউয়ের মাখায় জল ঢালতে ঢালতে তার জ্ঞান ফিরে এল।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হল— ‘তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?’

বউ বলল— ‘আমি দীঘিতে জল খেতে গেলাম। কিন্তু মাঝপথে জ্ঞান হারিয়ে
গেল। তারপর আর কিছু মনে নেই।’

বামাপদ আর তার মা এরপর আসল বউকে নিয়ে মনের সুখে ঘর সংসার
করতে লাগল।

সেই পেতনি আর কোনোদিনও তাদের ছায়া মাড়ায়নি।

মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১

আমি ঔপন্যাসিক। কেবল এইটুকু বললেই সব বলা হয় না, আমি উপন্যাস লিখে টাকা রোজগার করি— অর্থাৎ আমি যদি উপন্যাস না-লিখি, তাহলে আমার পেটও চলবে না। অর্থাৎ উপন্যাস লেখা হচ্ছে আমার পেশা।

কিন্তু এ পেশা বুঝি আর চলে না। বাড়িতে রোজ এত লোকের ভিড়— মাসিকপত্রের সম্পাদকদের তাগাদা, চেনা-অচেনা লোকের আনাগোনা, বন্ধুবান্ধবদের তাস-দাবার আড্ডা, এইসব সামলাতে-সামলাতেই প্রতিদিন কেটে যায়। যখন একলা হওয়ার সময় পাই তখন আসে ঘুমের সময়।

কাজেই কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছাড়তে হল। স্থির করলুম অন্তত একখানা উপন্যাস না-লিখে আর কলকাতায় ফিরব না। বিদেশে নিশ্চয়ই বাসায় এত চেনা-অচেনা লোকের ভিড় হবে না।

সিধে চলে গেলুম ঝাঁঝা জংশনে। একখানি ছোটোখাটো বাংলো ভাড়া নিলুম। সকালে ও বিকালে বেড়িয়ে বেড়াই, দুপুর ও সন্ধ্যা বেলাটা কেটে যায় উপন্যাস লেখায়।

ভিড়ের ভয়ে বিদেশে পালিয়ে এলেও মানুষের সঙ্গে বিনা মানুষের প্রাণ বাঁচে না। ঝাঁঝায় এসেও তিন-চারজন লোকের সঙ্গে আমার অল্প-বিস্তর ঘনিষ্ঠতা হল। একজন হচ্ছেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী। তিনি বিধবা, তাঁর স্বামী পেশোয়ারে কাজ করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি ঝাঁঝায় এসে বাস করছেন। তাঁর সন্তানাদি কেউ নেই। ধর্মে তিনি খ্রিস্টান।

আমার আর একজন নতুন বন্ধুর নাম অমূল্যবাবু। এ ভদ্রলোকের বয়স হবে বছর পঞ্চাশ। কলকাতার কোনো কলেজে প্রোফেসরি করতেন, এখন অবকাশ নিয়ে এইখানে বসেই লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটিয়ে দেন। অমূল্যবাবু পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে সারাজীবনই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, মৃত্যুর পরে জীবের কী অবস্থা হয় তাঁর মুখে সর্বদাই সেই কথা শুনেছি।

এখানকার রেলের ডাক্তার গোবিন্দবাবুর সঙ্গেও আলাপ হল। তিনি খুব সাদাসিধে ভালোমানুষ লোক এবং সন্ধ্যা হলেই ভূতের ভয়ে কাতর হয়ে পড়েন। সূর্যাস্তের পর তিনি প্রাণান্তেও অমূল্যবাবুর বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে রাজি হন না, কারণ পাছে তাঁকে কাছে পেয়ে অমূল্যবাবু দু-চারটে পরলোকের কাহিনি শুনিয়ে দেন।

২

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি অমূল্যবাবুর সঙ্গে বসে-বসে গল্প করছিলুম। কথা হচ্ছিল পৃথিবীতে সত্য-সত্যই পিশাচের অস্তিত্ব আছে কি না।

অমূল্যবাবুর বিশ্বাস, পৃথিবীতে সেকালেও পিশাচ ছিল— একালেও আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ‘পিশাচ কাকে বলে?’

অমূল্যবাবু বললেন, ‘প্রেতাত্মাদের আমাদের মতো দেহ নেই— একথা তুমি জানো। দেহ না থাকলেও দুষ্ট প্রেতাত্মাদের আকাঙ্ক্ষা প্রায় প্রবল হয়ে থাকে। কিন্তু দেহের অভাবে তারা সে আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না। তাই অনেক সময় দুষ্ট প্রেতাত্মারা মানুষের অরক্ষিত মৃতদেহের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন সেই মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠে জীবিত মানুষদের ধরে রক্তশোষণ করে। এই জীবন্ত মৃতদেহগুলোই পিশাচ নামে খ্যাত।’

অমূল্যবাবু এমন দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলি বললেন যে, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমি বললুম, ‘প্রায়ই শুনতে পাই অমুক লোক রক্তস্বল্পতা রোগে মারা গিয়েছে। আপনি কি বলতে চান যে পিশাচরাই তাদের মৃত্যুর কারণ?’

অমূল্যবাবু বললেন, ‘অনেক সময় হতেও পারে, অনেক সময় নাও হতে পারে।’

ঠিক এই সময়ই মিসেস কুমুদিনী অমূল্যবাবুর বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ‘কীসের গল্প হচ্ছে?’

আমি বললুম, ‘অমূল্যবাবু আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন।’

কুমুদিনী একখানা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে বললেন, ‘ও, ভূতের গল্প বুঝি? বেশ, বেশ, ভূতের গল্প শুনে ভয় পেতে আমি ভালোবাসি। অমূল্যবাবু, আমাকে একটা ভয়ানক ভূতের গল্প বলুন না!’

অমূল্যবাবু বললেন, ‘ভয়ানক ভূত কাকে বলে আমি তা জানি না। তবে আজ আমি পিশাচের গল্প করছিলুম বটে।’

কুমুদিনী খানিকক্ষণ নীরবে অমূল্যবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, ‘আচ্ছা অমূল্যবাবু, পিশাচের কথা সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন কি?’

অমূল্যবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘সত্যি বিশ্বাস করি। খালি তাই নয়, আমার ধারণা সম্প্রতি এই ঝাঁঝাতেই বোধ হয় পিশাচের উপদ্রব শুরু হয়েছে।’

আমি সচমকে অমূল্যবাবুর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালুম।

কুমুদিনীরও মুখ ভয়ে ল্লান হয়ে গেল। কিন্তু সে-ভাবটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন, ‘আপনার এমন গাঁজাখুরি ধারণার কারণ কী শুনি?’

অমূল্যবাবু স্থিরভাবেই বললেন, ‘সম্প্রতি এখানে রক্তস্বল্পতা রোগে মৃত্যুর হার বড়ো বেড়ে উঠেছে। এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।’

কুমুদিনী উচ্চস্বরে হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘বেশ তো অমূল্যবাবু, আপনি একটা পিশাচকে বন্দি করবার চেষ্টা করুন না!’

অমূল্যবাবু শুষ্কস্বরে বললেন, ‘হুঁ। সেই চেষ্টাই করব।’

ভূত না মানলেও ভূতের ভয় যে ছাড়ে না, অমূল্যবাবুর ওখান হতে সেদিন আসতে আসতে সে প্রমাণটা ভালো করেই পেলুম। সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রত্যেক আনাচেকানাচে মনে হতে লাগল, যেন সত্য-সত্যই কোনো জীবন্ত মৃতদেহ আমার দিকে লক্ষ্য স্থির করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

৩

অমূল্যবাবু প্রতিদিন সকালে আমার বাসায় এসে চা পান করতেন।

সেদিন সকালেও বাংলোর বারান্দায় বসে আমরা দু-জনে চা পান করছি, এমন সময়ে দেখলুম সামনের পথ দিয়ে ডাক্তার গোবিন্দবাবু কোথায় যাচ্ছেন।

আমি চেষ্টা করে তাঁকে এক পেয়ালা চা পান করবার জন্যে আহ্বান করলুম।

গোবিন্দবাবু কাছে এসে বললেন, ‘চা পান করতে আমি রাজি আছি, কিন্তু ভায়া, শিগ্গির। আমার একটুও দেরি করবার সময় নেই!’

আমি বললুম, ‘কেন, আপনার এত তাড়াতাড়ি কীসের?’

গোবিন্দবাবু বললেন, ‘মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর মালীর ছেলের ভারি অসুখ। বোধ হয় বাঁচবে না।’

জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কী অসুখ?’

গোবিন্দবাবু বললেন, ‘রক্তস্বল্পতা— অর্থাৎ অ্যানিমিয়া।’

অমূল্যবাবু চা পান করতে করতে হঠাৎ পেয়ালাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, ‘ডাক্তার, ঝাঁঝায় এত অ্যানিমিয়ার বাড়াবাড়ির কারণ কি বলতে পারো?’

গোবিন্দবাবু বললেন, ‘না। কিন্তু এই রোগের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি।’

অমূল্যবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর মালীর ছেলেকে আমি জানি। তার নাম গদাধর, সে রোজ আমাকে ফুল দিয়ে যায়। তিনদিন আগেও তাকে আমি দেখেছি, জোয়ান সোমন্ত ছেলে! আর তুমি বলছ ডাক্তার, এরই মধ্যে তার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। অ্যানিমিয়া রোগে এত তাড়াতাড়ি কারুর অবস্থা খারাপ হয় না। চলো ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমরাও গিয়ে গদাধরকে একবার দেখে আসি।’

আমার বাংলো থেকে মিসেস চৌধুরীর বাংলোয় যেতে চার-পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। মিসেস চৌধুরীর বাগানের এক কোণে মালীর ঘর। আমরা সকলে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলুম।

ঘরের ভিতরে একপাশে বুড়ো মালী মাথায় হাত দিয়ে স্নানমুখে বসে আছে। গদাধর শুয়ে আছে একখানা চৌকির ওপরে। তার মুখ এমন বিবর্ণ ও রক্তশূন্য যে দেখলেই মনে হয়, মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই।

ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে চুপি চুপি আমাদের বললেন, ‘আজকের রাত বোধ হয় কাটবে না।’

অমূল্যবাবু গদাধরের পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর রোগীর গায়ের কাপড়টা খুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কী দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে গদাধরের গলা ও বুকের মাঝখানে একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ‘ডাক্তার, এটা কীসের দাগ?’

গোবিন্দবাবু বললেন, ‘ওটা ক্ষতচিহ্ন বলেই মনে হচ্ছে। যা নোংরা ঘর, ইঁদুর-টিদুর কামড়েছে বোধ হয়।’

অমূল্যবাবু গদাধরের বাপকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার ছেলেকে সেবা করে কে?’

বুড়ো মালী বললে, ‘বাবু, গিন্নিমা (অর্থাৎ মিসেস চৌধুরী) গদাধরকে বড়ো ভালোবাসেন, ঠিক নিজের ছেলের মতন। ওকে দেখাশুনো করেন তিনিই, ওর জন্যে দিনে তাঁর বিশ্রাম নেই রাতে তাঁর ঘুম নেই।’

অমূল্যবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, ‘রোগীর ভালোরকম যত্ন-সেবা হচ্ছে না। গদাধরকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাব! ডাক্তার, তোমার রেলের দু-চারজন কুলিকে ডাকো, গদাধরকে তারা এখনি আমার বাড়িতে নিয়ে চলুক। আমার বিশ্বাস একে আমি নিশ্চয় বাঁচাতে পারব।’

অমূল্যবাবুর এই অদ্ভুত বিশ্বাসের কারণ কী আমরা বুঝতে পারলুম না। রোগ হয়েছে রোগীর দেহে, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি নিয়ে গেলে তার কী উপকার হতে পারে? যাক, কথামতোই কাজ করা হল।

গদাধরকে যখন বাগানের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই সময়

মিসেস কুমুদিনী তাঁর বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে নেমে এসে তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, ‘এ কী ব্যাপার, গদাধরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?’

অমূল্যবাবু বললেন, ‘আমার বাড়িতে। এখানে ওর ঠিকমতো সেবা আর চিকিৎসা হচ্ছে না।’

কুমুদিনীর দুই চোখে একটা ক্রোধের ভাব ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, ‘বেশ, আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন। গদাধর সুস্থ হলে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না।’

৪

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। গাছপালার আর্তনাদ ও মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে ছড়ছড় করে বৃষ্টিধারা নেমে আসার শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

অনেক রাতে আচম্বিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে মনে হল, জানলার শার্সির ওপরে বাইরে থেকে কে যেন ঠক ঠক করে আওয়াজ করছে।

প্রথমটা ভাবলুম আমারই মনের ভুল। বাইরে তখনও সমান তোড়ে বৃষ্টি ঝরছে, বাজ ডাকছে ও ঝড় হইহই করছে, এমন দুর্যোগে শার্সির ওপরে করাঘাত করতে আসবে কে?

হয়তো ঝোড়ো হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকতে চায়!

আবার বিছানার ওপরে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তখনই শার্সির ওপরে আবার শব্দ হল— ঠক ঠক ঠক। ঠক ঠক ঠক। ঠক ঠক ঠক।

সবিস্ময়ে বিছানার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লুম। আর তো কোনোই সন্দেহ নেই! কে এল? এই বনজঙ্গল-পাহাড়ের দেশে এই ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকারে কে আমার ঘরের ভিতরে ঢুকতে চায়?

অজানা বিদেশে বলে শোবার সময় বালিশের তলায় রোজই একটা ‘টর্চ’ রেখে দিতুম। টপ করে টর্চটা তুলে নিয়েই জ্বলে জানলার ওপরে আলোটা ফেললুম। সেই তীব্র আলোকে দেখলুম, বন্ধ শার্সির ওপরে দুই হাত ও মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি। ঝোড়ো হাওয়ায় রাশি রাশি কালো কালো লম্বা চুল এসে তার সারা মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং সেই চুলের ফাঁকে ফাঁকে আগুনের মতন দপ দপ করে জ্বলছে তার দুটো বিস্ফারিত চক্ষু!

পরমুহূর্তে মুখখানা আলোকরেখার ভিতর থেকে স্যাঁৎ করে সরে গেল।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

এ কী দুঃস্বপ্ন! ভয়ে মুষড়ে আলো নিবিয়ে বিছানার ওপরে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লুম।

আতঙ্কে সারারাত আর ঘুম হল না। কেবলই মনে হতে লাগল, শার্সির কাঁচ ভেঙে ওই বুঝি এক অমানুষিক মূর্তি ঘরের ভিতরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে।

৫

জানলা দিয়ে সকালের আলো ঘরের ভিতর এসে পড়েছে, কিন্তু তখনও আমি জড়ভরতের মতো বিছানার ওপরে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। এমনসময় বাইরে থেকে শুনলুম আমার নাম ধরে ডাকছেন অমূল্যবাবু। অশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

অমূল্যবাবু ঘরের ভিতরে এলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ‘এত ভোরে আপনি যে! গদাধরের অসুখ বেড়েছে নাকি?’

অমূল্যবাবু বিছানার ওপর উঠে বসে হাসিমুখে বললেন, ‘অসুখ বেড়েছে কী, এই অল্প সময়েই গদাধর প্রায় সেরে উঠেছে!’

আমি সবিস্ময়ে বললুম, ‘বলেন কী! কী করে সারল?’

অমূল্যবাবু বললেন, ‘গদাধরের কোনো অসুখ তো হয়নি, সে পড়েছিল পিশাচের পাল্লায়।’

চেষ্টা করেও আমি হাসি থামাতে পারলুম না। কৌতুকভরে বললুম, ‘আপনি কি চারিদিকেই এখন পিশাচের স্বপ্ন দেখছেন?’

অমূল্যবাবু অটলভাবেই বললেন, ‘তোমার যা ইচ্ছা হয় বলো, আমি কোনোই প্রতিবাদ করব না। গদাধর কেন বেঁচেছে জানো? কাল দিনরাত তার শিয়রে বসে আমি পাহারা দিয়েছি বলে। কারুকো তার ত্রিসীমানায় আসতে দিইনি! কাল রাতে আবার কেউ যদি তার রক্তশোষণ করত, তা হলে আজ আর তাকে জীবিত দেখতে পেতে না।’

আমি সবিস্ময়ে বললুম, ‘রক্তশোষণ! অমূল্যবাবু, কি আপনি বলছেন? কে তার রক্তশোষণ করত?’

অমূল্যবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ‘তোমার ওকথার কোনো জবাব আগে আমি দেব না। কাল রাতে আমি স্বচক্ষে কী দেখেছি তোমার কাছে আগে সেই কথাই বলতে চাই। তুমি জানো, আমার বাড়ি দোতলা। গদাধরকে আমি দোতলার ঘরেই শুইয়ে রেখেছিলুম। পাহারা দেওয়ার জন্যে তার পাশে বসে কাল সারারাত আমি কাটিয়ে দিয়েছি। কালকের রাতের ঝড়-বৃষ্টির কথা তুমিও টের পেয়েছ বোধ হয়। মাঝরাত্রে ঝড়বৃষ্টির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে।

সেইসময় বই পড়তে পড়তে হঠাৎ আমি মুখ তুলে দেখি, জানলার ঠিক বাইরেই একটা স্ত্রী-মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দোতলার ঘর, মাটি থেকে সেই জানলাটা অন্তত বিশ ফুট উঁচু, সেখানে কোনো স্বাভাবিক মানুষের মূর্তির আবির্ভাব যে সম্ভবপর নয়, একথা তুমি বুঝতেই পারছ! আমি অবাক হয়ে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। ঘরের আলো তার মুখের ওপরে গিয়ে পড়েছিল, তাকে দেখেই আমি চিনতে পারলুম। কে সে, কিছু আন্দাজ করতে পারো?’

আমি হতভম্বের মতো ঘাড় নেড়ে জানালুম— ‘না।’

অমূল্যবাবু বললেন, ‘সে মূর্তি হচ্ছে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর! ...কুমুদিনী খুব হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ালুম। তারপর শার্সি খুলে খড়খড়ির পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলুম সজোরে। আমাকে বাধা দেওয়ার জন্যে মূর্তিটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল— কিন্তু বাধা দিতে পারলে না। আমার মনে হল, জানলা বন্ধ করবার সময় তার ডান হাতখানা পাল্লার তলায় পড়ে চেপটে গেল। তারপরেও জানলার ওপরে আরও কয়েক বার করাঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম, কিন্তু সেদিকে আমি আর দ্রক্ষেপও করলুম না। এখন বলো, আমার কথা পাগলের গল্প বলে মনে হচ্ছে?’

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলুম, ‘অমূল্যবাবু, অমূল্যবাবু! আপনি কি বলছেন! মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী—’

অমূল্যবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ‘শোনো। টেলিগ্রামে আমি আর-এক খবর আনিয়েছি। পেশোয়ারে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর স্বামী মারা যান অ্যানিমিয়া রোগে। আর মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীও তাঁর মৃত্যুর পনেরো দিন আগে দেহত্যাগ করেছেন।’

আমার সর্বশরীর কেমনধারা করতে লাগল, টেবিলের একটা কোণ ধরে তাড়াতাড়ি চেয়ারের ওপরে বসে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে অমূল্যবাবুর কাছে আমিও কাল রাত্রে যা দেখেছি, সেই ঘটনাটা খুলে বললুম।

অমূল্যবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

ফিরে দেখলুম, বাংলোর সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে উঠলেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী। তাঁকে দেখেই সর্বপ্রথমে আমার চোখ পড়ল তাঁর ডান হাতের দিকে। তাঁর ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

কুমুদিনীও আসতে আসতে অমূল্যবাবুকে আমার ঘরে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তাঁর মুখে-চোখে এমন একটা অমানুষিক বিস্মী ভাব জেগে উঠল যা কোনোদিন কোনো মানুষেরই মুখে আমি লক্ষ করিনি!

তারপরেই দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তিরের মতন তিনি বারান্দার ওপর থেকে নেমে গেলেন এবং সেইরকম বেগেই সামনের দিকে ছুটে চললেন।

আমি দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে চৌচিয়ে উঠলুম, ‘মিসেস চৌধুরী, সাবধান! ট্রেন, ট্রেন—’

কিন্তু আমার মুখের কথা মুখে রইল; আমার বাংলোর সামনে দিয়ে যে রেলপথ চলে গেছে, কুমুদিনী তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই, একখানা ইঞ্জিন ছড়মুড় করে একেবারে তাঁর দেহের ওপর এসে পড়ল—

ভয়ে আমি দুই চোখ বুজে ফেললুম— সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম তীক্ষ্ণ এক মর্মভেদী আর্তনাদ, তারপরেই সব স্তব্ধ।

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে রইলুম, আমার চারিদিকে পৃথিবী যেন ঘুরতে লাগল এবং সেই অবস্থাতেই শুনলুম অমূল্যবাবু বলছেন, ‘স্থির হও ভাই, স্থির হও! ট্রেনে যে চাপা পড়ল, ও কোনো মানুষের দেহ নয়, ও হচ্ছে কোনো পিশাচের আশ্রিত দেহ।’

৬

ঝাঁঝার গোরস্থানে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর দেহ কবর দেওয়া হল।

তারপর মাসখানেক কেটে গেল। এই ভীষণ ঘটনার ছাপ আমাদেরও মনের ওপর থেকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটা বিষয় সম্বন্ধে এখনও আমাদের মনের ধাঁধা ঘুচল না।

ঝাঁঝায় রক্তস্বল্পতা রোগের বাড়াবাড়ি এখনও কমলো না কেন, তাই নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

অমূল্যবাবু পর্যন্ত ধাঁধায় পড়ে গেছেন। তিনিও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে বলেন, ‘তাই তো হে, রক্তস্বল্পতা রোগটা এখানে সংক্রামক হয়ে দাঁড়াল নাকি? এর কারণ তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।’

কিছুদিন পরে একদিন নদীর ধার থেকে ফিরতে আমার রাত হয়ে গেল। সে রাতটা ছিল চমৎকার, পরিপূর্ণ পূর্ণিমা নদীর জলকে যেন মেজে ঘষে রূপোর মতো চকচকে করে তুলেছে এবং চারিদিক ধবধব করছে প্রায় দিনের বেলায় মতো। এই পূর্ণিমার শোভা দেখবার জন্যেই এতক্ষণ আমি নদীর ধারে অপেক্ষা করছিলুম।

বিভোর হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বাসার পথে ফিরে আসছি। গভীর স্তব্ধতার ভিতরে ঝিল্লিরব ছাড়া আর কোনো কিছুই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পথও একান্ত নির্জন।

প্রাণে হঠাৎ গান গাইবার সাধ হল— এমন রাতের সৃষ্টি তো গান গাইবার জন্যেই!

কিন্তু গান গাইবার উপক্রম করতেই সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল!

অরাজকতা একক্লমিত

পথের একটা মোড় ফিরে প্রায় আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী!

আমার দেখবার কোনো ভ্রম হয়নি, তেমন উজ্জ্বল পূর্ণিমায় ভ্রম হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

ভাগ্যে কুমুদিনী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাই আমাকে তিনি দেখতে পেলেন না। আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে সরে গেলুম।

কুমুদিনী সেই পথ ধরে একদিকে অগ্রসর হলেন, আমি স্তম্ভিত নেত্রে লক্ষ্য করলুম, তাঁর দেহ যেন মাটির ওপর দিয়ে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে না— শূন্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একখানা মেঘের মতন।

পথের বাঁকে সেই অদ্ভুত ও ভীষণ মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং আমিও ছুটতে লাগলুম রুদ্ধশ্বাসে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে।

ছুটতে ছুটতে একেবারে অমূল্যবাবুর বাড়িতে! অমূল্যবাবু বৈঠকখানায় একলা বসে বই পড়ছিলেন, হঠাৎ আমাকে সেইভাবে সেখানে গিয়ে পড়তে দেখে নির্বাক বিস্ময়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন।

আমি প্রায় রুদ্ধশ্বরে বলে উঠলুম, ‘মিসেস চৌধুরী, মিসেস চৌধুরী! অমূল্যবাবু, এইমাত্র মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হল!’

অমূল্যবাবু সিঁথে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ‘তার মানে?’

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, ‘নদীর পথ দিয়ে ফিরে আসছিলুম, মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী প্রায় আমার পাশ দিয়ে এইমাত্র চলে গেলেন।’

‘তুমি ঠিক দেখেছ?’

‘আপনাকে যেমন ঠিক দেখছি, তাঁকেও ঠিক তেমনি দেখেছি।’

‘ওঠো, ওঠো। আর দেরি নয়, এখন আমার সঙ্গে চলো। এখন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করো না।’

অমূল্যবাবু হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বাগানের কোণ থেকে একটা শাবল ও একখানা কোদাল তুলে নিয়ে কোদালখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘এসো!’ আমি যন্ত্রচালিতের মতন তাঁর সঙ্গে চললুম।

আবার সে নদীর পথ। চারিদিক তেমনি নীরব ও নির্জন, আকাশের তেমনি স্বপ্নময় চাঁদের হাসি। নিবিড় বনজঙ্গল ও পাহাড়ের পর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে যেন ছবিতে আঁকা। কিন্তু সেসব দৃশ্য দেখবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না, আমার প্রাণ থেকে সমস্ত কবিত্ব তখন কর্পূরের মতন উবে গিয়েছিল। ঘাসের ওপরে বড়ো বড়ো গাছের ছায়া নড়ছে আর আমি চমকে চমকে উঠছি। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা পেঁচা চোঁচিয়ে উঠল, শিউরে উঠে আমি ভাবলুম, ঝোপে-ঝোপে

অরাজকতা এতকুসিদ্ধ

আড়ালে-আবছায়ায় যেসব অশরীরী দুষ্ট আত্মা রক্ততৃষায় উন্মুখ হয়ে আছে, ওই নিশাচর পাখিটা যেন তাদেরই সাবধান করে জানিয়ে দিলে তোমরা প্রস্তুত হও, পৃথিবীর শরীরী প্রাণী আসছে।

ওই তো ঝাঁঝার গোরস্থান। কবরের পর কবর সারি সারি দেখা যাচ্ছে, তাদের ওপরে ইটের বা পাথরের গাঁথুনি। পাশ থেকে নদীর জলের তান ভেসে আসছে অশ্রান্ত তালে। আমার মনে হল, এতক্ষণ ওই সব কবরের পাথরের ওপরে যেসব ছায়াদেহ বসে বসে রাত্রিযাপন করছিল, আচম্বিতে জীবিত মানুষের আবির্ভাবে অন্তরালে গিয়ে নদীর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে তারা ভয়াবহ কানাকানি করছে।

একটা ঝোপের ভিতরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে অমূল্যবাবু বললেন, ‘এইখানে স্থির হয়ে লুকিয়ে বসে থাকি এসো। সাবধান, কোনো কথা কইয়ো না।’

সারারাত সেইখানে আড়ষ্ট হয়ে দু-জনে বসে রইলুম। সেদিনকার সে-রাতটাকে আর পৃথিবীর রাত বলে মনে হল না, ইহলোকে থেকেও আমরা যেন পরলোকের বাসিন্দা হয়েছি।

চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে। পূর্বদিকে ধীরে ধীরে যেন মৃত রাত্রির বুকের রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। ভোর হচ্ছে।

হঠাৎ অমূল্যবাবু আমার গা টিপলেন। চমকে ফিরে দেখি, নিবিড় বনের ভিতর থেকে মেঘের মতো গতিতে এক অপার্থিব নারীমূর্তি বাইরে বেরিয়ে আসছে—মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী!

অমূল্যবাবু আমার কানে কানে বললেন, ‘আজকের রাতের মতো পিশাচীর রক্তপিপাসা শান্ত হল।’

মিসেস চৌধুরীর দেহ ধীরে ধীরে গোরস্থানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একটা কবরের ওপরে গিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আচমকা শূন্যে দুই হাত তুলে এমন প্রচণ্ড তীক্ষ্ণস্বরে হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি করে অটুহাস্য করে উঠল যে আমার সমস্ত বুকটা যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল! সে কী পৈশাচিক শীতল হাসি! ...তারপর দেখলুম, তার দেহটা ধীরে ধীরে মাটির ভিতরে নেমে যাচ্ছে! খানিক পরেই সে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

পূর্ব আকাশে সূর্যের প্রথম ছটা জেগে উঠল। অমূল্যবাবু এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ‘আর অপেক্ষা নয়। শিগগির আমার সঙ্গে এসো!’

আমরা মিসেস চৌধুরীর কবরের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। অমূল্যবাবু বললেন, ‘আমি শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ি আর তুমি কোদাল দিয়ে মাটি তোলো।’

তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কী জিজ্ঞাসা করলুম না, কারণ আমি তখন আচ্ছন্নের মতো ছিলাম। তিনি যা বলেন, আমি তাই করি।

অলঙ্করণ পরেই কফিনটা দেখা গেল। অমূল্যবাবু বললেন, ‘দেখ, এইবারে আমি কফিনের ডালাটা খুলব তারপর আমি যা করব তুমি তাতে আমাকে বাধা দিও না। খালি এইটুকু মনে রেখো, কফিনের ভেতরে যে দেহ আছে তা কোনো মানুষের দেহ নয়!’

অমূল্যবাবু দুই হাতে টেনে কফিনের ডালাটা খুলে ফেললেন। আমি স্তম্ভিত চক্ষে দেখলুম কফিনের ভিতর শুয়ে আছে মিসেস চৌধুরীর পরিপূর্ণ দেহ! সে দেহ দেখলে মনে হয় না তা কোনোদিন ট্রেনে কাটা পড়েছিল। সেটা একমাস আগে কবর দেওয়া কোনো গলিত মৃতদেহও নয়। তার তাজা মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল, তার ওষ্ঠাধরের চারপাশে তরল রক্তধারা লেগে রয়েছে এবং তার জীবন্ত চোখ দুটো সহাস্য দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে।

অমূল্যবাবু দুই হাতে শাবলটা হঠাৎ মাথার ওপরে তুলে ধরলেন, তারপর সজোরে ও সবেগে শাবলটা মৃতদেহের বুকের ওপরে বসিয়ে দিলেন।

ইঞ্জিনের বাঁশির আওয়াজের মতো এক তীব্র দীর্ঘ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারপর সব চুপচাপ।

[প্রথম প্রকাশ মাসপয়লা পত্রিকায় ১৯৩০-এর দশকে]

দিনে দুপুরে

বুদ্ধদেব বসু

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্রাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড়চড় করে ফুটছে আলপিনের মতো। ওই এতক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আস্তে আস্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্রামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হয়ে ছোটো একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, ‘আপনি কি ডাক্তার?’

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু পর মুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘দেখুন আপনি কি ডাক্তার?’

খুব অবাক হলুম, একটু যেন খুশিও— ‘কী করে বুঝলে?’

‘ওই যে আপনার পকেটে বুক দেখার যন্ত্র। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন?’

মেয়েটি এমনভাবে কথাটা বলল যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কী অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দারুণ রোদ্দুরে আবার হয়তো পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা ভাঙা গলায় কাতরভাবে আবার বলল, ‘চলুন না যাবেন?’

ওসব কথায় কান না দিয়ে ট্রামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলাম না, ট্রামটা মোড় ঘুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটর ঘটর করতে করতে বেরিয়ে গেল।

‘যাবেন তো?’

‘কোথায় তোমার বাড়ি?’

‘চেতলায়— এই কাছেই।’

‘কী হয়েছে, তোমার মা-র?’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

‘কী হয়েছে, জানি না তো। বড়ো অসুখ।’

‘কদিন অসুখ?’

‘অনেকদিন। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন তো।’

মেয়েটির স্নান মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হল, ভাবলুম যাই না, দেখে আসি ব্যাপারটা।

বললুম, ‘চলো।’

‘ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমি তো টাকা দিতে পারব না—’ মেয়েটি আরও কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেল।

‘আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে ভেবো না’, আমি তাড়াতাড়ি বললুম।

নতুন পাশ করে বেরিয়েছি, আত্মীয় বন্ধু মহলে ডাক-খোঁজ পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশ টাকা যে মাসে পাই, সেই মাসেই খুব খুশি। এই তো বন্ধুর ছেলের নিরানব্বই বুঝি জ্বর হয়েছে, ট্রামের পয়সা খরচ করে এসে তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে এতক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরছিলুম। তবু এই মেয়েটিই যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনল।

হেঁটে রওনা হলুম মেয়েটির সঙ্গে কালীঘাট পুলের দিকে। জিজ্ঞেস করলুম, ‘তোমার মাকে আর কোনো ডাক্তার দেখেননি?’

‘ডাক্তার? না। মা বলেন, ডাক্তার দিয়ে কী হবে, এমনিই আমি ভালো হবো। টাকা পাব কোথায়—’

‘তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে? আর কেউ নেই তোমার বাড়িতে?’

‘নাঃ কে আর থাকবে। এক দাদা ছিল আমার সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেল কাটা পড়ল। সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা— এর মধ্যে কেন অসুখ করল মা-র? ডাক্তারবাবু, মা কদিনে ভালো হবেন?’

আমি ডাক্তারি ধরনে হেসে বললুম, ‘সে এখন কী করে বলি?’

‘ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হয়ে আছেন— একবারও চোখ মেলে তাকান না। দেখুন বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এতদূরে এসেছি, যদি কোনো ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার ওপর কোনো ডাক্তার দয়া করেন। ওই তো সব ওষুধের দোকান, ভেতরে পাতলুন পরা ডাক্তাররা বসে— আমার তো সাহস হয় না ভেতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক-ওদিক কেবলই ঘুরছি, এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হল আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ি; কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা— ছি, ছি, এটা কী বললুম; আপনারা কেন গরিবের বাড়িতে যেতে আসবেন? ডাক্তারবাবু, আপনার দয়া আমি কোনোদিন ভুলব না।’

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, জরুরীকর্তব্যে এককুসিভ

‘কিছু না চলো।’

পুল থেকে নেমে জিঙেস করলুম, ‘আর কতদূর?’

‘বাঃ, এইটুকু হাঁটতে পারব না!’

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ দিয়ে ডাকলে, ‘মা মা’।

‘মা মা তোমার জন্য ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে দেখো। মা এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভালো করবেন।’

মেয়েটি বলল, 'ডাক্তারবাবু, ভালো করে দেখুন, মাকে আজই ভালো করে দিন।'

তাড়াতাড়ি বললুম, ‘তুমি একটু বসো, আমি আসছি।’

‘এক্ষুনি আসছি ওষুধ নিয়ে,’ বলে আমি বেরিয়ে গেলুম।

ফেরবার সময় রাস্তাটা বোধ হয় কিছু গোলমাল হয়েছিল; একটু ঘুরপথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। রোজকুরে একটুটা করে তখন আমি কানে পিপি

আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাক্তারের নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার তখন সময় নয়। ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিল না, কে জানে গিয়ে কী দেখব। দরজাটা খোলা দেখে ঢুকলুম, কিন্তু ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম? না, ওই তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, ওই দুটো সুপারি গাছ। দেড় ঘণ্টা আগে এই ঘরটাতেই তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু মেয়েটি কোথায়? তার মুমূর্ষু মা-ই বা কোথায় গেল? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য খুব কমই ছিল, কিন্তু যে কটা ছিল, সে কটাই বা কোথায়?

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই মারা গেল, আর ওর মাকে নিয়ে চলে গেল কেওড়াতলাতে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে তা হতে পারে? ঘরে কিছু জিনিসপত্র ছিল, একটা লঠন, দু-একটা থালা-বাটি সেগুলো?

আস্তে আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল...মনের ভুল? এই রোদুরে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে, আমার পকেটে ইঞ্জেকশন, সব ঠিক আছে না কি আমি পথ ভুল করে ভুল বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি মাথার উপরে যে আগুন ঝরছে সে খেয়ালও নেই। চারিদিকে ছবির মতো চুপচাপ। হঠাৎ দেখি টাকপড়া একটি আধবয়সি লোক আমার পাশে এসে তখন দাঁড়িয়েছে। কোনোখানে কেউ ছিল না, লোকটা হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। তার দিকে তাকাতেই সে বলল, ‘কি মশাই, বাড়িখানা কিনবেন নাকি?’

‘আপনার বাড়ি বুঝি?’

লোকটা ঠোঁট উলটিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, আইনত আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে! কোথাকার এক বিধবা পিসি, জন্মে দু-বার চোখে দেখিনি মশাই— সংসারে কেউ কোনোখানে নেই, আইনের প্যাঁচে ঘুরতে ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়ল আমারই ঘাড়ে। আর বলেন কেন এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ! পিসে টেসলেন তিরিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেল কাটা পড়ল, পিসি যখন স্বর্গগে গেলেন, ভাবলুম ভালোই হল। একটা মেয়ে ছিল—’ হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম সুরে লোকটা বলল, ‘ওসব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।’

আমি কথা বলার জন্য হাঁ করলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোবার আগেই লোকটা বলে চলল, ‘ওই তো এক ফোঁটা বারো বছরের মেয়ে, তা মা-টা যেদিন অন্ধা পেল, পরের দিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়ল। একখানাই শাড়ি ছিল পরনে, সেটা দিয়ে কর্ম সারল। কী ডেপো মেয়ে মশাই! থাকলে আমরা একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দিতুম, বাড়িখানা ছিল তিন পুরুষের,

অরাজকতা প্রকট

একরকম চলে যেত। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা মশাই— হ্যাঁ ভূত না হাতি। আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন, ওসব কথায় কি কান দিতে আছে? নিতে চান তো খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা— আচ্ছা হরেদরে চারশোই দেবেন, যান। জলের দরে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইল, আপনি ইচ্ছে মতো বাড়ি তৈরি করে নেবেন।’

অতি ক্ষীণ স্বরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, ‘কদিনের কথা এটা?’

‘কোনটা? এই পিসির... তা দু-বছর হবে। পিসির জন্যে কোনো ভাবনা ছিল না মশাই, মেয়েটার জন্যে বাড়িটার এমন বদনাম হয়েছে যে, পাঁচ টাকাতে কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো গুনতে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারিনে, উগরাতেও পারিনে। আমি গরিব মানুষ, আমার ওপরে এ জুলুম কেন? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়, রোজ রোজ এসে যে তদবির করব তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে। আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন ... বলুন না।’

[জলছবি, পৌষ ১৩৪৪ (ডিসেম্বর ১৯৩৭)]

ডাইনি

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের একালে ডাইনি নাই। ডাকিনি নাই। মায়াবিনী নাই।

সে হিসেবে একালের ছেলেরা ভাগ্যবান।

আমাদের আমলে, মানে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে ডাইনি ছিল। ডাইনি, ডাকিনি, মায়াবিনী। একালের ছেলেরা ডাইনি ডাকিনির কথা শুনে হেসে উঠবে। কিন্তু সে আমলে আমাদের অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যেত এদের নামে।

আমাদের গ্রামে আমাদেরই বাইরের বাড়ির পূর্বপ্রান্তে বড়ো একটা পুকুর, বড়ো বড়ো তালগাছে ঘেরা। তার উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনির ঘর।

একেবারে গ্রামের প্রান্ত। একপাশে জেলেপাড়া— অন্য পাশে বাউরিপাড়া— মাঝখানে খানিকটা খালি জায়গা। সেই খালি জায়গায় একটা অশ্বখ গাছ। সেই গাছতলায় ছোটো একখানি ঘর। তারপর, অর্থাৎ স্বর্ণের বাড়ির পর পূর্বদিকে আর বসতি নাই, প্রান্তর চলে গিয়েছে। বালি আর লালচে মাটির প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যে লালুকচাঁদা নামে পুকুরটা ছিল গ্রামের শ্মশান, এখানে অবশ্য শবদাহ করা হত না, মুখাণ্ডি করা হত। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকত— মড়ার বিছানা মাদুর, বালিশ ন্যাকড়া বাঁশ, মাটির সরা ভাঁড় আধ-পোড়া কুঁচি কাঠি। পুকুরটার উপরে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। দিনের বেলাতেও কেউ সে গাছতলায় যেত না। রাত্রে সেটা জমাট অন্ধকারের মতো থমথম করত।

স্বর্ণ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকত— সেই বটগাছটার দিকে।

আমরা তাই ভাবতাম।

নইলে— প্রান্তরটা যেখানে শেষ হয়েছে— সেখানেই শুরু হয়েছে ধানের খेत। সবুজ শস্যক্ষেত্র। কিন্তু ডাইনি কি সবুজ ভালোবাসে? না— বাসতে পারে?

স্বর্ণ ডাইনি। আমাদের দেশের ভাষায় ‘স্বনা ডান’।

শুকনো কাঠির মতো চেহারা, শক্ত দু-পাটি দাঁত, একটু কুঁজো, মাথায় একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। চোখ দুটো নরুণে-চেরা চোখের মতো ছোটো। তাতে

খয়েরি রঙের তারা। বিচিত্র স্থির দৃষ্টি। ভাবলেশহীন শুষ্ক— যেন খটখট করত দুটো হলদে পাথর ওই শুকনো ডাঙার বুকে। ডাইনির দৃষ্টি!

এই দৃষ্টিতে ডাইনিরা কচি নধর দেহের, সুন্দর সুশ্রী মানুষের, তরুণী নববধূর দেহের অস্থি চর্ম মেদ মাংস ভেদ করে— ভিতরে প্রবেশ করে— খুঁজত প্রাণপুত্তলি। তাকে পেলে চুষে চুষে তারা খেয়ে ফেলে। নধর মানুষ শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে যায়, সোনার মতো দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়; তরুণী নববধূর সব লাভণ্য ঝরে পড়ে; শুধু মানুষ কেন কচি পাতায় ভরা লকলকে সতেজ গাছ অকস্মাৎ শুকিয়ে যায়। ডাইনিরা তারও সরস প্রাণটুকু দৃষ্টিযোগে পান করে নেয় নিশ্চেষ্টে।

সুন্ধ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তালগাছের মাথায় চিল চ্যাঁচায়— চি-ই-ই-লো! চি-ই-ই-লো, চি-ই-ই-লো!

কান পেতে শুনলে শুনতে পাওয়া যায়— ঘরের দাওয়ায় বসে ডাইনি তার সুরে সুর মিলিয়ে সংগীত গাইছে— অনুনাসিক মিহি সুরে গাইছে— হিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ। হিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ!

রাত্রে— গভীর রাত্রে স্বর্ণ ডাইনির ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায়— শব্দ উঠছে— হুট-পাট, হুট-পাট, হুট-পাট।

বাট বইছে স্বর্ণ। যারা ডাইনি তারা ভগবানের অভিশম্পাতে রাত্রে মাটির উপর বুকে হেঁটে বেড়ায়। বাট বয়।

ভয় হয় না এর পর?

* * *

স্বর্ণ তরিতরকারি বেচে বেড়াত। ওই ছিল তার জীবিকা। তিন-চার ক্রোশ দূরের হাট থেকে কিনে আনত, বেচত আশপাশের গ্রামে। পান, কাঁচকলা, পাকারঙা, শাক, কুমড়া এইসব। আমাদের গ্রামে সে বেচত না। আশপাশের গ্রামেই বেচত। গ্রামের কারও বাড়িতে ঢুকতে সে চাইত না। কী জানি— কার অনিষ্ট সে কখন করে বসবে! তার ভিতর যে লোভটা আছে, সে যখন লক লক করে জিভ বার করে— তখন তো স্বর্ণের বারণ শুনবে না। কিন্তু স্বর্ণ যে লজ্জায় মরে যাবে। ছি-ছি-ছি! ওর ভিতরের ডাইনিটা তো ওর অধীন নয়। সেই তো ওর জীবনের মালিক, তারই হুকুমে ওকে চলতে হয়। তার হুকুম ছাড়া ওর মরবারও অধিকার নেই। তার ভিতরের যে ডাইনিটা— সে যে এক সিদ্ধ-বিদ্যা, তাকে কোনো নতুন মানুষকে না-দেওয়া পর্যন্ত স্বর্ণ মরবে না।

স্বর্ণের মাসি কি কে যেন ছিল ডাইনি।

মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজনদের খবর পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেউ যায়নি। ভয়ে যায়নি, যদি সে কোনো কৌশলে তাকে দিয়ে যায় ওই সর্বনাশা ভয়ংকর বিদ্যা! সে যে ডাইনি হয়ে যাবে।

মৃত্যুর পর স্বর্ণ গেল। নিশ্চিত হয়েই গেল। বিদ্যা সে তো কাউকে দিয়ে

অরাজকতা প্রকৃতিসিদ্ধ

গিয়েছে। নইলে মরণ হল কেমন করে? গিয়ে দেখলে— তখন মাসির অনেক আত্মীয় এসেছে, মাসির যা ছিল ভাগ করে নিয়েছে। সকলে চলে গেল। বিধবা তরুণী স্বর্ণ বসে রইল দাওয়ার উপর। তার যেমন অদৃষ্ট!

হঠাৎ ম্যাও ম্যাও শব্দ করে মাসির পোষা বেড়ালটি তার গা ঘেঁষে বসল। ওটাকেই কেউ নিয়ে যায়নি। বেড়ালটা তার গায়ে গা ঘষলে, গর গর শব্দ করলে, লেজটা উঁচু করে তার নাকে-মুখে ঠেকিয়ে দিলে। যেন বললে— আমাকে তুমি নিয়ে চলো। তুমি কিছুই পাওনি, আমাকেও কেউ নেয়নি।

স্বর্ণের মায়া হল। নিয়ে এল বেড়ালটা। মাছ ভাত দুধ খাওয়ায়, কোলের কাছে নিয়ে শোয়। পাশের জেলে পাড়ায় যায়, বাউরি পাড়ায় যায়।

সেদিন হইচই উঠল জেলে পাড়ায়।

জেলেদের একটা কচি ছেলের কী হয়েছে। ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে, আর কাঁদছে— কাঁদছে যেন বেড়ালের মতো আওয়াজ করে! —এ্যাঁ-ও। অবিকল বেড়ালের শব্দ।

গুণিন এল। গুণিন দেখে বললে— ডাইনির কাজ! কিন্তু—
কিন্তু কী?

ডাইনটা মনে হচ্ছে—

বলতে হল না শেষটা— স্বর্ণের বেড়ালটা ছুটে এল উঠনে, রোঁয়া ফুলিয়ে লেজ ফুলিয়ে— এ্যাঁ-ও শব্দ করে থাবা পেতে বসল।

—এই। এই তো বেড়ালটা, এইটাই ডাইন।

—বেড়াল ডাইন?

—হ্যাঁ। কোনো ডাইন মরবার সময় ওকে দিয়ে গেছে ডাইনি বিদ্যে।

—ঠিক কথা। স্বর্ণের মাসি ছিল ডাইনি। বেড়াল তো তারই! কী সর্বনাশ!

একটা জোয়ান জেলের ছেলে— দুরন্ত ক্রোধে— বসিয়ে দিলে এক লাঠি তার মাথার উপর। মাথাটা প্রায় চুর হয়ে গেল। কিন্তু তবু মরল না। লেজ পাছড়াতে লাগল, নখগুলো বের করে মাটির উপর আঁচড়াতে লাগল।

গুণীন বললে— সাবধান! কেউ কাছে যাবে না। ও এখন ডাইন মন্ত্রটি দেবার চেষ্টা করবে। নইলে ওর মৃত্যু হবে না।

সে মন্ত্র পড়লে, নিজের অঙ্গবন্ধন করলে— তারপর সন্তর্পণে লেজে ধরে— বের করে ফেলে দিয়ে এল গ্রামের প্রান্তে।

স্বর্ণ ঘরে বসে সভয়ে কেঁপে উঠল।

লোকে তাকে গাল দিয়ে গেল। কেন এনেছিল সে ওই পাপকে।

সন্দের মুখে ক-টি ছেলে পথ দিয়ে গেল— তারা বলে গেল— বেড়ালটা এখনও মরেনি। ইঃ— কী গোঙাচ্ছে; বাপরে! শিউরে উঠল তারা।

স্বর্ণ গেল চুপি চুপি। না-দেখে থাকতে পারলে না।

সাদা দুধের মতো বেড়ালটার রং— রক্তে-ধুলোয় পিঙ্গল হয়ে গেছে।—কী যজ্ঞশব্দে শব্দ!

স্বর্ণ এগিয়ে গেল— দু-পা, এক-পা করে।

তাকে স্পর্শ করলে।

বেড়ালটা মরে গেল।

স্বর্ণের এ কী হল?

স্বর্ণের চোখে এ কী দৃষ্টি! এ কী হল তার? এ সব সে কী দেখছে? ওই যে গর্ভবতী ছাগলটা যাচ্ছে— তার গর্ভের মধ্যে দুটি ছাগল ছানাকে দেখতে পাচ্ছে। ওই যে কলা গাছটা— ওর ভেতর দেখতে পাচ্ছে— কলার মোচা।

তার জিভ সরস হয়ে উঠছে! লক লক করে উঠছে!

এ কী হল তার? হে ভগবান!

* * *

এমনি করে নাকি স্বর্ণ হয়েছিল ডাইনি।

সে আবার কাউকে ডাইনি বিদ্যে দেবে— তবে তার মরণ হবে। নইলে ওই মাথা-ভাঙা বেড়ালটার মতো কাতরাবে, কাতরাবে, কাতরাবে— তবু তার মৃত্যু হবে না।

মৃত্যু চোখের সামনে বসে থাকবে।

ও বলবে— আমাকে নাও গো! আমাকে নাও।

মৃত্যু বলবে— কী করে নেব? ওই বিদ্যে তুই আগে কাউকে দে— তবে নেব। নইলে তো পারব না! স্বর্ণের হাত নাই তার ভিতরের ডাইনির উপর। সে কি গ্রামের কারুর বাড়ি যেতে পারে? বাপরে!

আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমি বলতাম— স্বর্ণ পিসি।

ছেলেবেলায় কখনো তার সামনে যেতে সাহস হত না। বড়ো হবার পর ওপাথে গিয়েছি-এসেছি; নিজের ঘরের আধো-অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। চুপ করে বসে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে— তাড়াতাড়ি দু-একটা জবার দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত।

আমার বিশ-বাইশ বছর বয়স যখন হল, তখন আমি তার বেদনা বুঝলাম। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেও সে বিশ্বাস করত সে ডাইনি। কাউকে স্নেহ করে সে মনে মনে শিউরে উঠত। কাউকে চোখে দেখে ভালো লাগলে চোখ বন্ধ করত; চোখের ভালো লাগার অবাধ্যতাকে তিরস্কার করত। তার আশঙ্কা হত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে;—হয়তো-বা খেয়ে ফেলেছে বলে শিউরেও উঠত। মনে হত ডাইনিমন্ত্র বিষাক্ত তার ভালোবাসা— লোভ হয়ে তিরের মতো গিয়ে তাকে বিঁধে ফেলেছে তার হৃৎপিণ্ডে।

ডাইনিতে আজ আর বিশ্বাস করি না। এ-কালের ছেলেরাও করে না। কিন্তু স্বর্ণ ডাইনির ডাইনিত্বের একটি বিচিত্র পরিচয় আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই কথাটি বলব।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। কিন্তু ঘটনাটি আজও মনে হয় এই ক-দিন আগের দেখা ঘটনা। হঠাৎ শুনলাম— ও-পাড়ার অবিনাশ দাদাকে স্বর্ণ ডাইন খেয়েছে। অর্থাৎ ডাইনে নজর দিয়ে— দৃষ্টিবানে বিদ্ধ করেছে, তার ভিতরে প্রবেশ করে তাকে শুষে খাচ্ছে। গ্রামটা একেবারে তোলপাড় করে উঠল। বিখ্যাত গুণিন ছিলেন আমাদেরই বাড়িতে। আমার বাবা গ্রামের বাইরে বাগানে তারা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেইখানে থাকতেন এক সন্ন্যাসী— পশ্চিম দেশীয় সাধু। আমি তাঁকে বলতাম গোঁসাইবাবা; অর্থাৎ গোস্বামী বাবা। তিনি জানতেন অনেক বিদ্যা। তাঁকে খবর দেওয়া হল। তিনি এলেন; আমি তাঁরই সঙ্গে গেলাম স্বর্ণ ডাইনের কীর্তি দেখতে এবং গোঁসাইবাবার ডাইন তাড়ানো দেখতে।

অবিনাশ দাদা, অবিনাশ মুখুজ্জের বয়স তখন সতেরো-আঠারো। বাড়িতে আছে মা আর দুই বোন। অবিনাশ দাদার মা— গোঁসাইবাবাকে বলেন গোঁসাই দাদা। অবিনাশ দাদা বলেন— গোঁসাই মামা। অবিনাশ দাদার বাড়ি তখন লোকে লোকারণ্য; স্বর্ণ ডাইন অবিনাশকে খেয়েছে, রামজি সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠার উপরে অবিনাশ দাদা শুয়ে আছেন চোখ বন্ধ। প্রবল জ্বর। ডাকলে সাড়া নাই। মাথার শিয়রে বসে মা। পাশে বসে বোন। চোখের জল ফেলছেন। রামজি সাধু গিয়ে একপাশে বসলেন তার পাশেই আমি।

ডাকলেন— ভাগনা। অবিনাশ ভাগনা।

কোনো উত্তর দিলেন না অবিনাশ দাদা।

—অবিনাশ! এ! গায়ে নাড়া দিলেন।

এবার অবিনাশ ঘুরে শুল। বললে— মর হা-ঘরে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে। আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন?

—হঁ! তু কৌন? মেয়েছেলে? কে রে তু?

অবিনাশ উত্তর দিল না।

—এ! তু কে রে? এ?

—বলব না।

—বলবি না।

—না।

মন্ত্র পড়া শুরু হল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়েন আর ফুঁ দেন— ছু! ছু! ছু!

পরিব্রাহি চিৎকার করে অবিনাশ। —বলছি, বলছি, বলছি!

তবু মন্ত্র পড়া চলল, সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকার। —ছু! ছু! ছু!

অরাজকতা এগ্রক্লুসিভ

—বাবা রে, মা রে! মরে গোলাম রে! ও গোঁসাই আর মেরো না! বলছি আমি বলছি।

—বোল! বোল তু কে? বোল!

—আমি স্বর্ণ!

আজও স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি। —আমি স্বর্ণ! চোখে সব দেখতে পাচ্ছি।
থাক সেকথা!

গোঁসাই প্রশ্ন করলেন— স্বর্ণ? তু কাহে হিয়া? আঁ? এখানে কাহে?

—আমি একে খেয়েছি যে।

—হাঁ— হাঁ। উ তো জানছি। ওহি তো শুধাচ্ছি— কাহে— কাহে খেলি?

—কী করব? আমার ঘরের ছামনে দিয়ে এই বড়ো বড়ো আম হাতে নিয়ে
যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেললাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে? কাহে বললি না— হামাকে দাও?

—কী করে বলব? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায়
বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা। ভাগ।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে বলো না।

আদেশের সুরে গোঁসাই বললেন— যা তু। আমি বলছি।

—না। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনি।

—না? আচ্ছা। এ দিদি, আন সরষা।

সরষে এল। হাতের মুঠায় সরষা নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে— ছুঁ শব্দে ফু
দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশ দাদার গায়ে।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল অবিনাশ দাদা— বাবারে, মারে, ওরে মেরে ফেললে
রে। ওরে বাবা রে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না। আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ, যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশ কেঁদে উঠল— ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না? চালাকি লাগাইয়েছিস, আঁ? হাত তুললেন রামজি সাধু,
মারবেন ছিটে। অবিনাশ চিৎকার করলে আবার— না না। যাব, যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

—তব্ এক কাম কর। ঘরের বাহারে একঠো কলসিমে জল আছে, দাঁতে
উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জুরে অচেতন অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজিবাবা বললেন— না। ঘর থেকে অবিনাশ বের হল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দোতালার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসি আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধরেই সে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসিটা খসে পড়ে ভেঙে গেল, সে নিজেও পড়ে গেল মাটির উপর— ধরলেন গোঁসাইবাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সদ্য-যুবা অবিনাশকে ছোটো ছেলেটির মতো পাঁজাকোলে করে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুয়ে দিলেন। গোঁসাইবাবার পাশে পাশেই রয়েছে আমি। এবার গোঁসাইবাবা ডাকলেন— অবিনাশ! মামা!

—আঁ?

—কেমন আছ?

—ভালো আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশ দাদার জুর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিন্তে ডাইনি আতঙ্ক দৃঢ়বন্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে দফা যে মার খেয়েছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

অনেকদিন পর, তখন আমার বয়স তেরো-চোদ্দো বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান তরকারি নিয়ে আসত। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ।

স্বর্ণ আসত এর পর আমাদের বাড়ি। আমার ভয় চলে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ পৃথিবী পরিত্যক্ত স্বর্ণ।

স্বর্ণ ছাড়া আরও অনেক ডাইনি ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক বেশি। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশ্বখগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশ্বখগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়েছিল। একদিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, মনে হত গাছটার আধখানা আছে আধখানা নাই। শুনতাম ওটা ডাকিনির গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারি এক গুণিন। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরমকালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে বসে কয়েক জন বন্ধুবান্ধব মিলে গান গল্প করছে, এমন সময় আকাশপথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলেছে। সকলে বিস্মিত হল— এ কী? আশ্চর্য মেঘ তো!

অরাজকতা এককুসিভ

গুণিন হেসে বললে— মেঘ নয়, গাছ উড়ে চলেছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে? —কি বলছ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনি বিদ্যা যারা জানে, তারা গাছে বসে বিদ্যার প্রভাবে গাছকে উড়িয়ে নিয়ে চলে— দেশ থেকে দেশান্তর। ডাকিনি চলেছে আকাশপথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে— তুমি ধোঁকা দিচ্ছ।

—দেখবে?

—দেখাও।

গুণিন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে একটা চিৎকার উঠল, চিলের মতো চিৎকার, একসঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল দুরন্ত ক্রোধে আকাশের বুক চিরে চিৎকার করে উঠল, ঈ—!

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণিন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ করেই চলল। মেঘের মতো জিনিসটির গতি থামল না, কিন্তু সে সামনে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপর নেমে এল এক অশ্বখগাছ। গুণিনের মন্ত্র তখনও থামেনি। মাটি ফাটল, গাছের শিকড় মাটির সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি এখানে জন্মানো গাছের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা— গাছের মাথায় দেখা দিল অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে, একপিঠ এলোচুল কিন্তু সম্পূর্ণ বিবস্ত্র।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনি বললে— আমাকে নামালে তুমি গুণিন, দশের সামনে এই অবস্থায়! আমাকে লজ্জা দিলে? আমি ডাকিনি হলেও মেয়েছেলে, আমার লজ্জা রক্ষা করো, আমাকে কাপড় দাও।

গুণিন হাসল।

ডাকিনি তখন হাত বাড়িয়ে বললে দাও, কাপড় দাও।

গুণিন হেসে ঘাড় নাড়লে। —সবুর করো। সবুর করো।

কিন্তু যারা গুণিনের সঙ্গী— তাদের সবুর হল না; একজন বললে— ছি ভাই! গুণিন তাকে ধমক দিলে— না।

ততক্ষণে আর একজন অতর্কিতে গুণিনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুড়ে দিলে। গুণিন আঁতকে উঠল— করলি কি? করলি কি?

ডাকিনি খিলখিল করে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিকে ঢেকে নিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের দিকে গামছাটার প্রান্তটা ধরে উপরের দিকে টেনে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার করে ফেলে দিলে। গুণিন মর্মান্তিক চিৎকার করে উঠল— সকলে সভয়ে দেখলে, গুণিনের দেহের চামড়াও পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশ মাথার দিকে গুণিনের পিছনের দিকে উলটে গেল। চামড়া

ছাড়ানো মানুষটা পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল। ডাকিনির খিলখিল হাসি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে। গুণিন সেই অবস্থাতেই তখনও মস্ত পড়ছিল; মস্ত আধখানার বেশি পড়তে পারলে না সে। গাছটা আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মতো চলে গেল— কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে। ওই অশ্বথ গাছটা সেই আধখানা গাছ।

আজ সে কালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনিও আজ আর নাই বললেই হয়। ডাইনিতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে যারা আজও ডুবে আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে। সে কালের ডাইনির বিচিত্র গল্পও আজ লোকে ভুলে আসছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শুধু অন্ধ বিশ্বাসই তো নাই— আছে কত মানুষের মর্মান্তিক বেদনা। সারাটা জীবন তারা এই অপবাদের গ্লানি বহন করে চলত, নিজেরাও বিশ্বাস করে নিত এই অপবাদকে সত্য বলে, আর ভগবানকে ডাকত— স্বর্গের মতো— আমার এ-লজ্জার বোঝা নামিয়ে দাও প্রভু, এ ভয়ংকর জীবনের অবসান করো। চোখের জল মুছে ফেলত কাপড়ের আঁচলে; মাটিতে কোনোক্রমে একফোঁটা ঝরে পড়লে শিউরে উঠত; মা বসুমতীর বুক যে জ্বলে উঠবে!

[মৌচাক, বৈশাখ ১৩৫৮ (এপ্রিল ১৯৫১)]

কাশী কবিরাজের গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার উঠোন দিয়ে রোজ কাশী কবিরাজ একটা ছোট ব্যাগ হাতে যেন কোথায় যায়। জিজ্ঞেস করলেই বলে, এই যাচ্ছি সনকপুর রুগি দেখতে, ভায়া।

একদিন বললে, নৈহাটি যাচ্ছি রুগি দেখতে, সেখান থেকে শ্যামনগর যাব।

—সেখানেও আপনার রুগি আছে বুঝি?

—সব জায়গায়। কলকাতায় মাসে দু-বার যাতি হয়।

আমার হাসি পায়। কাশী কবিরাজ আমাদের গ্রামে বছরখানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসে বাসা করেছে। জঙ্গলের মধ্যে একখানা দোচালা ঘর। আমগাছের ডালপালায় ঢাকা। দিনে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। ছেঁড়া কাপড় পরে কাশী কবিরাজের বউকে ধান সেদ্ধ করতে দেখেছি। এত যদি পয়সা, তবে এমন অবস্থা কেন?

একদিন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আকাশে ঘন মেঘ এসে জমল। বৃষ্টি আসে আসে। কাশী কবিরাজ দেখি আমার উঠোন দিয়ে হনহন করে চলেছে ব্যাগ হাতে।

ডেকে বললাম— ও কবিরাজমশাই! শুনুন, শুনুন, কোথায় চললেন? বৃষ্টি আসছে।

কাশী কবিরাজ আমার চণ্ডীমণ্ডপে এসে উঠে বসল।

বললে— একটু রানাঘাট যাতাম এই ট্রেনে, রুগি ছেলো।

—কে রোগী?

—একজন মাদ্রাজি। পা ফুলে বিরাট হয়েছে, সব ডাক্তারে জবাব দিয়েচে। তিনবার এক্স-রা কন্টি গিয়োলো। আমি বলিচি, এসব এক্স-রা টেক্স-রা আমার সঙ্গে লাগবা না। আমার মুখিই এক্স-রা...

আমার হাসি পেল। নিজের যদি অত গুণ, তবে দোচালায় বাস করো কেন জঙ্গলের মধ্যে? লম্বা লম্বা কথা বললেই কি লোকে তোমাকে বড়ো কবিরাজ ভাববে?

—একটু চা খান, দাদা।

—তা খাওয়াও ভাই, বৃষ্টি এল। একটু বসেই যাই।

—আপনার পসার তাহলে বেশ বেড়েছে?

—বাড়বে কী ভায়া, বরাবর আছে। আমার তাত্ত্বিক কবিরাজি। যা কেউ সারাতি পারবে না, তা আমি সারাব।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

—বলে কী?

—এইজন্যেই তো আমার পসার। শুধু ঝাড়ানো-কাড়ানো—

—ঝাড়িয়ে রোগ সারিয়েছেন?

—আরে, এ পাগল বলে কী? বড়ো বড়ো রোগ ঝাড়িয়ে সারিয়েচি।

—বটে!

—তোমরাই ইংরাজি লেখাপড়া জানো কিনা, সমস্ত অবিশ্বাস করো জানি।

ভূত মানো?

এই রে! ঝাড়ফুঁক থেকে এবার ভূত-প্রেতে এসে পৌঁছুল! কাশীনাথ কবিরাজ অনেক কিছু জানে দেখছি। বললাম— যদি বলি মানিনে?

—তা তো বলবাই, ইংরাজি পড়াতে তোমাদের ইহকালও গিয়েছে, পরকালও গিয়েছে! রাগ করো না, ভায়া। সত্যি, তাই বললাম। চা এসেছে? তাহলে একটা গল্প শোনো বলি। আমার নিজের চোখে দেখা।

খুব বৃষ্টি এসে পড়ল। চারিদিক অন্ধকার করে এল। কাশীনাথ কবিরাজ তার গল্প আরম্ভ করল।

কাশীনাথ কবিরাজ তাত্ত্বিক-মতে চিকিৎসা করে বলে অনেক দূর দূর থেকে তার ডাক আসে। আজ বছর দশেক আগে হরিহরপুরের জমিদার শিবচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ি থেকে তাঁর চিকিৎসার জন্যে কাশীনাথের ডাক এল।

আমি বললাম— আগে কখনো সেখানে গিয়েছিলেন আপনি?

—না।

—নাম জানতেন?

—খুব। আমাদের ওদেশে হরিহরপুরের জমিদারের নাম খুব প্রসিদ্ধ।

—যখন গিয়ে পৌঁছোলেন, তখন বেলা কত?

—সন্দের কিছু আগে। তারপর শোনো...

কাশীনাথ ওদের বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। সেকেলে নামকরা জমিদার, মস্তবড়ো দেউড়ি, দু-তিন মহল বাড়ি। দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘর, তার পাশে একটা বড়ো বারান্দা। ওদিকে ঠাকুরদালান, বাইরে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ। তবে এসবই ভগ্নপ্রায়— পূর্বের সমৃদ্ধি ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, বড়ো বড়ো বট-অশ্বথের গাছ গজিয়েছে বাড়ির গায়ে। মন্দিরের চুড়োর ফাটলে বন্য শালিকের গর্ত, কাঠবিড়ালির বাসা। সামনে বড়ো একটা আধ-মজা দিঘি পানায় ভরতি।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই মস্তবড়ো পুরোনো ভাঙা বাড়ি দেখে কাশীনাথের মনে কেমন এক অপূর্ব ভাব হল।

আমি বললাম— কী ভাব?

—সে তোমাদের বলতে পারিনে, ভায়া। ভায়াও না, আনন্দও না। কেমন যেন

মনে হল, এ বড্ড অপয়া বাড়ি। এ ভিটেতে পা না দেওয়াই ভালো আমার পক্ষে। তোমার হবে না, কিন্তু আমার হয় বাপু, এমনি।

—অন্য কোথাও হয়েছে?

—আরও দু-একবার হয়েছে এমনি। কিন্তু সেকথা এখন আনবার দরকার নেই। তারপর বলি শোনো না—

তারপর কাশী কবিরাজ সেখানে গিয়ে রোগী দেখল। দশ বৎসর বয়সের একটি ছেলের টাইফয়েড জ্বর, খুব সংকটাপন্ন অবস্থা। কাশী কবিরাজ গিয়ে তাত্ত্বিক প্রশালীতে ঝাড়ফুক করে শেকড়বাকড়ের ওষুধ বেটে খাওয়াল। রোগী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠল।

অনেক রাত্রে কাশী খাওয়া-দাওয়া সেরে দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখল, সেখানে তার জন্যে শয্যা প্রস্তুত। উৎকৃষ্ট শয্যা, দামি নেটের মশারি, কাঁসার গেলাসে জল ঢাকা আছে, ডিবের বাটিতে পান— সব ব্যবস্থা অতি পরিপাটি।

আমি বললাম— বড়োলোকের বাড়ির বন্দোবস্ত।

—হাজার হোক, বনেদি ঘর তো? যতই অবস্থা খারাপ হোক, পুরোনো চালচলন যাবে কোথায়?

—তারপর?

কাশী কবিরাজ বেশিক্ষণ শোয়নি, এমন সময় সে দেখল ঘোমটাপরা একটি বউ হনহন করে মাঠের দিক থেকে এসে দেউড়ির মধ্যে দিয়ে জমিদারবাড়ি ঢুকছে। কাশী খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। এত রাত্রে বাইরের মাঠ থেকে এসে বাড়ি ঢুকল কে? ভদ্রলোকের ঘরের সুন্দরী বধূ বলেই মনে হল, যতটুকু দেখেছে তা থেকেই।

যাক সে এসেছে কবিরাজি করতে, অতমতো খোঁজে তার কী দরকার? যে যা ভালো বোঝে করুক।

আমি বললাম— রাত তখন কত?

—রাত একটার কম নয়, বরং বেশি।

—যেদিক থেকে এল, সেদিকে কোনো লোকালয় নেই?

—না, মশাই। ফাঁকা মাঠ অনেকখানি পর্যন্ত, তারপর কোদালে নদী। কোদালে নদীতে গরমকালে জল থাকে না। হেঁটে পার হওয়া যায়— তার ওপারে বলরামপুর গ্রাম।

—আপনি কী করে বুঝলেন ভদ্রবংশের মেয়ে?

—হাত-পায়ের যতটুকু খোলা, ধবধবে ফর্সা। আধ-জ্যোৎস্না রাত, আমি দিবা টের পাচ্ছি— মুখখানা অবিশ্যি ঘোমটায় ঢাকা ছেলো।

—বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় অন্য কোনো লোক সেখানে ছিল?

—না।

—আপনাকে টের পেয়েছিল?

অরাজকতা এককুসিভ

—কোনোদিকে না চেয়ে হনহন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কাশী কবিরাজ নির্বিরোধী ভালো লোক, সে জলের গেলাস তুলে খানিকটা জল খেয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম আর আসে না, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। লোকে বাড়িতে চিকিৎসক ডাকে ঘুমবার জন্যে নয়। কাশী কবিরাজ অভিজ্ঞ লোক, দায়িত্ববোধ তার যথেষ্ট, সে অবস্থায় তার চোখে ঘুম আসে কী করে?

মিনিট খানেক পরে কাশী হঠাৎ দেখলে, সেই বউটি তার পাশের দেউড়ি দিয়ে আবার বার হয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে তড়াক করে উঠে পড়ল। বউটি ক্রমে দূরে মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় তার সাদা কাপড় দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম— মাঠের দিকে গেল একা?

—একদম একা। আর এত রাত!

—আপনি কী ভাবলেন?

—আমি আর কী ভাবব, মশাই, একেবারে অবাক। এত রাত্রে একটি সুন্দরী মেয়ে এমনভাবে যে নির্জন মাঠের দিকে চলে যেতে পারে, তা কখনো দেখিওনি।

কাশী কবিরাজ সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে একজন ছুটে এসে বললে, শিগগির আসুন, কবিরাজ মশাই, রোগী কেমন করছে।

কাশী গিয়ে দেখে, রোগীর অবস্থা সত্যিই খারাপ। কিন্তু হঠাৎ এত খারাপ হওয়ার কথা তো নয়। যাহোক তখনকার মতো ব্যবস্থা করতে হল। অনেকক্ষণ খাটুনির পরে রোগী খানিকটা সামলে উঠল। তখন আবার এসে শুয়ে পড়ল কাশীনাথ বাইরের দেউড়ির ঘরে।

এরপর রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকেই চলল। জমিদারবাবুর মন বেশ ভালো— প্রথম দিন বড়োই যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। এমনকী কবিরাজের সঙ্গে বসে দুপুরের পর খানিকক্ষণ পাশাও খেললেন। কবিরাজ তাঁদের বড়ো দিঘিতে একদিন মাছ ধরতে যাবার আমন্ত্রণও জানালেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও দুপুরে বেশ ভালোই হল— মাছের মুড়ো, দুধ, সন্দেশ ইত্যাদি। কবিরাজ খুব খুশি। জমিদারবাবু বেশ প্রফুল্ল।

সেই রাত্রে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এমন ধরনের ব্যাপার কাশী কবিরাজ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

রোগীর অবস্থা ভালো থাকার দরুন সেদিন আর বেশি খাটুনি ছিল না ওর। সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে শয্যা আশ্রয় করল। কিন্তু ঘুম আসতে দেরি হতে লাগল। কোথাকার ঘড়িতে একটা বেজে গেল ঢং করে। ঠিক সেইসময়ে দেখলে কবিরাজের বড়ো বিস্ময়বোধ হল। কী সাহস মেয়েটার! এত রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে আসতে ভয়ও কি করে না?

মিনিট পনেরো কেটে গেল, কী বিশ মিনিট। তারপর কাশী কবিরাজকে আশ্চর্য স্তম্ভিত করে দিয়ে সেই বউটি ~~ওর ঘরে এসে~~ ঢুকল।

আমি বললাম— আপনার ঘরে?

—হ্যাঁ, একেবারে আমার সামনে।

—ঘরে আলো ছিল?

—বাড়িতে রোগী থাকার দরুন আমার ঘরে সারারাতই একটা হারিকেন জ্বলে।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মুখের ঘোমটা অনেকখানি তুলে কবিরাজের দিকে চাইল। বেশ সুন্দরী মহিলা। দেখলে সম্রমের উদ্বেক হয়, এমনি চেহারা। কাশী কবিরাজকে বলল— তুমি এখানে থেকে না, চলে যাও এখান থেকে।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত কাশী কবিরাজ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বলল— আপনি কে, মা?

—আমি যেই হই, তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

—মা, আমি চিকিৎসক। রুগি দেখতে এসেছি। আমার কাজ না সেরে আমি কী করে যাব?

—তুমি এ রুগি বাঁচাতে পারবে না। কাল সকালে তুমি চলে যাও এখান থেকে।

—কী করে আপনি জানলেন রুগি বাঁচবে না?

—আমি ওর মা। ওর সম্ভ্রম ওকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, সে কষ্ট আমি দেখতে পারছি। আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেছি। নিয়ে যাবই। তুমি তাকে কিছুতেই রাখতে পারবে না।

কাশীনাথ কবিরাজ তখনও ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেনি। সে আমতা আমতা করে বললে— আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি মারা যাওয়ার পরে আজ চার বছর হল ওর বাবা আবার বিয়ে করেছে। আমার সেই সতীন ওকে বড়ো যত্ন দিচ্ছে। আমি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারি না— খোকা আপন মনে কাঁদে। আমি শুনতে পাই। ওকে আমি নিয়ে যাবই। তুমি কেন অপযশ কুড়াবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

কাশীনাথের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছে যেন। কী ব্যাপারটা সামনে ঘটছে, তার যেন কোনো ধারণাই নেই, তবুও সে হাতজোড় করে বললে— মা, একটা কথা। আমি জমিদারবাবু, মানে আপনার স্বামীকে সব বলি। তিনি তাঁর ছেলেটিকে বড়ো ভালোবাসেন। ছেলেটিকে আপনি নিয়ে গেলে তাঁর কী অবস্থা হবে, সেটা তো আপনার বিবেচনা করা উচিত।

বউটি বললেন— তাঁর এপেক্ষের ছেলে-মেয়ে হবে। তাঁদের নিয়ে থাকবেন তিনি।

—ওকথা বলবেন না, মা। আপনি তাঁর কথা চিন্তা না করলে কে চিন্তা করবে? সবদিকে বুঝুন। তাঁর কথা ভাবতে হবে আপনাকেই। আমি আজই সব বলছি তাঁকে খুলে। যদি তিনি তাঁর এপেক্ষের স্ত্রীকে বলে ছেলেটির ওপর অত্যাচার নিবারণ করতে পারেন, তবে আপনি আমাকে কথা দিন, ছেলেটিকে আপনি নিয়ে যাবেন না? আমি সে চেষ্টা করি, ^{স্বাভাবিকতা এককুসিভ} মা?

—করো।

বলেই মূর্তি অদৃশ্য হল না কিন্তু। ঘর থেকে বার হয়ে দেউড়ি দিয়ে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গিয়ে নিশীথরাত্রের শুভ জ্যোৎস্নার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— বলেন কি?

—হ্যাঁ মশাই।

—আচ্ছা, এ মূর্তির কোনো অংশ অস্পষ্ট নয়?

—দিব্যি মানুষের মতো। কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই কোথাও। কথাবার্তা বললাম, আমার কোনো ভয় হল না। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছি, তেমনি মনে হল।

মূর্তিটি অদৃশ্য হওয়ার খানিক পরেই বাড়ির মধ্যে থেকে কাশীকে ডাকতে এল। রুগির অবস্থা খুব খারাপ। অথচ সমস্ত দিন এমন ভালো ছিল। তখনকার মতো সুব্যবস্থা করে ভোরের দিকে কাশী কবিরাজ জমিদারবাবুকে বললে, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, বাইরে চলুন।

আমি বললাম, বাইরে এসে সব কথা বললেন নাকি?

—হ্যাঁ, গোড়া থেকে। বললাম, এই আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

—বিশ্বাস করলেন?

—কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমি জানি। আমি এই অসুখের সময় একদিন ওকে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত।

জমিদার বললেন— আমি জানি, ওর সৎমা ওর ওপর খুব সদয় নয়। তবে এতটা আমি জানতাম না। আমি কথা দিচ্ছি, খোকা সেরে উঠলে ওর মামার বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখাব। এ সংস্রবে আর আনব না। আমার এ স্ত্রীকেও আমি শাসন করছি। আপনি তাঁকে জানাবেন।

রাত ভোর হয়ে গেল।

রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালো হয়ে উঠতে লাগল। এগারো দিনের পরে কাশী কবিরাজ পথ্য দিলেন তার রোগীকে।

বললাম, ওর মাকে আর দেখেননি? আসেননি আপনার কাছে?

—না।

[অভিষেক (দেব সাহিত্য কুটীর), ১৯৫১]

নিশির ডাক

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

ঝন্টু যখন একেবারে ছেলেমানুষ— মানে কোলের ছেলে— তখন তার মায়ের শক্ত অসুখ করে। সেইজন্যে সে আল্লাদী পিসির কোলে মানুষ হয়। আল্লাদী পিসি ঝন্টুর বাবার দূর সম্পর্কের এক বোন, মাথায় একটু কেমন যেন ছিট আছে বলে স্বশুরঘর করতে পারেনি। আবার কারণে-অকারণে এলোমেলো আল্লাদীর মতো কথা বলে। সেইজন্যে তার নাম হয়েছে আল্লাদী। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সে তাই আল্লাদী পিসি। মায়ের অসুখ থেকে সেই যে ঝন্টুকে সে কোলে তুলে নিলে, তার পরেই ছেলেটা ওর এমন ন্যাওটা হয়ে গেল যে মায়ের অসুখ ভালো হলেও আল্লাদী পিসি আর ওকে কোল থেকে নামাতে চায়নি। ঝন্টুও আল্লাদী পিসি বললে একেবারে অজ্ঞান। আল্লাদী পিসি স্নান করিয়ে দেবে, খাইয়ে দেবে, জামা-কাপড় পরিয়ে দেবে আর ঘুম পাড়িয়ে দেবে। পিসিকে না হলে ঝন্টুর একমুহূর্ত চলে না। ঝন্টুর মা-ও সংসারের সাত ঝামেলায় দিবা-রাত্রির জড়িয়ে থাকেন, তাই আল্লাদী পিসির কোলে ছেলে ফেলে দিয়ে তাঁরও সকলরকমে নিশ্চিন্দি।

আল্লাদী পিসি মাছ খেতে বড়ো ভালোবাসে। বিশেষ করে শোল মাছ। ঝন্টু, যখন একটু বড়ো হল, সে পিসির জন্যে নানারকম মাছ ধরে নিয়ে আসে। পিসি এক গাল হেসে বলে, ‘ভাগ্যিস আমার ঝন্টু ছিল, তাই দুটো মাছ-ভাত খেয়ে বাঁচি!’

বর্ষার সময় যখন দেশের নদী-নালা ভরাট হয়ে আসে— নিজেদের পুকুরে জল পড়ে, ঝন্টু গভীর রাত্রে গিয়ে পোলো দিয়ে নানা জাতীয় মাছ ধরে নিয়ে আসে; বিশেষ করে আল্লাদী পিসির জন্যে শোল মাছ যদি পায় তবে তার মুখে আর হাসি ধরে না।

আল্লাদী পিসি ঝন্টুর বাবার সংসারেই থাকে বটে, তবে তার নিজেরও বেশ কিছু টাকা আছে। সেই টাকা আল্লাদী পিসি যক্ষের মতো আগলে রাখে। শুধু ঝন্টুকে মাঝে মাঝে মিষ্টি কিনে খাওয়ায়। ঝন্টুর মা ঠাট্টা করে বলেন, ঠাকুরঝি, এমন করে তোমার টাকাগুলি নয়-ছয় করে ফেলো না।

আল্লাদী পিসি রাগ করে উত্তর দেয়, আমার টাকা আমি যা খুশি করব, রাস্তায় ছড়িয়ে দেব, তাতে কার কী!

আসল কথা হচ্ছে, এই ব্যাপার নিয়ে বাড়ির সবাই আল্লাদী পিসিকে ক্ষ্যাপায়! আল্লাদী পিসি মরলে যে ঝন্টুই গয়ায় তার পিণ্ডি দেবে— এই কথাই সে গর্বে সবাইকে বলে বেড়ায়!

এই আল্লাদী পিসি হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা গেল।

দিব্যি শক্ত-সমর্থ আল্লাদী পিসি... দেহে রোগ-বালাই নেই— এমনভাবে যে হঠাৎ মারা যাবে তা বাড়ির কেউ ধারণাই করতে পারেনি। দুর্দান্ত দস্যি ছেলে ঝন্টু... আল্লাদী পিসির মৃত্যুর পর কে যেন তার মুখে বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। কারো সঙ্গেই কথা কয় না, খায় না দায় না, উদাস চোখে একদিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলে যেন দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো।

এই ব্যাপারে ঝন্টুর মা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-মাদুলি— কিছুতেই কিছু নয়! ঝন্টুর দেহের রক্ত কে যেন শুষে নিতে লাগলো। বাড়িসুদ্ধ লোক ভেবে কিছু কূলকিনারা পায় না!

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে ঝন্টু কখনো কখনো ধড়মড় করে উঠে বসে।

মা শুধোন, হ্যাঁরে ঝন্টু, বিছানার ওপর উঠে বসলি কেন? এখন তো অনেক রাত। ঘুমিয়ে পড়!

ঝন্টু ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকায়, তারপর ফিসফিস করে মাকে বলে, আল্লাদী পিসিমা আমার কানের কাছে ডাকল যে!

শুনে মা শিউরে ওঠেন। ঝন্টুর গায়ে-মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। মুখে বলেন, রাম-রাম-রাম!

পাড়ার পাঁচজন বউ-ঝি বলে, অ ঝন্টুর মা, ওর দিকে বেশ কড়া নজর রেখো, পোড়ামুখী আল্লাদী মরেও ওকে ভুলতে পারেনি। তাই বুঝি এখনও আশেপাশে ঘুরঘুর করছে!

ঝন্টুদের বাড়ির নীচে পুকুরপাড়ে একটা শ্যাওড়া গাছ; গাঁয়ের লোকেরা হাট থেকে সওদা করে ফেরবার মুখে ওই শ্যাওড়া গাছের ডালে কাকে যেন বসে থাকতে দেখেছে।

বৃন্দাবন গাঙ্গুলী একদিন নাকি একেবারে সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিলেন। বললেন, ভাগ্যিস আমি বুদ্ধি করে পৈতেটা জড়িয়ে ধরে গায়ত্রী জপ করতে শুরু করলাম! নইলে ঝন্টুদের পুকুরের খালে আমার ঘাড় মটকে রাখত! —এইভাবে সারা গাঁয়ে একটা চাপা ফিসফিস আলোচনা! কেউ বিশ্বাস করে, কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়!

তখন আষাঢ় মাস। আশেপাশের নদী-নালা বর্ষার জলে ভরাট হয়ে গেছে। ঘোলা জল পাক খেতে খেতে ধানের জমি ভরিয়ে, মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে, উঁচু-নীচু গাঁয়ের পথগুলিকে পেছল করে ঝন্টুদের বাড়ির পুকুরের খালে ঢুকছে।

তখন বোধ করি দুপুররাত। এমন একটা আবছা জ্যোছনা ফুটেছে যে আশেপাশে দূরে সব কিছু নজরে পড়ে, কিন্তু ভালো করে ঠাहर করা যায় না। মনে হয় যেন

একটা পাতলা কুয়াশা জ্যোহ্নার সঙ্গে মিশে গোটা গ্রামটাকে ঘিরে রেখেছে।

মায়ের পাশে শুয়ে ঝন্টু অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওদের বাড়ির রান্নাঘরের পেছন দিক দিয়ে একটা কালো বেড়াল বিকটভাবে ডেকে চলে গেল। কোথায় কোন ঝোপে বসে একটা ভূত-ভূতম পাখি একটানা বেসুরোভাবে ডেকে বিরক্তি জাগিয়ে তুলছে। একটা থমথমে ঝিমঝিমে ভাব...

এমনি সময় ঝন্টুর হঠাৎ মনে হল— ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আল্লাদী পিসি ওকে ডাকছে। আল্লাদী পিসি বলছে, ওরে ঝন্টু, শিগ্গির আয়— তোদের পুকুরের খালে নতুন জল এসেছে। কত মাছ উঠেছে... দেখবি আয়! তোর পোলোটা নিয়ে আসতে ভুলিসনি যেন!

আচমকা ঝন্টুর ঘুমটা ভেঙে গেল। সে বিছানার ওপর উঠে বসল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলে, সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার মায়ের ডান হাতটি ওর গায়ের ওপর ছিল। আশ্তে আশ্তে হাতটা সে সরিয়ে রাখলে।

আল্লাদী পিসি বলেছে পোলো নিয়ে যেতে। মস্তমুঞ্ছের মতো ঝন্টু পাশের ঘরে ঢুকল। ওইখানেই পোলো থাকে। বেড়ালের মতো খুব সাবধানে পা-টিপে-টিপে সে পোলো নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

কে যেন কানের কাছে বললে, দরজাটা ভেজিয়ে দে ঝন্টু, নইলে ওরা জেগে উঠবে। ঝন্টু, বিনা প্রতিবাদে তাদের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হনহন করে পুকুরের খালের ধারে চলে গেল।

নিশুতি রাত... কেউ কোথাও জেগে নেই... কলকল করে বর্ষার জল ঢুকছে খালে... ঝন্টু ছপ্ ছপ্ করে পোলো ফেলছে আর রাশি রাশি মাছ ধরছে। এত শোল মাছ কোথেকে এল— ঝন্টু ভেবে কূলকিনারা পায় না। ও যে খালৈ সঙ্গে এনেছিল, সেটা মাছে ভরতি হয়ে গেল। কীসের যেন একটা পোড়া গন্ধ ক্রমাগত তার নাকে আসছিল। কার আকর্ষণে ঝন্টু সেই মাছ-ভরতি খালৈ নিয়ে এগিয়ে চলল! এ কী! এ যে সেই শ্যাওড়া গাছ!

ফিসফিস কথা কানে এল।

—আমায় শোল মাছ পোড়া খাওয়াবি ঝন্টু?

ঝন্টু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, শ্যাওড়া গাছের ডালে লাল শাড়ি পরে দিব্যি পা ঝুলিয়ে কে যেন বসে আছে! আল্লাদী পিসি না? দেখতে ঠিক সেইরকম!

এতক্ষণে ঝন্টুর জ্ঞান যেন ফিরে এল। আল্লাদী পিসি তো মরে গেছে! ও তাহলে কার ডাকে এই নিশুতি রাতে মাছ ধরতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে? ভয়ে ওর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করল পালিয়ে যেতে... কিন্তু পা দুটো কিছুতেই উঠছে না! মনে হচ্ছে এঁটেল মাটির কাদায় যেন বসে গেছে! শেষকালে মনে জোর এনে ঝন্টু মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করে দিলে। পেছন

থেকে আল্লাদী পিসির নাকি সুরে কান্না শোনা গেল, ওঁরে ঝন্টু, শৌল মাছগুলো
আঁমায় দিয়ে যা— আঁমি আর কিচ্ছু চাইনে—

যত আল্লাদী পিসির কথা কানে আসে ঝন্টু তত ছোটো! হঠাৎ সে দেখলে
একটা বিরাট লম্বা হাত শ্যাওড়া গাছের ওদিক থেকে এসে তার হাতের মাছের
খালে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

একটা আত্ননাদ করে ঝন্টু সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তার
চিৎকার শুনে বাড়ি থেকে লোকজন এসে যখন পৌঁছুলো, ওর মুখ দিয়ে
গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে!

অনেক ভূত-তাড়ানো রোজা, বহু মন্তর, রাশি রাশি তাবিজ, কবচ, মাদুলি...
কিছুতে কিছু না... ঝন্টু অসাড় হয়ে পড়ে থাকে— ডাকলে সাড়া দেয় না!

অবশেষে মায়ের বুকভাঙা কান্নায় তিনদিন পর ঝন্টু চোখ চেয়ে তাকালো।
কিন্তু কী হয়েছিল কোনো কথাই সে মনে করে গুছিয়ে বলতে পারে না, শুধু
বোকার মতো ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকে।

গাঁয়ের মাতব্বর, পাড়াপ্রতিবেশী সবাই বললে, দেখ ঝন্টুর মা, এখন থেকে
ঝন্টুকে একেবারে চোখে চোখে রাখতে হবে। পেতনিরা ওইরকম করে নিশির
ডাকে ভুলিয়ে জলার ধারে নিয়ে ঘাড় মটকে রাখে।

শুনে ঝন্টুর মার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সারারাত ধরে ছেলের শিয়রে বসে
জেগে থাকে মা। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে থাকে। ভাবে আমার শান্তির সংসারে
এ কী হল! কী কুস্কণেই পরের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম!

এদিকে তারপর থেকেই বাড়ির লোকে একটা অবাক কাণ্ড লক্ষ্য করতে লাগলো।

পাথরের মূর্তির মতো পাগলা পাগলা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে ঝন্টু।

হঠাৎ সে বলে বসল, আমি পোড়া শৌল মাছ খাব।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কোথেকে একটা পোড়া শৌল মাছ ঘরের মাঝখানে এসে
পড়ল! ভয়ে আঁতকে উঠল সবাই।

ব্যাপার দেখে বাড়ির লোকে ঘন ঘন রাম নাম জপ করতে লাগলো।

কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাপারটা সহজ হয়ে এল— যখন দেখা গেল যে, ঝন্টু যখন
যা চায় কোনো অদৃশ্য হস্ত যেন সঙ্গেসঙ্গে তাই এনে হাজির করে!

সেদিন দুপুর गरমে আই চাই করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠে ঝন্টু বললে, মা, এক
গেলাস ঠান্ডা জল দাও না!

মুখের কথা খসাতে যতটুকু সময়!

দেখা গেল শ্বেতপাথরের সুন্দর একটি গেলাসে টলটলে পরিষ্কার জল। ঝন্টু
সেই জল খেতে যাচ্ছিল— কিন্তু ওর মা হাত দিয়ে সব টুকুন মেঝেতে ফেলে দিয়ে
বললেন, কক্ষনো মুখে দিসনে ঝন্টু ওসব পেতনিতে জোগাচ্ছে!

আরও একটি জিনিস লক্ষ করা গেল যে, এই জাতীয় ভৌতিক কাণ্ড রাস্তির বেলাতেই ঘটছে।

সন্দের পর পাড়ার গিন্নিবান্দিরা দল বেঁধে আসত ঝন্টুকে দেখতে। কথায় কথায় গাঙ্গুলী গিন্নি বললেন, আমার জর্দা গিয়েছে ফুরিয়ে! কাশীর জর্দা না হলে আবার আমার মুখে রোচে না!

আপন মনে ঝন্টু বললে, তুমি কাশীর জর্দা খাবে ঠানদি? সঙ্গেসঙ্গে ঠন্ করে মেঝেতে পড়ল একটি কৌটো!

গাঙ্গুলী গিন্নি অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠে বললেন, এই তো কাশীর জর্দা! একেবারে নতুন কৌটো! কোথেকে এল ঝন্টুর মা?

আর যারা আশেপাশে ছিল— ব্যাপারটা জানত— তারা উত্তর দিলে, গাঙ্গুলী গিন্নি বুঝি জানো না? সব ওই আল্লাদী পেতনিতে জোগাচ্ছে।

জর্দার কৌটোটা গাঙ্গুলী গিন্নি হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যেই আল্লাদী পেতনির কথা শুনলেন অমনি রাম রাম করতে করতে একেবারে নিজেদের বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

এইভাবে নানা জাতীয় ঘটনা ঘটতে লাগলো। হঠাৎ চাঁপা ফুলের গন্ধে গোটা বাড়িটা ম-ম করতে লাগলো, তার পর মুহূর্তেই পচা মাছের গন্ধে লোকে নাকে কাপড় দিয়ে পালিয়ে যেতে পথ পায় না!

পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে ঘিরে রয়েছে ঝন্টুকে... কোথাও কিছু নেই ...হঠাৎ রাশি রাশি ইট পাটকেল পড়তে শুরু হল। কিন্তু মজা এই যে, একটি টিলও ঝন্টুর গায়ে লাগলো না। যেসব ছেলেরা ঘিরে রয়েছে ওকে, তাদের মাথায় পিঠে ক্রমাগত ভাদ্রের তালের মতো এসে দমাদম পড়তে থাকে! বাপ রে মা রে করে তখন যে-যেদিকে পারে পালিয়ে যায় ওরা।

যতদিন ব্যাপারটা তামাশা থাকে লোকে ভিড় জমায়... কৌতূহলী হয়ে বসে থাকে পেতনির কাণ্ড দেখতে। কিন্তু কত রাস্তির লোকে এইভাবে না ঘুমিয়ে জাগতে পারে?

কাজেই আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে আসতে লাগলো। গমগমে বাড়ি আবার মানুষ-জন-শূন্য... থমথমে হয়ে এল।

কীসের যেন দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাস্তিরে ঝন্টুর মায়ের ঘুম ভেঙে যায়! মা ছেলেকে বুকের কাছে প্রাণপণে টেনে নেন। বাঁশঝাড়ের পেছন দিকে যেখানে একটানা ঝাঁঝি ডেকে চলে, সেখানে নাকিসুরে কার যেন হাসির রেশ শুনতে পাওয়া যায়।

মা চমকে উঠে বসেন। ছেলের মাথায় হাত রেখে সারারাত ধরে দুর্গা নাম জপ করতে থাকেন। কেবলি মনে হয় তাঁর কোলের ছেলেকে কে যেন ছিনিয়ে নিতে আসছে।

সেদিন সন্ধে থেকেই একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে।

দূর বনে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকছে... মনে হচ্ছে যেন ওরাও খুব ভয় পেয়েছে। পাখি-পাখালিরা কখন যে গিয়ে যার যার বাসায় সঁধিয়েছে— কেউ খবর রাখে না! গেরস্ত বাড়ির গোয়ালগুলিতে গোরুগুলো এমনভাবে হামলাচ্ছে যে, মনে হয় তারা অশুভ কোনো ইঙ্গিত পেয়েছে। মাঝে মাঝে কাল-প্যাঁচার চ্যাঁচানি কানে ভেসে আসছে।

শ্মশানের দিক থেকে একটা শোঁ শোঁ হাওয়া গাঁয়ের বুক চিরে উত্তর অঞ্চলের জলাভূমির ওপর দিয়ে বইছে! মনে হচ্ছে কোনো প্রেতিনি বুঝি নিশ্বাস ফেলছে!

গাঁয়ের পথে আজ একটিও লোক নেই। কোনো বাড়িতে একটি ছোটো ছেলেও কেঁদে উঠছে না! মনে হচ্ছে রুদ্ধ আতঙ্কে সবাই প্রহর গণনা করছে!

ঝন্টুদের বাড়িতে আজ সবাইকে কি কাল-ঘুমে পেয়েছে... কে জানে!

সন্ধেবেলা উনুনে আগুন পড়েনি। বামুনদিদি ঘুঁটে আর কয়লা সাজাতে গিয়ে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের ঘরে বাড়ির কর্তারা সন্ধে থেকেই দাবা-পাশা খেলতে বসেন! তাঁদের চিৎকারে দশটা আশেপাশের বাড়ির লোকে ঘুমুতে পারে না। আজ আঁধার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দাবার ছক একপাশে সরিয়ে রেখে সবাই ফরাসের ওপর কেউ চিত, কেউ উপুড় হয়ে পড়ে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে!

ঝর ঝর ঝর— অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলছে— তারই একটানা শব্দের সঙ্গে তাল বজায় রেখে খানা ডোবায় ব্যাঙেরা আসর জমিয়ে তুলেছে। আকাশের সমস্ত তারা মেঘে মেঘে ঢাকা পড়েছে। মাথার ওপর কালপুরুষ একটা সাজ্জাতিক কিছু ঘটবে বলে বুঝি এক চোখে দম বন্ধ করে প্রহর গণনা করছে!

মায়ের পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে ঝন্টু। এমন ঘুম যে দেখে মনে হয়— ওর দেহে বুঝি প্রাণ নেই!

আকাশের বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, ঝিঁঝির ডাক, ব্যাঙের শব্দ, প্যাঁচার চ্যাঁচানি আর কালপুরুষের নীরব ইঙ্গিত ওকে যেন এমনভাবে ঘুম পাড়িয়েছে যে সে ঘুম আর ভাঙবে না!

কিন্তু হঠাৎ বেড়ার পাশে কার ফিসফিসে কথা শোনা গেল।

—ঝন্টু, উঠে আয়, জলার ধারে আজ মাছ থই-থই করছে!

ঝন্টু একমুহূর্তে সচকিত হয়ে ওঠে।

আবার সেই ফিসফিসে আহ্বান ভেসে এল।

উদাস দৃষ্টিতে ঝন্টু উঠে বসল।

কার ডাক— কোথায় যেতে হবে— কিছু জানে না— তবু সে মায়ের কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাগলের মতো।

আবার সেই বাঁশবনের কানাকানির মতো কার যেন আহ্বান! —আজ আর পোলো
নিসনে ঝন্টু, খ্যাপলা জালটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বেরিয়ে আয়—
এই প্রহেলিকাময় নিশির ডাকে সাড়া না-দিয়ে উপায় নেই!
ঝন্টু খ্যাপলা জালটা কাঁধের ওপর তুলে নিলে, তারপর দরজার ছড়কোটা
খুলে ফেলে উঠোনে বেরিয়ে এল।

সঙ্গেসঙ্গে কানে-তালা-লাগানো মেঘের গর্জন— আর বাদুড়ের ডানার ঝটপটি!
কিন্তু মেঘের ডাকেও কারো ঘুম ভাঙলো না!
ছায়ামূর্তির হাতছানিতে ঝন্টু জলার দিকে এগিয়ে যায়।
পথে অন্ধকার এত জমাট বেঁধে আছে... তবু ওর পথ চলতে কোনো অসুবিধে
হয় না!

ওই যে ওইখানে। কত মাছ ঘাই মারছে...! তুই দেখতে পারছিস নে ঝন্টু?
এগিয়ে যা, ছুড়ে দে খ্যাপলা জাল—

অশরীরীর নির্দেশ শুনে ঝন্টু, একেবারে জলার মধ্যে পা চালিয়ে দিলে।
তারপর কচুরিপানার দামের মধ্যে তার দেহটা যে কোথায় তলিয়ে গেল— সারা
গাঁয়ের কেউ জানতে পারল না!

শুধু ঝন্টুদের বাড়ির কালো বেড়ালটা ওর মায়ের দরজার কাছে কেঁদে কেঁদে
ফিরতে লাগলো।

মায়ের কাল-ঘুম তবু ভাঙল না!

* * *

পরদিন জেলেরা যখন ঝন্টুর মৃতদেহটা জালে টেনে তুললে, সারা গাঁয়ের
লোক একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

গাঁয়ের একজন বর্ষীয়সী মহিলা কপাল চাপড়ে বললেন, আহ্লাদী পোড়ারমুখী
পেতনি হয়েও ওকে ভুলতে পারেনি— তাইতো রাহু হয়ে ঝন্টুকে কোলে টেনে নিলে!

বহু বছর হয়ে গেছে, এখনও গাঁয়ের লোকেরা একটু বেশি রাস্তিরে জলার ধার
দিয়ে যেতে ভয় পায়!

শেষ রাস্তিরের দিকে কে যেন ওখানে কেঁদে কেঁদে, এলো চুল উড়িয়ে বুক
চাপড়িয়ে ছুটোছুটি করে!

[পরশমণি (দেব সাহিত্য কুটীর), ১৯৫২]

মড়া কাটতে ভয়

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ডাক্তারি কলেজে পড়তে পড়তে কেন যে আমি হঠাৎ ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলুম তার আসল কারণটা কেউই জানে না। কাউকেই আমি বলিনি। তখন বলার আমার কোনো উপায় ছিল না, বললেও হয়তো কেউ বিশ্বাস করতেন না।

গুরুজনেরা জানতেন মড়া কাটবার ভয়ে ডাক্তারি পড়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। পাড়াপড়শিদের ধারণা হয়েছিল আমি অকর্মণ্য ফাঁকিবাজ— সেইটেই আসল কারণ। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কোনো কারণই খুঁজে পেতেন না, কেন ডাক্তার হবার এমন একটা সুযোগ আমি অবহেলায় নষ্ট করলুম। আসলে মড়া কাটবার ভয়েই আমি ডাক্তারি পড়া ছেড়েছিলুম, কিন্তু আত্মীয়েরা যেমনভাবে ভেবেছিলেন তেমনভাবে নয়। ব্যাপারটা তাহলে গোড়ার থেকেই বলি।

ডাক্তারি কলেজের প্রথম বছরের শেষের দিকটায় আমাদের অস্থিবিদ্যার পাঠ শুরু হল। এক বাস্ক মরা মানুষের হাড় কিনে আমার খাটের পিছনে আলমারির মাথায় রেখে দিলুম। বাড়ির বুড়ি ঝি, যে ছেলেবেলা থেকে আমাদের সকলকে মানুষ করেছে, সে রোজ রাত্রে আমার ঘরের দরজার কাছে মাদুর পেতে শুতো। যেদিন থেকে জানতে পারলে ঘরে আলমারির মাথায় মরা মানুষের হাড় রয়েছে, সেদিন থেকে সে আমার ঘরের মেঝেতে শোওয়া ছেড়ে দিলে।

আমি বললুম— ‘কী হল রে বুড়ি?’

বুড়ি বললে— ‘না বাপু রাত্রে ভয় করে। কই আগে তো করত না।’

আমি বললুম— ‘কীসের ভয়?’

—‘তা জানিনে বাপু। ওই বাস্কের মধ্যে খড়খড় করে শুনতে পাও না?’

আমি বললুম— ‘ইঁদুর-টিঁদুর হবে হয়তো। তাতে আর ভয় কী?’

বুড়ি ফোঁস করে বললে— ‘এ ঘরে আবার ইঁদুর আসবে কোথা থেকে? বেড়াল ঘুরে বেড়ায় দেখতে পাও না? বেড়ালকে কি মাছ-ভাত খাওয়াই না?’

আমি বললুম— ‘বুড়ি, তোমার কোনো ভয় নেই। এই তো আমি ঘুমোই, আমার তো কিছু হয় না।’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

বুড়ি বললে— ‘তোমাদের বুকের পাটা বাপু। তোমরা বড়ো বড়ো ডাক্তার হবে, তোমাদের কথা আলাদা। আমি আর ও ঘরে শুতে পারব না।’

সেই থেকে বুড়ি রাত্রে অন্য ঘরে শুতো।

অস্থিবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আমাকে হাড়গুলোর চর্চা করতে হত। বুড়ি যখন উঁকি মেরে দেখে যেত একখানা মড়ার হাড় পরম যত্নে কোলে রেখে আমি তার উপর পেন্সিলের দাগ মারছি, তখন সে আমাকে নব্য-ডাক্তার না ভেবে কাপালিক-টাপালিক কিছু-একটা ভাবত নিশ্চয়।

যাই হোক, এমনি অস্থিচর্চা করতে করতে শেষে আমাদের শবদেহ চর্চার সময় উপস্থিত হল। ক্লাসের ছেলেদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে প্রত্যেক দু-জন ছাত্রের জন্যে একখানি করে মৃতদেহ দেওয়া হল। ছেলেরা শানানো ছুরি আর সন্না হাতে বসে গেল তাদের চিরে দেখতে।

কেন জানি না সে-বছর যথেষ্ট শব পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই আমি আর আমার বন্ধু অজিত প্রথমটায় কোনো মড়াই পাইনি। একটার-পর-একটা মড়া এসে শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহের এ কোণ থেকে ও কোণ অবধি জমা হয়ে উঠতে লাগলো— অজিত আর আমি তখনও কিন্তু খালি হাতে বসে।

অজিত ছেলেটিকে আমি ডাক্তারি কলেজে ভরতি হবার আগে চিনতুম না। কিন্তু এখানে ভরতি হয়ে অবধি তার সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব হয়েছে। বলতে কি, ডাক্তারি কলেজে সে-ই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিল। অজিতের সঙ্গে অলাপ হবার কিছুদিন পরেই আমি একদিন তাদের বাড়ি গিয়েছিলুম। অজিতের দুই দিদি সুনীতি আর প্রকৃতি তখন তাঁদের আসন্ন এম. এ পরীক্ষার পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত। অজিতের চেয়ে তাঁরা তিন-চার বছরের বড়ো। দুই বোনের বয়সের তফাত বছর খানেক হবে, কিন্তু দু-জনে বরাবর স্কুলে এবং কলেজে একই ক্লাসে পড়ে এসেছেন, তাই এম. এ পরীক্ষাও দিচ্ছেন একইসঙ্গে।

এরকম সুন্দরী মেয়ে আমার খুব কমই চোখে পড়েছে, হয়তো দেখিইনি কখনো। আমাদের বাড়িতে এবং আত্মীয়দের মধ্যে যাঁরা বেশ নাম করা সুন্দরী, তাঁরাও এই দুই বোনের তুলনায় কিছুই নন। বিশেষ করে অজিতের ছোটদি প্রকৃতির তুলনা মেলা ভার। আমি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম অচেনা বাড়িতে প্রথম দিন এসেই মেয়েদের মুখের দিকে যে বোকার মতো তাকাতে নেই সেটা মনে ছিল না। মনে পড়তেই হঠাৎ এমন লজ্জা পেয়ে গেলুম যে আমার মাথা গেল নীচু হয়ে, আর উঠতেই চায় না। শেষে অজিতের দিদিরা যখন গরম লুচি, বেগুন ভাজা আর মিষ্টি নিয়ে আমাদের দু-জনকে খাওয়াতে এলেন এবং তাঁদের মিষ্ট স্বভাবের গুণে মুহূর্তে আমাকে আপন করে নিলেন, তখন সত্যিই মনে হল সুনীতি আর প্রকৃতি এরা আমারই দুই দিদি— কতকাল যেন এদেরই সঙ্গে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি।

আমার নিজের চার দিদি— কিন্তু কারুর সঙ্গেই আমার ভাব নেই। দিদিরা কত সময় কত জিনিস আমায় দিয়েছেন, ভাইফোঁটার সময় কত কী রেখে খাইয়েছেন কিন্তু, কোনোদিন আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করিনি। সেজদি আর ছোটদিকে তো ছেলেবেলায় কত ঠেঙিয়েছি। বড়দি মেজদির বয়েসটা একটু বেশি হওয়ায় তাঁদের নাগাল পাইনি, নইলে বোধ হয় তাঁদেরও পিড়ি দিতুম। এই নিয়ে কত ঝগড়া, কত কান্নাকাটি হয়েছে। মারামারি ঝগড়ার জন্যে কোনোদিন আমার ক্ষোভ হয়নি। সেদিন কিন্তু সেই লুচি আর বেগুন ভাজার থালা গ্রহণ করে আমার মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল। সেইদিন থেকে আমি অজিতদের বাড়ির আর এক ছেলে হয়ে গেলুম।

বাড়িতে এসে দিদিদের বললুম আমার নতুন দিদিদের কথা। তারা তো হিংসেয় জ্বলে মরল। সেজদি বললে— ‘হ্যাঁ, রেখে দে তোর প্রকৃতি দি! ছোটো পিসিমার চেয়ে সে সুন্দরী নাকি? ওই তো দেখেছি তোর অজিতকে। ওরই তো বোন, কত আর হবে?’

জানতুম দিদিদের মনে অসীম আগ্রহ জাগবে। অজিতের দিদিদের দেখবার জন্যে সবাই ছটফট করে উঠবে। আমিও তাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাঁদের গুণ বর্ণনা করলুম। শেষে ঠিক হল সুনীতিদি আর প্রকৃতিদির পরীক্ষা হয়ে গেলেই একদিন তাদের আর অজিতকে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হবে। আমি গিয়ে বলে এলুম। সুনীতিদি প্রকৃতিদি তখনই রাজি হয়ে গেলেন।

কিন্তু ওই রাজি হওয়া পর্যন্তই হল; আমাদের বাড়িতে আসা বা দিদিদের সঙ্গে আলাপ হওয়া, কিছুই হয়ে উঠল না।

সুনীতিদিদের পরীক্ষা শেষ হবার আগে থেকেই জরুরি তাগিদ আসছিল তাঁদের মীরাট-বাসী মাসির কাছ থেকে, যাতে পরীক্ষা দিয়েই তারা মীরাটে আসে। মাসি উত্তর-ভারত প্রদক্ষিণ করবার জন্যে দিন স্থির করে বসে আছেন, বোনঝিরা এলেই তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। সুতরাং সুনীতিদি প্রকৃতিদির পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, সেইদিনই রাত্রে ট্রেনে দুই বোন চলে গেলেন মীরাটে। কথা দিয়ে গেলেন, ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে যাবেন।

তারপরেই ঘটল সেই ভয়ানক দুর্ঘটনা। উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে এক অন্ধকার রাতে নির্জন এক নদীর ধারে তাঁদের ছুটন্ত ট্রেন লাইন ফস্কে জলের উপর উলটে পড়ল। ট্রেন যাত্রীর মধ্যে কতজন যে মারা পড়ল তার সঠিক কোনো হিসেব পাওয়া গেল না। প্রকৃতি আর মাসিমার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। শুধু সুনীতিদি দিন পনেরো হাসপাতালে ভুগে মাথায় পট্টি বেঁধে কলকাতায় ফিরে এল। পট্টি যখন খোলা হল তখন দেখা গেল তার একটি চোখ আর নেই। তা ছাড়া সুন্দরী বলে তাকে আর চেনা যায় না। কোনোদিন যাবেও না। সুনীতিদির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— ‘ওদের সঙ্গে আমিও তো একত্রে গলে পারতুম।’

এরপরে সুনীতিদির বা প্রকৃতিদির আমাদের বাড়িতে আসার আর প্রশ্নই উঠল না।

অজিত ছেলেটি ছিল খুব সংযত, খুব চাপা। তার মনের মধ্যকার তোলপাড় সে চাপা দিয়ে কলেজে তখন নতুন যে অস্থিবিদ্যার চর্চা হচ্ছে তাতেই মনোনিয়োগ করলে। কলেজের প্রায় কেউই তার পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা জানতে পারলে না। আমাকেও বলে দিলে, এ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা না করতে।

অজিতের সঙ্গে আমার ক-দিনেরই বা আলাপ, তারই মধ্যে এতগুলো ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমার মনে হত যেন কত বছরের আলাপ অজিতের সঙ্গে। কেমন করে জানি না, এইসবের পরে অজিতের উপর আমার একটা মস্ত টান গিয়ে পড়ল। মনে হল অজিতের মতো এমন প্রিয় বন্ধু আমার আর নেই। অজিতের সঙ্গে তাই প্রাণ ভরে মিশতুম, লেখাপড়াও করতুম প্রায় একইসঙ্গে।

দু-জনে মিলে অস্থিবিদ্যার চর্চা করতুম এক জায়গায় বসে। অজিত আমার মুখস্থ ধরত, আমি ধরতুম অজিতের। আমাদের লেখাপড়া বেশ ভালোই চলছিল। কত দিনে একখানা শব পাব যার ত্বক, পেশি ও শিরা-উপশিরাগুলিকে আলাদা করে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দেখব। দেখব আমাদের বই-পড়া মুখস্থ বিদ্যের সঙ্গে মিলছে কি না, এই নিয়ে অজিতের সঙ্গে প্রায়ই আমার আলোচনা হত। আমরা মড়া না-পেয়ে সত্যি একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলুম। অন্য ছাত্রদের শবচ্ছেদ মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতুম বটে, কিন্তু তাতে মন উঠত না।

সে-বছরের কোর্স অনুযায়ী আমাদের ব্যবচ্ছেদ করবার কথা একখানি করে হাত। অজিতকে তাই আমি বলতুম— ‘ওরে একটা পুরো মানুষ না পাওয়া যাক, একখানা হেঁড়া হাতও জোটে না আমাদের ভাগ্যে?’

অজিত বলত— ‘অত যদি তোর তড়িঘড়ি, কাট তবে আমারই একখানা হাত কাট।’

এইভাবেই চলেছিল। একদিন দুই ক্লাসের ফাঁকে অজিতের সঙ্গে বসে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ একটি ছেলে এসে খবর দিয়ে গেল, আমাদের জন্যে একটা মড়া এসেছে। আমি লাফিয়ে উঠলুম। এতদিন অপেক্ষা করার পর এ তো মড়া নয়, হাতে যেন চাঁদ পেলুম। আমরা দৌড়ে গিয়ে আমাদের মড়াটা দেখে এলুম। ভিজ়ে কাপড়ে চাপা শুকনো এক মৃতদেহ ঘরের এক কোণে এক টেবিলে শোয়ানো রয়েছে। এখনও অক্ষত, ঘরের অন্যান্য শবের মতো ছিন্নভিন্ন নয়। আমি বললুম— ‘আজই লেগে যাব। আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারি না, কি বলিস?’

অজিত আমার মতো অতটা উৎসাহ দেখাল না। সেদিন তার শরীরটা তেমন ভালো ছিল না, আগে থেকেই বাড়ি যাব যাব করছিল। তাকে আমতা আমতা করতে দেখে আমি বললুম— ‘অজিত, তুই বরং আজ বাড়ি যা, তোর শরীর খারাপ। ভালো করে ঘুম দে গে। আমি আজ ক্লাসের পর মড়াটাকে তৈরি করে

রাখব, একটু-আধটু আঁচড়ও পারি তো দেব। তারপর কাল থেকে দু-জনে শকুনির মতো বাঁপিয়ে পড়া যাবে লাশটার উপর।’

সেদিন শেষ ক্লাসের পর অজিত বাড়ি চলে গেল, আর আমি একটু হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে তৈরি হয়ে নিতে লাগলুম শব-ব্যবচ্ছেদের প্রথম অভিযানের জন্য।

বেশ পেট ভরে চা বিস্কুট রুটি খেলুম, যেন কোনো উৎসবে যাচ্ছি। তারপর কাটাকুটির যন্ত্রের বাক্সটা বগলদাবা করে চললুম মড়ার ঘরের দিকে।

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার খুব দেরি নেই। অন্য ছাত্রেরা দিনের বেলাতেই নিজেদের কাজ সেরে নিয়েছিল। মড়ার ঘরে কেউই ছিল না— ঘর খালি। শুধু দেখলুম আমাদের মড়ার টেবিলের কাছে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমটা মনে হল হাসপাতালের কোনো নার্স অথবা উঁচু ক্লাসের কোনো ছাত্রী-টাত্রী হবেন। কিন্তু যেরকমভাবে নীচু হয়ে তিনি একমনে আমার মড়াটাকে পরীক্ষা করছিলেন তাতে কেমন যেন একটু আশ্চর্য লাগল। এমনভাবে মড়াটার মধ্যে দেখবার কি আছে? আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলুম। মহিলাটি আমায় দেখতে পাননি। যখন খুব কাছে এসেছি তখন হঠাৎ আমার উপস্থিতি অনুভব করে একটু চমকে উঠে সরে গেলেন। আমি দেখলুম, তাঁর মুখে যেন একটা অপরিসীম ক্লান্তি এবং দুঃখের ছায়া। এরকম একটা মুখ দেখব বলে আশা করিনি— হঠাৎ তাই কিছু বলতে পারলুম না।

আমি কথা বলবার আগেই মহিলাটি মুখ খুললেন। তিনি বললেন— ‘আপনারই লট-এ বুঝি এই শবটি পড়েছে?’

আমি বললুম— ‘হ্যাঁ, কেন বলুন তো?’

তিনি বললেন— ‘আপনাকে একটি অনুরোধ করছি। এ মড়া আপনি কাটবেন না। কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে। এটা বেওয়ারিশ লাশ নয়। এ আমারই এক আত্মীয়ের দেহ। কী করে এখানে এল আমি বুঝতে পারছি না। আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে এ লাশ এখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করব। তার আগে আপনাকে অনুরোধ, এর গায়ে হাত দেবেন না।’

এই বলেই মহিলা ব্যস্ত হয়ে দ্রুতপদে ঘর পার হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় কর্তৃপক্ষেরই উদ্দেশ্যে।

যন্ত্রের বাক্স হাতে স্তব্ধ হয়ে আমি খানিকক্ষণ বসে রইলুম। তারপর হতাশ মনে ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়েই দেখি শীতের আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। একটা ভিজে হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

প্রথমেই চললুম আমি অজিতকে খবর দিতে। হাতে লাশ পেয়ে এমনভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে— এরকম নিরাশ জীবনে আমি কখনো হইনি। অজিতের বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে বৃষ্টি এসে গেল। দৌড়ে গিয়ে যখন তাদের বাড়ির মধ্যে

অরাজকতা একত্রুসিভ

টুকলুম, তখন কাপড় জামা ভিজে গেছে। অজিতের মা আমায় শুকনো কাপড় দিলেন এবং বললেন, অজিত এখনও বাড়ি ফেরেনি।

অজিত একটু পরেই ফিরল ভিজতে ভিজতে। তার এই অদূরদর্শীতার জন্যে আমার কাছে বকুনি খেল। অজিতের মা-ও বকলেন।

অজিত বললে— ‘বাড়ি এলেই তো বন্দি। তাই আড্ডা-টাড্ডা সেরে ফিরলুম, এইবার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ব আর কী!’

বিছানায় ঢলে পড়তেই অজিতের তেড়ে জ্বর এল। আমি তাকে সংক্ষেপে সেদিনের ঘটনাটার উল্লেখ করে বললুম— ‘আবার কতদিনে একটা বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া যায় দেখ।’

অজিত বললে— ‘দুঃখ করিসনে। জ্যান্ত মানুষ হাতছাড়া হয়ে যায়, এ তো একটা মড়া।’

অজিতকে আর না বকিয়ে সেদিন আমি বাড়ি ফিরে গেলুম। মন বড়ো চঞ্চল হয়েছিল। আমার ন্যায্য অধিকারে কে যেন হাত দিয়েছে, তাই যেমন বিরক্ত বোধ করছিলুম তেমনি আবার সেই মহিলাটির দুঃখ-ক্লান্ত মুখের কথা মনে করে মায়াও করছিল। আহা, বেচারার আত্মীয়র দেহ— তার সদগতি না হলে তিনিই-বা শান্তি পাবেন কোথা থেকে? আচ্ছা, কেমন করে তিনি দেহটার সন্ধান পেলেন?—সেইটাই আশ্চর্য! নিশ্চয় অনেকদিন ধরে ওত পেতে ছিলেন— যেমনি টেবিলে লাশ আসা অমনি এসে ছোঁ-মেরে পড়েছেন। কিন্তু এই কেশহীন বর্ণহীন শুষ্ক কঠিন মৃতদেহ, একে শনাক্ত করলেন কী করে? বাহাদুরি আছে বলতে হবে।

নানা চিন্তায় রাত্রে ভালো ঘুম হল না। সকালে একটু বেলা করে উঠে মুখে ভাত গুঁজে কলেজে গেলুম। প্রথমেই খোঁজ নিলুম, আমার মড়া সরানো হয়েছে কি না। কেউ সে লাশ দাবি করেছে কি না?

আশ্চর্য হয়ে গেলুম, যখন শুনলুম, কেউই লাশ দাবি করতে আসেননি। শুনলুম, এতদিন পরে এ লাশ দাবি করবার কারুরই নাকি অধিকার নেই। দাবি করার সময় বহুদিন হল পেরিয়ে গেছে। মৃতদেহ এত বিকৃত হয়ে গেছে যে তাকে এখন শনাক্ত করা অসম্ভব। করলেও কর্তৃপক্ষ তা মানবেন না। শুনে আমার খারাপ লাগল। মহিলার জন্যে দুঃখ হল। মড়াটা শুনলুম পাওয়া গিয়েছিল বিহারের কোনো এক অঞ্চলে। পুলিশের কাছে বহুদিন পড়ে থাকার পর লাশটা বেওয়ারিশ বলে ঘোষণা করে স্থানীয় ডাক্তারি কলেজে দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে অতিরিক্ত লাশের প্রয়োজন না থাকায় কলকাতায় চালান দেওয়া হয়েছে।

অন্য ছাত্রেরা শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহে গেল যে-যার মড়ার কাছে। পাছে মহিলা এসে পড়েন এই ভেবে আমি গেলুম না। কিন্তু সারাদিন মহিলার কোনো খোঁজ পাওয়া

গেল না। আমি তখন এই ভেবে নিশ্চিত হলাম যে তিনি বোধ হয় নিরাশ হয়ে তাঁর দাবি ত্যাগ করেছেন। ক্লাসের শেষে আরও একবার খোঁজ নিলাম যে তিনি এসেছিলেন কি না। শুনলাম, আসেননি। মড়াটা কাটতে পারি কি না জিজ্ঞেস করাতে উত্তর পেলুম, আলবাত পারি— ও দেহের সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদাগারের, আর কারুর নয়।

এই শুনে আমার আবার মড়া কাটবার উৎসাহ ফিরে এল। গোড়ায় ভেবেছিলুম, অজিতের জ্বর সেরে গেলে দু-জনে একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করব, কিন্তু হাত নিশাপিশ করে উঠল। মনে হল, আজ অন্তত দু-একটা আঁচড় মেরে কাজটা আরম্ভ করে যাওয়া যাক।

এই ভেবে মড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেদিনও ছাত্রেরা যে-যার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছিল। ঘর খালি। মড়ার ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ নাকে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম, কী আশ্চর্য আজও সেই মহিলা আমার মড়ার কাছে একটা উঁচু টুলের উপর বসে রয়েছেন।

আমাকে ঘরে ঢুকতে তিনি দেখেছিলেন। মনে হল আমারই জন্যে যেন অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই বললেন— ‘দেখুন, এ দেহ আপনি কাটতে পারেন, কিন্তু অজিত যেন না ছোঁয়।’

আমি অবাক হয়ে বললাম— ‘আপনি অজিতকে চেনেন নাকি?’

মহিলা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটু থেমে একটা নিশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন— ‘এ দেহ অজিতের দিদি প্রকৃতির।’

সে কী!

কীসের যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলুম। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেল— বসবার টুলটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। দেখি, মহিলা দ্রুতপদে ঘর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। আমি চোঁচিয়ে বললাম— ‘আপনি কে?’

মহিলা এক মুহূর্ত থমকে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু স্নান হাসি হাসলেন, তারপর দ্রুততর গতিতে দরজা পার হয়ে চলে গেলেন।

এইবার আমি চিনলাম। কোনোদিন চাক্ষুস দেখিনি, কিন্তু অজিতের মাকে তো দেখেছি— সেই কপাল, সেই চোখ। অজিতের মীরাটের মাসি, যিনি ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন— তিনি ছাড়া আর কেউ নয়।

একা আমি শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহের মধ্যে। আমার সামনে পড়ে আছে যার বিকৃত গলিত দেহ, এই কিছুদিন আগেও তাকে দেখে ভেবেছিলুম, তার মতো সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। সেই শীতের সন্ধ্যায় কপালের ঘামটা মুছে যত তাড়াতাড়ি পারি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

কী করা যায় এখন? যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা কি বিশ্বাস করব না ভুয়ো

বলে উড়িয়ে দেব? ভুয়োই হোক আর সত্যিই হোক, অজিতকে কিন্তু ও-মড়া ছুঁতে দেওয়া হবে না। আমিও যে ছোঁব না তা-ও একরকম প্রায় স্থির।

চললুম সোজা অজিতদের বাড়ি। অজিতের মার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন— ‘অজিতের জ্বরটা আজ বেড়েছে। ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। সুনীতি ঘরে আছে, যাও বাবা তুমি দেখে এসো।’

অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর। বারান্দা দিয়ে পা-টিপে-টিপে ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম। শীতের আকাশের কালো মেঘে বারান্দাটাও আবছায়া আঁধারে ঢাকা। সেখানে দাঁড়িয়ে একটু থমকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারলুম। দেখলুম, অজিত ঘুমচ্ছে— বুকের উপর একখানা হাত— নিশ্বাসের সঙ্গে উঠছে আর নামছে। কিন্তু তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ও কে? সুনীতিদি তো নয়— ও যেন প্রকৃতিদি। স্পষ্ট হুবহু ঠিক আগের দিনের মতো, অজিতের সেই ছোটদি যে আমায় গরম লুচি আর বেগুনভাজা খাইয়েছিল।

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকলুম। যখন অজিতের মাথার কাছে এলুম তখন দেখলুম সুনীতিদিই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে তাকে বাতাস করে চলেছেন।

আমি ফিসফিস করে বললুম— ‘অজিত এখন ঘুমচ্ছে, আমি যাই। কাল আবার আসব।’

সুনীতিদি কিছু বললেন না, শুধু একটু ঘাড় নাড়লেন।

তার পর দিনই আমি বাড়িতে বললুম— ‘আমার দ্বারা মড়া কাটা চলবে না। আমি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেব।’

প্রথমটা খুব আপত্তি উঠল, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সবাই যখন বুঝলেন, আমাকে টলানো যাবে না, তখন বললেন— ‘যা খুশি কর।’ আমিও সেইদিনই কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে আমার নাম কাটিয়ে এলুম।

প্রিন্সিপ্যাল একটু অবাক হয়ে কারণ জানতে চাইলেন। আমি সংক্ষেপে বললুম— ‘আমার ভালো লাগছে না।’ এ নিয়ে আর কোনো কথা হল না।

অজিতের অসুখ কিন্তু বেড়ে চলল। শেষে এমন অবস্থা হল যে আজ যায় কী কাল যায়! যাই হোক অজিত কিন্তু শেষ অবধি টিকে গেল। বহুদিন ভুগে যখন সে সেরে উঠল তখন কলেজের ছুটি— নতুন সেশান কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে। আমি তো কলেজ ছেড়েই দিয়েছি— অজিতেরও একটা বছর নষ্ট হল।

অজিতকে এতদিন আমার ডাক্তারি কলেজ ছাড়ার কথা বলিনি। এইবার বললুম। সে শুনে বললে— ‘কেন কী হয়েছিল?’

আমি সংক্ষেপে বললুম— ‘মড়া কাটা আমার দ্বারা হবে না।’

অজিত অবাক হয়ে বললে— ‘সে কি রে? তোর অত উৎসাহ ছিল। মড়ার জন্মে যে শকুনির মতো বসেছিলি, মনে নেই?’

বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবার আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না, আমি বললুম— ‘যা হবার হয়ে গেছে। এবারে আমি অন্য কিছু পড়ব।’

অজিত বললে— ‘আমিও তবে ডাক্তারি পড়া ছাড়লুম।’

আমি বললুম— ‘বাঃ তা কেন? আমারই না-হয় মড়া কাটাকে ভয়, তুই কেন ছাড়বি?’

অনেক বোঝাবার পর অজিত শেষটা রাজি হল। বললে— ‘যাক তবে তোর কথাই শুনলুম। কিন্তু তুই যে অমন ভীতু তা তো জানতুম না।’

সে আজ বহু বছরের কথা। তারপর থেকেই অজিতের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি। এখন সে কোথায় জানি না। নিশ্চয় কোথাও ডাক্তারি করছে। যে পথে আমরা একসঙ্গে চলতে শুরু করেছিলুম, মনে করেছিলুম, এইভাবেই চিরদিন চলব দুই বন্ধুতে, তা যে কেন হঠাৎ দু-মুখো হয়ে দু-দিকে চলে গেল তার আসল রহস্য এতদিন শুধু আমারই কাছে গোপন ছিল। আজ তা প্রকাশ করতে গিয়ে দেখছি সমস্ত জিনিসটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে। এতে আজ আর কারো কোনো ক্ষতি হবে না জেনে আমার গোপন ইতিহাস লোকচক্ষে মেলে ধরলুম।

[মৌচাক, আশ্বিন ১৩৬২ (সেপ্টেম্বর ১৯৫৫)]

তিন ভাই ও ডাইনি

নীহার ঘোষ

কোনো এক গ্রামে তিন ভাই একসঙ্গে বাস করত। কিন্তু তাদের অবস্থা বড়োই খারাপ ছিল। সংসার যখন চলে না এমন এক সময়ে তাদের মধ্যে বড়ো ভাই বাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যান্বেষণে।

চলতে চলতে অনেক দূরে এসে পড়ল সে। তারপর ক্লান্তিতে আর তার পা চলতেই চায় না। ঠিক সন্ধ্যার সময় সে এসে পৌঁছোল একটা ভাঙা বাড়ির সামনে। দরজায় কড়া নাড়তে এক কুৎসিত-দর্শন বুড়ি এসে দরজা খুলে দিয়ে তাকিয়ে রইল বড়ো ভাইয়ের মুখের দিকে। বুড়িটা ডাইনি। বড়ো ভাই বলে ডাইনিকে, আজ রাত্রে মতো একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে?

ভেতরে এসো। বলে ডাইনি তাকে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। ওপরে উঠে এসে বড়ো ভাই দেখল মেঝেতে একটা মাদুর পড়ে আছে। সেটা ভালো করে বিছিয়ে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল। পথ হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়েছিল বলে শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল। কতকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল তার মনে নেই; হঠাৎ মাঝরাত্রে টুং টাং শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখল একপাশে মেঝেতে একটা জায়গার গর্ত মতো, সেখান দিয়ে আলো আসছে। আশ্বে আশ্বে গিয়ে সে সেই গর্ত দিয়ে দেখতে পেল, নীচে ডাইনি বুড়ি একটা থলিতে সোনার মোহর ভরছে। পাশে হারিকেনটা জ্বলছে। সব মোহরগুলো ভরা হয়ে গেলে ডাইনি বুড়ি থলিটা বেঁধে দেওয়ালে একটা তাকের ওপর রেখে দিল। তারপর এসে আলোটা কমিয়ে দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল। বড়ো ভাই ওপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাইনি বুড়ির নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বড়ো ভাই আশ্বে আশ্বে নীচে নামল। ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, আশ্বে ঠেলা দিতেই খুলে গেল সেটা। ঘরে ঢুকে তাক থেকে থলিটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। তারপর আরম্ভ করল ছুটতে। ছুটতে ছুটতে সে একটা কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে পৌঁছোল। সেখানে আসতে ঘরটা তাকে বললে— ভেতরে বড্ড ময়লা জমেছে, একটু পরিষ্কার করে দেবে?

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

না। উত্তর দিল বড়ো ভাই, আমার দাঁড়াবার সময় নেই। সে আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

সকাল হয়ে গেছে। সূর্য ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে। বড়ো ভাই ছুটতে ছুটতে একটা মাঠের কাছে এসে পৌঁছোল।

তাকে দেখে মাঠ বললে— ভাই, আমার আশপাশে বড্ড ঝোপ মতো হয়ে গেছে, একটু পরিষ্কার করে দেবে?

না, পারব না। বলে সে আবার ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পারল না। খানিকটা গিয়েই তার মনে হল থলিটা যেন দ্বিগুণ ভারী হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটা কুয়ার কাছে এসে পৌঁছোল। বড়ো ভাই ছুটতে ছুটতে পিপাসার্ত হয়েছিল। তাই সে জলপান করতে এগিয়ে এল। কুয়া বললে, আমার গায়ে শ্যাওলা জমেছে, একটু পরিষ্কার করে দেবে?

তক্ষুনি জবাব দিল বড়ো ভাই, না, আমার একটুও সময় নেই। এই কথা বলেই অবার চলতে শুরু করল সে।

দুপুরবেলা সে এসে পৌঁছোল একটা বটগাছের নীচে। সেই গাছের তলায় ছায়ায় বসে সে বিশ্রাম করতে লাগলো।

এদিকে সকালবেলায় ডাইনি বুড়ি ঘুম থেকে উঠে দেখল ছেলেটা তো নেই-ই, অধিকন্তু তার সোনার থলিটাও নেই। তখন সে বেরিয়ে পড়ল তার খোঁজে। যেতে যেতে ডাইনি গিয়ে পৌঁছোল সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করল—

থলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার যত টাককড়ি,
নিয়ে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে?

ঘর তাকে বললে— মাঠের দিকে গেছে চলে।

ডাইনি তখন আবার মাঠের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—

থলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার যত টাককড়ি,
নিয়ে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে?

মাঠ তাকে বলল—

মাঠ পেরিয়ে কুয়ার ধারে,
গেলে সেথায় মিলতে পাবে।

ডাইনি কুয়ার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—

খলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার যত টাকাকড়ি,
নিয়ে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে?

সেকথা শুনে কুয়া জবাব দিল—

বটগাছটি আছে যেথায়,
পাবে তারে গেলে সেথায়।

ডাইনি বুড়ি তাড়াতাড়ি বটগাছের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল, বড়ো ভাই মাথায় খলিটি নিয়ে পরম সুখে নিদ্রা দিচ্ছে। ডাইনি এক মুঠো ধুলো মস্ত পড়ে ছুড়ে মারল বড়ো ভাইয়ের দিকে। চোখের নিমিষে উধাও হয়ে গেল বড়ো ভাই। পড়ে রইল শুধু সোনা ভরতি খলিটা। সেটা কাঁধে নিয়ে বুড়ি ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

কিছুদিন পর মেজো ভাই দেখল এভাবে আর থাকা যায় না। এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। সেও বেরিয়ে পড়ল সব ছেড়ে দিয়ে, যদি ভাগ্য ফেরাতে পারে কোনোরকমে।

হাঁটতে হাঁটতে সন্দের সময় মেজো ভাই গিয়ে পৌঁছোল সেই ডাইনি বুড়ির বাড়ির সামনে। কড়া নাড়তে বুড়ি বেরিয়ে এল।

আজ রাত্রে মতো একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে? জিজ্ঞেস করল মেজো ভাই।

ভেতরে এসো। বলে বুড়ি তাকে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি দেখিয়ে দিল, এবং মেজো ভাই ওপরে গিয়ে একটা মাদুর পড়ে থাকতে দেখে, সেটা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল। সারাদিন হাঁটার জন্যে পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল ছেলোট, তাই শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাাত্রে কীসের টুং টাং আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল তার। তারপর সেই গর্ত দিয়ে আলো আসতে দেখে তাকিয়ে দেখল মেজো ভাই, বুড়ি একটা খলিতে সোনার মোহর ভরছে।

বুড়ি ঘুমিয়ে পড়তে যখন সে তার নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেল, তখন নীচে নেমে খলিটা নিয়ে দিল চম্পট।

ছুটতে ছুটতে সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে আসতে, ঘর বললে, ভেতরটা বড্ড নোংরা হয়ে আছে, পরিষ্কার করে দেবে?

—না, আমার সময় নেই। বলেই আবার ছুটল মেজো ভাই।

—আমার আশপাশের ঝোপগুলো পরিষ্কার করে দেবে? —তাকেও বলল মাঠ।

অরাজকতা এককুসিদ্ধ

—না আমার দাঁড়াবার সময় নেই। জবাব দিল মেজো ভাই।

—ভাই, আমার গায়ের শ্যাওলাগুলো পরিষ্কার করে দেবে? —বলল কুয়া।

—বাজে কাজের সময় নেই আমার। বলে সেও তার বড়ো ভাইয়ের মতো গাছের নীচে গিয়ে বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে।

ওদিকে সকালবেলা ডাইনি বুড়ি যখন দেখল। তার থলি আর অতিথি দুই-ই অদৃশ্য, তখন রাগে গরগর করতে করতে সে ছুটে চলল ছেলেটির খোঁজে। রাস্তার মাঝে সেই ঘর, মাঠ ও কুয়া আগের মতোই মেজো ভাইয়ের খোঁজ দিয়ে দিল ডাইনি বুড়িকে। মেজো ভাইকেও মস্তবলে ডাইনি ধুলো পড়া দিয়ে অদৃশ্য করে দিল আর বাড়ি ফিরে গেল সোনার থলি নিয়ে।

এদিকে ছোটো ভাই একলা থাকে। কোনোরকমে তার দিন চলে। অবশেষে এমন সময় এল যে, আর তার দিন কাটে না। এইভাবে চলতে চলতে তারও বিতৃষ্ণা এসে গেল সংসারে। তখন সে-ও একদিন বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যান্বেষণে। তারপর চলতে চলতে এসে পড়ল সেই ডাইনির বাড়ির কাছে এবং এসে সে-ও আশ্রয় পেল রাত্রের জন্যে। অনেক রাত্রে তার ঘুম ভেঙে যেতে — থলি ভরতি মোহর দেখে, বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ার পর সে-ও সেটা নিয়ে চম্পট দিল। যেতে-না-যেতে সে এসে পৌঁছোল সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে। ঘর তাকে বললে, ভেতরে বড্ড ময়লা জমে আছে, পরিষ্কার করে দেবে ভাই একটু?

এই ছোটো ভাইটি ছিল ভীষণ পরোপকারী, কখনো কাউকে ‘না’ বলত না। সে সেই কথা শুনে বললে, হ্যাঁ, দেবো। পরিষ্কার করতে যদিও তার সময় লাগলো, তবু সে ভালো করে সব ময়লা পরিষ্কার করে দিল। তারপর আবার ছুটতে শুরু করল যতক্ষণ না মাঠের কাছে এসে পৌঁছোল।

আমার আশপাশের ঝোপগুলো পরিষ্কার করে দেবে? বললে মাঠ। ছোটো ভাই আপত্তি করল না। সে মাঠের চারিদিক পরিষ্কার করে দিল; আগাছা, ঝোপঝাড় সব তুলে ফেলে দিল। তারপর সে ডাইনি বুড়ির এসে পড়ার ভয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌঁছোল সেই কুয়ার ধারে। তাকে দেখে কুয়া জিজ্ঞেস করল, আমার গায়ের শ্যাওলাগুলি একটু পরিষ্কার করে দেবে ভাই?

এবারও ছোটো ভাই ‘না’ বলল না। যদিও তার ভীষণ ভয় হচ্ছিল যে, ডাইনি বুড়ি এসে নিশ্চয়ই তাকে ধরে ফেলবে, তবু সে ভালোভাবেই কুয়ার গায়ে জমা শ্যাওলাগুলি পরিষ্কার করে দিল। তারপর দুপুরবেলা পরিশ্রান্ত হয়ে সে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল সেই বটগাছটার তলায়।

এখন, ডাইনি বুড়ি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ছোটো ভাই আর তার সোনার মোহরের থলি কোনোটাই দেখতে পেল না। তখন সে বিদ্যুতের মতো ফেটে

পড়ল। ছুটে চলল ছোটো ভাইয়ের সন্ধানে। যেতে যেতে গিয়ে সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—

থলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার যত টাকাকড়ি,
নিয়ে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে?

কুঁড়ে ঘর তাকে কিছু বলল না। কিন্তু হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরের চালাটা উড়ে এল ডাইনি বুড়ির দিকে। বাঁশগুলো পটাপট খুলে গিয়ে এসে পড়ল বুড়ির ঘাড়ে। ডাইনি বুড়ি ছোটোছুটি করেও রেহাই পেল না, তার অবস্থা প্রায় সঙ্গিন হয়ে উঠল। অবশেষে কোনোরকমে পরিত্রাণ পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল বুড়ি। থামলো এসে মাঠের কাছে। জিজ্ঞেস করল তাকে—

থলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার যত টাকাকড়ি,
নিয়ে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে?

মাঠ তার উত্তরে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ডাইনি বুড়িকে প্রায় অন্ধ করে দিল। সে চোখ ঢাকে তো ধুলো ঢাকে মুখে, মুখ ঢাকলে চোখে। অতিষ্ঠ করে তুলল তাকে। তারপর কুয়ার কাছে গেল ডাইনি। তাকে বললে—

থলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার যত টাকাকড়ি,
নিয়ে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে?

কুয়া কিছু বললে না, কিন্তু তার জল হঠাৎ বাড়তে লাগল। বাড়তে বাড়তে তার ঠান্ডা হাত দিয়ে বুড়িকে টেনে নিয়ে ভেতরে ফেলে দিল। ডাইনি বুড়ি জলে ডুবে— কোথায় তলিয়ে গেল।

ছোটো ভাই বাড়ি ফিরে গেল। তারপর সেই মোহর নিয়ে সে সুখে ঘরসংসার করতে লাগলো।*

* একটি বিদেশি উপকথা অবলম্বনে।

। মৌচাক, আষাঢ় ১৩৬৫ (জুন ১৯৫৮)।

বড়োমা

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

যে কাহিনিটি বলতে বসেচি, এটি বহুবছর পূর্বেকার আমার নিজের দেখা একটি সত্য ঘটনা। যে পরিবারে এই ঘটনাটি এককালে ঘটেছিল, তার বংশধরেরা অনেকেই জীবিত; সুতরাং তাঁদের প্রকৃত নাম-ধাম আমি প্রকাশ করব না; তাতে মূলবিষয়বস্তুর কোনো হানি ঘটবে না। এঁরা ছিলেন আমাদের নিকট আত্মীয়।

এঁরা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। পশ্চিমের কোনো শহরে বাস করতেন। দুই ভাই। বড়ো ভাই যোগেনবাবু সেখানকার একজন নামকরা উকিল; ছোটো ভাই পশারওলা ডাক্তার। দু-ভাই মিলে প্রচুর আয় করতেন। সেখানকার সমাজে দু-ভাইয়ের যথেষ্ট নাম-যশ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি।

সংসারটিও বেশ বড়ো। বড়ো বাপ-মা, দু-ভাইয়ের দুই স্ত্রী, প্রত্যেকের পাঁচ-ছয়টি করে সন্তান, এক বর্ষীয়সী বিধবা ভগিনী, তাঁরও চার-পাঁচটি সন্তান। তাদের মধ্যে আবার কারো বিবাহ হয়েছে, তাদের স্ত্রী ও ছেলেপুলে। এ ছাড়া চাকরবাকর, ঝি, পাচক, মুহুরি, কমপাউন্ডার, সরকার, গোমস্তা প্রভৃতি মিলে সংসারটি খুবই বড়ো। সর্বদাই জমজম করত।

এই বৃহৎ সংসারের যিনি গিনি ছিলেন, সকলেই তাঁকে ‘বড়োমা’ বলে সম্বোধন করত। তিনি যোগেনবাবুর স্ত্রী। বৃহৎ সংসারের ছোটো-বড়ো সবরকম খুঁটিনাটিই তাঁকে দেখতে হত। ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর কাজের আর বিরাম ছিল না— যদিও বিধবা ননদ কাদম্বিনী দেবী সর্ববিষয়েই তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু একবছর হঠাৎ বড়োমা মারাত্মক ব্যাধি কলেরাতে আক্রান্ত হলেন ও মারা গেলেন।

তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। যমুনা নামে এক প্রৌঢ়বয়স্ক দাসী অনেকদিন থেকে এ-বাড়িতে কাজ করে আসছিল। ছোটো ছোটো জন কয়েক ছেলে-মেয়েকে নিয়ে রাত্রে সে দোতলার একটা ঘরে শুতো। একদিন রাত দুটো-আড়াইটের সময়, তাকে বাইরে আসতে হয়। ঘরের বাইরে একটা খোলা লম্বা টানা বারান্দা ছিল। সেই বারান্দার শেষপ্রান্তে মুখ-হাত ধোবার ঘর ছিল। বাড়িটা ছিল সেকালের— চক-মেলানো বাড়ি; মাঝে খানিকটা জমি উঠানের মতো

রেখে, চারিধারে চারি সার ঘর, ও চারি সার ঘরের কোলে, ভেতরের দিকে উন্মুক্ত টানা বারান্দা। ঠিক এর ওপর, এইভাবেই এর দোতালা। দোতালায় চারি দিককার এই টানা বারান্দার দুই বিপরীত কোণায় দুটো বাথরুমের মতো মুখ-হাত ধোবার ঘর ছিল। সেদিনের রাত্রিটা ছিল জ্যোৎস্নাময়।

যমুনা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে, বিপরীত দিককার বারান্দায় চেয়ে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই, বিকট একটা চিৎকারের সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তার চিৎকারে অনেকেরই ঘুম ভেঙে যায়। সকলে সেখানে ছুটে আসে। ছোটো ভাই দ্বিজেনবাবু ছিলেন ডাক্তার; তাঁর চেষ্টায় শীঘ্রই যমুনার জ্ঞানসঞ্চার হল। তারপর একটু সুস্থ হয়ে যমুনা যা বলল, তা কেউ-বা বিশ্বাস করল, কেউ-বা তার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল। যমুনা বলল, সে ওদিককার বারান্দায়, বড়োবাবুর শোবার ঘরের জানালা ধরে বড়োমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

সেদিন কথাটা অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু এর কয়েক দিন পরেই যখন পিসিমা অর্থাৎ যোগেনবাবুর বিধবা ভগিনী বললেন যে, গতরাত্রে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে, তিনি খোলা জানালা দিয়ে, বড়ো বউকে ওদিকের বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, তখন সকলেরই মনে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার একটা ঘন ছায়া চেপে বসল। তখন ব্যাপারটাকে কেউ আর উড়িয়ে দিতে বা অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

তারপর থেকেই এইরকম ঘটনা খুব ঘন ঘন ঘটতে লাগলো। বাড়ির অনেকেই ‘বড়োমা’র যেখানে-সেখানে দেখা পেতে লাগলো। কখনো ছাদের আলসেতে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন, কখনো রেলিং বা রেলিং-এর লোহার-খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, কখনো-বা যোগেনবাবুর শোবার ঘরের একটি কোণায়, লালপাড় শাড়ির ঘোমটাটা টেনে দিয়ে বসে আছেন। ক্রমাগত দিনের-পর-দিন এইরকম ব্যাপার ঘটতে থাকায়, সকলের প্রাথমিক আতঙ্কটা অনেক পরিমাণে কেটে গেল বটে, কিন্তু একটা অশুভ আশঙ্কায় সকলেই উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের দল নানারকম পরামর্শ দিলেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বললেন— ‘খুব শিগগির গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদানের ব্যবস্থাটা করে আসুন।’ সুতরাং তাই করা স্থির হল এবং তারই জোগাড়যন্ত্র হতে থাকল।

কিন্তু কয়েক দিন পরে, কাদম্বিনী দেবীর বড়ো ছেলে সুরেশ রাত প্রায় ১১টার সময় যখন বার বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে, ওদিককার বারান্দা পার হয়ে এদিককার বারান্দার দিকে আসছিল, তখন স্পষ্ট দেখলে যে, বারান্দার একপাশে তার বড়ো মামিমা দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন— ‘সুরেশ, ওসব তোরা কী মতলব কচ্ছিস? কিছু করিসনি, বাবা; ওতে কোনো ফল হবে না।’ —কথা কয়টা বলবার পর আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না।

অতঃপর গয়ায় পিণ্ডদানও হল এবং আরও অনেক কিছুই হল, ফল কিন্তু কিছুই হল না। এদিকে যোগেনবাবুর শরীর দিন দিনই শুকিয়ে যেতে লাগলো। অথচ তাঁর কোনো নির্দিষ্ট রোগের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা গেল না।

তখন আত্মীয়স্বজন সকলের পরামর্শে স্থির হল যে, এ অবস্থায় এস্থান ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বাস করাই কর্তব্য। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই তাঁরা সকলে কলকাতা চলে এলেন।

কলকাতায় এসেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল না। পশ্চিমের বাড়ির মতো এখানেও ‘বড়োমা’কে সকলে দেখতে পেতে থাকল। এদিকে যোগেনবাবুর শরীরও দিন দিন বেশি বেশি শীর্ণ হয়ে আসতে লাগলো। কলকাতায় তখনকার বড়ো বড়ো ডাক্তারদের দেখানো হল, কিন্তু তাঁর শরীর দিনের-পর-দিন ভাঙনের দিকেই যেতে লাগলো। কোনো রোগের লক্ষণই তাঁর দেহে পাওয়া গেল না; শুধুমাত্র দুর্বলতা। এদিকে ‘বড়োমা’র ব্যাপারেও অনেক কিছু করা হল; অনেক নামকরা ‘রোজা’কে আনানো হল। তারা অনেক কিছু ঝাড়ফুক, অনেক কিছু কাণ্ডকারখানা করলে, কিন্তু ফল— ‘যথা পূর্ব তথা পরম্’।

অবশেষে যোগেনবাবু একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর বিকালের দিকে প্রত্যহই একটু করে জ্বরও হতে লাগলো। এই জ্বর হবার সূত্রটা পেয়ে, ডাক্তাররা অকূলে একটু যেন কূল পেলেন। তাঁরা নতুন উদ্যমে চিকিৎসা চালাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই যোগেনবাবুকে ভালোর দিকে আনা গেল না। তাঁর অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে আসতে লাগলো।

এই সময়টায় আমি আমার ঠাকুরমার সঙ্গে এদের বাড়িতে এসে দিন পনেরো থাকি। পূর্বেই বলেছি, এঁরা আমাদের আত্মীয় হতেন। এঁরা পশ্চিমে থাকায় এঁদের সঙ্গে সে আত্মীয়তায় কতকটা ভাটা পড়েছিল, কিন্তু কলকাতায় ফিরে এলে আবার ঘনিষ্ঠতা ও যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। যোগেনবাবুর অসুখ বাড়াবাড়ির দিকে খবর পেয়ে, ঠাকুমা তাঁকে দেখতে গেলেন। আমার তখন বালক বয়স। বোধ হয় ১২ কী ১৩ বছর মাত্র।

ঠাকুরমা যোগেনবাবুর ঘরে গিয়ে বলতেই, তিনি ঠাকুরমাকে বললেন— ‘পিসিমা, এরা আমাকে বাঁচাবার জন্যে অনর্থক চেষ্টা আর অর্থব্যয় করছে; আমাকে যেতেই হবে।’

পূর্বের মতোই সকলে ‘বড়োমা’কে দেখতে পায়। এ জিনিসটা এখন সকলের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, সেজন্যে প্রথম দিককার মতো কেউ আর ভয় খায় না। বিশেষত এই সময়টায়, ব্যাপারটা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ-ব্যাপারের জন্যে কারোর মনেই শান্তি ছিল না; অথচ শান্তি পাবার আশায় প্রত্যেক পথে অগ্রসর হয়ে, শেষ পর্যন্ত পথ হারাতে হয়েছে। শুধু একজনের একটি প্রস্তাব মতো কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তিনি বলেছিলেন, ভারতের বাইরে, কোনো সুদূর

দেশে যোগেনবাবুকে পাঠিয়ে দেওয়া। বাড়ির সকলেরও ইচ্ছা হয়েছিল, কয়েকটা মাস ইংলন্ডে ওঁকে রাখবার জন্য। কিন্তু এ ব্যবস্থা প্রথম দিকে হলে হয়তো হতে পারত, এখন তাঁর শরীরের যেকোন অবস্থা, তাতে— ইচ্ছা হলেও এ কাজ সম্ভবপর নয়। এখন তাঁকে জাহাজে তুললে, হয়তো জাহাজের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

ঠাকুমার সঙ্গে যে-কটা দিন ও-বাড়িতে ছিলাম, তার মধ্যে আমি দু-দিন ‘বড়োমা’কে দেখতে পেয়েছিলুম; কিন্তু বিশেষ কিছু ভয় পাইনি। তার কারণ, ভূত-প্রেতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ও তাদের ‘নাকি সুরে’ কথা কওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে, তোমাদের ছোটো ছোটো মনে যেরকম একটা কাল্পনিক বিকট ছবি অঙ্কিত ছিল, সেসবের সঙ্গে এর কিছুই মিল নেই; এ যেন বাড়ির অন্য দশজনেরই মতো একজন। মানুষের মতোই আকার, মানুষের মতোই কথা, মানুষের মতোই কণ্ঠস্বর। বাড়ির গৃহিণীর মতোই তাঁর সব বিষয়ে গৃহিণীপনা। টকটকে লাল পেড়ে শাড়ি পরা, হাতে বালা, নোয়া, মাথায় সিঁদুর —এ যেন জীবন্ত ‘বড়োমা’ তাঁর বহুদিনের হাতে গড়া বৃহৎ সংসারটির সকল দিকের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারই সুগভীর মমতা ও প্রীতির ভরে পরিচালনা করছেন। এই সূত্রেই তিনি এক রাত্রে বিমলা নামে অল্পবয়স্কা এক দাসীকে বলেন, ‘দেখ বিমলি, ন-বউমার ছোটো ছেলেটা দিন দিন পাকিয়ে যাচ্ছে। ওর কৃমি হয়েছে। ঠাকুরপো যেন ওর ওষুধের ব্যবস্থা করে দেয়, বুঝলি?’ একদিন দ্বিজেনবাবুর স্ত্রীকে বললেন, ‘ও রে ছোটো, নিমুর কোলের মেয়েটা রোজই মাঝ রাত্রে কেঁদে কেঁদে কোকিয়ে যাবার মতো হয়। ওর মা কি মরে ঘুমোয়? ওই সময় উঠে বসে মেয়েটার গলাটা একটু ভিজিয়ে দিতে পারে না? কী ঘুম রে বাবা! বলিস তো ছোটো, ওর মাকে।’ —এইরকম জীবিতকালের মতো, মরে গিয়েও সব দিকে নজর। তার মধ্যে বেশি নজর— স্বামীর দিকে। ন-বউমার ছোটো ছেলে ওষুধের ব্যবস্থা করছেন। নিমুর কোলের মেয়ের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি, কিন্তু স্বামী যে দিনের-পর-দিন মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কোনোই তাঁর খেয়াল নেই, দুঃখ নেই, অস্থিরতা নেই, শুধু আছে একটা গভীর আকর্ষণ। অথচ তখন যোগেনবাবুর এমন অবস্থা যে, কবে কোন দিন তাঁর হয়তো কী ঘটে।

কয়েক দিন পরে ঘটলও তাই। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে যোগেনবাবু চিরদিনের মতো চক্ষু বুজলেন।

বিস্ময়ের কথা এই যে, সেদিন থেকে আর কোনোদিনই ও-বাড়িতে ‘বড়োমা’কে দেখা যায়নি।

এক রাত্রি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

নৌকা করে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যার পর তুমুল জল-ঝড়ে নৌকা পথে আটক পড়ল। এক ঘাটের কাছে একটি বাঁশের খুঁটিতে নৌকা বাঁধা রইল পুরো দুটি ঘন্টা।

রাত আটটায় যেখানে পৌঁছোবার কথা সেখানে পৌঁছোলাম রাত দশটার পরে।

সেখান থেকে পুরো এক ক্রোশ গেলে তবে আমার গন্তব্য স্থান। পাকা পথ কিছু নেই। ধান খেতের আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। রাতে সে-পথ দিয়ে যেতে ভরসা পেলাম না। তার উপর আকাশে তখনও মেঘ ছিল। ঘাটের পাশেই একটি খাবারের দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে বললাম— আজকের রাতটা এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা হবে?

দোকানি বলল— না মশাই, পর পর এই অঞ্চলে কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে; সেইজন্য দারোগাবাবুর কড়া হুকুম আছে, বাইরের কোনো লোককে যেন এখানে থাকতে দেওয়া না হয়। আপনি বরং থানায় যান, ওখানে বারান্দায় শোবার জায়গা আছে।

—থানা কতদূর?

এখান থেকে পোয়াটাক পথ, ওই রাস্তায় সোজা গেলেই দেখতে পাবেন, একটা আলো জ্বলছে।

কিন্তু থানায় একবার গেলেই তো অনেক কথা, অনেক কৈফিয়ত। বললাম— না, অতদূর আর যাব না। কাছাকাছি কোনো জায়গা নেই, যেখানে শুয়ে রাতটা কেটে যায়, ভিজতে হয় না?

—ওই পাশেই নদীর ঘাটে একটা চাতাল আছে, দেখুন গে।

সেই দিকেই গেলাম। একটু গিয়েই একটা ঘাট। বাঁধানো চত্বর, দু-পাশে একটু রোয়াক। মাথার উপর ছাদ। স্থানটি খারাপ লাগলো না, একটা রোয়াকের উপর শুয়ে পড়লাম।

নতুন জায়গা। ঘুম আসতে চায় না। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলাম। আবার বৃষ্টি নামলো। ব্যাং ডাকতে শুরু করল। একটানা ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে কোনো এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, সহসা কোনো এক সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে চাতালের উপর। কেউ কোথাও নেই। মনের ভুল তাহলে। নিশ্চিতমনে চোখ মুদলাম।

আবার যেন কে আমাকে ডাকল!

চোখ চাইলাম। এবার চোখে পড়ল চাতালটার বাইরে থামের পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোয় তার সাদা কাপড়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। একজন রমণী। মুখখানি কুয়াশার মতো অস্পষ্ট, কিন্তু চোখ দুটি বড়ো বেশি স্পষ্ট। সেই চোখের পানে তাকিয়ে কেমন যেন মনে হল, জিজ্ঞাসা করলাম— তুমি কে?

—আমি গো, আমি! স্পষ্টকণ্ঠে রমণী উত্তর দিল।

—কে তুমি?

—আমায় চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার স্ত্রী।

—আমার স্ত্রী! আমি বিয়ে করলাম কবে? আমার বয়স তো মাত্র বাইশ বছর।

সেকথার কোনো জবাব না-দিয়ে রমণী বলল— এসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

—আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এসো।

রমণী ধীরে ধীরে আমার সামনে এগিয়ে এল। সাদা কাপড় পরা অস্ফুট জ্যোৎস্নার মাঝে অস্পষ্ট আবছা দেহ। স্পষ্ট শুধু দুটি চোখের স্থির দৃষ্টি। সে দুটি আমার মুখের উপর। সে দৃষ্টির সামনে এবার আমার সত্যই ভয় হল। মনে হল একদৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাই, কিন্তু পালাতে পারলাম না, সারা দেহ অনড়, সব শক্তি যেন উবে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম বটে, কিন্তু রমণী তখন একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল— এসো, আমার সঙ্গে চলো—

—তোমার সঙ্গে কোথায় যাব? তোমাকে তো আমি চিনি না!

—চলো না, খানিক ঘুরে আসি। অনেক দিন পরে তোমাকে পেলাম। কতদিন তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে আছি। জানি তুমি আসবে। এসো... বলে রমণী আমার একখানি হাত ধরল।

আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা হাত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা হিমের প্রবাহ বয়ে গেল। ঝটকা মেরে হাতখানি ছাড়িয়ে নিতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। রমণী হেসে উঠল, বলল— ভয় করছে, না?

অমন তীক্ষ্ণ হাসি কখনো শুনিনি। তার মুখের পানে তাকালাম, সাদা দাঁতের স্পষ্ট আভাস দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ফাঁকে। সে হাসির রেশটুকু কান থেকে না মেলাতেই, আমার হাত ধরে সে টানল, বলল— এসো—

অরাজকতা এতকুসিদ্ধ

সে আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার শক্তি আমার ছিল না। স্বচ্ছন্দে সে আমাকে নামিয়ে আনল রোয়াক থেকে, অতি সহজে সে আমাকে টেনে আনল চাতালের বাইরে। তারপর চোখের নিমেষে সে উঁচু হয়ে উঠল, তার মাথা চাতালের ছাদ ছাপিয়ে উঠে গেল। আবার সে খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল— বড্ড ভয় করছে, না?

বুঝলাম, আমাকে প্রেতিনি ধরেছে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বোধ হয় কাঁপছিলাম।

সহসা সে আমার দু-হাত ধরে আমাকে শূন্য তুলে ফেলল, বুপ করে বসিয়ে দিলে এক গাছের মাথায়, বলল— বসো।

একটা ডাল ধরে কোনোরকমে তো বসলাম, কী করে যে বসলাম তা জানি না, তবে বসলাম যে সেটুকু জানি। অনেক চেষ্টা করে এবার কথা বললাম— এ কী, এখানে বসে আমি কী করব?

—আমি এখানে থাকি, তুমিও থাকবে।

—মানুষ কখনো গাছে থাকে? তুমি আমাকে নীচে নামিয়ে দাও।

—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমাকে ছাড়ব কেন? আমি যেখানে থাকি, তুমিও সেখানে থাকবে।

—আমি বিয়েই করিনি, আমি তোমার স্বামী হলাম কেমন করে?

—বুঝেছি, আমাকে স্ত্রী বলে মানতে এখন তোমার ভয় হচ্ছে, আমি কিন্তু ঠিক চিনেছি। তোমায় কখনো ভুলতে পারি? তুমি কীরকম লোক! বাবা পণের পুরো টাকা দিতে পারেননি, সেজন্যে তুমি আমাকে কত মেরেছ, শেষে আমাকে পুকুরের জলে ঠেলে ফেলে দিলে। আমি কি তোমাকে সহজে ভুলতে পারি?

—আমি তোমাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছি?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। এখন সব ভুলে গেলে চলবে কেন?

—আমি থাকি কলকাতায়, সেখানে পুকুর কোথায়?

—আমাকে কথা দিয়ে ভোলাতে পারবে না, আমি তোমাকে ঠিক চিনেছি!

বাতাসের ঝাপটায় গাছ দুলে ওঠে। মনে হয় এখনি বুঝি পড়ে যাব। প্রাণপণে কয়েকটি ডাল দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকি। কোথায় যেন একটা পৌঁচা ছুট ছুট করে ডেকে ওঠে। কী বলব, কী করব কিছুই ভেবে পাই না। সামনের পানে তাকিয়ে দেখি সেই দুটি চোখ। আজ রাতে এই প্রেতিনির হাতেই বোধ হয় অপঘাতে মরতে হবে।

কতক্ষণ এভাবে গাছের মাথায় বসেছিলাম কে জানে, কোনো এক সময় সে বলে উঠল— কী, খুব ভয় করছে, না?

—গাছের উপর বসে থাকলে ভয় করবে না?

—এসো, তোমাকে নামিয়ে দিই।

নিমেষে আমার হাত ধরে সে নীচে নামিয়ে দিল। নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

অরাজকতা একক্লান্ত

কিছুটা সাহস ও পেলাম। বললাম— আমাকে নিয়ে এমনি করছ কেন? কী চাও বলত? সত্যি বলছি, আমি তোমার স্বামী নই।

—তোমার সব মিছে কথা। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে সহজে ভোলাতে পারবে না।

—বলো, আমি ঠাকুর দেবতার নামে দিব্যি করছি।

—ঠাকুর ঠাকুর করো না, এসো... সে ধমক দিয়ে উঠল।

—ঠাকুর দেবতার নাম করব না?

—না। এসো—

আমার হাত ধরে শাঁ করে সে একপাশে ঘুরে গেল। মনে হল, আমার চারপাশ দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। পরক্ষণেই দেখি আমি একেবারে নদীর ঘাটে জলের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। সামনেই একটি চিতা জ্বলছে। দমকা বাতাসে কাঠগুলি ধক ধক করে জ্বলে উঠছে। আমাকে দেখে চিতার পাশে দুটি শেয়াল খ্যাঁক খ্যাঁক করে ডেকে উঠল। বললাম— এ তো শ্মশান!

—হ্যাঁ।

—আমাকে এখানে আনলে কেন?

—তোমাকে দেখাতে।

—কী?

—ওই যে আমি পুড়ছি। সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সারা দেহ জ্বলছে। তোমার জন্যে আমি জ্বলে মলুম। উঃ!

তাকালাম তার পানে। সেই দীর্ঘ প্রেতিনি আবার ছোট মানুষ হয়ে গেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট আবছা সাদা কাপড়, চিতার আগুনের আভাতেও তা স্পষ্ট হয়নি। স্পষ্ট শুধু দুটি চোখ, স্থির দৃষ্টিতে জ্বল জ্বল করছে আমার মুখের উপর। সেই চোখের পানে তাকিয়ে আমার সারা দেহ কেঁপে উঠল। তবু কোনোরকমে বললাম— তুমি কোথায় জ্বলছ? এই তো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ!

—না, আমি জ্বলছি, দেখতে পাচ্ছ না ওই তো আমি জ্বলছি, তোমাকেও আমি অমনি জ্বলাব।

এই বলে সহসা আমার হাত ধরে এক ঝটকায় সে আমাকে টেনে নিয়ে ফেলে দিলে একেবারে চিতার উপর। আগুনের স্পর্শ পেয়েই আমার সারাদেহ চনমন করে উঠল। বাঁচবার একটা প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা দিল মনে। চিতার আগুনটা ধুইয়ে ধুইয়ে জ্বলছিল বলেই রক্ষা, না হলে তখনই দক্ষ হয়ে যেতাম। তখনই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সরে এলাম।

খিলখিল করে প্রেতিনি হেসে উঠল। আরও অনেকগুলি ছায়া খিলখিল করে

উঠল আমার চারপাশে। সহসা কী মনে হল, চিতা থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলাম, চিৎকার করে উঠলাম— তবে রে!

প্রেতিনি সট করে আমার সামনে থেকে সরে গেল। আমার সামনের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। জ্বলন্ত কাঠখানা হাতে নিয়ে আমি ছুটলাম। শুনতে পেলাম পিছনে সে ডাকছে— যেও না, যেও না, শোনো। আমাকে এখানে একলা ফেলে যেও না। শোনো—

কোনো দিকে না তাকিয়ে আমি দৌড়োলাম। কোন দিকে কতদূর গিয়েছিলাম জানি না, দেখি একখানি দোকানঘরের সামনে জন চারেক লোক বসে গাঁজা খাচ্ছে। কন্ধের আগুনটা ধক ধক করে জ্বলে উঠছে। তাদের মাঝে গিয়ে ব্লুপ করে বসে পড়লাম। তারা চমকে উঠল, বলল— কে গো? কী হল?

বললাম— পেতনি তাড়া করেছে!

গাঁজা খাওয়া থেমে গেল, সবাই আমার মুখের পানে তাকাল। আমার অবস্থা দেখে একজন বলল— জল খাবে?

হাতের কাছেই ঘটিটি ছিল, এগিয়ে দিল।

বেশ খানিকটা জল খেয়ে তবে একটু সুস্থ বোধ করলাম।

এবার তারা জিজ্ঞাসা করল— কী হয়েছিল, কী? এই রাতদুপুরে শ্মশানে গিয়েছিলে কেন?

—আমি কি আর গেছি, আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।

—কী হয়েছিল, কী? —সবাই তাকাল আমার মুখের পানে।

চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলাম। প্রেতিনিকে আর দেখতে পোলাম না। সাহস পেলাম। ধীরে ধীরে বললাম সব ঘটনা। শুনে তারা বলল— এ তো হতেই পারে। ওটা তো শ্মশানের ঘাট। শ্মশানে ভূত-প্রেত থাকবে এ আর আশ্চর্য কী? কত রকমের কত মরা আসছে। ওখানে তো রাতে কেউ থাকে না। তার উপর তুমি আবার একা ছিলে। তোমার সাহস বলিহারি যাই। যাক, নারায়ণ তোমাকে রক্ষা করেছেন। তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদ। না হলে এই তো বছর খানেক আগে এই শ্মশানের পাশ দিয়ে আসার সময় আমাদের হারাধন ডাক্তারের ঘাড় মটকে মেরে ফেললে। কী হাতযশাই ছিল ডাক্তারবাবুর, এক ফোঁটাতে কত রোগ সারিয়েছে। ও শ্মশানটা জায়গা ভালো নয়। তুমি খুব বুদ্ধি খরচ করে চিতা থেকে কাঠখানা তুলে নিয়েছিলে, তাই রক্ষা! যাক, রাতের বেলা ওসব কথা থাক, রাম রাম রাম রাম!

নিশ্চিন্তমনে তারা আবার গাঁজা টানতে শুরু করল।

বাকি রাতটুকু আমি সেই গাঁজাখোরদের পাশে বসেই কাটিয়ে দিলাম।

জামাই

মনোজ বসু

অনেক দিনের কথা। খুলনা অবধি নতুন রেললাইন বসেছে। একটা স্টেশন ঝিকরগাছি।

শ্রাবণ মাস। সারাদিন ঝুপঝুপে বৃষ্টি। সন্ধ্যা থেকে একটুখানি ধরেছে। রাত্রি সাড়ে আটটায় কলকাতার ট্রেন ঝিকরগাছি এসে থামল। দুর্যোগে মোটে ভিড় নেই। জন তিন-চার গাড়িতে উঠল। নামল একটিমাত্র যুবাপুরুষ। নাম বিনোদ। কাছাকাছি সাদিপুর গাঁয়ের মাখনলাল করের জামাই। তাঁর ছোটো মেয়ে চঞ্চলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বছর দুই আগে।

পুনায় থাকে বিনোদ, মিলিটারিতে জামাই চাকরি করে। সম্প্রতি বাসা পেয়েছে। বউকে নতুন বাসায় নিয়ে যাবে। এক হপ্তার ছুটি নিয়ে স্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। এর পর ভাদ্র মাস পড়ে যাবে। স্বশুর-শাশুড়ি তখন মেয়ে পাঠাবেন না। সেইজন্যে তাড়াতাড়ি।

স্টেশনে নেমে বিনোদ গেট পেরিয়ে বেরুল। গেটে লোক নেই, কেউ টিকিট চাইল না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কোনো দিকে জনমানব দেখা যায় না। আরও দু-বার সে স্বশুরবাড়ি এসে গেছে, পথ মোটামুটি জানা। তবু ভালো করে একবার স্টেশনমাস্টারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবে।

অফিসঘরের দরজা ঝাঁকচ্ছে— মাস্টারমশায়, মাস্টারমশায়—

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আলো জ্বলছে। স্টেশনমাস্টার আছেন অতএব অফিসে। সাড়া দিচ্ছেন না।

শুনুন একবারটি মাস্টারমশায়—

পয়েন্টসম্যান এল হঠাৎ কোন দিক থেকে। গায়ে নীল কোট; তার উপর মোটা কম্বল জড়ানো। তা সত্বেও হি-হি করে কাঁপছে। বলে, ডাকেন কেন বাবু? মাস্টারমশায় জুরে বেহঁশ। গাড়ির ছাড় গার্ডসাহেব আজ আমার কাছ থেকে নিয়ে নিল। উনি উঠতে পারবেন না, আমায় বলুন কী দরকার।

সাদিপুর থেকে আমার জন্য ^{অরাজকতা একটু মিলে} পালকি আসার কথা। দেখতে পাচ্ছিলেন তো।

ক্রভঙ্গি করে পয়েন্টসম্যান বলে, পালকি চাচ্ছেন বাবু, বলি পালকিটা বইবে কারা? বেয়ারা জুটবে কোথা? ম্যালেরিয়ার নতুন আমদানি— ঘরে ঘরে মেয়েমর্দ সকলের জ্বর। একবাটি বার্লি রৈঁধে দেবার মানুষ জোটে না, আপনার মাথায় পালকির শখ চাপল এখন।

হাঁসফাস করছিল লোকটা— বিনোদের সামনে সেইখানে মেঝের উপর বসে পড়ল। বলে, আগের লোকটা মারা গেল জ্বরে। পরশুদিন আমায় এই স্টেশনে পাঠাল। আমাকেও জ্বরে ধরেছে। কপালে কী আছে জানিনে।

দু-মাসের মধ্যে বিনোদ স্বশুরবাড়ির কোনো চিঠিপত্র পায়নি। মন বড়ো উতলা। স্টেশনমাস্টার পুরোনো লোক, তিনি হয়তো খবরাখবর কিছু বলতে পারতেন। এ লোক একেবারে নতুন, একে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই।

সারাদিন খাওয়া হয়নি বিনোদের। বড়ো ক্লান্ত। একবার ভাবল, রাত্রিটা স্টেশনে কাটিয়ে সকালবেলা বেরুবে। কিন্তু সামান্য পথ, মাইল তিনেকের বেশি নয়। মশা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে— যা গতিক, রাতের মধ্যে চোখ বুজতে দেবে না। তার চেয়ে কোনোরকমে পথটুকু কাটিয়ে স্বশুরবাড়ির খাটের উপর গদিয়ান হয়ে পড়া ভালো।

পথে নেমে পড়ল বিনোদ। হনহন করে চলেছে। হাতঘড়িতে ন-টা। সন্ধ্যারাত্রি বলা যায়। এরই মধ্যে চারিদিক একেবারে নিশুতি। রাস্তার জল কলকল করে নালায় পড়ছে। ব্যাং ডাকছে গ্যাঙর-গ্যাং। বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছে মাথার উপরে।

চাঁদ দেখা দিল আকাশে। মেঘ ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্না। অদূরে কেয়াঝাড়। ছত্রাকার কেয়া পাতার নীচে মানুষ যেন! মানুষটা কাঁটাবনের মধ্যে মোটা কেয়া গুঁড়ির উপর আরামে পা ছড়িয়ে বসে আছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এতক্ষণের মধ্যে প্রথম এই মানুষ।

বিনোদ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, সাদিপুর্নে মাখনলাল করের বাড়ি যাব। যাচ্ছি তো ঠিক?

উহ—। শব্দের মতন আওয়াজে মানুষটা জবাব দেয়— সাদিপুর্ন যাবে তো এই দিকে চলে এসো। ডাকছি, আসছ না কেন?

পথ কোথা গহিন জঙ্গলের মধ্যে। পাগল নিশ্চয়— নয় তো রাত্রিবেলা ঘরবাড়ি ছেড়ে এমন জায়গায় কেন? মিলিটারি মানুষ বিনোদ— সে কিছু গ্রাহ্য করে না। নিরুত্তরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আরও জোরে গটমট করে চলল।

দীর্ঘ একটা খেজুরগাছ ঝড়ে বেঁকে গেছে। কাত হয়ে আছে সেটা রাস্তার উপর। গাছটা আগেও দেখেছে, বিনোদের মনে পড়ল। ঠিক পথেই যাচ্ছে তবে, পথ হারায়নি। যেই মাত্র গাছের নীচে আসা, গাছটা নুয়ে এসে বিষম জোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

সঙ্গেসঙ্গে আবার আগেকার অবস্থায়— তেমনি কাত হয়ে আছে রাস্তার উপর। আর যেন খলখল হাসি শুনতে পায় বাতাসে। বিনোদ ছুটে বেরুল, তাই রক্ষা! নইলে গাছ ঠিক মাথার উপরে পড়ত, মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

খুব খানিকটা গিয়ে পিছনে তাকায়। খেজুরগাছ যেমন তেমনি আছে, পাতা ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্নায়। সাহসী মানুষ বিনোদ— প্যারেড করে, বন্দুক চালায়। ভাবছে, চোখের ভুল। বসে মেল আজ বড্ড লেট ছিল— হাওড়া স্টেশনে নেমেই শিয়ালদা মুখে ছুটতে হল। খাওয়া-দাওয়া হয়নি সমস্তটা দিন। ক্ষিধে-তেষ্টায় অবসন্ন হয়ে মাথা ঘুরছে, আর এই সমস্ত আজব জিনিস দেখছে। আসলে কিছুই নয়।

স্বস্তরবাড়ি পৌঁছে গেল। অবস্থা ভালো এঁদের, পাকা কোঠাবাড়ি। বৈঠকখানা অন্ধকার। শীতকালে বড়োদিনের সময় বিনোদ এসেছিল, দিনরাত লোক গিজগিজ করত তখন। রাতদুপুর অবধি পাশা খেলার ছল্লোড়। আজ কেউ নেই। সেটা হয় তো ওই পয়েন্টসম্যানের মুখে যা শোনা গেল— জ্বরজারির মধ্যে আড্ডা দেওয়ার পুলক নেই মানুষের। বাড়ির কর্তারাও হয়তো জ্বরের তাড়সে ভিতর-বাড়ির বিছানায় পড়ে কোঁ-কোঁ করছেন।

ভিতর-বাড়ির দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে। জামাই ঢুকে গেল ভিতরে। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে শব্দসাড়া করে। কাশছে। একজন কেউ বেরিয়ে আসুক। কী আশ্চর্য, গেলেন কোথা সব?

এইরকম ভাবছে। কোন দিক থেকে ঘোমটা দেওয়া এক বউ এসে সামনে দাঁড়াল। বিনোদ হকচকিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি পরিচয় দিল, এ বাড়ির ছোটো জামাই আমি— বিনোদ।

খিলখিল খিলখিল উচ্ছলিত হাসি। হাসতে হাসতে ঘোমটা খুলে ফেলে চঞ্চলা। বিনোদের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

চঞ্চলা আগে আগে চলেছে। মস্তবড়ো বাড়ি। আরও কত বারান্দা কত সিঁড়ি উঠান পার হয়ে চলল। একসময়ে বিনোদ সেই আগের প্রশ্ন করে, মানুষ দেখিনে— গেলেন কোথা এঁরা সব?

চঞ্চলা বলে, ঝিকরগাছি আমার এক পিসির বাড়ি। পিসির মেয়ের বিয়ে আজ। বাড়িসুদ্ধ সেখানে চলে গেছেন।

একবার ঢোক গিলে বলে, আমারও যাবার কথা। কিন্তু জ্বর থেকে উঠে সবে কাল অন্নপথ্য করেছি কিনা—

ঘরের মধ্যে এসে গেছে দু-জনা। কুলুঙ্গিতে প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় বিনোদ চঞ্চলার দিকে ভালো করে তাকাল। অসুখ করেছিল, চেহারায় তা বোঝা যায় না। আগে যেমন দেখে গেছে, তেমনি। চঞ্চলার চেহারা ও স্বাস্থ্য চমৎকার।

বিনোদ বলে, এত বড়ো বাড়ির মধ্যে একলা একটি প্রাণী ভয় হচ্ছে না তোমার? একলা কেন হবে? বুড়ো দরোয়ান আর গোবিন্দ চাকর রয়েছে। তারা বৈঠকখানায়। সৌদামিনী ঝি-ও আছে। শরীর খারাপ বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে, ডাক দিলে এসে পড়বে।

পালঙ্কের বিছানায় চেপে বসে বিনোদ অভিমান ভরে বলে, আজ এসে পৌঁছোব, স্টেশনে পালকি রাখবার জন্য চিঠি দিয়েছিলাম। পালকি না জুটুক, স্টেশনে অন্তত বুড়ো দরোয়ানকে পাঠালে পারতে।

চঞ্চলা ঘাড় নাড়ল— চিঠি পৌঁছোয়নি, পৌঁছোবার উপায়ও নেই। পোস্টমাস্টার— পিওন দুটোই মারা গেছে। যে রানার ডাক বয়ে আনত, সে-ও নাকি নেই।

সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া। জ্বরজারি কাকে বলে এ অঞ্চলের লোক আগে জানত না। পাথরে কোঁদা নিরেট দেহ যেন মানুষের। রেললাইন হয়ে অবধি এই কাণ্ড। গাঙ-খালের মুখ বন্ধ করে রাস্তা বেঁধেছে। খানাডোবা চারিদিকে। বর্ষার জল পড়তে না পড়তে নরক গুলজার। মানুষজন উজাড় হয়ে গেল।

কথাবার্তার মধ্যে একসময় বিনোদ বলে, তোমার কাছে বলতে কী— সারাদিন ভাত জোটেনি, বিষম ক্ষিধে পেয়েছে। ক্ষিধের চোটে মুখে আমার কথা সরছে না। তাড়াতাড়ি চাউ ভাত ফুটিয়ে দিতে পার তো দেখ।

চঞ্চলা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল— ছি ছি, আগে বলতে হয়! চালে-ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে দিইগে, তাড়াতাড়ি হবে। তরকারির হাঙ্গামায় যাব না। শুয়ে থাকো তুমি, বিশ্রাম করো। এসে ডাকব তোমায়।

চলে গেল চঞ্চলা। যেন উড়ে বেরিয়ে গেল পাখির মতন।

এই ঘরটায় বিনোদ আগেও থেকে গেছে। পিছনে খিড়কির বাগান। কদম ফুল ফুটেছে, খোলা জানলায় মিষ্টি গন্ধ আসছে। কুলুঙ্গির প্রদীপটা হঠাৎ দপদপ করে। আলো নাচে দেয়ালে দেয়ালে। চমক লাগে— অনেক লোকের আনাগোনা যেন বাইরে, ফিসফিস কথাবার্তা।

কে রে, গোবিন্দ নাকি ওখানে?

জবাব নেই। একা গোবিন্দ কিংবা দু-জন চার জন মানুষ নয়। অনেক, অনেক। বাড়ির সকলে নিমন্ত্রণে গিয়েছে। এত লোক তবে কোথা থেকে আসে?

উঁকি দিয়ে দেখল জানলার বাইরে। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হয়েছে এখন। না, কিছুই নয়। কিন্তু যেই মাত্র ভিতর দিকে সরে আসে, আবার সেই পাতার খসখসানি। ভিড় জমেছে বুঝি জানলায়, ঠেলাঠেলি করে তার দিকে উঁকি দিচ্ছে। চাপাগলায় শলাপরামর্শ।

উঠে গিয়ে বিনোদ দড়াম করে জানলার কব্জাট বন্ধ করল। একলা ঘরে গা

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ছমছম করছে। চঞ্চলার কাছে একথা বলা যাবে না। হাসবে। ঠাট্টা করবে— এই বীরপুরুষ তুমি, এই সাহস নিয়ে লড়াইয়ের পায়তারা কষে বেড়াও!

তার চেয়ে কোথায় চঞ্চলা রান্নাঘরে খিচুড়ি চাপিয়েছে— চলে যাওয়া যাক সেখানে। রান্না চলবে আর গল্প হবে দু-জনায়।

পা-টিপে-টিপে নিঃসাড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঢুকে পড়ে চঞ্চলাকে চমকে দেবে।

কিন্তু— ওরে বাবা, কী সর্বনেশে কাণ্ড গো! রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে বিনোদ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। রান্না করছে চঞ্চলা— উনুন জ্বালাবার কাঠকুটো নেই বুঝি, সেইজন্য নিজের পা দু-খানা ঢুকিয়ে দিয়েছে উনুনের ভিতর, দাউদাউ করে পা জ্বলছে! উনুনের উপর কড়াইতে খিচুড়ি ফুটছে টগবগ করে। চঞ্চলা আঙুল দিয়ে এক-একবার তুলে টিপে দেখছে সিদ্ধ হল কি না। গরম খিচুড়ির মধ্যে ইচ্ছামতো আঙুল ডুবিয়ে দিচ্ছে, পা জ্বলছে ওদিকে উনুনের ভিতরে।

মশলা বাটবে। কোণের দিকে শিল-নোড়া। চঞ্চলার উঠবার জো নেই— পা তুললেই তো নিভে যাবে উনুন। হাত বাড়াল শিল-নোড়া আনবার জন্য। হাত ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। লম্বা হয়ে শিল-নোড়া ধরল। তারপর ছোটো হচ্ছে। হতে হতে আবার স্বাভাবিক আকারে এল। কাছে এনে শিল পেতেছে। হাত লম্বা করে তখন তাকের উপরের মশলার ডালা নামিয়ে আনল। এক জায়গায় বসে সমস্ত হচ্ছে। ঘটরঘটর করে চঞ্চলা বাটনা বাটে এবার।

বিনোদ রুদ্ধনিশ্বাসে দেখে সব তাকিয়ে। পা দুটো খুঁটির মতন অনড় হয়ে গেছে। দেখছে একদৃষ্টিতে।

খিচুড়ি নামিয়ে চঞ্চলা থালায় ঢালে। পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করল, জলের গেলাস দিল পাশে। পাতিলেবুর কথা মনে হল বুঝি এইসময়। জানলার গরাদ দিয়ে হাত বের করে দেয়। লম্বা হচ্ছে হাত— আরও, আরও। হাত পঞ্চাশ তো হবেই।

পাঁচিলের প্রান্তে পাতিলেবুর গাছ— বিনোদের দেখা আছে। ডান হাত সেই অবধি বাড়িয়ে পটপট করে গোটা চারেক লেবু ছিঁড়ে হাত আবার গুটিয়ে আনে। বাঁটি পেতে লেবু কাটছে।

হঠাৎ বিনোদ যেন সংবিৎ পেয়ে যায়। উঠি-কি-পড়ি ছুটছে। স্বশুরবাড়ির বাইরে, একেবারে রাস্তার উপর। রাস্তা ধরে ছুটছে। মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু চারিদিক থেকে কলরব। বহুকণ্ঠে ডাকাডাকি করছে— পালাস কোথা? দাঁড়া! ভালোর তরে বলছি, দাঁড়িয়ে যা—! খলখল করে হাসি।

বাঁশতলার অন্ধকার। ছুটতে ছুটতে অন্ধকার কাটিয়ে বিনোদ ফাঁকায় এল। কী আশ্চর্য, তার সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে চারদিকে চারটে বউ। সে যত ছোটো, বউগুলোও ছোটো ততই। ছায়াকে যেমন ছেড়ে পালানো যায় না, তেমনি এরা।

সামনের বউটা একসময় থমকে দাঁড়ায়। গায়ের উপরে বিনোদ হুমড়ি খেয়ে

পড়ছিল, কোনোরকমে সামলে নিল। রক্ষা নেই, এইবারে ধরল। তাকিয়ে দেখে, অন্য তিন বউও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে।

সামনের বউটা ঘুরে দাঁড়ায় বিনোদের দিকে। এতক্ষণে মুখের ঘোমটা তুলল। তারই স্ত্রী চঞ্চলা— রান্না করছিল যে বসে বসে। ডাইনে-বাঁয়ে ও পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে, তারাও সব ঘোমটা খুলেছে। চঞ্চলা সবাই। এক চঞ্চলা চারজন হয়ে গেছে। পালাবার পথ নেই কোনো দিকে। বিনোদের গায়ে ঘাম দেখা দিয়েছে। চারজনের আটখানা হাত অক্টোপাসের মতো টুটি চেপে ধরে বুঝি এইবার। হাতগুলো সত্যি লম্বা হচ্ছে একটু একটু করে, তার দিকে এগিয়ে আসছে। ফাঁকার মধ্যে বেঘোরে প্রাণটা গেল— হায় ভগবান!

চেতনা হারিয়ে বিনোদ পড়ে যায় আর কী পথের উপর! কিন্তু, না— হাতের মুঠিতে গলা চেপে ধরে না, হাতের আঙুলের কোমল স্পর্শ তার দেহে। সর্বাস্ত জুড়িয়ে গেল।

চঞ্চলার চোখে জল। চারজনের একসঙ্গে জল এসে গেছে চোখে। বলে, দেখ, একজন আমি চারজন হয়ে চার দিক থেকে ঠেকিয়ে নিয়ে এলাম। নয় তো রক্ষা ছিল না। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দিত না ওরা।

বিনোদ বলে, ওরা কারা?

চঞ্চলা বলে, আমি মরে গেছি। আমার ভাই-বোন বাপ-মা সবাই। মহামারিতে এত বড়ো গাঁয়ের মধ্যে একটি প্রাণী বেঁচে নেই। বেঁচে থাকতে এখানকার মানুষ গাঁয়ের মধ্যে চোর ডাকাত ঢুকতে দিত না। মরার পরে তেমনি এখন জ্যাস্ত মানুষ ঢুকতে দেয় না। ঢুকে পড়লে গলা টিপে মেরে দলের মধ্যে নিয়ে নেবে। তোমায় যে পারেনি, সে কেবল আমার জন্যে। তুমি বেঁচে থাক, শতক পরমায়ু হোক। এই কম বয়সে কেন তুমি মরতে যাবে?

হাঁপাচ্ছিল চঞ্চলা ছোটোছুটির ক্লাস্তিতে। খানিক দম নিয়ে বলে, গোড়ায় পিছু পিছু আসছিলাম। কিন্তু ভরসা হল না। কেউ এসে টপ করে যদি ধরে নেয়। সামনের দিক দিয়ে কিংবা ডাইনে-বাঁয়ে একজনে চারজন হয়ে চতুর্দিক ঘিরে নিয়ে এসেছি। সে যে কী কষ্ট! আর ভয় নেই, সাদিপুরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি। একটুখানি গিয়েই স্টেশন।

চার বউ চার পাশ থেকে মাথা নুইয়ে চারখানা ডান হাত বের করে বিনোদের পায়ের ধুলো নিল। পলকের মধ্যে দেখে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে একলা সে দাঁড়িয়ে। কোনো দিকে কেউ নেই।

[শারদীয়া (দেব সাহিত্য কুটীর), ১৯৬১]

আবার রাসমণি

বাণী রায়

আমার নাম রুবি।

আপনারা সকলেই আমার ইতিহাস জানেন, নয় কি?

আমি মা-বাবার এক মেয়ে। একজন রক্তচোষা ঝি-এর হাতে পড়েছিলাম—
যাকে ‘ভ্যাম্পায়ার ওম্যান’ (Vampire Woman) বলা হয়।

সেই ঝি-টা আঠারো নম্বর শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে সর্বপ্রথম হানা দিয়েছিল, আমি
যখন কলেজে ঢুকেছি। তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম অতিকষ্টে। তারপর
গোলাম হাজারিবাগ রোডে চারবছর পরে। সেখানেও বেনেগিনির ঝি সেজে রাসমণি
রক্ত চুষতে এসেছিল।

দ্বিতীয় বার রাসমণির হাত থেকে প্রাণটা আমার বাঁচল। কিন্তু মন কালো করে
এক বাজপাখি ভয় পাখনা মেলে জেগে থাকে: রাসমণি এখনও বেঁচে আছে!

হাজারিবাগ রোড থেকে সেবার কলকাতায় ফিরে গোটা তিনটি মাস বিছানায়
পড়েছিলাম। একরাশে শয়তানি রাসমণির আক্রমণ থেকে জীবন রক্ষা পেলেও
শরীর ভেঙে পড়েছিল। ক্রমাগত ভয় পেয়ে পেয়ে দেহপাত হয়ে গিয়েছিল।

বাবা ডাক্তার লাগিয়ে হাত জোড় করে বললেন, যা যা বলুন সবই করা হবে,
শুধু হাওয়া বদল বাদে! ওটি চলবে না।

প্রায় একবছর লাগল আমার সুস্থ হয়ে উঠতে। রাত্রে কেঁপে উঠতাম। ঘুম হত না।
খেতে পারতাম না। অনেক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পরে আমার দেহমন স্বাভাবিক হল।

এর মধ্যে সুশাস্ত লেখাপড়া শেষ করে চাকরি নিয়েছে। কেতকী বি. এ পাশ
করেছে, বি. টি পড়ছে। খুড়তুতো ভাই মুকুল ও মনীশ দু-জনেই বিদেশ চলে
গেছে। একজন ডাক্তারি পড়তে, অন্যজন ইঞ্জিনিয়ারিং। আমার সব চেয়ে ছোটো
ভাই শোভন বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে চলেছে।

আর আমি? রাসমণির ঘটনায় আমি দু-বার পড়ায় ভাঙ দেওয়াতে বেশ দেরি করে
এম. এ পাশ করেছি। মনে জোর এনে লেখাপড়াটা আমায় শেষ করতে হয়েছিল।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট ছেড়ে আমরা বালিগঞ্জে রাসমণির ঘটনার পরেই চলে এসেছিলাম। এখন কলকাতার বাসিন্দাই হয়ে গেছি আমরা। দেশ থেকে অবশ্য নিয়মিত টাকাকড়ি আসে জমিদারি থেকে; সেখানে কাকা কাকিমা দেখাশোনায় আছেন।

প্রথমে ইউনিভার্সিটি যেতাম ভয়ে ভয়ে। বাড়ির গাড়িতে সরকারমশাই পৌঁছে দিতেন রোজ রোজ। তারপর ভয় কমে গেলে শেষের বছরটা একাই যাতায়াত করতাম।

ক্রমে ক্রমে জীবনে সাহস ও উৎসাহ ফিরে এল আবার।

দেখলাম পৃথিবী কত উজ্জ্বল। সকলে কী আনন্দে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে স্বাধীনভাবে। আমার মতো একটা ভয়ের তাড়া খেয়ে কেউ পালিয়ে নেই।

কলেজ স্ট্রিটের দোকানগুলোয় কত আনন্দ, কত উৎসব! মেয়ে, ছেলে নদীর স্রোতের মতোই ভেসে চলেছে আনন্দের টানে। চারদিকের জীবনে উৎসাহ!

কবে আমার কি ঘটেছিল, একটা ঘণ্টা, রক্তচোষা স্ত্রীলোক আমার রক্ত চুষে খাবার আশায় দু-দু-বার যে আমার পিছু নিয়েছিল, সেকথা কি মনে করে বসে থাকতে হবে ঘরে দোর দিয়ে, খিল লাগিয়ে? সে তো ব্যর্থ হয়েছেই। আর কেন? এতদিনে মরেই গেছে রাসমণি। সুশান্ত গুলি লাগিয়েছিল ওর পায়ের গোড়ালি ঘেঁষে। লেগেছিল। রক্তের দাগও ছিল পথের খানিকদূর পর্যন্ত। গুলি খেয়েই মরে গেছে ও!

শেষে কলকাতার এক কলেজে কাজ নিলাম। জীবনটা বেশ চমৎকার কেটে যেতে লাগল। পৃথিবীর কোথাও যে ভয় থাকতে পারে ভুলেই গেলাম।

সেবার শীতের ছুটি। এমন সময়ে এক সাহিত্য সম্মেলনে হঠাৎ ডেলিগেট হয়ে গেলাম। দেশবিদেশ দেখার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল। মধ্যে ভয়ের তাড়া খেয়ে পারতাম না কোথাও যেতে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু সে তো বহুদিন আগের কথা। এম. এ পাশ করে স্বাধীন চাকরি নিয়ে আমার যেন সাহসটা ফিরে এল। দিব্যি স্বাধীন কাজকর্ম করছি। অতগুলো টাকা মাস মাস হাতে পাচ্ছি! ফলে জীবনে শখ মাথা তুলল। এখান-ওখান বেড়াতে শুরু করলাম নিজের পয়সায়।

সরকার মশাই এখন অতিশয় বুড়ো হয়ে দেশে চলে গিয়েছেন। যাবার আগে একটি উপদেশ আমাকে দিয়ে গিয়েছেন—

‘রুবি মা, সাবধানের বিনাশ নেই।’

তাই সাবধান হতে ভুলতাম না প্রায়ই, কিন্তু হাসি পেত আমার পূর্ব জীবনের ভয়ের স্মৃতি মনে পড়ে।

যাইহোক, দল বেঁধে আমরা চারটি অধ্যাপিকা রওনা হলাম দক্ষিণ ভারতে সাহিত্যসম্মেলনে ডেলিগেট হয়ে। এদিকে পূর্বে কেউ আসিনি। আশেপাশে যতটা পারি দেখে নেব স্থির করেই গেলাম।

প্রথম তিন দিন চলল সম্মেলন বড়ো শহরে। আমরা খুবই ব্যস্ত রইলাম এ

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

তিনটি দিন। তারপর ডেলিগেটের ক্যাম্প বন্ধ হওয়ায় আমরা একটা ছোটোখাটো হোটেল খুঁজে নিলাম। এখানে কয়েক দিন থেকে শহরটা দেখে নেব।

তারপর পাশের শহরগুলোও যতটা পারি দেখব।

বন্ধুরা বলল, ‘ভালো হোটেল পেতে হলে আগে ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। এখন যা পেয়েছি, এতেই থাকতে হবে।’

ছোটো-গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ি। পাশে খানিকটা দূরে শহরের যত আবর্জনা ঢালা হচ্ছে। বাড়িটার মধ্যে অবশ্য যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখা হয়েছে। সামনে ছোটো একফালি লনও আছে। একটা ঘর পেলাম। তিনজনের যোগ্য ঘরে আর একটি চৌকি ঢুকিয়ে তাকে চারজনের মতো করে দিয়েছে। পুরো নিরামিষ হোটেল, দক্ষিণ ভারতের সাধারণ চটিশ্রেণির হোটেলগুলোর মতোই।

সাদা-কাপড় পাতা একটা টেবিল, দু-খানা শক্ত চেয়ার ঘরে ছিল। আমরা ঠিক করলাম কোনোমতে ক-টা দিন এখানেই খাবার আনিয়ে খেয়ে কাটিয়ে দেব।

মোটামুটি একটা আস্তানা ঠিক করে শান্তি হল। গলিটা বড়ো ছোটো, এই যা অসুবিধা। পাড়াটাও আর একটু পরিষ্কার হলে ভালো হত। গলির শেষে খানিকটা খোলা জায়গা আবর্জনা ফেলে ভরিয়ে রাখা। নিশ্চয় ময়লাফেলার গাড়ি কোনো এক সময়ে এগুলো নিয়ে যায়। জায়গাটার ওপাশ দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তাটা কোথায় গেছে কে জানে?

আমরা শহরটা দেখবার আশায় গলি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত বড়ো রাস্তায় এলাম। এখানে ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়। একখানা গাড়ি ভাড়া করে আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম।

শহর মন্দ নয়, কিন্তু বড়ো নির্জন। সাহিত্যসম্মেলনটি এখানে বসবার একমাত্র কারণ এখানকার রাজা প্রচুর অর্থ দিয়েছেন সাহায্যকল্পে। একদল লোক আছে হুজুগে। তারা দক্ষিণ ভারত দেখার লোভে এখানে সভা করতে রাজি হয়েছে। নইলে দল বেঁধে আসার মতো নয় স্থানটি।

যাই হোক, এসেই যখন পড়েছি, তখন ভালো করেই বেড়িয়ে ফিরব।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম, জায়গাটি ভরা ভিথিরি। ‘এখানে এত ভিথিরি কেন?’ নন্দা, আমাদের ইংরেজি অধ্যাপিকা, জিজ্ঞাসা করল?

‘এ সমস্ত জায়গার লোকেরা বড়ো গরিব। খেতে পায় না। তাই ভিক্ষে করে বেড়ায়।’ বাংলার অধ্যাপিকা মীরা উত্তর দিল।

রেবা সোমকে আমরা ঠাট্টা করে ‘ভীমভবানী’ বলতাম। সে দেহচর্চার ভার পেয়েছিল কলেজে।

রেবা বলে উঠল, ‘একবার আমি এখানে বসলে লোকগুলোকে কাজ করাতাম। ভিক্ষে করে বেড়ানো চলত না।’

অরাজকতা এককুসিভ

আমরা হেসে উঠলাম।

‘তুমি বসে যাও এখানে, ভীমভবানী। একটা ভালো মতো সার্কাসের দল খোলো। বুকে হাতি তোলো। পিঠে লোহা ভাঙো।’

রেবা বলল, ‘পারি না নাকি আমি? বুকে হাতি তুলতে না পারলেও আমি দাঁত দিয়ে কতটা ওজন তুলছি আজকাল, দেখছ না? একটু একটু করে অভ্যাস করছি। ধীরে ধীরে সমস্ত হবে। কেবল মেয়েদের ড্রিল আর খেলা নিয়ে থাকলে আমার চলবে না। নিজের শরীরগঠনে মন দিতে হবে। বাঙালি মেয়ের বদনাম আছে, তারা দুর্বল। আমি দেখিয়ে দেব। শরীরের বলে ভীমভবানী না হতে পারলেও দাঁতের জোরে পারব।’ পাতলা ছিপছিপে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস রেবা একসারি ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই রেবার দাঁতে ভয়ানক জোর। সে তাই সারাদিন দাঁতের তোয়াজ নিয়েই থাকে। সকালে উঠেই আর যা হোক না হোক দাঁত মাজবার গরম জল চাই। হিরের মতো ঝকঝকে দাঁত রেবার। দাঁতে ধার ঠিক হিরের মতোই। অনেকদিন সে আমাদের কাছে দাঁতের কত জোর হতে পারে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছে।

দাঁত নিয়ে রেবার মাতামাতি দেখে আমরা অবশ্য যথেষ্ট হাসিঠাট্টা করেছি। হাতপায়ে জোর হয় মানুষের, শরীরে শক্তি হয়। কিন্তু, দাঁত কি করে, শক্ত-সমর্থ হলেই বা অমন স্থান নিতে পারে?

রেবাকে দেখে সাধারণ বাঙালি ঘরের ছোটোখাটো একটা মেয়ে বলেই মনে হয়, যেমনটি আমরা পথেঘাটে পাই রোজই। দাঁতের শক্তির জন্যেই আমরা তাকে ‘ভীমভবানী’ বলতাম।

শহরটি মোটামুটি দেখে নিয়ে আমরা এলাম চটিটায় ফিরে। বলে-কয়ে ঘরে খাবার পাওয়া গেল। কানা-উঁচু পিতলের থালায় দোসা, ইডলি, চাটনি। বাটিতে সম্বর, রসম, দহিবড়া। একটা করে অমৃতি।

যাই হোক, আমাদের মাছ-ভাত খাওয়া মুখে নতুন ধরনের খাদ্য খারাপ লাগলেও নতুনত্বের আশায় আমরা খেয়ে গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে সকলে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। কয়েক দিন যাবৎ অতিরিক্ত ঘোরাঘুরি হওয়াতে সকলেই ক্লান্ত ছিলাম।

ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে শাড়ি বদলে নিতে নিতে ঘরে বিকেলের জলযোগ দিয়ে গেল। কফি ও পাকোড়া।

কফির পরে ঠিক হল স্টেশনে গিয়ে ট্রেন দেখে সিট রিজার্ভ করা হবে সাত দিন পরে। এই সাত দিনে এই শহরটিকে কেন্দ্র করে মোটরবাসে পাশের শহরগুলো দেখে নেব। বাসের ভাড়াও সস্তা, যাতায়াতের অসুবিধা নেই। আমাদের কুলিয়ে যাবে।

প্রোগ্রাম ঠিক হওয়ার পরে সকলেই শান্তি পেলাম। নন্দা একটা দোকানে জামারকাপড় দেখে এসেছে, সে সেখানে যেতে চাইল। আমিও ঠিক করলাম কেতকীর জন্য জামার একটা কাপড় কিনব। অন্য দুইজন গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখতে চায়। ঠিক হল ওদের মন্দিরে নামিয়ে কাপড়চোপড় কিনে আমরা মন্দিরেই ফিরে আসব।

গাড়ি করে গেলাম বেরিয়ে। রেবা ও মীরাকে মন্দিরে নামিয়ে নন্দার সঙ্গে কাপড়ের দোকানে গেলাম। একটা কিনতে দশটা কিনে ফেলা হল। ফলে খুবই দেরি হয়ে গেল।

নন্দা বলল, ‘ওরা যা চটে আছে। একসঙ্গে বসে আরতি দেখব, প্রসাদ খাব, কথা ছিল। এতক্ষণে ক্ষেপে রয়েছে।’

আমি বললাম, ‘আরতি না দেখি ঠাকুর দেখেছি তো। আহা, কিবা প্রসাদ। শুকনো নারকেলের টুকরো আর কিসমিস। তার চেয়ে চলো, কিছু ভালো মিঠাই কিনে নিয়ে যাই বাজার থেকে। ওরা মিষ্টি পেলে রাগ ভুলে যাবে। যা ব্যবস্থা দেখছি খাবারের হোটেল।’

অনেক মিষ্টি কিনে আমরা মন্দিরে গেলাম। তখন আরতির ভিড় নেই। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে লোকজনেরা। বেশিরভাগ মাদ্রাজি লোক। তারা কেমন শক্ত শক্ত অক্ষরে কথা বলে জটলা করছে। দু-চারজন টুরিস্টও আছে। রাত্রি প্রায় আটটা।

শহরের বড়ো রাস্তার উপর মন্দিরটা হলেও পাশের সরু গলি পথেও আর একটা বড়ো ফটক। এই শহরটার বিশেষত্ব এর সরু সরু গলিগুলো। দক্ষিণ ভারতের পথঘাট বড়ো বড়ো চওড়া, ঝরঝরে পরিষ্কার। কিন্তু এই শহরটায় সবই উৎকট।

গলিগুলোর মধ্যে ভাঙাচোরা বস্তিবাড়িও দেখা যায়। ইচ্ছা করলে শতশত চোর ডাকাত খুনে লুকিয়ে থাকতে পারে। হয়তো-বা থাকেও। দেখার জিনিসও বেশি নেই। গোবিন্দজীর মন্দির তার মধ্যে একটা বস্তু। এখানে নাকি কঠিন কঠিন রোগের ঔষধ মিলে যায়। সেইজন্যে নানা জায়গা থেকে লোকজন ধন্য দিতে আসে।

মন্দিরের চত্বর ভরে গেছে রোগী ও ভিখিরির দলে। অনেক ধরনের রোগী আছে। ছোঁয়াচে রোগ যাদের, তাদের স্থান পাশের গলির মধ্যে। গোবিন্দজীকে ওখান থেকেও দেখা যায়।

রেবা ও মীরাকে সম্মুখে দেখলাম না। কাজেই খুঁজতে হল। নন্দা বলল, ‘চলে যায়নি তো আমাদের দেরি দেখে?’ আমি বললাম, ‘কিন্তু কথা ছিল তো যত দেরিই হোক আমাদের, ওরা অপেক্ষা করবে। নতুন শহরে সন্ধ্যার পরে দল বেঁধে না গেলে বিপদ ঘটতে পারে, মেয়েদের বেলায়।’

নন্দা টিপ্পনী কাটল, ‘আর, রাস্তাঘাটের ছিরি দেখলে হয়ে যায়!’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

রাস্তাঘাট তো এ ক-দিন দেখাই হয়নি। আমরা সভা আর বক্তৃতা নিয়েই ছিলাম। এখন শহর দেখতে বেরিয়ে থান্ডারস্ট্রাক। এমন একটা জায়গায় আসে কেউ? কোনোমতে পাশের শহর দুটো আর পাহাড়টা দেখে নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি, বাবা! দক্ষিণ ভারতে কত না কত ভালো জায়গা! অবশেষে কিনা এলাম এখানে!

আমি বললাম, ‘আর দেখাশোনা পয়সায় কুলোনো চাই তো। গোবিন্দজীর মন্দিরে শুনি বিনে পয়সায় থাকতে, খেতে দেয়। তেমন তেমন বিপদে যদি পড়ি তো এসে এখানেই আস্তানা গেড়ে বসা যাবে। কিন্তু, ওরা গেল কোথায়? রেবা আবার যা রাগী! দেরি দেখে চটে চলে গেল না তো? ওর ভয়-ডর নেই। মীরাকে টেনে নিয়ে গেছে বোধ হয়।’

নন্দা বলল, ‘আবার রাগের মাথায় আমাদের ওপর দাঁতের জোরের না পরখ করে!’

আমরা হাসতে হাসতে কিন্তু একটু চিন্তিতভাবে প্রকাণ্ড মন্দিরটার চারদিকে তন্নতন্ন খুঁজতে শুরু করলাম।

একজন পূজারি শ্রেণির ব্রাহ্মণ আসছিলেন এধারে। আমাদের এমন করে খুঁজতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি হয়েছে ছেলেপিলে হারিয়েছে না কি?’

এখানে লোকেরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতেও পারে, বুঝতেও পারে। অথচ হিন্দি জানে না। আমরাও ইংরেজি বোঝাবার জন্য থেমে থেমে বলে কাজ চালানো।

পূজারি বললেন, ‘কিছুদিন হল মন্দির থেকে বড্ড ছোটো ছেলে-মেয়ে চুরি যাচ্ছে। এত বড়ো মন্দির, এত লোকজন, যে ছেলেধরাকে ধরাও শক্ত। তাই আমরা নিজেরা যাত্রীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিই।’

‘ছেলেধরা ধরা পড়ে না?’

আমাদের প্রশ্নে পূজারি বললেন, ‘ধরা পড়লে তো একটা গ্যাংকেই ধরে ফেলতে পারতাম।’

‘ছেলেগুলোকে ফিরে পাওয়া যায় না?’

‘না। তবে হ্যাঁ, দু-একটির মৃতদেহ পাওয়া গেছে।’

আমরা শিউরে উঠলাম ‘তবে ছেলেধরা বলছেন কেন? এ তো ডাকাত! গয়নাগাঁটি কেড়ে মেরে ফেলেছে, ছেলেটি ধরিয়ে দিতে পারে ভেবে।’

পূজারির ভাঙা ইংরেজিতে কথা চালাতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি কথা না বাড়িয়ে সরে পড়লেন।

গায়ের মধ্যে ছমছম করতে লাগল। এত জায়গায় গেছি, দেশ-বিদেশে বেড়িয়েছি, কই, আমার কখনো তো এইরকম মনোভাব হয়নি?

গা যেন ভয়ে ভারী হয়ে আসছে, পা যেন উঠছে না। কেমন একটা চাপা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আকাশে-বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

অরাজকতা এককুসিদ্ধ

এদিকে সরে আসায় গোবিন্দজীর মন্দিরের ঝকঝকে উঁচু চক্রচিহ্নের ওপরে দেখলাম রাত্রির আকাশের তারা জ্বলছে একটি দপ দপ! লাল হয়ে উঠেছে যেন আকাশটা। তারা চমকে চমকে কাঁপছে ভয়ে।

চমকানো আর কাঁপা তারা যেন বলে দিতে চায়, আমিই তোমার অশুভ নক্ষত্র, রুবি। তোমার ভাগ্য সেজে আজ এখানে টেনে এনেছি।

জীবনে বহু ভয়ের পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হয়েছে আমাকে। জোর করে নতুন মানুষ হতে হয়েছে। তাই মনকে শক্ত করে ভয়টা ঝেড়ে উঠতে হল আমাকে আজ।

যাই হোক দেখলাম গলির দিকে মুখের কাছে রেবা, মীরা দাঁড়িয়ে।

আমরা ডাকলাম, ‘ওখানে কেন নোংরার মধ্যে? এদিকে এসো।’

মীরা ছুটে এল, ‘বাবা, এতক্ষণে আসা হল! পয়সাকড়ির ব্যাগটা পর্যন্ত নিয়ে গেছ ভুল করে? আমাদের কাছে একটি পয়সাও নেই।’

‘কেন? প্রণামী দেবে বুঝি?’

‘না ভাই, পাথরের দেবতাকে প্রণামী দিয়ে কি করব, যখন চারপাশে এতগুলো মানুষ না খেয়ে মরছে? একটা বাঙালি বুড়ো ভিথিরি দেখলাম। গোবিন্দজীর নাম ডাক শুনে এখানে কিছুদিন হল এসে রয়েছে। বেচারিকে কিছু দিতাম।’

‘কী রোগ ওর?’

‘এই গলিটায় সাধারণত কুষ্ঠরোগী থাকে। ওর অবশ্য কুষ্ঠ নয়, শ্বেতী।’

ততক্ষণে রেবাও এগিয়ে এসেছে। মীরা বলল, ‘ওই যে দেখ ভিথিরিটা। আমরা “রুবি এখনও এল না, রুবির কী হল?” বলছিলাম দেখে যেচে এসে কথা বলল। বুড়ো মানুষটা, রোগে, অভাবে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। দেশের লোককে এতদূরে দেখে ভারি খুশি হলাম। এই যে দেখ, এই যে!’

দেখলাম ধুতির ওপর মোটা চাদর জড়ানো এক বুড়ো অতিকষ্টে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ-মাথা-গলা সমস্ত জড়ানো মোটা চাদর। শুধু চোখ দুটো বাইরে। ক্ষিধেয় বা রোগে যাতেই হোক, চোখ দুটো জ্বলছে। এতদূর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মীরা আমাদের হাতের ব্যাগ খুলে কিছু পয়সা বার করে নিল।

দয়াময়ী রেবা বলল, ‘তোমরা কত খাবার এনেছ কিনে। এর থেকে কিছু দিই। বেচারি মান্দ্রাজী ছত্রে পেট পুরে খেতে পায় কি না কে জানে?’

রেবা প্রসাদ পেয়েছিল একটা মাটির সিঁদুর মাখা সরায়। সে প্রসাদী ফুল রুমালে বেঁধে সরায় চারটে মিষ্টি দিয়ে বুড়োটার হাতে দিয়ে এল। আমরা নোংরা গলির দিকে এগোলাম না।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে। গাড়ি কাছাকাছি দেখতে পেলাম না, যদিও রাস্তা এখনও লোকজনে ভরা।

নন্দা বলল, ‘হোটেল এখান থেকে বেশ দূরে। হেঁটে যাওয়া চলবে না।’

রেবা বলল, ‘না না। সোজা রাস্তা ধরে গেলে দূর বটে, কিন্তু মন্দিরের পেছনের রাস্তা দিয়ে গেলে খুবই কাছে। রাস্তাটা পড়েছে আবার হোটেলের গলির আবর্জনা ফেলার পতিত জায়গাটায়।’

আমি বললাম, ‘তুমি আবার এমন ভূগোল শিখলে কোথা থেকে?’

রেবা উত্তর দিল, ‘আমি মীরাকে বলেছিলাম রুবিরে এখনও এল না। হোটেলের ফিরব কী করে বেশি রাত হলে? তাই শুনে ওই ভিথিরিটা বলল, কেন মা, হোটেল তো এক পা, এই রাস্তাটা দিয়ে গেলে।’

আমি বললাম, ‘ভিথিরিটার সঙ্গে অনেক গল্প করেছ দেখছি।’ রেবা অপ্রতিভ হল, ‘মানে, আমরা কথা বলছিলাম কি না, ও কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই শুনেছে। আহা, লোকটিকে দেখলে মায়া হয়। নড়বড়ে শরীরটা, নড়াচড়ায় কষ্ট। গলাটা ভাঙা-চাপা। রোগে বসে গেছে বোধ হয়। পুরুষ কি মেয়ে বুঝতেই কষ্ট হয়। বুঝতে পারা শক্ত।’

আমরা ধীরে ধীরে আধো অন্ধকারে পা টিপে টিপে গলি ধরে চলতে লাগলাম। রাস্তা সত্যিই অল্প, কিন্তু পথঘাট ভালো জানা না থাকায় আমাদের সময় লাগল আবর্জনা ফেলা জায়গায় পৌঁছোতে।

মীরা নাকে কাপড় টেনে বলল, ‘উঁহু হুঁ! দেখছ ছোটো ছোটো মরা জন্তু পর্যন্ত পড়ে আছে। এখানে ধাঙড়ও নেই?’

নন্দা বলল, ‘বিদেশবিভূঁই, অত খুঁতখুঁত করলে চলে নাকি?’

রেবা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। অবাক হয়ে আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল, ‘দেখ, দেখ!’

দেখলাম সেই সরাভরতি মিষ্টি পড়ে আছে। সিঁদুর মাখা প্রসাদী সরা, ভুল হওয়ার উপায় নেই। সেইসব মিষ্টান্ন— বালুসাই, পেঁড়া, অমৃতি, কুমড়োর মেঠাই!

‘কী আশ্চর্য! খাবারগুলো এভাবে নষ্ট করল কেন? ভারি অসভ্য তো!’

মীরা বলল, ‘হয়তো রোগে মিষ্টি খাওয়া বারণ। রেবা যখন দিচ্ছিল তখন কেমন অদ্ভুতভাবে রেবার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। চোখ দুটো যেন জ্বলছিল।’

রেবা বলল, ‘আহা, গরিব মানুষ। কত আশা করে রোগ ভালো হবে বলে এখানে গোবিন্দজীর মন্দিরে পড়ে আছে। ভালো-মন্দ খাবার দেখে লোভে চোখ জ্বলছিল। ঠোঁট চাটছিল ঘন ঘন।’

‘তাহলে ফেলে দেবে কেন?’

‘ফেলে হয়তো দেয়নি। এখানেই রেখে গেছে কোথাও। মন্দির থেকে জায়গাটা এত কাছে যে ঘন ঘন যাতায়াত করছে।’

‘এমন নোংরা জায়গায় কেউ খাবার রাখে? ফেলেই দিয়েছে। কিন্তু কোথায় গেল ও?’ নন্দা এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

একধারে পাহাড় সমান উঁচু আবর্জনা। তারি আড়ালে বুড়ো হয়তো গেছে মনে করে আমরা চলে এলাম। কিন্তু আমার কেমন লাগতে লাগল।

পরের দিন ভোরের ট্রেনে আমরা পাশের শহরে একটি পাহাড় দেখতে গেলাম। সেদিন রাত্রিটা ওখানেই কাটিয়ে পরের দিন ফিরলাম।

আজকের প্রোগ্রাম মোটর বাসে নারকেলের আবাদ দেখতে যাওয়া। এটা টুরিস্ট সিজন। টিকিট পাওয়া যাবে না ভেবে আগেই টিকিট কাটা হয়েছে।

কিন্তু সকলের যাবার অবস্থা নেই। পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়াতে রেবার পা-টা জখম হয়েছে। চলাফেরা করতে সে পারছে না। আমিও জ্বর নিয়ে ফিরেছি। অতটা উঁচু পাহাড়ে জিদ করে উঠতে যাওয়া ভুল হয়ে গিয়েছিল।

আমরা নন্দা-মীরাকে জোর করেই বেড়াতে পাঠালাম। ‘টিকিট কাটা হয়েছে। সবাই বসে থাকার মানে হয় না। হোটেলে একরাত আমরা দু-জনে বেশ কাটিয়ে দেব। কাল ভোরেই তো ফিরছ তোমরা।’

ওরা ইতস্তত করতে লাগল, ‘রুবির জ্বর। বিদেশে কখনো দলছাড়া হতে নেই। কার ভরসায় রেখে যাব?’

আমি বললাম, ‘কেন, ভীমভবানীর ভরসায় রেখে যাও।’

রেবা কাতরাতে কাতরাতে বলল, ‘আর ভীমভবানীর ভরসা নেই। পাখানা তো গেছেই, ডান হাতটাও নাড়াতে পারছি না। তবে ম্যানেজারটি বড়ো ভালো। ডাক্তার ডেকে আনলেন। কতবার খবর নিচ্ছেন। তোমরা চলে যাও। ভয় নেই কোনো।’

মীরা বলল, ‘আহা, ম্যানেজারের পোষা কুকুর দু-টোর একটা এমনভাবে মারা গেল। তবুও উনি কত করছেন!’

ম্যানেজারের পোষা একটা কুকুর আবর্জনার গাদার পাশে সকাল থেকে মরে পড়ে আছে। গায়ে কামড়ের দাগ। অন্য কুকুরদের সঙ্গে অসম যুদ্ধে তার প্রাণ গেছে বোঝা যায়।

যাইহোক, নন্দা-মীরা অনিচ্ছায়ও অবশেষে চলে গেল। আমরা সারাদিন দু-জনে ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়েই কাটালাম আর গজগজ করতে লাগলাম বিদেশে এসে অসুখ হয়ে পড়ার ক্ষোভে।

সন্কার দিকে আমার জ্বর ছেড়ে গেল বটে, কিন্তু শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ল যে, মাথাও তুলতে পারি না। রেবার অবস্থাও তথৈবচ।

রাত্রে তাড়াতাড়ি দুধপাঁউরুটি খেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। বাইরে ঘন অন্ধকার। টিপ টিপ বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

রেবা একবার ঘুমের ঘোরে বলল, ‘বাথরুমের দরজাটা বন্ধ আছে তো?’

পাশের বাথরুমে জমাদারের যাতায়াতের উদ্দেশ্যে একটা বাইরের দিকে দ্বার ছিল। ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুম।

আমি বললাম, ‘একবার দেখে এলে হত না? সাবধান হওয়া ভালো।’

কিন্তু উঠে যেয়ে দেখবে কে? শরীরের এমন অবস্থায় নড়াচড়া সম্ভব নয়।

পরস্পরকে অনুরোধ উপরোধ করতে করতে আমরা ঘুমিয়েই পড়লাম।

ঘুম ভেঙে গেল। আমার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ মাঝরাাত্রে। অনেক রাত্রির বিভীষিকা দক্ষিণ ভারতের সুদূর কোনো এই শহরটার বুকে ফিরে এল। হাজারিবাগ রোডের সেই ভয়াবহ রাত্রির একটা লাইন টেনে কে যেন যোগ করে দিল আজ এই মান্দাজী রাত্রে।

গোঁ-গোঁ আওয়াজ করছে রেবা। হাত-পা তার মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা খাটের সঙ্গে। নড়বার উপায় নেই একচুল। মুখে তার একগাদা কাপড় গোঁজা। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মুখ লাল কপালের শিরা দড়ির মতো শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে। মাথার কাছের ছোটো খোলা জানালা দিয়ে আকাশের আলো আসছে, তাইতে দেখা গেল।

আমার অবস্থা?

আমার হাত-পা বাঁধা নয়, মুখে কাপড় গোঁজা নয়! কিন্তু লোহার মতো শীর্ণ একটা হাতের শক্ত পাতা মুখ চেপে আছে। চোঙার মতো সরু মুখ, টকটকে ঠোঁট আর দাঁতের সার! আবার রাসমণি!

বাঘ যেমন শিকার চেপে বসে তেমনি রাসমণি আমাকে চেপে বসেছে। সাদা সাদা পোড়া দাগে ভরা মুখখানা। জলন্ত চোখ কোটরে দপ দপ করে অন্ধকারে জ্বলছে।

অনেকটা রোগা হয়ে গেছে রাসমণি বুড়ো বয়সে। কিন্তু মানুষের রক্ত খেয়ে, প্রাণীর রক্ত খেয়ে যার দিন কাটে তার দেহে মানুষখেকো বাঘের শক্তি! আমার কিছুই করবার নেই।

দাঁতে দাঁতে পিষে রাসমণি চাপা গলায় বলল, ‘তোর ভাই আমাকে খোঁড়া করে দিয়েছে এবার শোধ নেব! ভেবেছিলি মরে গেছি, না? কেমন জব্দ! বুড়ো ভিথিরি সেজে গা-মুখ ঢেকে ভাঙা গলায় কথা বলে ধোঁকা দিয়েছি। দু-দু-বার তুই আমার মুখের গ্রাস থেকে পালিয়ে বেঁচেছিস। এবার তোকে কে বাঁচাবে? তোর রক্তের স্বাদ আমার মুখে লেগে আছে! তোকে শেষ করে তোর বন্ধুটাকে ধরব! ওটার রক্তও মন্দ হবে না!’

রেবা আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। আমার আর নড়বার শক্তি নেই! দুর্বল দেহে রাসমণির আক্রমণের বিরুদ্ধে কুটোর মতো ভেসে গেলাম। রেবার হাত-পা মচকানো, তার ওপর শক্ত বাঁধন। তাই বুঝি কষ্টে গোঁ-গোঁ করছে ও?

অতিকষ্টে চোখ ঘুরিয়ে তাকালাম। গাভীর রক্তের দরজা বন্ধ ঘরে ঘরে। তাই

রাসমণি রসিয়ে রসিয়ে শিকারে দাঁত বসাবে। রক্তচোষার হাত থেকে মুক্তির আজ কোনো পথ নেই।

রেবা ওর চোখের সাহায্যে কী যেন বলতে চায়। চোখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নীচের দিকে দেখাতে চেষ্টা করছে। আমার মতো ভয় সে পায়নি ঠিকই। কিন্তু রাসমণিকে তো ও চেনে না!

ভ্যাম্পায়ার রাসমণি ধারালো দাঁতে পৈশাচিক হাসি হাসছে। আমাদের রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই জেনে ওর রক্তলোভ উগ্র হলেও ‘ও রয়ে-সয়ে চেখে চেখে রক্ত চুষে নেবে, বুঝলাম!

নিশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে আসছে! এখনি অজ্ঞান হয়ে পড়ব! ভয়ানকভাবে বিদেশে এখনই দুই বন্ধুর জীবন শেষ হয়ে যাবে! কেউ নেই যে বাঁচাতে পারে!

রেবা যেন অসহিষ্ণু হয়ে আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। কিছু সে করতে বলছে। হ্যাঁ, বুঝলাম। আমার তো এদিককার হাতটা খালি আছে। রাসমণি হাঁটু চেপে ওপরের দিকটা ধরলেও কনুই থেকে ডান হাতখানা খালি।

প্রাণপণ চেষ্টায় হাতখানা ভাঙার মতো করে বেঁকিয়ে এক ঝটকায় রেবার মুখে-গোঁজা কাপড়ের তাল খুলে দিলাম ফেলে।

একমিনিট মাত্র সময় কাটল।

গগনভেদী চিৎকারে রাসমণি লাফিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। রেবার মুখে তার দুইটি হাতের আঙুল কাটা। রক্তে বিছানা ভেসে যাচ্ছে! আমাদের রক্ত নয়—রাসমণির রক্ত এবার! চারদিক থেকে সাড়া জেগে উঠল। করিডরে আলো জ্বালা ও আমাদের ঘরে ধাক্কা পড়ার আগেই রাসমণি লাফিয়ে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুম দিয়ে বার হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝলাম যে জমাদারের দরজা আমাদের মনের ভুলে খোলা রেখে আমরা শুয়েছিলাম। সেই পথে রক্তচোষা ঘরে ঢুকেছে।

রাসমণির কাহিনি বিচিত্র।

পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সে বাংলা ছেড়ে বিহার গিয়েছিল। আবার সেই ভয়ে সুদূর মাদ্রাজে পালিয়ে এসেছিল। গোবিন্দজীর মন্দিরে রোগী ও ভিথিরির ভিড়ে নিজের গায়ের সাদা দাগ, খোঁড়া পা নিয়ে দিব্য লুকিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে যাত্রীদের ছেলে-মেয়ে চুরি করে নিজের রক্তপিপাসা মেটাত।

হোটেলের আবর্জনার মধ্যে ওর আশ্রয় করেছিল রাসমণি। এখানে লোকজন কমই আসত! আবর্জনার পাহাড় জমে আড়ালও হয়েছিল। কুকুর বেড়াল ধরে ধরে এখানে বসেই রক্ত চুষে খেত; তারপর মৃত দেহগুলো ফেলে রেখে যেত। রাসমণি রক্তচোষা, মাংসাশী নয় কি না! এখানে আবর্জনার গাদায় মরা জীবজন্তু কারুর চোখে পড়ত না। ম্যানেজারের কুকুরটিকেও রাসমণি গ্রাস করেছিল। আমাকে এতদিন পরে দেখে ওর রক্তচোষার ইচ্ছা উগ্র হয়ে উঠেছিল। আমাদের গতিবিধির

ওপর চোখ রেখে এই আবর্জনার গাদায় লুকিয়ে রাসমণি সুযোগ খুঁজছিল। মন্দির থেকে অতি অল্প সময়ে এখানে ও চলে আসতে পারত।

সেদিন মিষ্টিগুলো ফেলে দিয়েছিল রাসমণি। মিষ্টান্ন দিয়ে ও কী করবে? অমৃত জোগালেও তাতে ওর অরুচি হত। ওর খাদ্য একটিই— রক্ত! মানুষের রক্ত পেলেই সবচেয়ে ভালো!

এই ভ্যামপায়ারগুলোর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। সুযোগ খুঁজে খুঁজে কাজ হাসিল করা রাসমণির পক্ষে অতি সহজ ছিল।

কিন্তু, কী করে বার বার তিনবার আমার ভাগ্য আমাকে ডেকে ওর হাতের মুঠোয় তুলে দিয়েছিল? রাসমণি অস্বাভাবিক বুদ্ধিবলে বোধ হয় বুঝেছিল ভবিষ্যতে আমি কোনোদিন এখানে আসব। তাই ওঁত পেতে অপেক্ষায় ছিল।

এতক্ষণে একটি দল আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে রাসমণির পেছনে গেছে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে কাঁপছি আমার প্রাণরক্ষাকর্ত্রী বন্ধু ভীমভবানী রেবার পাশে বসে। এমন সময়ে দলটি খবর নিয়ে ফিরে এল রাসমণির।

সত্যি সত্যি এবার রাসমণি শেষ হয়ে গেছে। খোঁড়া পা নিয়ে ছুটে পালাতে পারেনি। আবর্জনার গাদায় হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। ম্যানেজারের আর একটি কুকুর ছিল। সেই বুলডগ সঙ্গেসঙ্গে টুঁটি কামড়ে বুলে পড়েছে। তার সঙ্গীটির মৃত্যুর কারণ বলে সে কুকুরের ঘ্রাণশক্তি দ্বারা রাসমণিকেই বুঝে নিয়েছিল। রাসমণির মৃত্যুর বহু পরে জোর করে রাসমণির ছিন্ন গলার নল থেকে তার দাঁত ছাড়াতে হয়েছে।

অন্যের গলার নলি ছেঁড়া যার ব্যাবসা, সে অবশেষে কুকুরের কামড়ে নিজের গলা ছিঁড়ে প্রাণ দিল!

এবার আমার গল্প শেষ হয়ে গেছে। এবার তোমরা নিশ্চিত্তে ঘুমোও। রাসমণি আর নেই।

[সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৭২ (১৯৬৫)]

বেগম কুঠি

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অফিসের কাজে গিয়েছিলাম উত্তর বিহারের এক ছোটো শহরে। এক দিনেই কাজ শেষ হয়ে গেল। মাঝখানে দিন দুয়েক ছুটিও ছিল। বাড়ি ফেরবার কোনো তাড়া ছিল না। কী করে সময়টা কাটাতে তাই ভাবছি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

আমার দূর সম্পর্কের এক মামাতো বোন। পূরবী। বছর দশেক আগে এই শহরের কাছাকাছিই কোথায় বিয়ে হয়েছিল। পূরবী বিয়ের পর তার স্বশুরবাড়ি যাবার জন্য আমাকে অনেকবার চিঠি লিখেছিল। চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু তার কথা রাখা সম্ভব হয়নি। বোধ হয় রাগ করেই পূরবী চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। অনেক বছর তার কোনো খবর পাইনি।

সেই সুযোগ যখন এসেছে আর হাতে সময়ও আছে, তখন ভাবলাম পূরবীর ওখানে একবার ঘুরেই আসি। খবর না দিয়ে গিয়ে তাকে একেবারে চমকে দেব।

ডায়েরি খুলে পূরবীর ঠিকানাটা দেখে নিলাম। সুলতানপুর। বাড়ির নাম বেগম কুঠি।

সুলতানপুর এখান থেকে মাইল তিনেক। বাস চলে।

ভাবলাম যাবার আগে বোনের জন্য কিছু জিনিস নিয়ে যাই। এই প্রথম যাচ্ছি, কাজেই একেবারে খালি হাতে যাওয়াটা শোভন হবে না। কিন্তু নিয়ে যাবার মতন জিনিস এই ছোটো শহরে পাওয়া সম্ভব নয়।

কিছু কাচের চুড়ি, এক বাস্‌ মিস্ট্রি আর দুটো কারুকায়করা কাঠের ফুলদানি নিয়ে বিকেলবেলা বাসে চড়ে বসলাম।

সুলতানপুর আরও ছোটো শহর। এখানে গুটিপোকাকার চাষ হয়। রেশমের কারবার। শুনেছিলাম পূরবীর স্বামী অদিতিবাবু গুটিপোকাকার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। এই নিয়ে গবেষণা করছেন।

বেগম কুঠি যখন পৌঁছোলাম, তখন বিকেলের আলো স্নান হয়ে এসেছে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে দু-তলা বাড়ি। চারদিকে বাগান। বড়ো বড়ো গাছে ভরতি বোধ হয়, একসময়ে মোগল সুবাদারের কোনো বউ থাকত এখানে। তখন

সুবাদারদের দোদর্শ প্রতাপ। দিল্লি অনেক দূর, কাজেই লোকেদের কাছে তারাই বাদশার সামিল ছিল। তাদের পরিবারদের লোকে বেগমের সম্মান দিত।

গেটের কাছেই দুটি ছোটো ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাছাকাছি বয়সের দু-জন। ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরবার চেষ্টা করছে।

আমাকে দেখে খেলা থামিয়ে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একজন হিন্দিতে বলল, কাকে চান?

বললাম, পূরবীকে চাই। আমার বোন পূরবী।

অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছেলেটা হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আরে, ও তো আমার মা।

একটু লজ্জা পেলাম, কারণ পূরবীর সন্তান থাকতে পারে এ সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয়নি। লজ্জা পেলাম এই জন্য যে এদের জন্য কিছু খেলনা হাতে করে আসা উচিত ছিল।

বড়ো ছেলেটি বলল, আসুন। মা বাগানে আছে।

সব কথাবার্তাই কিন্তু হিন্দিতে চলল।

একটা নিমগাছের কাছ বরাবর আসতেই চমকে উঠলাম।

আরে পানুদা যে!

চেয়ে দেখি পূরবী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগের চেয়ে একটু ভারী হয়েছে শরীর। একটু ফর্সাও হয়েছে।

কোথায় ছিলে?

নিমগাছে। তোমায় দেখে সড়াং করে নেমে এলাম।

কথাটা বলে পূরবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

পূরবী চিরকালই এইরকম। ছোটোবেলা থেকে। মজার মজার কথা বলবে আর হেসে লুটিয়ে পড়বে। এতদিন পরেও ওর স্বভাব বদলায়নি।

তারপর, হঠাৎ যে বোনের কথা মনে পড়ল?

কাছাকাছি একজায়গায় অফিসের কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম ঘুরে যাই।

অভিमानে পূরবী মুখটা ভার করল, ও, তাই বলো, শুধু বোনকে দেখতে আসোনি? বোনের কথা মনে ছিল না?

হেসে বললাম, বোনের কথা মনে না থাকলে আর চলে এলাম কী করে? নে, বড্ড তেষ্ঠা পেয়েছে, একটু চা খাওয়া।

মিষ্টির বাস্কাটা একটা ছেলের হাতে তুলে দিলাম। চুড়ি আর ফুলদানি দিলাম পূরবীকে। বললাম, তোর ছেলেদের কথা আমার জানা ছিল না। তুই তো লিখিসনি কিছু!

তোমায় যখন চিঠি লিখতাম তখন এরা হয়নি যে।

এরা বাংলা বলতে পারে না?

কী করে পারবে। ধারে-কাছে কোনো বাঙালি পরিবার তো নেই। ওদের নামগুলো শুনবে?

কী?

বাবুয়া আর ছবুয়া।

ভালো নাম?

ভালো নাম হয়ইনি। এসো, বাড়ির মধ্যে এসো।

বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। সাজানো গোছানো ঘর। একটা চেয়ারে বসলাম। ছেলেদুটিকে কাছে ডাকলাম, কিন্তু তারা এল না।

একজন বলল, বাড়ির মধ্যে ভালো লাগে না। ভয় করে। আমরা বাগানে যাচ্ছি। দু-জনেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর পূরবী এল। এক হাতে থালায় গোটা কয়েক লাল আটার লুচি আর তরকারি, আর এক হাতে কাচের গ্লাসে দুধ।

কীরে চা কী হল?

এখানে চা কেউ খায় না। খুব ভালো দুধ পাওয়া যায়, তাই সবাই দুধ খায়।

ও, এইবার বুঝতে পারছি তুই এত মোটা হলি কী করে। খাঁটি দুধে চর্বি বাড়ায়।

পূরবী আবার হাসতে আরম্ভ করল। তবে থালা বাটি আর গ্লাস তার আগেই আমার সামনে নামিয়ে রেখেছিল।

তোর ছেলেরা এইরকম বাগানে বাগানে ঘোরে? বাড়িতে ঢুকতে চায় না?

পূরবী সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। থেমে থেমে বলল, ভালোই করে পানুদা। বাড়ির মধ্যে না ঢোকাই ভালো। আমি ঢুকেছি আমারই যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। চারদিকে অবশ্য প্রচুর খোলা জায়গা। অব্যবহৃত বাতাস। সেই তুলনায় বাড়ির মধ্যে একটু গুমোট। পূরবী বোধ হয় তারই ইঙ্গিত দিল। কিন্তু অস্বীকার হয়ে এসেছে, এসময় বাগানের মধ্যে ছেলেদের ঘোরাফেরা না করাই ভালো। সাপ থাকতে পারে, কত রকমের বিষাক্ত কীট।

আমি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করলাম।

হ্যাঁরে, অদিতিবাবু কখন ফেরেন?

ওর ফেরারও কিছু ঠিক নেই। বাইরে বাইরেই বেশি থাকে।

উনি কী একটা গবেষণা করছিলেন, না?

হ্যাঁ, ওই সব গুটিপোকা নিয়ে। তা গুটিপোকা তো অনেক মরে গেছে।

মরে গেল? কী করে?

আবার পূরবীর মুখের ওপর গাম্ভীর্যের ছায়া নামল। পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, চলি পানুদা, তোমার খাবার ব্যবস্থা করি গে।

পূরবী বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ লক্ষ করিনি, ঘরের কোণে একটা হারিকেন জ্বলছিল। বাইরে অন্ধকার গাঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে হারিকেনের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে বাইরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নিকষকালো অন্ধকার। কোথাও আলোর ক্ষীণ দীপ্তিও নেই। ওপরের দিকে চেয়ে দেখলাম, দু-তলার কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না।

একটু দূরে একতলা একটা ঘর। সম্ভবত সেটাই রান্নাঘর। কিন্তু সেখানেও ঘুটঘুটে আঁধার।

তাহলে রান্নার ব্যবস্থা করতে পূরবী গেল কোথায়?

এতক্ষণ পরে সব কিছু যেন একটু অস্বাভাবিক ঠেকল। মনে হল, এভাবে আমি আসাতে পূরবী যেন খুব খুশি হয়নি। আশা করেছিলাম, আমার কাছে বসে গল্প করবে। আমার মা-বাবার কথা জিজ্ঞাসা করবে। আমার বউ-ছেলে-মেয়ের খবর নেবে। কিন্তু সেসব কিছুই করল না।

ক্ষুণ্ণমনে আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। রাত বাড়ছে। বাইরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। ঘরের কোণে একটা তক্ষকের ডাকও শোনা গেল।

বেশ খিদে পেয়েছে। পেটের নাড়িগুলো মোচড় দিয়ে উঠল। আস্তে আস্তে পায়চারি করতে আরম্ভ করলাম। নিঃশব্দ বাড়ি। বাবুয়া ছবুয়ার গলার স্বরও শোনা গেল না।

বড্ড দেরি হয়ে গেল পানুদা। পোড়াবাড়িতে কিছু নেই। সব আনতে হল। নিজেকে ছুটতে হল দোকানে।

ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে পূরবী বলল।

তাকে? কেন, বাড়িতে কি চাকর কেউ নেই?

আর বলো না। এ হতভাগা দেশে মানুষ আছে নাকি! নাও, বসো।

পূরবী টেবিলের ওপর থালা রাখল। পাশে জলের গ্লাস।

বসেই হতাশ হলাম। ক-খানা আধপোড়া রুটি, একটা কুমড়োর তরকারি আর সঙ্গে আমারই দেওয়া একটা মিষ্টি।

এই সামান্য রান্নার জোগাড় করতেই পূরবী রাত কাবার করে ফেলল। বেশ বুঝতে পারলাম আমি অবাঞ্ছিত অতিথি। আমার এখানে আসাটা পূরবীর মোটেই মনঃপূত নয়। ঠিক করলাম, ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই পালাব। আর এক দিনও এখানে নয়।

পেটে আগুন জ্বলছিল, কাজেই নির্বিচারে সেই আধপোড়া রুটিগুলোর সদ্ব্যবহার করলাম। মুখ ধুয়ে পূরবীকে বললাম, শোবার ব্যবস্থা করে দে। বড্ড ক্লান্ত লাগছে কাল সকালেই বরং অদিতিবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

এদিকের ঘরে এসো।

পূরবী আঙুল দিয়ে পাশের ঘরের দিকে দেখাল।

তার পিছন পিছন পাশের ঘরে ঢুকলাম। জানলা নেই, একটা ঘুলঘুলি তার নীচে একটা দড়ির খাটিয়া পাতা। বিছানার যে ব্যবস্থা তাতে রাত্রে যে ঘুম হবে, এমন আশা দুরাশা।

একটি কথাও না বলে, মনের রাগ মনে চেপে খাটিয়ায় শুয়ে পড়লাম। শোবার সঙ্গেই দড়িগুলো আর্তনাদ করে উঠল। এপাশ-ওপাশ করতে সাহস হল না, কী জানি, যদি ছিঁড়ে যায়।

শুয়ে শুয়ে ঘরটা নিরীক্ষণ করলাম। বোধ হয় মোগলযুগে বদমাইশ প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য এ ঘরটা ব্যবহৃত হত। ঘুলঘুলিটা কোনোরকমে বন্ধ করে দিলে, বাইরের আলো বাতাসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

শরীর আর মন দুইই ক্লান্ত ছিল। নানা চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম না ভেঙে উপায়ও ছিল না। মনে হল, খাটিয়াটা ধরে হিড়হিড় করে কারা যেন ঘরময় টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

চোখ খুলতেই খাটিয়াটা স্থির হয়ে গেল। ভাবলাম, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু ভালো করে এদিক-ওদিক দেখেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

শোবার সময় খাটিয়াটা ঘুলঘুলির তলায় ছিল, কিন্তু এখন খাটিয়াটা একেবারে উলটোদিকে, অর্থাৎ চৌকাঠের কাছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আমার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়াটাও যেন দু-ফিট শূন্যে উঠে আবার আস্তে আস্তে মেঝের ওপর নেমে এল।

গতিক মোটেই সুবিধার নয়। নেমে পড়ে পাশে রাখা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে নিলাম। জুতোজোড়াও পরলাম।

বাইরে যেন কাদের গুঞ্জন। চাপা হাসি আর কথাবার্তার আওয়াজ। পা টিপে টিপে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

অবারিত জ্যোৎস্না। চারদিক দিনের আলোর মতন পরিষ্কার। দেখতে একটুও অসুবিধা হল না। নিমগাছের তলায় চারজন বসে। পূরবী, বাবুয়া, ছবুয়া আর একজন ভদ্রলোক, তিনিই নিশ্চয় অদিতিবাবু। কিন্তু কারোরই রক্তমাংসের শরীর নয়, শুধু কঙ্কাল। সবাইয়ের মাঝখানে কী-একটা পড়ে আছে, হাত দিয়ে তুলে তুলে চারজনেই একটু একটু করে মুখে দিচ্ছে।

বাইরে যেতে হলে ওই নিমগাছের পাশ দিয়েই যেতে হবে। উপায় নেই, যেমন করেই হোক আমাকে এই বেগম কুঠি ছেড়ে পালাতেই হবে।

খুব সন্তর্পণে গাছের আড়াল দিয়ে এগোতে আরম্ভ করলাম। জুতোজোড়া

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

খুলে হাতে নিয়ে। একেবারে নিমগাছটার কাছাকাছি যেতে বুঝতে পারলাম ওদের সামনে একটা মরা ছাগল। তারই নাড়িভুঁড়িগুলো টেনে টেনে বের করে সবাই মুখে দিচ্ছে মুখের দু-পাশ বেয়ে টাটকা রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। হাত তোলা আর নামানোর সঙ্গে সঙ্গে হাড়ে হাড়ে লেগে শব্দ হচ্ছে ঠক, ঠক, ঠক!

কোনোরকমে ফটকের বাইরে কয়েক পা আসতেই পিছনে একটা দারুণ শব্দ। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম বেগম কুঠি ভেঙে পড়ছে। ইঁটের টুকরো, দরজা জানলার কাঠ ছিটকে পড়ছে চারদিকে।

জুতো হাতে করেই তিরবেগে ছুটতে শুরু করলাম। কেবল মনে হতে লাগল পিছনে পিছনে চারটে কঙ্কালমূর্তিও ছুটে আসছে। ধরতে পারলে ওই ছাগলটায় মতনই রক্তমাখা আমার নাড়িভুঁড়িগুলো টেনে বের করে জলযোগ সারবে।

কতক্ষণ দৌড়েছিলাম মনে নেই। শেষদিকে পথ ছেড়ে মাঠে নেমে পড়েছিলাম। কাঁটাগাছ, জল, কাদা কোনোদিকে দৃকপাত করিনি। চলতে চলতেই দূরের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজতে শুনলাম।

আচমকা একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে ছিটকে পড়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কেবল গোঁ-গোঁ শব্দ বের হল।

একটু পরে জ্ঞান ফিরতে দেখলাম একজন চৌকিদার আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। বুঝতে পারলাম তার সঙ্গেই ধাক্কা লেগেছিল।

সব শুনে চৌকিদার বলল, আরে রামজী, বেগম কুঠি তো সেই বড়ো ভূমিকম্পের সময় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এক বাঙ্গালি বাবু, তার আওরত, দুই ছেলে সব বাড়ি চাপা পড়ে খতম। ও জায়গার পাশ দিয়ে কেউ যায় না। নানারকম শব্দ শোনে, হরেকরকমের মূর্তি দেখে। আমিও ওদিকে পাহারায় যাই না। আমি নিজে এক আওরতকে নিমগাছের মধ্যে মিশে যেতে দেখেছি।

এ ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে। এখনও মাঝে মাঝে বেগম কুঠির সে রাতের ঘটনাটা স্বপ্নে দেখা দেয়। আতঁনাদ করে বিছানার ওপর উঠে বসি। বাকি রাতটা আর ঘুমাতে পারি না।

পাড়ার দু-একজন মাতব্বর বলছে গয়ায় এদের পিণ্ড দিয়ে আসতে। ভাবছি কী করব!

[শুকতারা, ভাদ্র ১৩৭৪ (অগাস্ট ১৯৬৭)]

জঙ্গল বাড়ির বউরানি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেক দিন থেকে সাধ, অকূল বিশাল কোনো নদীর উপর পানসি করে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়ার মতো স্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দেব। অনেক দিন থেকে— মানে ‘ছিন্নপত্র’ পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের উপর ভেসে উঠেছিল, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝ রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনোহাঁসের পাখার শব্দ— সে আর মন থেকে কোনো কিছুতেই মুছে যায়নি। সেসব মধুর নামগুলোও ভুলিনি! শিলাইদহ তো পৃথিবীর কোনো জায়গা বলেই মনে হয় না আমার এখনও। সে যেন কোনো রূপকথার ভৌগোলিক নাম। আমার ছিন্নপত্রের ‘পদ্মায়’, তো রেলি ব্রাদার্সের পাটের স্টিমার যায় না, সে পদ্মা সাত সমুদ্র তেরোনদীর একটি রূপো-গলানো, তার জলে ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড়োজোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলায় সে সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল, তা বলতে পারি না, কারণ নদীটা পদ্মা নয়— ধলেশ্বরী। তাতে কিন্তু এমন কিছুই এসে যায় না। সব নদীই আশ্চর্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখলেই হল, ফুলে উঠলেই হল হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল, আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হল তারার ছায়া।

বরং আসল পদ্মার দিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই খারাপ হল। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগত কাটাকাটি-মারামারি, আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে, আর স্মৃতিও জমত না মধুর করে। আর আমার ধলেশ্বরীর-বা অভাব কীসের! সেও ছোটোখাটো রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে বর্ষার প্লাবনে ভাস্কর ধরায় লোকালয়ের কূলে। তার বুকে চর জাগে স্বপ্নের মতো, চখা-চখির ডাকে তার দু-কূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রি।

মাঝারি সাইজের একটি পানসি ভাড়া করে নিলাম। মাঝি মাঝা, চাকর-বাকর নিয়ে সবসুদ্ধ আমরা ছ-জন মাত্র।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

এত লোকেরও বুঝি দরকার ছিল না। বিনা তাড়াছড়ায় ধীরে-সুস্থে যেমন খুশি, ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ, বড়ো বড়ো গঞ্জে কি লোকালয়ে ভিড় করা যাটে নয়, শূন্য-নির্জন তীরে। শুধু পাখির ঝাঁক-বসা চড়ার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরণ মাঝি যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবার ছুটি, একা চরণ বসে থাকে হালে কাঠের মূর্তির মতো। শুধু যখন মেঘনার মোহনায় গিয়ে পড়বার উপক্রম হল তখন স্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত দিতে হয় অন্য মাঝিদের।

ছিন্নপত্রের স্বপ্নের কুয়াশা মনের মধ্যে না থাকলে পানসির জীবন বেশ পানসে হয়ে উঠতে পারত? গরমিল তো কম নয়। ছিন্নপত্রের পদ্মায় কচুরিপানার কুৎসিত জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া রামসেবকের রান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম ও সবার প্রায় ওপরে।

প্রায় ওপরে এই জন্যে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সবসময়ে ঠিক স্বাভাবিকভাবে বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক-এক সময়ে নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন মাঝি রাত্রে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পানসির কোলে, আর মেঘঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থম থম করছে, তখন মিশরের মমির মতো শুধু চরণ আছে নিষ্পন্দভাবে হালে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে, আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরসা।

সত্যি, জ্যাস্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা চেহারা হতে পারে— এ আমি আগে কখনো জানতাম না। রং তার কালো বলে নয়, কালো তো সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন অপার্থিব বিবর্ণতা! যেন অনেক দিন মাটির তলায় সে চাপা পড়েছিল। এই সবেমাত্র যেন উঠে এসেছে শ্যাওলাধরা ভিজে মাটি মুছে গা থেকে!

লোকটার ধরন-ধারণাও অদ্ভুত! কথা সে খুব কমই কয়, অত্যন্ত ভারী হাঁড়ির মতো গলায় শুধু একটু-আধটু হ্যাঁ-না ছাড়া আর কিছু বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সাথে তার মেলামেশাও নেই; তবুও সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ করে দূরে রেখে চলে, সে কেবল তার মরা-চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার জন্য।

সেদিনও মেঘে ঢাকা ভাঙা চাঁদের মরা জ্যোৎস্নায় চারদিক ছমছম করছে।

সন্ধে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিসফিস শুনলাম। রাত একটু হলেই তার কারণটা বোঝা গেল।

এক মাঝি সাহস করে এগিয়ে এসে কান-মাথা চুলকে, আমতা আমতা করে জানালে যে আমি যদি তাদের ছুটি দিই, তাহলে তারা একটু ভালো যাত্রা শুনে আসে।

‘যাত্রা’ কোথায় হচ্ছে হেসে জিজ্ঞাসা করে জানলাম খানিক আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেইখানেই নাকি ভারি নামজাদা এক যাত্রা দল এসেছে। এমন যাত্রা শোনবার ভাগ্য নাকি এ-তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে সে আমাকেও যাওয়ার প্রস্তাব করে ফেলে এবার।

হেসে বললাম না মাঝির পো আমার অত শখ নেই, তবে তোমরা শুনে আসত পারো, ইচ্ছে হয়েছে যখন, কিন্তু গঞ্জের ঘাটে তো আমি থাকতে পারব না।

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালে যে আমায় সে কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হোঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙলেই ফিরে আসবে ভোরবেলায়, কিন্তু আপনার ভয় করবে না তো?

হেসে বললাম— তা যদি একটু করে মন্দ কী!

মাঝি সাহস দিয়ে জানালে— এখানে ভয়ের অবশ্য কিছুই নেই। জলঝাড়ের সময় নয়, নৌকো নোঙর বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন জিজ্ঞাসা করলাম জানি না, চরণ মাঝি যাচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে? মাঝির মুখে ‘যাচ্ছে বই কী কর্তা’ শুনে কেমন যেন আশ্চর্য বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একেবারে পানসির কামরার ছাদে উঠে গিয়ে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখনো তো হয়নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানি ঠাকুর রাম সেবক পর্যন্ত সঙ্গে গেছে হুজুকে পড়ে। দূরে কোথাও একটা-দুটো নৌকার আলো পর্যন্ত নেই, বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা— একথা ভাবতেও কেমন যেন পুলকের রোমাঞ্চ হয়।

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু পরে সেটা রইল না।

রাত্রির নির্জনতায় ধ্যান করতে করতে বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, চারিদিকের দৃশ্য বেশ বদলে গেছে, ভাঙা চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কূলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন মলিন চেহারাটা ভারি অস্বস্তিকর লাগল। একটা নাম-না-জানা পাখি দূর-আকাশে কীরকম আর্তনাদের মতো ডাক ছেড়ে উড়ে গেল! শিউরে উঠলাম একটু।

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমানো উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন যেন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেইসঙ্গে।

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এতবড়ো একটা বিশাল পোড়োবাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটলধরা বিশাল দেওয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনও যেন আকাশ আড়াল করে আছে। বুঝলাম এতক্ষণে জোড়াসার অস্পষ্ট আলোয় এই পোড়ো-প্রাসাদ

কুয়াশায় মিশেছিল, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারের দৈত্যর মতো জেগে উঠেছে। এই পোড়ো-প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হল।

পেছনে কী-একটা বনবান করে শব্দ হল যেন। সত্যি বলছি এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর একটি লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধ হয় না।

এ কী চরণ! প্রায় ধরা গলায় বললাম— তুমি কখন ফিরলে যাত্রা দেখলে না? সে শেকল-সমেত নোঙরটা তুলে পানসির ওপর রেখে গভীর স্বরে বললে না! কিন্তু নোঙর তুললে কেন? —অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার ভালো লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে— দেখেছেন!

দেখিনি, কিন্তু এইবার দেখলুম। সেদিন রাত্রি শেষে যে অদ্ভুত অসাধারণ সব ঘটনা একসঙ্গে ঘড়যন্ত্র করে এসেছে আমার জীবনে, তখন তা ভালো করে বোধ হয় বুঝিনি।

পাড়ের ওপড় জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারী মূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

কে ও? জানো নাকি! প্রায় চিৎকার করে উঠলাম বিস্ময়ে উত্তেজনায়। হাল ঘুরিয়ে নৌকো সেই পাড়ের কাছে ভিড়াতে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

পাড়ে ভিড়াতে-না-ভিড়াতে মহিলাটি যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পানসিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত-ব্যাকুল স্বরে বললেন— আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান! দোহাই আপনার!

সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম— আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু কী ব্যাপার, আমার একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।

আঁচল ঢাকা দিয়ে কী যেন একটা ভারী জিনিস তিনি বয়ে এনেছিলেন। কামরায় চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু হোঁচট খেতে ভদ্রতা করে বললাম— ওটা বড্ড ভারী বোধ হয়। আমার হাতে দিতে পারেন।

তিনি একথায় এমন আঁতকে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয়ই ও কথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ়ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল করে দিলাম।

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধ হয় একটু লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত আকারের বাক্স বের করে আমার সামনে

রেখে তিনি বললেন— আমায় মাপ করবেন। আপনাকে অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমনি হয়ে গেছি।

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এতক্ষণে ভালো করে দেখলাম। চেহারা তার স্পষ্ট বড়ো ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা ধরন-ধারণ যেমন তার অদ্ভুত, তেমনি তাঁর পোশাক! যাই হোক, তখন সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয় তার। কী আছে ওতে?

তিনি কথা না বলে শুধু বাস্তবের ভেতর, কুণ্ডলী পাকানো এক রাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠল। চমকে গেলাম। সাপ নয়— হিরা মুক্তোর জড়োয়া গয়না। তেমন গয়না আমি তো কখনো দেখিনি।

মহিলাটি মুঠো করে কয়েকটা গয়না বাস্তব থেকে তুলে কামরার মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড় বস্তু নয়, ক্রুর সরীসৃপ!

দরজায় খুঁট করে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি চরণ, কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মতো হিংস্র লোভের ঝিলিক!

পলক ফেলতে-না-ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললাম— তুলে ফেলুন এসব বাস্তব! এসব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কী বলে এই রাতে একা বেরিয়েছেন!

আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলি বাস্তব তুলতে তুলতে তিনি বললেন— বেরুব না? ওরা যে এসব ছিনিয়ে নিতে চায়।

ওরা কারা।

আমার শ্বশুর বাড়ির জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে— খুন করতে পারে! কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?

যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমায় দিনরাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু-ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি, আমায় সেখানে পৌঁছে দিন!

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি— বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেওয়ার জন্যে বেরোলাম।

কিন্তু আশ্চর্য। চরণ যেন আগে থাকতেই সব জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকা চলেছে।

বললাম— ক্রোশ-দুয়েক বাদে নৌকা থামিয়ে খবর দিও।

নিশ্চলভাবে বসে কী যেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে! অত্যন্ত বিস্মী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার আমি কামরার ঢুকে বসলাম— আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ কামরার ভেতরে দরজা দিয়ে দিন।

তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন— না না, সে আরও ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ কী নৌকা হঠাৎ ঘুরে গেল কেন? চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি। পানসি নিজের খেয়ালে ঘুরছে।

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে যাওয়া চাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মতো চরণ এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে। কী হিংস্র লোভ তার অমানুষিক চোখ ও মুখে! বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে!

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চিৎকার করে বাজ্ঞ সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু বৃথা। আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটা মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপর। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কীরকম একটা আচ্ছন্ন-অভিভূত অবস্থা। চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলেও আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলার স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাজ্ঞটি রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে!

ধীরে ধীরে বাজ্ঞটি কায়দা করে নিয়ে চরণ তাঁকে নৌকার ধারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুণ হতাশায় শেষ শক্তি সংহত করে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাজ্ঞসুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুশমনও।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড়া পেয়ে আমি চিৎকার করে ছুটে গেলাম পানসির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারী সেই বাজ্ঞের টানে দু-জনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তার সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। ক-টা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চিৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে একনিশ্বাসে তাদের যথাসম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের দু-জনে ডুবেছে, সে জায়গাটা দেখালাম।

তারা প্রথমে গম্ভীর হয়ে শুনে হেসে উঠল। হেসে জানাল যে এ-রকম আজগুবি ব্যাপার হতেই পারে না। যত ভারী জিনিসই হোক একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু-দুটো লোককে। হাতে ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে দু-জন না হোক, একজন তো ভেসে উঠতোই। আর তা ছাড়া দু-ক্রোশ কেন এদিক-ওদিক বিশ ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মতো কোনো পোড়োবাড়িই নদীর ধারে নেই। দামি গয়নার বাসসমেত ওরকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে!

আমি রেগে উঠে বললাম— তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?

বৃদ্ধগোছের একটি মাঝি একটা ডিঙির এক কোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তার কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শান্ত স্বরে বললে— না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেননি, আমি জানি আপনি জঙ্গল বাড়ির বউরানিকে দেখেছেন।

তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে বললাম— জঙ্গল বাড়ির বউরানি তুমি জানো তাহলে। কোথায় জঙ্গল বাড়ি বলো তো?

খানিক চুপ করে থেকে নীচে জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বললে— ওইখানে বাবু। আজ পঞ্চাশ বছর হল জঙ্গল বাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বউরানি তাঁর জ্বালা ভোলেছেন। এখনও মাঝে মাঝে কারো পানসিতে এসে ওঠেন।

জেলেরাই আমার পানসি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝিমাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজেছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম, সব না-হয় স্বপ্ন; কিন্তু আমার পানসির নোঙর কে তুললে?

পানসির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার আর পানি বিহারে। আমি ‘ছিন্নপত্র’ই পড়ব।

[ছোটোদের অমনিবাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৭৪ (প্রথম প্রকাশকাল অজ্ঞাত)]

চিলেকোঠার রহস্য

মুরারিমোহন বিট

গ্রামটার নাম মনে নেই।

তবে এটুকু মনে আছে, ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেললাইনের ত্রিবেণী নামক জায়গা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে গঙ্গার ধারে সেই গ্রামটি।

ছবির মতো গ্রাম। গঙ্গার ধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। ধরা যাক গ্রামটির নাম চন্দনপুর।

এই গ্রামেরই একটি মাঝারি আকারের আধপুরোনো দোতলা বাড়ি বেশ সস্তা দামে খরিদ করলেন কলকাতার এক স্টিল কোম্পানির মালিক সুরজিৎ আগরওয়ালা।

বাড়িটার অবস্থা মোটামুটি খুব খারাপ নয়। একটু-আধটু, মেরামত করে নিতে পারলে বসবাসের কোনোই অসুবিধা হবে না। তবু কোটিপতি আগরওয়ালা স্থির করলেন, বাড়িটা আগাগোড়া চুনবালি খসিয়ে নিখুঁতভাবে সারিয়ে নেবেন। তাতে খরচ যা হয় হবে, সে খরচ করতে তিনি কার্পণ্য করবেন না— কারণ গঙ্গাধারের অমন সুন্দর পরিবেশের এই বাড়িটাকেই তিনি করতে চান নানারকম ফুলগাছ ও বাহারি লতাপাতায় সাজানো একটি মনোরম পল্লীভবন, যেখানে তিনি মাঝে মাঝে কলকাতার ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে অবসরগ্রহণ করতে পারবেন।

এই ভেবে একদিন তিনি তাঁর অফিসের একজন বিশ্বাসী কর্মচারী অনিমেষ রায়ের সঙ্গে সাতজন মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দিলেন চন্দনপুর। এবং পৃথক একটি লরিতে করে সিমেন্ট, বালি, চুন ইত্যাদি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন— যাতে প্রথম কয়েকটা দিন কাজ চালানো যাবে। তারপর দেখে-শুনে অনিমেষ যেন ত্রিবেণী থেকেই ওইসব জিনিস সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে।

এমন একটি বাড়ি এত কম দামে পাওয়ার আশা সত্যিই করতে পারেননি আগরওয়ালা। এই বাড়িটা তিনি কিনেছেন হরিশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় নামে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের একজন পদস্থ অফিসারের কাছ থেকে। ভদ্রলোক বর্তমানে সপরিবারে কলকাতায় বাস করেন, তাঁরই স্বোপার্জিত অর্থে কেনা নিজের বাড়িতে। চন্দনপুরের এই বাড়িটি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, বহুদিন যাবৎ তিনি ছাড়াই থাকেন। বছর পনেরো

হল, তিনি কলকাতায় বাড়ি কিনে গাঁয়ের বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে বসবাস শুরু করেছেন কলকাতায়।

প্রথম প্রথম বছরে একবার দুর্গা পূজার সময় দু-চার দিনের জন্য দেশের বাড়িতে গিয়ে বাস করে আসতেন। তারপর ক্রমশ দু-বছর অন্তর একবার, তিন বছর অন্তর একবার এইভাবে কমতে কমতে গত কয়েক বছর হল তিনি আর চন্দনপুর যাননি। ছেলে-মেয়েরাও কেউ আর দেশের বাড়িতে যেতে চায় না। আর তাঁর বর্তমান দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী তো খাঁটি বালিগঞ্জের মেয়ে; তাঁর তো ওদিকে পা দিতে কোনোরকম ইচ্ছাই নেই। স্বামী যেতেন বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে যেতে হত, এই যা।

দেশের মায়া হরিশঙ্করবাবুর কেটে গেছে, দেশে বাস করার ইচ্ছা তাঁর আর নেই। সে কারণে তিনি বাড়িটাকে বিক্রি করার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপন দেখেই আগরওয়ালা বাড়িটা কিনে নিয়েছেন।

কারখানার মোটর ভ্যানে করে দলবল নিয়ে যখন অনিমেষ চন্দনপুর পৌঁছাল, তখন বেলা তিনটে। মিস্ত্রিরা সকলে মিলে খানতিনেক ঘর পরিষ্কার করে নিল সকলের বাস করার জন্য। যতদিন না বাড়িটার মেরামতের কাজ শেষ হয়, ততদিন তাদের এবং অনিমেষকে এখানেই থাকতে হবে— এইরকমই নির্দেশ আছে আগরওয়ালার।

এবং থাকতে হলেই রান্নাখাওয়ার আয়োজন করতে হবে। মিস্ত্রিরা সাতজন আর অনিমেষ নিজে— এই আট জনের দু-বেলার রান্নার জন্য একজন লোকের নিতান্তই দরকার। এবং আজ থেকেই দরকার। বাড়িতে পৌঁছেই অনিমেষ তাই আবার গাঁয়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল লোকের সন্ধানে।

খানিক পথ অগ্রসর হওয়ার পর একটা ছোটো কোঠাবাড়ির বাইরের বারান্দায় কয়েক জন বয়স্ক লোককে দাবা খেলতে দেখে অনিমেষ দাঁড়াল তাঁদের সামনে। এক কেতাদুরস্ত, সুটপরিহিত অচেনা যুবককে দেখে গাঁয়ের লোকগুলির দাবা খেলা বন্ধ হল। তাঁরা সকৌতূহলে অনিমেষের দিকে তাকালেন। অনিমেষ বলল, আমি কলকাতা থেকে আসছি। আপনাদের বোধ হয় অজানা নেই, এখানে হরিশঙ্কর গাঙ্গুলীর বাড়িটা সুরজিৎ আগরওয়ালা কিনেছেন।

একজন ভদ্রলোক বললেন, গঙ্গার কাছে অশখতলার ডান দিকে যে দোতলা কোঠাবাড়িটা রয়েছে, ওই বাড়িটার কথা বলছেন তো?

অনিমেষ বলল, হ্যাঁ, ওই বাড়িটাই। আমি আগরওয়ালা সাহেবের স্টিল কোম্পানিতে কাজ করি। সাহেব আমাকে কয়েক জন রাজমিস্ত্রি দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন বাড়িটা মেরামত করবার জন্য। পনেরো-বিশ দিন লাগবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা আছি আটজন। দু-বেলা রান্না-খাওয়া তো করতে হবে। ভালো রাঁধতে পারে, এমন একজন লোকের দরকার। সেই খোঁজেই আপনাদের কাছে এসেছি। যদি আপনারা একটা ^{অন্যজনকে} ~~ব্যক্তি~~ ^{একজন} ~~কর~~ ^{দেখ} দিন, খুব উপকার হয়।

দ্বিতীয় একজন ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, একজন বয়স্কা মেয়েছেলে আছে, দিতে পারি। তা তাকে তো দু-বেলা খেতে দিতে হবে, আর হাতখরচাও দু-এক টাকা দেওয়া দরকার।

অনিমেষ বলল, তা তো বটেই। পনেরো দিন হোক, বিশ দিন হোক, পঁচিশ দিন হোক, রান্না করে দিতে হবে দু-বেলা তিনি খাবেন, আর হাতখরচ বাবদ পাঁচ টাকা দেব।

—ব্যস, ব্যস। ওতেই হবে। তা আপনার কি আজই লোকের দরকার?

—হ্যাঁ, সেইজন্যে তো বাড়িতে পা দিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। আর সম্ভ্যার আগেই যদি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন—

—বেশ, ঘণ্টাখানেক পর আমি নিজেই তাকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি থাকবেন তো?

অনিমেষ বলল, হ্যাঁ আছি। আচ্ছা এদিকে দোকানপসার, বাজারহাট এসব কোথায়? যদি বলে দেন তো ঘুরে ঘুরে এখন একবার দেখে আসি। আজকের মতো চাল ডাল তরিতরকারি কিছু নিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু মুদির দোকানের কিছু জিনিস আজ নেব।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি দাবাখেলার দর্শক ছিলেন। হাব ভাব এবং কথাবার্তায় তাঁকে বেশ অমায়িক ও সহানভূতিশীল মনে হল। তিনি বললেন, বাজার আর দোকান কাছেই। সকালে টাটকা তরিতরকারি মাছ সবই পাবেন— চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে আসি।

অনিমেষকে সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের প্রধান সড়ক ধরে তিনি উত্তরদিকে হাঁটা দিলেন। এই ভদ্রলোকের নাম শঙ্কর নারায়ণ চৌধুরী।

পরদিন সকাল আটটা থেকে মিস্ত্রিদের কাজ শুরু হয়ে গেল। একতলা-দোতলা মিলে বাড়িটাতে সবসুদ্ধ খান দশেক ঘর। আর দোতলার ছাদের ওপর আছে একটা চিলেকোঠা। চিলেকোঠা ঘরটাও নেহাত ছোটো নয়। লম্বা-চওড়াও আছে এবং উঁচুও বেশ।

দোতলার ছাদ এবং চিলেকোঠা থেকেই কাজ আরম্ভ করা হল। ঘরদোর ছাদ মোটামুটি সব ভালোই আছে; খারাপের মধ্যে চুনবালির প্লাস্টারে বহু জায়গায় নোনা ধরেছে, আর স্থানে স্থানে চুনবালি খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। দরজা জানালার কপাট ইত্যাদি মজবুত আছে— শুধু রং খুব ফিকে হয়ে গেছে।

আগরওয়ালায় নির্দেশ আছে, ঘরগুলির সমস্ত বালি খসিয়ে আগাগোড়া নতুন চুনবালির প্লাস্টারিং করা হবে। সেই হিসেবেই ছাদ ও চিলেকোঠার প্লাস্টারিং খসানোর কাজ শুরু করা হল। দু-জন মিস্ত্রি চিলেকোঠার মধ্যে ঢুকল, বাকিরা ছাদের কাজে হাত দিল।

চিলেকোঠার দেওয়ালে একজন মিস্ত্রি প্রথম যেই শাবলের ঘা মেরেছে, অমনি একটা বিদ্রী কাণ্ড ঘটে গেল। শাবলটা আচমকা পিছলে গিয়ে পড়ল লোকটার পায়ের পাতায়। বেশ খানিকটা গর্ত হয়ে গেল...রক্তারক্তি কাণ্ড!

অনিমেষ খুব বুদ্ধি করেই সঙ্গে কিছু ওষুধপত্র, তুলো, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি এনেছিল। সে তৎক্ষণাৎ টিংচার বেঞ্জয়িন লাগিয়ে তার পা-টা বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল, এবং কিছুক্ষণের জন্য তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিল। যদি তার পায়ের অবস্থা ভালো থাকে, তাহলে পরে সে কাজ করবে, নচেৎ দরকার বুঝলে তাকে ডাক্তার দেখানো হবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আর একজন মিস্ত্রি যে চিলেকোঠায় ছিল, তারও ঘটে গেল একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। শাবলের আঘাতে দেওয়ালের খানিকটা প্লাস্টার খসিয়ে ফেলতেই লোকটা মাথা ঘুরে পড়ে গেল মেঝের ওপর। তার আর জ্ঞান রইল না।

হইহই ব্যাপার। সব মিস্ত্রিরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এসে ছাদের ওপর তাকে শুইয়ে দিল। মুখে-চোখে জলের ছিটে দিয়ে খানিকক্ষণ হাওয়া দিতে তবে সে চোখ খুলল। অনিমেষ বলল, চিলেকোঠা ঘরটা বড়ো অপয়া। দু-দু-বার এরকম বাধা পড়ল। আজ এ ঘরের কাজ বন্ধ থাক।

বৈকাল পাঁচটা অর্ধ মিস্ত্রিরা নির্বিঘ্নে ছাদের আলিসা, এবং দোতলার ঘরের কিছু কিছু দেওয়ালের কাজ শেষ করল। বেলা বারোটা থেকে একটা অবধি মিস্ত্রিদের খাওয়ার ছুটি ছিল। কাজ তারা করল বটে, কিন্তু সহকর্মী দু-জনের দুর্ঘটনার জন্য তাদের মন কারো ভালো ছিল না। ওই অসুস্থ মিস্ত্রি দু-জনের পক্ষে এদিন আর কাজ করা সম্ভব হয়নি।

সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ রাঁধুনি মহিলাটি এসে উনুন জ্বলে রান্না চাপিয়ে দিল। সকালে আটটা নাগাদ এসেছিল। রান্নাবান্না করে বারোটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে চলে গিয়েছিল। কাল রাতে গিয়েছিল সাড়ে ন-টায়। আজ গেল ন-টায়।

অনিমেষ রাত এগারোটার আগে খেতে পারে না, এইরকমই ওর বরাবরের অভ্যাস। মিস্ত্রিদের একটু সকাল সকাল খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও অনিমেষের কথা শুনে তারাও বাবুর সঙ্গে রাত এগারোটাতেই খাওয়া উচিত বিবেচনা করেছে। কাল রাত এগারোটাতেই একসঙ্গে সকলে খেয়েছে, আজও তারা সেইরূপ খাবে স্থির করে মেঝেতে আঁক কেটে হ্যারিকেনের আলোয় বাঘবন্দি খেলা শুরু করেছে। আর অনিমেষ তাদের পাশের ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে একটা ইংরাজি বই পড়ছে। মাথার ওপর জ্বলছে হ্যারিকেন।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে।

বেশ তন্ময় হয়েই অনিমেষ বইখানা পড়ছিল। হঠাৎ কীসের যেন একটা শব্দ পেয়ে সে দরজার দিকে তাকাল। তাকিয়েই কেমন যেন একটা চমকে উঠল। দেখল দরজার গোড়ায় আধা আলো আধা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

মহিলা। পরনে তার কালো বা ওই ধরনের কোনো গাঢ় রঙের নকশাদার চওড়া পাড়ওলা সাদা ভূমির শাড়ি... মাথায় ঘোমটা টানা। মুখমণ্ডল ভালো দেখা যাচ্ছে না— বোঝাও যাচ্ছে না কীরকম দেখতে!

অনিমেষ অত্যন্ত অবাক হল, এত রাত্রে তার কাছে সম্পূর্ণ একজন অচেনা মহিলাকে আসতে দেখে। প্রথম নজরে সে হঠাৎ ভেবেছিল, রাঁধুনি মেয়েটাই বোধ হয় এসেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে তার ভুল ভেঙেছে। অনিমেষ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিছানার ওপর উঠে বসে অস্বস্তিকর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, কে আপনি?

মহিলাটি এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে উত্তর যা এল, অনিমেষের মনে হল তার সেই কণ্ঠস্বর যেন ভেসে এল বহুদূর থেকে। মহিলাটি বলল, আমার পরিচয় জেনে আপনার লাভ নেই। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি। সারা বাড়িটা মেরামত করুন, বাধা দেব না— কিন্তু ওপরের চিলেকোঠাতে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না— কারণ ওই ঘরটাতে আমি বাস করি। আমার ঘর যেমন আছে তেমনি থাকবে। আমার ঘরে হাত দিলে খুব বিপদে পড়বেন— সাবধান!

অনিমেষ বিস্ময়িত নেত্রে হতভম্বের মতো বলল— কই, ওপরের ওই চিলেকোঠায় কেউ বাস করে বলে তো মনে হল না।

অনিমেষের কথা বলার মধ্যেই মহিলাটি অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

হারিকেন নিয়ে অনিমেষ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। মুহূর্তের মধ্যে আবার তিন সেলের টর্চটা নিয়ে এল, চতুর্দিকে আলো ফেলল— নাঃ, কেউ কোথাও নেই। কী আশ্চর্য! সে চতুর্দিকে অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিপাত করছে, আচমকা তার মনে হল, একেবারে পাশ থেকে তার কানের কাছে মুখ এনে কে যেন ফিসফিস করে বলল— সাবধান! সাবধান!

গভীর আতঙ্কে অনিমেষের সারা দেহটা শিরশির করে উঠল। যেন একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল তার শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে।

পাশের মিস্ত্রিদের ঘরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল— তোমরা এইমাত্র কোনো মেয়েছেলেকে দেখেছ কি? মাথায় ঘোমটা দেওয়া... সাদা কাপড় পরা?

সকলে অবাক হয়ে অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল। একজন বলল— না তো!... আমরা বাবু খেলাতেই ডুবে আছি, অন্যদিকে খেয়াল করিনি। কোনো মেয়েছেলে এসেছিল কি? আপনি দেখেছেন?

—হুঁ! অনিমেষ সংক্ষেপে উত্তর দিল।

মিস্ত্রিরা অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

নানা চিন্তায় রাতে ভালো ঘুম হল না অনিমেষের। কে ওই মহিলাটি? চিলেকোঠায় তো কেউ থাকে না!

তবে তার ওই কথার অর্থ কী? কেন সে বলল যে সে চিলেকোঠায় বাস করে? তা ছাড়া মেয়েটির অস্বাভাবিক আগমন ও প্রত্যাগমন অত্যন্ত রহস্যজনক... তার কথাবার্তা আরও রহস্যময়! তবে কি...তবে কি চিলেকোঠায় হাত দেওয়ার অপরাধেই ওই মিস্ত্রি দু-জনের অমন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেছে? মহিলাটি মানুষ, না মানুষের রূপধারী অন্য কিছু?

অনিমেষের দেহটা ভয়ে কাঠ হয়ে আসে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা-টা খেয়ে বাজারের থলি হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

এখানে সাড়ে সাতটার আগে ভালো বাজার বসে না। তার এত সকাল সকাল বেরুনোর উদ্দেশ্য, শঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে ওই রহস্যজনক মহিলাটি সম্পর্কে কিছু জানা যায় কিনা চেষ্টা করতে হবে।

চৌধুরী মশায়ের বাড়ি অনিমেষের জানা। প্রথম দিন চৌধুরীমশাই যখন অনিমেষকে বাজারহাট দেখাতে বেরিয়ে ছিলেন, সেইসময় তাঁর বাড়িটি পশ্চিমপাশে পড়ায় তিনি তাকে বাড়িটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

অনিমেষকে এত সকালে তাঁর বাড়ির দরজায় দেখে চৌধুরীমশাই একগাল হেসে প্রশ্ন করলেন, কি অনিমেষবাবু, এত সকালে?

অনিমেষ বলল— বিশেষ একটা কারণে আসতে বাধ্য হলাম চৌধুরীমশাই...

— কী ব্যাপার; বসুন বসুন—

ঘরের বাইরের দাওয়ায় তিনি মাদুর বিছিয়ে দিলেন।

অনিমেষের মুখমণ্ডলের রেখাগুলো দুশ্চিন্তায়ও অনিদ্রায় কুঁচকে রয়েছে... মুখমণ্ডল শুষ্ক। সেটা লক্ষ করে বিচক্ষণ চৌধুরীমশাই প্রশ্ন করলেন, আবার কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে কি? আপনার সেই মিস্ত্রি দু-জনের কথা তো কাল শুনেই এলাম, এবং তারা তো ভালোই আছে আপনি বললেন। আবার অন্য কিছু...

অনিমেষ বলল, হ্যাঁ, রাত্রে আর একটা ঘটনা ঘটেছে অস্বাভাবিক ঘটনা!

চৌধুরীমশাইও আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, কীরকম? কী হল আবার? কেউ আবার জখম-টখম...

—না, জখম-টখমের ব্যাপার নয়, শুনুন বলছি।

আগাগোড়া ঘটনাটা জানাল অনিমেষ।

শুনে-টুনে গভীরমুখে চৌধুরীমশাই বললেন, বুঝেছি।

—কী বুঝেছেন? —গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে অনিমেষ প্রশ্ন করল।

চৌধুরীমশাই বললেন, যার বাড়ি আপনি কিনেছেন, সেই হরিশঙ্কর গাঙ্গুলীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সাংসারিক কোনো অশান্তির জন্য প্রায় পনেরো-ষোলো বছর আগে ওই চিলেকোঠা ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরই

কিছুদিনের মধ্যে হরিশঙ্করবাবু, কলকাতায় বাড়ি কিনে চলে যান, এবং কলকাতার মেয়ে বিয়ে করে আবার নতুনভাবে ঘরসংসার পাঠেন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, তাঁর সেই প্রথমা স্ত্রীর অতৃপ্ত আত্মা এখনও পর্যন্ত ওই চিলেকোঠা ঘরটি আঁকড়ে ধরে রয়েছে। আপনার মিস্ত্রি দু-জনের দুর্ঘটনার কারণ এবার স্পষ্ট হল।

অনিমেষ সভয়ে তাকাল চৌধুরীমশায়ের মুখের দিকে।

—হ্যাঁ তাই। ওই ঘরে হাত দেওয়ার জন্যেই মহিলাটির প্রেতাত্মা ক্রুদ্ধ হয়ে ওদের শাস্তি দিয়েছে।

—তাহলে এখন আমার কী কর্তব্য?

বোকার মতো মুখের হাবভাব করে অনিমেষ প্রশ্ন করল।

—কী করা উচিত, তা ভেবে দেখতে হবে। আপনি এখন ওই ঘরটা ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য ঘরগুলো মেরামতে হাত দিন। কয়েক জনের সঙ্গে আমি পরামর্শ করে দেখি... ত্রিবেণীতে একজন খুব ভালো ওঝা আছেন, তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করা দরকার। এরই মধ্যে একবার তাঁর কাছে যাব সময় করে... আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তবে আজ কাল হবে না— পরশুদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যেতে পারি।

অনিমেষ কিন্তু এখানেই থামল না। মিস্ত্রিদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বেলা এগারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়ে পড়ল। বলে গেল, পাঁচটার মধ্যেই ফিরে আসবে।

মি আগরওয়ালা তো সব শুনে ক্ষেপে আগুন। অনিমেষকে তিরস্কার করে বললেন, থাম। যত সব বুজরুকি গাঁজাখুরি! তুমি আজকালকার ছেলে হয়ে এসব বিশ্বাস করো? ছিঃ ছিঃ, কী দেখতে কী দেখেছ, কী শুনতে কী শুনেছ... ঠিক আছে, এখন তুমি চলে যাও, আমি কাল সকালে চন্দনপুর যাচ্ছি...দেখব সে মেয়ে-ভূত কেমন...কত তার শক্তি! কেউ নিশ্চয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে। দেখা যদি তার পাই, গলা টিপে তাকে মারব! সকাল ন-টার মধ্যেই যাব তুমি আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো রায়। আমার সঙ্গে একজন বন্ধু যাবে, আর ড্রাইভার থাকবে... আর একজন দারোয়ানকেও নিয়ে যাব। মোট চারজন আমরা যাব খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

আগরওয়ালা কথা রাখলেন। নিজের মোটরে করে পরদিন সাড়ে ন-টা নাগাদ চন্দনপুর পৌঁছালেন তিনি। সঙ্গে এনেছেন তাঁর অফিসের একজন বন্দুকধারী দারোয়ান আর তাঁর একজন বন্ধুকে। তিনি তো বাড়িতে পৌঁছেই ওই দু-জন এবং অনিমেষকে নিয়ে উঠে গেলেন দোতলার ছাদে। দেখলেন চিলেকোঠা ঘরটি। বেশ কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর ও চারপাশটা লক্ষ করে ওপরে ডেকে পাঠালেন সমস্ত মিস্ত্রিদের।

মিস্ত্রিরা হাজির হল সব। আগরওয়ালা ঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, এই তোরা একজন আমার সামনে দেওয়ালে শাবলের ঘা মারতো দেখি কী হয়?

মিস্ত্রিরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

অরাজকতা এককুসিভ

আগরওয়ালা রেগে গেলেন। কী হল, হাবাগোবার মতো তোরা সব দাঁড়িয়ে রইলি যে! এই, তুই মার তো দেখি—

—বাবু। —ছোকরা মিস্ত্রিটি ভয়ে ভয়ে বলল, বাবু বিশ্বাস করুন, এঘরে অপদেবতা বাস করে, তা না হলে এমন হয়? একজনের পা জখম হল, একজন অজ্ঞান হয়ে গেল—

—রাবিশ! —আগরওয়ালা হংকার ছাড়লেন। বললেন, শাবলটা আমাকে দে, আমিই দেখছি।

দারোয়ান এগিয়ে এল— বাবু, শাবল আমাকে দিন। সব ভীতুর দল আছে এরা। শাবলটা নিয়ে দারোয়ান যেই দেওয়ালে ঘা লাগিয়েছে, অমনি সেই বিস্ময়কর দুর্ঘটনা। দেওয়ালের গা থেকে শাবলটা আশ্চর্যজনকভাবে পিছলে বাঁকাভাবে এসে লাগল তাঁর হাঁটুতে। খুব চোট লাগল... কেটে রক্তারক্তি হয়ে গেল! দাঁড়িয়ে থাকতে না-পেরে হাঁটু ধরে সে বসে পড়ল সেখানেই।

আগরওয়ালা গম্ভীর মুখে নেমে গেলেন নীচে। অনিমেষ তাড়াতাড়ি ওষুধপত্র এনে দারোয়ানের হাঁটুর তদ্বির-তদারক করতে লেগে গেল।

আগরওয়ালের মুখে আর কোনো কথা নেই। মুখ বুজেই চা জলখাবার খাওয়া শেষ করলেন। তাঁর মুখভাব থমথমে।

মিস্ত্রিরা দোতলায় আবার যে-যার কাজ শুরু করে দিয়েছে। দারোয়ান পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে রইল নীচেতলার ঘরে।

অনেকক্ষণ পর আবার হাঁক ছাড়লেন আগরওয়ালা। —রায়! রায় কোথায় গেলে? দোতলা থেকে অনিমেষ তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে।

আগরওয়ালা বললেন, তুমি মিস্ত্রিদের বলো, তারা যেন এক্ষুনি বিশ-পঁচিশ বালতি জল দোতলার ছাদের ওপর জমা করে।

—কী হবে স্যার?

—কী হবে তা দেখতে পাবে। যা বলছি ব্যবস্থা করো।

আধঘণ্টার মধ্যেই নানা পাত্রে বিশ-পঁচিশ বালতি মতো জল মিস্ত্রিরা তুলে দিল ওপরে। অতঃপর আগরওয়ালা তাঁর মোটর থেকে পেট্রোল বোঝাই টিনটা নিয়ে সদলবলে চিলেকোঠার সামনে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, ঘরটাকে জ্বালিয়ে দেব, পুড়িয়ে মারব শয়তানটাকে!

এই বলে তিনি সমস্ত পেট্রোলটা ঘরের মেঝেতে এবং দেওয়ালের গায়ে ছড়িয়ে দিলেন।

তারপর—

তারপর বাইরে এসে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে ছুড়ে দিলেন ঘরটার মধ্যে।

দপ করে সারা ঘরটাই একসঙ্গে জ্বলে উঠল।

ছাদের একপাশে দাঁড়িয়ে সকলে নির্নিমেয় নয়নে সেই অগ্নিকাণ্ড দেখতে লাগলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা ও জানালার কপাটে আগুন ধরে গেল। তখন আগরওয়ালা বললেন, জল ঢালো এবার, আগুন নেভাও। দেখব এবার ঘরের দেওয়াল খোঁড়া যায় কি না?

আগুন ভালোভাবে নিভে যাওয়ার পর আগরওয়ালা এবার নিজের হাতে চিলেকোঠার দেওয়ালে শাবলের ঘা মারলেন। নাঃ, কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। পর পর বেশ কয়েক বার ঘা মেরে তিনি নেমে এলেন নীচে। তাঁর মন হালকা হয়ে গেছে— তিনি নিশ্চিত।

ঘণ্টা তিনেক পর।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আগরওয়ালা বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় একখানা মোটর এসে দাঁড়াল দরজায়। গাড়ি থেকে একজন নেমে ভেতরে ঢুকতেই অনিমেষের সঙ্গে দেখা। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে অনিমেষ ‘কে এল’ সেই সন্ধানই নিতে আসছিল। অনিমেষকে দেখে লোকটি দ্রুতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, বাবু কোথায় অনিমেষদা?

অনিমেষ বলল— ওই ঘরে। তা— কী খবর সুখলাল। হাঁপাচ্ছ মনে হচ্ছে?

সুখলাল ততক্ষণে আগরওয়ালার ঘরে ঢুকে গেছে।

—বাবু! সুখলালের গলা কাঁপছে থরথর করে।

আগরওয়ালা বিস্মিতনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে বললেন— তুমি এখানে?

সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু!

আগরওয়ালা উঠে বসলেন। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, সর্বনাশ?

—হ্যাঁ বাবু, আপনার তিনতলার ফ্ল্যাটে হঠাৎ আগুন লেগে গেছে!

আগুন! আগরওয়ালার দু-চোখ বিস্ফারিত, ভয়ার্ত।

সুখলাল বলতে লাগল, কী করে যে আগুন লাগলো তার কোনো হৃদিস পাওয়া যায়নি। একসঙ্গে চারখানা ঘরে আগুন জ্বলে ওঠে। আপনার লোকজনের কারো কোনো ক্ষতি হয়নি আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে নীচে নেমে আসতে পেরেছেন। কিন্তু জিনিসপত্র কোনো কিছুই বাঁচানো যাবে না। ওঃ, সে কী আগুন বাবু, দাউদাউ করে ঘরগুলো জ্বলছিল! দমকল আসতেই আমি মোটর নিয়ে আপনাকে খবর দিতে চলে আসি। এতক্ষণে নিশ্চয় আগুন নিভে গেছে, আপনি এফুনি চলুন বাবু।

আগরওয়ালা বজ্রাহতের মতো বসে রইলেন।

[শুকতারা, চৈত্র ১৩৮৩ (মার্চ ১৯৭৭)]

পুরোনো বাড়ি

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

এটা কিন্তু সত্যি ঘটনা। আমার জ্যাঠামণির মুখ থেকে শুনেছিলাম। তিনি ঠিক যেভাবে গল্পটা আমাকে বলেছিলেন, আমিও সেইভাবেই তোমাদের বলছি।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

আমার বয়স তখন কুড়ি-বাইশ। সবে একটা ভারী অসুখ থেকে উঠেছি। ডাক্তার বললেন চেপ্তে যেতে। একে অসুখে ভুগে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, তার ওপর শরীর সারানোর জন্যে বাইরেও যেতে হবে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে কাছে-পিঠে দেওঘরেই যাবার ঠিক করলাম।

ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে এক চায়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে বিলাসী টাউনে একটা বাড়ির সন্ধান পেলাম। বাঙালির বাড়ি। পাওয়া মাত্রই টাঙ্গা ভাড়া করে এসে হাজির হলাম সেই বাড়িতে। বাড়িটা পুরোনো। তা হোক। চারিদিক বেশ ফাঁকা।

টাঙ্গাওলা বাড়ির কাছে টাঙ্গা থামিয়ে বলল— আপনি এখানে প্রথম আসছেন নাকি বাবু?

—হ্যাঁ।

—এরকম জায়গায় আপনি থাকতে পারবেন? এ খুব খারাপ জায়গা কিন্তু। বিলাসী টাউন নামে টাউন হলেও তখন একেবারে ফাঁকা ও বুনো জায়গা ছিল। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করত। বললাম— খুব পারব। তা ছাড়া বাইরে বেরোলে অত ভয় করলে চলে?

টাঙ্গাওলা বলল— আমার সন্ধানে একটা ভালো ঘর ছিল। একেবারে মন্দিরের পাশে। যাবেন বাবু সেখানে?

আমি মালপত্তর নামাতে নামাতে বললাম— না থাক। এখানটা বেশ নির্জন। আমার পক্ষে এই জায়গাই ভালো। এই বলে টাঙ্গাওলাকে বিদায় দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, কী জানি টাঙ্গাওলার কথা শুনে আর কোথাও গিয়ে যদি কোনো পাণ্ডা গুন্ডার হাতে পড়ি?

মালপত্তর বাড়ির রোয়াকে রেখে দরজায় কড়া নাড়তেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন— কাকে চাই?

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

—আপনার এখানে কোনো ঘর খালি আছে? এক মাস থাকব।

ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন— পুরো বাড়িটাই খালি আছে। আমি ওপরে থাকি, আপনি নীচে থাকবেন। এক মাসের জন্য কিন্তু দশ টাকা ভাড়া দিতে হবে। পারবেন তো?

আমি কোনো কথা না বলে দশটা টাকাই বার করে দিলাম।

বাড়িটা ছোটো। নীচে দু-টি ঘর। রান্নাঘর। ওপরে একটি ঘর। ছাদ ও বারান্দা। বাড়ির বাইরে পাতকো, পায়খানা। চারিদিকে গাছপালা, বন। মাঝে মধ্যে দু-একটা ঘরবাড়ি। দূরে পাহাড়ের রেখা।

যাই হোক, ভদ্রলোক টাকা দশটি অগ্রিম নিয়ে ঘর পরিষ্কার করে একটি ক্যাম্প-খাট পেতে দিয়ে গেলেন। আমি তাইতেই বিছানা পেতে ফেললাম। তারপর ঘরে তালা দিয়ে দোকান-বাজার করে আনলাম। সঙ্গে স্টোভ ছিল।

তাইতেই রান্না করে খেয়ে-দেয়ে দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটলাম। বিকেলে মন্দির ঘুরে কিছুটা ভালো ঘি, প্যাঁড়া ও চমচম কিনে ঘরে ফিরে এলাম। তখন সন্কে হয়ে গেছে। কার্তিকের শেষ, অল্প অল্প শীতও পড়েছে তখন। ঘরে এসে তালা খুলেই অবাক। দেখলাম ঘরের ভেতর হারিকেনটা কে যেন জ্বলে রেখে গেছে। পেরেকে দড়ি বেঁধে তাইতে আমার জামাকাপড় সব সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে। আমি তো ভেবেই পেলাম না এ-রকমটা কী করে হল? কেন না, চাবি রইল আমার কাছে অথচ ঘরের কাজ করল কে? বাড়ির মালিকের নাম গজেনবাবু। আমি তাঁকে ডাকলাম। দু-তিন বার ডেকেও যখন কোনো সাড়া পেলাম না, তখন টর্চ জ্বলে ওপরে উঠেই দেখি, ঘরে তালা দিয়ে একজন মধ্যবয়সি মহিলা নেমে আসছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম— গজেনবাবু আছেন?

মহিলা আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে কিছু না বলেই নেমে গেলেন।

মনে মনে খুব রাগ হল আমার। আচ্ছা অভদ্র তো! মেজাজটাও খিঁচড়ে গেল। কেন না, এ ঘরে যখন আর কোনো দরজা নেই, তখন নিশ্চয়ই ডুপ্লিকেট চাবি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে অবশ্য আমার উপকারই হয়েছে। তবুও এ জিনিস কখনোই বরদাস্ত করা যায় না।

আমি সে-রাতে দু-চারটে পরোটা তৈরি করে প্যাঁড়া চমচম খেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে ঘুমোতে শুলাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে।

ঘুম থেকে উঠেই গজেনবাবুকে বাইরে কুয়োতলায় দাঁতন করতে দেখলাম। আমিও তাড়াতাড়ি দাঁত মাজার সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

গজেনবাবু একগাল হেসে বললেন— কি ভায়া, রাতে ঘুম হয়েছিল তো?

আমি হেসে বললাম— আজ্ঞে হ্যাঁ! তারপর পিতৃকালের কথাটা বললাম।

শুনে গজেনবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন— টাকাকড়ি সবসময় নিজের কাছে রাখবেন। সন্দের পর জানলা দরজা বন্ধ করে দেবেন। কেউ কড়া নাড়লে দরজা খুলবেন না। এসব জায়গা ভালো জায়গা নয়। তা ছাড়া রাত্রে আমি এখানে থাকি না। ওধারে আমার আর একটা বাড়ি আছে, সেইখানে থাকি।

—তা না হয় হল, কিন্তু আমার ঘরে আলোটা জ্বালল কে? আপনার স্ত্রী?

—আমার স্ত্রী? তিনি তো অনেকদিন গত হয়েছেন।

—তাহলে ওই মহিলা কে?

গজেনবাবু হেসে বললেন— আপনি ভুল দেখেছেন। এখানে কোনো মহিলা থাকেন না।

এমন সময় হঠাৎ একটা ছাগলকে হ্যাট হ্যাট করে তাড়া দিতে দিতে আমার প্রশ্নটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে কেটে পড়লেন গজেনবাবু।

এর পর সারাদিনে যতবারই গজেনবাবুর সঙ্গে দেখা হল, ততবারই তিনি আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। আজ তাই ঠিক করলাম, বেলাবেলি মানে সন্দের আগেই এখানে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে দেখব কে কীভাবে ঘরে ঢোকে।

তাই করলাম। সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসে দূরে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সন্কেটি যেই উদ্ভীর্ণ হল, অমনি দেখলাম আলো জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে! চারিদিক নিস্তন্ধ নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। আমি টর্চের আলোয় পথ দেখে ঘরে যেতে গিয়ে তালা খুলেই যা দেখলাম, তাইতে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। দেখলাম আমার ঐটো বাসনপত্তর কে যেন মেজে ঝকঝকে করে রেখেছে। এলোমেলো বিছানা পরিপাটি করে মায় আমার রাতের খাবারটি পর্যন্ত তৈরি করে রেখেছে।

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ কোথায় এসে উঠেছি আমি! কাউকে যে ডাকব, ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। গজেনবাবুও সন্দের পর থাকেন না এখানে। কেন যে থাকেন না, তা এবার বুঝতে পারলাম। শুধু বুঝতে পারলাম না ওই মহিলাটি কে? তবে কি—

হতাশভাবে ধপ করে বসে পড়লাম বিছানায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সবে সাড়ে ছ-টা। চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। এ রাতে কোথাই-বা যাব? বসে বসেই মনস্থির করে ফেললাম। আজকের রাত্রিটা যেমন করেই হোক এখানে কাটিয়ে কাল সকাল হলেই পালাব এখান থেকে। কিন্তু সারাটা রাত এখানে যে কী করে কাটাব তা ভেবে পেলাম না।

অনেকক্ষণ বসে থেকে কোনোরকমে রাত ন-টা করলাম। তারপর সঙ্গে আনা প্যাঁড়া চমচমগুলো খেয়ে নিলাম। যে রান্না তৈরি করা ছিল তাতে হাতই দিলাম না।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

এবার জল খেতে হবে। কিন্তু কলসি গড়াতে গিয়েই অবাক। এ কী! জল কই? বাইরে যাবার আগে জলপূর্ণ কলসি যে আমি নিজে হাতে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। আমার সর্বাস্ত তখন নীল হয়ে উঠেছে। তার ওপর ভয়ে এবং প্যাঁড়া চমচম খাওয়ার ফলে তেঁটায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কী আর করি, বাইরে কুয়োতলায় গিয়ে জল আনতে ভয় করছিল যদিও, তবুও যেতেই হবে। যেতে গিয়েই বাধা পেলাম। দরজা খুলতে গিয়ে দেখি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। অনেক টানাটানি করেও সেই বন্ধ দরজা কিছুতেই খুলতে পারলাম না। এমন সময় হঠাৎ দপদপিয়ে হারিকেনটাও নিভে গেল। আমার গা দিয়ে কলকল করে ঘাম বেরোচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমি জোরেই কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম— কে তুমি? কে আমাকে এইভাবে ভয় দেখাচ্ছে? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। তা ছাড়া তুমি আমার অনেক কাজ এমনিই তো করে দিচ্ছ। তবে কেন এমন করছো আমার সঙ্গে? আমায় তুমি রক্ষা করো।

হঠাৎ বাইরে কুয়োতলায় টিপ করে একটা শব্দ হল। নিশ্চয়ই কেউ জল তুলতে এসেছে। অনেকে এই কুয়ো থেকে দিনেরবেলায় জল নিতে আসে দেখেছি। কিন্তু রাতে কেউ আসে কিনা জানি না। কী করেই বা জানব?

সবে তো একটা দিন এসেছি। তাড়াতাড়ি জানলা খুলে কুয়োতলায় তাকাতেই দেখলাম, কুয়োর পাড়ে একটা হারিকেন জ্বলছে। আর তারপরেই যা দেখলাম সে এক বীভৎস ব্যাপার। কুয়োতলায় ভাঙা পায়খানার ধারে বড়ো একটা গাছের ডালে সেই মহিলা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। কী ভয়ংকর সেই দৃশ্য! জিভটা এক হাত বেরিয়ে এসেছে। মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে। আর ঠেলে বেরিয়ে আসা বড়ো বড়ো চোখ দুটো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

পরদিন সকালে যখন চোখ মেললাম তখন দেখলাম ঘর ভরতি লোক। গজেনবাবু আমার মাথার কাছে বসে হাওয়া করছেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। তারপর সব কিছু খুলে বললাম সকলকে।

আমার বৃত্তান্ত শুনে প্রত্যেকেই বকাবকি করলেন গজেনবাবুকে।

আমি তখুনি মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে স্টেশনে চলে এলাম। আবার থাকে এখানে? লোক মুখে শুনলাম, যে মহিলাকে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছি, উনিই গজেনবাবুর স্ত্রী। তাঁর বর্তমানে গজেনবাবু দ্বিতীয় বার বিবাহ করায় ভদ্রমহিলা ওই গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

[চন্দনা (দেব সাহিত্য কুটীর), ১৯৭৮]

হাজারির বউ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঘটনাটি আমার ছোটোবেলার। কিন্তু সেদিন এর রহস্য উদ্ঘাটন করার মতো আমার বুদ্ধি হয়নি। আজ এই ঘটনার কথা মনে করলে এখনও গা শিরশির করে ওঠে।

তখন আমার বয়স কত হবে, পাঁচ কি ছয়। আমরা তখন গোবরডাঙায় আমাদের গ্রামের বাড়িতে থাকতাম।

আমাদের গ্রাম এখন বেশ বড়ো শহর হয়ে গেছে, কিন্তু সে সময় ছিল অজপাড়াগাঁ। চারিদিকে ছিল ঝোপঝাড়, ডোবা আর আমবাগান। আর আমরা যে পাড়ায় থাকতাম সে পাড়ার নাম যুগিপাড়া। পর পর কিছু বাড়ির পরই রেল স্টেশন পর্যন্ত এক মাইল ছিল বনবাদাড়। চারিদিকে আমবাগান থাকায় আমরা জ্যেষ্ঠ মাস হলেই আম কুড়োতে বেরুতাম। সকাল-দুপুর আমবাগানেই পড়ে থাকতাম। আমাদের বাড়ির ঠিক পিছনে ছিল হাজারি বিশ্বাসের বাড়ি। হাজারি বিশ্বাস দিনমজুর খাটত এর-ওর বাড়ি। তার বউ-এর নাম ছিল গুরুদাসী। আমার বাবা-মা তাকে গুরুদাসী বলে ডাকতেন। দেখাদেখি আমিও নাম ধরে ডাকতাম।

হাজারি বিশ্বাস ও গুরুদাসীর একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির বয়স বছর দুয়েক হবে। গুরুদাসী আমাদের বাড়ি আসত ছেলেটিকে নিয়ে। মা খুব ভালোবাসতেন ছেলেটিকে। এটা-ওটা খেতে দিতেন। গুরুদাসী ভীষণ ভালোবাসত ছেলেটিকে। শীতকালে একটু সন্ধ্যা হলেই মাকে বলত আমি বাড়ি চললুম মাসিমা, ছেলের ঠান্ডা লাগবে।

মা বলতেন, তোর বড়ো বাতিক হয়েছে গুরুদাসী। এখন তো চারটেও বাজেনি।

—না, মাসিমা। দেখছেন না, রোদ পড়ে এসেছে। কাল থেকে আবার ছেলের গা গরম হয়েছে।

মা বললেন, কই, গায়ে হাত দিয়ে দেখি। তারপর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, তুই দেখালি বটে গুরুদাসী! গা তো পাথরের মতো ঠান্ডা।

—না, মাসিমা, কাল রাতে গরম হয়েছিল। একটু সর্দিও ছিল আমি তুলসীপাতার রস করে খাইয়েছি।

হাজারি প্রায়ই খেনো মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত আর গুরুদাসীকে ধরে পেঁটাত।

আমরা শুনতে পেতাম। গুরুদাসী চোঁচিয়ে কাঁদছে।

এক-একদিন বাবা গিয়ে বাধা দিতেন। হাজারি, ফের যদি বউ-এর গায়ে হাত তুলবি তাহলে তোর একদিন কী আমার একদিন।

হাজারি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতো দেখুন না, ছোটোবাবু; বাড়ি ফিরলাম, কিছুতেই দরজা খুলে দেবে না। না মারলে কি এরা শায়েস্তা হয়, ওকে মেরে ফেলে জেলে যাব আমি।

বাবা বলতেন, তুই রোজ নেশা করে বাড়ি ফিরবি আর দরজা খুলে দেবে কেন? সারারাত উঠোনে পড়ে থাক, তখন মজা বুঝবি।

গুরুদাসী এসে দুঃখ করত মার কাছে। এই মানুষটাকে নিয়ে কী করি বলুন তো মাসিমা, যা রোজগার করবে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে। ছেলে একটা বিস্কুট খেতে চেয়েছে আজ একমাস হয়ে গেল। তা একদিনও নিয়ে এল না। মা বলতেন, কী আর করবি বল, তোর ভাগ্য। এই নে একটা পয়সা নে। পঞ্চাননের দোকান থেকে বিস্কুট কিনে ছেলেকে দিস।

গুরুদাসী বলত, ছেলেটার চেহারা দিন দিন কীরকম হয়ে যাচ্ছে। ও বোধ হয় বাঁচবে না মাসিমা। ওই ছেলের জন্যেই তো যত ঝগড়া আমার। মা বলতেন, ষাট, ষাট, অমন কথা মুখে আনিস নে গুরুদাসী। বাছার এতে অকল্যাণ হবে। আহা, বেঁচেবর্তে থাক। ওই ছেলেই দেখবি, বড়ো হয়ে তোর দুঃখ দূর করবে। মানুষ হবে।

—হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে। ছোটোলোকের ঘরে কেউ কি মানুষ হয়, মাসিমা?

—ওসব কথা বলিসনি গুরুদাসী। ছোটোলোক আবার কী কথা! মানুষ নিজের কর্মদোষেই তার ফল পায়। হাজারি লেখাপড়া শেখেনি, কুসঙ্গে মিশল, তাতেই তো গোপ্লায় গেল। তোর ছেলেকে যদি লেখাপড়া শেখাস, তাহলে দেখবি সে বড়ো হবে।

সেই গুরুদাসী একদিন তিনদিনের অসুখে পট করে মরে গেল। সান্নিধ্যপাতিক জ্বর হয়েছিল। প্রথম দিন জ্বর অবস্থাতেই সব কাজকর্ম করেছে। দ্বিতীয়দিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। আমাকে নিয়ে মা দেখতে গিয়েছিলেন। হাজারি সকালে কোথায় কাজ করতে বেরিয়েছে। সারাদিন পাত্তা নেই। আমার বাবাও সারাদিন বাড়ি থাকেন না। গ্রামের সুধীর ডাক্তার হাড় কঞ্জুষ। বিনা পয়সায় কোনো রোগী দেখবে না। জ্বরে গুরুদাসীর গা পুড়ে যাচ্ছে। কে ওকে ওষুধ দেয়, কে পথ্য দেয়। ছেলেটা একা একা উঠোনে ধুলো-কাদা মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা বললেন, খোকার বাবা না এলে ডাক্তারকে তো খবর দিতে পারব না। আমি তোর বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছি গুরুদাসী। আর দুধ-সাবু পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গুরুদাসী মার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আমি মরে গেলে আমার ছেলেটার কী গতি হবে মাসিমা?

মা বললেন, আঃ, অত উতলা হচ্ছে কেন? তুই সেরে উঠবি। জ্বর কি কারও হয় না।

বাবা ভট্টাচার্য্য পাড়া থেকে ফণীডাক্তারকে ডেকে আনলেন। ফণীডাক্তার গরিবের মা-বাপ। ডাকলে সবার বাড়ি যান। পয়সার দিকে তাকান না। তিনি এসে বললেন, বড়ো দেরি হয়ে গেছে। কিছু করার নেই। আগে হলে সদর হাসপাতালে পাঠাবার কথা বলতুম।

সেদিন রাতে গুরুদাসী মারা গেল। গুরুদাসীর ছেলের নাম অনিল। তাকে বলা হল মা গঙ্গা নাইতে গেছে। ছোটো ছেলে কী বুঝল কে জানে। দেখতাম গুম হয়ে থাকত। কান্নাকাটি তেমন করত না। হাজারিই রান্না করে ছেলেকে খাইয়ে কাজে যেত দুপুরে আবার ফিরত।

এর মাসখানেক পরে শুনলাম হাজারি আবার বিয়ে করেছে। নতুন বউয়ের নাম শ্যামা। শ্যামার বাপের বাড়ি চারঘাট। তারও বয়স হয়েছে। কেউ কেউ বলল, শ্যামার নাকি আগেও একবার বিয়ে হয়েছিল।

শ্যামা পাড়ার কারও সঙ্গে বেশি মিশত না। আমার মা একদিন যেচে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। শ্যামা তাঁকে বেশি পান্ডা দিল না। তাতে মা অত্যন্ত রেগে গেলেন। শুনলাম বাবাকে বলছেন, ‘বউটা একেবারে মুখপুড়ি।’

বাবা বলছেন, তোমার যাওয়ারই বা দরকার কী?

—আমি যাই ছেলেটার মুখ চেয়ে।

—আহা ছেলেটার কী দুঃখ!

সত্যি ছেলেটার বড়ো দুঃখ! প্রায়ই দেখতাম শ্যামা অতটুকু ছেলেকে লাঠি দিয়ে মারছে। ছেলেটি তারস্বরে চিৎকার করছে।

শেষে মা একদিন গিয়ে বলল, আহা, বাচ্চাটাকে অমন করে মারছ কেন মা? শ্যামা বলে উঠল, মারছি, বেশ করছি। যাকে সামলাতে হয় সেই বোঝে। অমন আলুনি দরদ সবাই দেখাতে পারে।

আগে ছেলেটি আমাদের বাড়ি আসত। শ্যামা তার বেরুনো বন্ধ করে দিল। বাবা একদিন হাজারিকে বলতে গেলেন।

হাজারি বলল, কী করব ছোটোবাবু। ছোটো বউ-এর মুখের ওপর কথা বলতে গেলে আবার আর এক অশান্তি। তার ওপর যখন সব ভার, তখন শাসন করার ভার তুলে না দিয়ে উপায় নেই।

কিছুদিন পরের কথা। জ্যৈষ্ঠ মাসের এক বিকেল। আমি আম কুড়োতে কুড়োতে রেল লাইনের ধারে গলায়-দড়ি বাগানে গিয়েছি। ওখানে কে একবার গলায় দড়ি দিয়েছিল তারপর থেকে নাম হয়ে গেছে ‘গলায়-দড়ি বাগান’। কেউ কোথাও নেই। ঝোঁকের মাথায় এতদূর চলে এসেছি। হঠাৎ দেখি আমার সামনে

একজন মেয়েছেলে আম কুড়োচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখতেই মেয়েছেলেটি আমার দিকে ফিরে তাকাতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম।

তাকিয়ে দেখি মেয়েছেলেটি আর কেউ নয়— গুরুদাসী। আমাকে অবাক হতে দেখে গুরুদাসী বলল, কী কালী, (আমার ডাক নাম) আমায় দেখে অবাক হয়ে গেছ, তাই না?

আমি বললাম, তুমি? তুমি মরে গেছ না?

গুরুদাসী বলল, কে বলল? এই তো আমি তোমার সামনে?

—তাহলে এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

গুরুদাসী বলল, ওখানে আমাকে মারধর করে। আমি তাই চলে এসেছি।

—তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও। তাকে যে তার নতুন মা ভীষণ মারে।

গুরুদাসী ধরা গলায় বলল, আমি সব জানি। কিন্তু আমি ওকে এখন নিয়ে আসব না। মাসিমা বলেছে ও অনেক বড়ো হবে ভদ্রলোক হবে। লেখাপড়া শিখবে।

—তুমি এখানে কী করছ?

—আম কুড়োচ্ছি। এই দুটো আম আমি খোকার জন্য তোমাকে দিলাম। তুমি কিন্তু বোলো না, কে দিয়েছে। শুধু তুমি হাতে করে দিও তাহলেই হবে।

এই বলে গুরুদাসী আম দুটো মাটিতে রেখে দিল। দেখলাম সুন্দর পাকা দুটো আম। কিন্তু আম দুটো আমার হাতে না দিয়ে কেন মাটিতে রেখে দিল তা বুঝলাম না।

আমি আম দুটো হাতে করে নিতে গুরুদাসী আবার বলল, কালী, একটা কথা কাউকে বলবে না বোলো।

আমি বললাম, বলব না।

—আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়েছে কাউকে বলতে পারবে না কিন্তু।

—বেশ বলব না।

আমি বাড়ি ফেরার পথে আম দুটো হাজারির বাড়ি দিয়ে এলাম। হাজারি বাড়ি ছিল।

আমি বললাম, কুড়িয়ে পেয়েছি, খোকাকে দিও।

সে সময় বয়স এত কম সকলের সব কথা বিশ্বাস করতুম। হাজারির বউ যে বলল সে মরেনি, আমি তাই-ই বিশ্বাস করলাম।

দিন দশেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একা একা ঘরে বসে আছি। মা পুকুরে গা ধুতে গেছে।

হঠাৎ দেখি আমার ঘরের দরজায় গুরুদাসী।

আমি বললাম, ওমা, তুমি কখন এলে?

গুরুদাসী বলল, এই মাত্র।

আমি বললাম, তোমার আম খোকাকে তাকে দিবেছিলাম।

আমি ঘুম থেকে উঠে তাকিয়ে দেখি গুরুদাসী।

—এত রাতে? তুমি?

গুরুদাসী বলল, রাত এমন কী। রাত না হলে তোমাদের সঙ্গে চুপিচুপি দেখা করব কী করে?

—আজ আবার কিছু এনেছ নাকি?

গুরুদাসীর মন খুব কোমল। সে বলল, না, ওকে কিছু দেওয়ার মানে হয় না। কোনোটাই ওর কাছে যায় না। আমি ভাবছি, ওকে আমার কাছেই নিয়ে যাব।

—তাই যাও। আমি বললাম। আমি আবার বললাম আমাকে দিয়ে আর কিছু দিতে এসো না। তোমার জন্য আমি মিছিমিছি মার খেলাম।

গুরুদাসী বলল, আহা রে! আমি একদম বুঝতে পারিনি, তোমাকে মাসিমা এর জন্য মারবেন। তুমি তা সত্ত্বেও যে আমার কথা বলে দাওনি, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি মুখ্য মানুষ, ছোটোলোক, তুমি বামুনের ছেলে। তোমাকে আমার আশীর্বাদ করতে নেই। তবে আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো। সেই সুবাদে বলছি তোমার ভালো হবে। তুমি কিছু মনে করো না।

দেখলাম গুরুদাসীর চোখ ছলছল করছে।

আমি তাকে আরও কী কী প্রশ্ন করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম, গুরুদাসী নেই। হঠাৎ কী করে সে এল, কী করে গেল তা বুঝতে পারলাম না।

এর কিছুদিন পরে আমরা বেনারস চলে যাই। বেনারস থেকে ফিরি এক বছর পরে। দেখি আমাদের বাড়ির সামনেটা জঙ্গলে ভরতি হয়ে গেছে। আমাদের পাড়াটারও এই এক বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে মনে হল। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে গেছে। জঙ্গল কেটে অনেক লোক ঘর-বাড়ি তৈরি করে ফেলেছে।

আমাদের বাড়ির পিছনেই হাজারিদের বাড়ি। দেখলাম সেই বাড়িতে অন্য লোক। মা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁগো, তোমরা কারা? হাজারিরা কোথায়? একজন মহিলা এসে উত্তর দিল, আমরা পাকিস্তান থেকে এসেছি। এই বাড়িতে ভাড়া আছি। প্রথমে স্টেশনের কাছে বাগানে ক্যাম্প করে ছিলাম। তারপর এই বাড়িটা ভাড়া পাই। বাড়ির মালিক হাজারির দ্বিতীয় পক্ষের বউ আর তার প্রথম পক্ষের বাচ্চা ছেলে একদিনের কলেরায় মারা যায়। হাজারি বাড়ি ভাড়া দিয়ে বিবাগী হয়ে এদিকে-ওদিক ঘোরে। প্রতি মাসে এসে একসময় ভাড়াটা নিয়ে যায়।

[বলমল, কার্তিক ১৩৮৭ (অক্টোবর ১৯৮০)]

ছবি

শিশিরকুমার মজুমদার

বেশ কিছুদিন অসুখে ভোগার পর ডাক্তারবাবুর পরামর্শে চেঞ্জের যাওয়াই ঠিক করলাম। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় তাই নিয়েই যত ভাবনা। কারণ এর আগে কখনো কলকাতার বাইরে যাইনি।

সব চিন্তার অবসান ঘটাল আমার অনেক দিনের বন্ধু সরল দত্ত। চাকুন্দিয়াতে ওদের একটা বাগান বাড়ি আছে। সে বাড়িটা খালিই পড়ে থাকে বছরের বেশিরভাগ সময়। কালেভদ্রে সরলদের কেউ ওখানে যায়। সব কথা শুনে, ও আমাকে ওখানে যেতেই পরামর্শ দিল।

জিনিসপত্র গুছিয়ে একদিন পা বাড়ালাম চাকুন্দিয়ার পথে। ট্রেন কখন যে চাকুন্দিয়া পৌঁছাবে তা জানা ছিল না। তাই ভাবনার পড়লাম। পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, পৌঁছাবে সন্ধ্যাবেলায়। শুনে বেশ ভাবনায় পড়লাম। অজানা অচেনা পাহাড়ে জায়গা, বেশ একটা ভয়ই হল।

সন্ধ্যাবেলাই চাকুন্দিয়ায় নামলাম। স্টেশন থেকে শহর বেশ দূরে, যেতে হবে টাঙ্গায়, তাই দেরি না করে তারই একটা চড়ে রওনা দিলাম সরলদের বাড়ির দিকে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গভীর জঙ্গলে ঢাকা পাথুরে লাল পথ। সোজা গেছে শহরের দিকে। একনজরেই জায়গাটা আমার ভালো লেগে গেল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনেক কথাই সরলের কাছে শুনেছি। তখন থেকেই মনে মনে চাকুন্দিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছি। এবারে এসে দেখছি সরল মিথ্যা কিছু বলেনি। সত্যিই চাকুন্দিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব।

ছবি আঁকা আমার পেশা। এ ব্যাপারে কলকাতায় একটু নামও হয়েছে। খ্যাত-অখ্যাত অনেকেরই ছবি আঁকায় ডাক আসে আজ-কাল। আঁকিও। তবে প্রকৃতি আর পরিবেশ নিয়ে ছবি আঁকতে যে আনন্দ পাই, তার কাছে আর কোনো ছবিই ছবি না।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছুকাল সবই বন্ধ ছিল। এখন রং তুলি ক্যানভাস সবই সঙ্গে এনেছি। একটু সুস্থ হলে চাকুন্দিয়ার খান কয়েক ল্যান্ডস্কেপ এঁকে নিয়ে যাব বলে।

দত্ত ভিলার গেটের সামনে টাঙ্গা এসে থামল। বোগেনভিলার সাজানো মস্ত গেটের সামনে আলো হাতে মালী দাঁড়িয়ে ছিল। টাঙ্গা থেকে নেমে পরিচয় দিতেই সে বলল, আমারই জন্য অপেক্ষা করছে। খবরটা দেরিতে পাওয়ায় স্টেশনে যেতে পারেনি। আমাকে নমস্কার জানিয়ে ও বলল, ‘তোর কোনো অসুবিধা হবে না সাহেব। আমি টেলি পেয়ে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি।’

মালপত্র সব ও ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখল।

চারদিক খোলামেলা। সব থেকে ভালো ঘরটাই ও আমার জন্য খুলে দিয়েছে। খাটে বিছানাও তৈরি। একটা চেয়ার টেনে বসতেই ও খবর দিল খাবার তৈরি। ক্লান্তিতে আমার শরীর তখন ভেঙে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে সেদিনের মতো বিছানা নিলাম।

পরদিন ভোরে নাম-না-জানা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই নজরে পড়ল দূরের পাহাড়গুলো। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একনজরে চারদিক দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সত্যিই এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার।

দত্ত ভিলার লাগোয়া বাগান! দেশি-বিদেশি জানা-অজানা নানান ফুলের গাছে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। এই সকালেই সেই সব ফুলে প্রজাপতির মেলা। ঠিক করলাম, আশপাশের সব বিউটিস্পটগুলোই ঘুরে দেখব, পারলে তাদের ছবি আঁকব। তবে যতদিন জোর না পাই, দত্ত ভিলার বাগানেই আটকা থাকতে হবে আমাকে।

চা-জলখাবার দিতে এসে মালী বলল, সে আর তার স্ত্রী দু-জনেই থাকে এখানে। বাগানের শেষে তাদের ঘর। সাহেবরা কেউ এলে ওরাই তাঁদের দেখাশুনা করে। আমাকেও কোনোরকম অসুবিধায় পড়তে হবে না। হাট বাজার, রান্না, সব কাজই ওরা করবে। কলকাতার মালিকের কাছ থেকে ওরা তেমন হকুমই পেয়েছে।

চা খাওয়ার পর মালী বলল, চল সাহেব তোকে এখন বাগানটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দি। এমন বাগান, এ তল্লাটে আর নেই।

বেশ কয়েক একর জমি নিয়ে দত্ত ভিলার বাগান। সামনে ফুলের বাগান, পিছনে ফলের। পিছনের বাগানের বিশাল গাছগুলো তাদের ডালপালা ছড়িয়ে জায়গায় জায়গায় আবছায়া শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ইটের কেয়ারির মাঝখানে লাল সুরকির পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে বাগানের মাঝ দিয়ে। দু-পাশে তার চোখ জুড়ানো সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা।

ঝোপে-ঝাড়ে বুলবুলির দল শিস্ দিচ্ছে। দল বেঁধে ছাতারে পাখিরদল ঘাসের উপরে লাফাচ্ছে। পথটা এঁকেবেঁকে একটা ঘন ঝোপের সামনে গিয়ে দু-ভাগ হয়ে এগিয়ে গেছে।

সে ঝোপ পার হয়েই আমি থমকে দাঁড়ালাম। ঝোপটা বেড় দিয়ে দুটো পথই আবার এক হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে এক রেলিং ঘেরা কবরের সামনে। শ্বেত পাথরের কবর। দেখে মনে হল বহু দিনের পুরোনো।

মালী বলল, এটা চৌধুরী মেমসাহেবের কবর। এ বাড়ির মালিক আগে ওরাই ছিলেন। এ বাগান ওদেরই হাতে গড়া।

কবরের রেলিং-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কবরের গায়ে খোদাই করা আছে— অঞ্জলি মেরী চৌধুরী।

জন্ম— ১৮৮৩ খ্রি, মৃত্যু— ১৯০৩ খ্রি।

মালী বলল, চৌধুরী মেমসাহেব মারা যাওয়ার পর শুনেছি, চৌধুরী সাহেবদের আর কেউই এ বাড়িতে আসেনি। মেমসাহেবের ছেলে এই তো ক-বছর আগে এ বাড়ি দত্ত সাহেবের কাছে বেচে দিয়েছেন।

ভারি সুন্দর তো এই জায়গাটা। আমার মুখ থেকে হঠাৎই যেন কথাগুলো বার হয়ে এল।

মালী বলল, দত্ত সাহেব এ বাড়ির অনেক কিছুই ভাঙচুর করেছেন, বদল করেছেন, তবে এতে হাত দেননি। আমিই এর দেখভাল করি। মাঝে মাঝে ফুল চড়াই।

মালীকে ছুটি দিয়ে বহুক্ষণ আমি কবরটার পাশে একা দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনে ফুলের গাছ। দূরে পিছনে পাহাড়ের সারি। মাঝখানে এক শ্বেত পাথরের কবর, এগুলো নিয়ে মনে মনে আমি তখন সুন্দর একটা ছবির কম্পোজিশনের কথাই ভাবছিলাম। বেলা বাড়তে ফিরে এলাম ঘরে। মনে মনে ঠিক করলাম, এখানে আমার প্রথম ছবিখানা হবে ওই কবরকে নিয়েই।

মালীর যত্ন আর তার বউয়ের হাতের রান্না মুরগির ঝোলভাত খেয়ে ক-দিনেই আমার শরীর বেশ ফিরে গেছে।

একদিন রোদ ঝলমল সকালে রং তুলি আর ইজেল নিয়ে আমি গেলাম সেই কবরের ছবি আঁকতে। এর মধ্যে অবশ্য বহুবার ওই জায়গাটা আমি ঘুরে এসেছি। কেন জানি না ওখানে গিয়ে বসে থাকতে আমার বেশ ভালো লাগত। দুপুরে উঁচু গাছের ডালে ঘুঘুর ডাক শুনতে শুনতে আমি আমার ছবির কথা ভাবতাম।

মালী আমার মনের কথা জানতে পেরে হেসেই অস্থির। চার দিকে এত সব জিনিস থাকতে কেন যে আমি ওই কবরের ছবি আঁকব তা ওর মাথায় কিছুতেই ঢুকল না!

আমার মনেরমতো একটা কোণ বেছে নিয়ে আমি ছবি আঁকা শুরু করলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কিছু ভুলে একেবারে ছবির চিন্তায় ডুব দিলাম। খেয়াল হল মালীর ডাকে। তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

কয়েক দিন কাজ করার পর ছবিটা বেশ মনোমতো রূপ পেল। শেষের দিন ছবির সুক্ষ্ম ব্যাপারগুলো নিয়ে এতই তন্ময় হয়ে ছিলাম যে কোনো কিছুতেই আর খেয়াল দিল না। হঠাৎ চমকে উঠলাম, মনে হল কানের কাছে কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন বলল, এ ছবি এঁকে লাভ কি? এ ছবি তো আর অঞ্জলি মেরী চৌধুরীর ছবি নয়।

চমকে উঠলেও বেশ হাসিই পেল আমার। এই কবরের ছবিটা নিয়ে বেশ একটু বাড়াবাড়িই করে বসেছি। এই দীর্ঘশ্বাস, এই না শোনা কথা, সবই তার ফল।

এরপর চাকুন্দিয়ার চারপাশ ঘুরে বেশ ক-টা ছবি আঁকলাম আমি। আর এই ছবি আঁকা নিয়েই আলাপ হল সিবাস্টিন সুরেশ বিশ্বাস মশাইয়ের সঙ্গে।

তাঁর কাছেই শুনলাম, বহু বছর আগে এক বিদেশি পাদরির পরামর্শে বেশ কিছু বাঙালি খ্রিস্টান পরিবার এই চাকুন্দিয়ায় তাঁদের নিজস্ব একটা কলোনি গড়ে তোলেন। এখানে এসে বসবাসও শুরু করেছিলেন তাঁরা। দেখতে দেখতে ছোটোখাটো একটা শহরের মতো হয়ে উঠেছিল জায়গাটা। কিন্তু এখানে রোজগারের কোনো ব্যবস্থা না থাকাতে একে একে সবারই উৎসাহে ভাটা পড়ছিল। তারপর সেই বিদেশি পাদরি মারা যাওয়ার পর কলোনিতে ভাঙন ধরেছিল। এখন এখানে-ওখানে কয়েকটা বাড়িতে কয়েক ঘর খ্রিস্টান পরিবার যদিও কোনোমতে টিকে আছে, কিন্তু বাদবাকি চাকুন্দিয়া আবার যেন জঙ্গলেই ঢাকা পড়ছে।

ওঁর কাছেই শুনলাম, চৌধুরী পরিবারের মিসেস চৌধুরী থাকবেন বলেই বাড়ি করেছিলেন। কিন্তু ক-দিন অসুখে প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মারা যান এখানে। তখন তাঁর ছেলের বয়স মাত্র এক বছর। চৌধুরী সাহেব কোনোদিনও থাকেননি এখানে। তিনি এসে ছেলেকে নিয়ে চিরদিনের মতোই কলকাতায় ফিরে যান। সেই ছেলেই বড়ো হয়ে এ বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে দত্ত সাহেবদের কাছে।

এখানকার কোনো এক পাহাড়ে কী যেন এক খনিজ ধাতুর খোঁজে এসে দত্ত সাহেব প্রথমে ওই বাড়িটা দেখেন। পছন্দ হতেই কেনেন। খনিজ ধাতুর সন্ধান পাননি তিনি। তাই তাঁরও এখানে পাকাপাকি থাকা হয়নি।

বাড়িটাকে উনি রেখেছেন যত্ন করেই। মাঝেমাঝে ক-দিনের জন্য ছুটিতে এসে থাকেনও এখানে।

আমাকে ছবি আঁকতে দেখে বিশ্বাস মশাই বললেন, একটা অনুরোধ করব? যদি কিছু মনে না করেন, আমার বৃদ্ধা মায়ের যদি একটা ছবি এঁকে দেন তো বড়ো উপকার হয়। এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। কিন্তু এই জঙ্গলে আর শিল্পী পাব কোথায় বলুন। আপনি যখন এসেই গেছেন, দয়া করে আমার এ ইচ্ছাটা পূরণ করুন।

আমি ওকে বললাম, ছবি আঁকাই আমার পেশা।
অরাজকতা একক্লান্ত

উনি বললেন, যদিও প্রচুর কিছু আমি দিতে পারব না, তা হলেও সাধ্যমতো আপনাকে কিছু দেব।

আমি রাজি হলাম। ঠিক হল, আকাশের মেঘলা ভাবটা কেটে গেলেই একদিন উনি আমাকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাবেন। সেখানেই আমি ওঁর মায়ের ছবি আঁকব।

সেদিন বিশ্বাস মশাই আমার কাছ থেকে যাওয়ার পরই আকাশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ঘন কালো মেঘে চারদিক ছেয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম, প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছে। আর সে বৃষ্টি সহজে ছাড়বে না।

একটু পরেই মালী লঠন জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, সাহেব, আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নে। যা মনে হচ্ছে ভীষণ ঝড় আসছে। চাকুন্দিয়ার সব ভালো, কিন্তু এখানে একবার ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে তিন-চার দিনের আগে থামতে চায় না। আকাশ দেখে তেমনি হবে মনে হচ্ছে।

চাকুন্দিয়ার সব কিছুই আমাকে মুগ্ধ করেছে। এখন এই ভয়ংকর ঝড়ের কথা শুনেও ভালো লাগল। এ তো এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। হয়তো কোনোদিন রং-তুলিতে ধরতে পারব এ ঝড়কেও। সব থেকে বেশি লাভ হল এই যে এখনি আমাকে বিশ্বাস মশাইয়ের মায়ের ছবি আঁকতে ছুটতে হবে না। কাজটা যদিও করব বলেছি, তবুও মন আমার ওতে তেমন সায় দেয়নি।

সন্ধ্যা হতেই ঝড় এল। তার কিছু পরেই শুরু হল মুঘলধারে বৃষ্টি। বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি এসে বন্ধ জানালার ওপরে আছড়ে পড়তে লাগল। সেইসঙ্গে শুরু হয়ে গেল বাতাসের গোঙানি।

ভেবেছিলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝড়ের দৃশ্য দেখব। কিন্তু ঝড়ের গর্জন ঘরের মধ্যেই মাঝে মাঝে আমাকে চমকে দিতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলাম, মালীর কথাই ঠিক, এই ঝড় বৃষ্টি দু-তিন দিনের আগে থামবে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একটা বই নিয়ে কিছুক্ষণ কাটাবার চেষ্টা করলাম। সাড়ে ন-টা। বাজতেই বিরক্তি লাগতে লাগল। আলোটাকে কমিয়ে বারান্দার একপাশে রেখে আমি শুয়ে পড়লাম। তখনও বাইরে ঝড়ের গর্জন সমানে চলছে। জানালাগুলোয় জলের প্রচণ্ড ঝাপটা লেগে একটানা ছরছর শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল। আধা ঘুম আধা জাগার মধ্যেই বুঝলাম, বাইরে তখনও ঝড়ের প্রলয় চলেছে। পাশ ফিরে শুতে যাব যেই তখনি হঠাৎ কোথায় যেন গোটা দুই বিড়াল বিশ্রীভাবে ঝগড়া শুরু করল। ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে ওদের সেই বেসুরো ওঁয়াও ওঁয়াও চিৎকার চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। কী বিভৎস ওদের চিৎকার! এ কী উপদ্রব শুরু হল আজ। শুয়ে শুয়েই ভাবলাম, এখানে তো কোনো বিড়াল

দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে কি এগুলো জংলি বিড়াল। ঝড়ের দাপটে এসে হাজির হয়েছে লোকালয়ে।

কিছু ভেবে ঠিক করার আগেই আচমকা বিড়ালের ঝগড়া থেমে গেল। মনে মনে খুশি হয়ে আবার পাশ ফিরে শুলাম। তখনি শুনতে পেলাম, কে যেন ঘরের দরজায় আস্তে একটা ধাক্কা দিল। প্রথমে ভেবেছিলাম ও হাওয়ার কাণ্ড, তাই নির্বিকার হয়ে শুয়েই ছিলাম। কিন্তু আবার ঘন ঘন ধাক্কা পড়তে অবাক হলাম, এ তো হাওয়া নয়। এত রাতে কে এল আবার।

উঠে দরজা খুলে দিলাম। আস্তে দরজা ঠেলে তিনি ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে ভীষণ অবাক হলাম। এক বৃদ্ধা, বয়স তাঁর অনেক হয়েছে। মাথা ভারতি সাদা ধবধবে চুল। পরনে তাঁর লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, আমাকে দেখে অবাক হয়েছে মনে হচ্ছে? কিন্তু কী করব বাবা, না এসে আমার আর কোনো উপায় ছিল না। একটা অনুরোধ নিয়ে আমি এসেছি তোমার কাছে। সে অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। বলো রাখবে?

সব কৌতূহল চেপে রেখেই আমি বললাম, কী এমন আপনার অনুরোধ? যার জন্য এমন দুর্যোগের রাতেই আপনার আসার প্রয়োজন হল? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে উনি সামনের চেয়ারটায় বসলেন। আমার দিকে একবার যেন একটু অদ্ভুতভাবেই তাকালেন, বললেন, জানি, এমন অসময়ে এসেছি বলে তোমার মনে হয়তো অনেক কথাই জেগেছে। কিন্তু বাবা বিশ্বাস করো, এমন অসময়ে আসা ছাড়া আমার আর কোনো সময় নেই। ঘরের চারদিক ভালো করে দেখে ফের বললেন, আমার অনুরোধ সামান্যই, তোমাকে আমার একটা ছবি এঁকে দিতে হবে। ছবিটার বড়োই প্রয়োজন বাবা, একজনকে দিতে হবে।

ওর কথা শুনে থমকে গেলাম আমি। মনে মনে ভাবলাম, স্বপ্ন দেখছি। আবছা আলোয় ওঁর উপস্থিতি যেমনই রহস্যময়, তেমনি অদ্ভুত ওঁর অনুরোধ। আমি কি কোনো পাগলের পাল্লায় পড়লাম। নাকি ইনিই সেই বিশ্বাস মশাইয়ের মা। কিন্তু তাঁর এমনভাবে আসার কী প্রয়োজন ছিল। ছবি তো আমি এঁকে দেবই বলেছিলাম। সেকথা কি উনি জানেন না!

কেমন করে যেন বৃদ্ধা আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, বললেন, না বাবা, না, আমি পাগল নই। তোমার কোনো ক্ষতি করতেও আসিনি। বলেছি তো বড়ো নিরুপায় আমি। তাই এখন এমনি করেই এসেছি তোমার কাছে। কিন্তু তুমি আর দেরি করো না বাবা, সময়ের দাম অনেক, নাও, আঁকতে শুরু করো।

ওঁর কথার যে কী উত্তর দেব ভেবেই পেলাম না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

আমাকে পেয়ে বসল। বিশ্বাস মশাইয়ের মায়ের মাথায় যে গোলমাল আছে তাতে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন এর হাত থেকে মুক্তি পাব কেমন করে!

কিছু বলার আগেই উনি হাসলেন। সে হাসি আমার মনে কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিল। উনি বললেন, জানি ছবি আঁকা তোমার পেশা। আমার ছবি এঁকেও তোমার লোকসান হবে না বাবা। আমিও তোমাকে নিশ্চয়ই কিছু দেব এর পর তো তোমার কোনো আপত্তিই থাকা উচিত নয়। নাও কাজ শুরু করো। কথায় কথায় সময় নষ্ট হল অনেক।

আমি মরিয়া হয়ে বললাম, কিন্তু এই আবছা অঙ্ককারে তো ছবি আঁকা যাবে না। আপনি বরং বৃষ্টি থামলে দিনের বেলায় আসবেন। কথা দিচ্ছি, ছবি এঁকে দেব।

আমার কথা শেষ হতেই কেমন যেন ছটফট করে উঠলেন বৃদ্ধা। একটা ভয়ংকর দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু বিরক্তিতেই বললেন, তোমার কোনো বাহানাই আমি শুনব না। ছবি তোমাকে এখনি আঁকতে হবে। বাইরের বারান্দা থেকে লণ্ঠনটা এনে রাখো সামনে। তারপর কাজ শুরু করো।

মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। বেশ বুঝতে পারলাম, ছবি আঁকার একটা অভিনয় না করলে এই বন্ধ পাগলির হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। বাকি রাতটুকু এভাবেই জেগে কাটাতে হবে। যে ভয়ংকর দৃষ্টিতে এইমাত্র উনি আমার দিকে তাকালেন, এর পরেও যদি আপত্তি করি, তবে ফল যে কী হবে তা বেশ বুঝলাম। একবার ভাবলাম, চেষ্টা করে মালীকে ডাকি। দু-জনে মিলে ওঁকে নিশ্চয়ই কাবু করতে পারব। কিন্তু তখনি ওঁর মুখের দিকে নজর পড়তে ভয়ে চমকে উঠলাম। বাপরে, কী ভীষণ দৃষ্টি ওর দু-চোখে! যেন আমার মনের ভিতরেই চলে গেছে সে দৃষ্টি। আমার সব চিন্তাগুলোই তাই ওঁর পড়া হয়ে গেছে।

না আর দেরি করা ঠিক হবে না। একটা-কিছু এখনই শুরু করতে হবে। লণ্ঠনটা বারান্দা থেকে এনে ঘরে রাখলাম। ইজেলটা আলোর পাশে এনে তাতে ক্যানভাস চড়ালাম। কী যে আঁকব জানি না। কিছু-একটা আঁকতেই হবে। নইলে ওর ওই ভয়ংকর দৃষ্টির সামনে আমি বোধ হয় পুড়ে ছাই হয়ে যাব।

খুশি হয়ে উনি বসলেন গুছিয়ে। বললেন, আমি বসছি বাবা, দেখো আঁকতে তোমার কোনো কষ্টই হবে না। আমি বুড়ো হয়েছি, যদি অন্যায় কিছু করেই থাকি, সেকথা ভুলে যেও বাবা। ছবি আঁকা হয়ে গেলে যখন আমার সব কথা জানবে, দেখো তখন আমার উপরে আর তোমার কোনো রাগই থাকবে না।

আমি বললাম, আঁকতে যখন হবেই আমাকে তখন একটু স্থির হয়ে বসুন। দেখি চেষ্টা করে কতটা কী করতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে উনি শান্ত হয়ে বসলেন। একটু হেসে বললেন, আর একটা কথা আছে বাবা, আমার যে ছবিটা তুমি আঁকবে, তা কিন্তু আমার এখনকার ছবি নয়।

অরাজকতা এককুসিভ

চমকে উঠে আমি বললাম, তার মানে?

এই ধরো আমার বয়স যখন বছর উনিশ-কুড়ি ছিল, আমার সে বয়সেরই একখানা ছবি আঁকো বাবা। কেমন যেন কাতরভাবেই বললেন উনি।

এ কী বলছেন আপনি? এ কী করে সম্ভব? আমি ভয় পেয়ে বললাম।

একথা শুনে উনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। কেমন যেন করুণভাবে বললেন, বাবা, তুমি শিল্পী, চেষ্টা করলে এ তুমি নিশ্চয়ই পারবে। আমার সে বয়সেরই একখানা ছবি চাই কি না।

হাতের রং-তুলি যেন হাতেই আটকে গেল। মাথার ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। মনে হল চেষ্টা করে মালীকে ডাক দেওয়াই উচিত। এই বৃদ্ধা পাগলির হাত থেকে নইলে আমার আর কোনোমতেই রক্ষা নেই।

কেমনভাবে যেন উনি বললেন, আরও একটা কথা বাবা, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না কখনো। যেমন করে বসতে বলবে, আমি তেমন করেই বসবো। নাও আর দেরি না করে কাজ আরম্ভ করো। দেখতে দেখতে কাজে মন বসে যাবে তোমার।

আড় চোখে দেখলাম টেবিলে রাখা ঘড়িতে তিনটে বেজে গিয়েছে। ঘণ্টা দুই কোনোমতে ঐঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই ভোর হয়ে যাবে। তখন যাহোক কিছু করা যাবে। এত রাতে এই প্রচণ্ড ঝড় জলের মাঝে তো ঐঁকে আর চলে যেতে বলতে পারি না আমি।

ক্যানভাসের উপরে তুলির টান দিতে শুরু করলাম। ওঁর মুখে ভারি সুন্দর হাসি ফুটে উঠল। সেই প্রথম আমার মনে হল ভারি আভিজাত্যপূর্ণ সুন্দর চেহারা ওঁর। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে অপূর্ব সুন্দরীই ছিলেন উনি। সে চেহারার ছবি আঁকতে যেকোনো আর্টিস্টই আগ্রহ দেখাত। মনে মনে ভাবলাম, ওঁর বর্তমানের চেহারা দেখে আমি কি ওঁর সেই অতীত সৌন্দর্যের কল্পনা করতে পারব না? ক্ষতি কী যদি কল্পনায় সেই চেহারার ছবিই আঁকতে চেষ্টা করি। অন্তত সে চেষ্টায় এই বিরক্তিকর পরিস্থিতির কথা ভুলে থাকতে পারব।

বার বার ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখে মন দিয়েই ছবি আঁকা শুরু করলাম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মনে হল সত্যিই তো এ ছবি আঁকতে আমার ভালোই লাগছে। শুধু তাই নয়, আমার তুলির প্রতিটি টানেই যেন খুব তাড়াতাড়ি এক অপূর্ব সুন্দরীর রূপ ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে ক্যানভাসে। এ ছবি নিশ্চয়ই আমি ঐঁকে শেষ করতে পারব। আর সে ছবি হবে বৃদ্ধার উনিশ-কুড়ি বছর বয়সেরই ছবি।

বাইরে এখনও ঝড়ের গোঙানি সমানে চলেছে। চলুক, আঁকতে আর আমার খারাপ লাগছিল না।

হঠাৎ ঝড় থেমে গেল। উনি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কেন যেন মুখ ফিরিয়ে নিলেন আমার দিক থেকে। আমি এগিয়ে গিয়ে আস্তে ওঁর মুখখানা

ফিরিয়ে দিলাম আমার দিকে। মুহূর্তের স্পর্শে মনে হল আঙুলগুলো যেন বরফের মতো জমে গিয়েছে! কী ঠান্ডা ওর দেহ!

আমার দিকে তাকালেন উনি। আতঙ্কে ক-পা পিছিয়ে গেলাম আমি। এ কী অসম্ভব দৃষ্টি ওঁর চোখে। কে উনি! কী সর্বনাশ করতে চান উনি আমার!

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন বৃদ্ধা, বললেন, আর এক দণ্ডও আমার থাকা চলবে না।

আঁচলের গিট খুলে কী যেন সব উনি নামিয়ে রাখলেন সামনের টেবিলে। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, চমৎকার ঐকেছ ছবিটা! ঠিক অমনিই দেখতে ছিলাম আমি। যেটুকু কাজ বাকি রইল, মন থেকেই শেষ করে ফেলো বাবা।

আর দাঁড়ালেন না উনি। বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। দরজার বাইরে যেতেই প্রচণ্ড শব্দে ইজেল থেকে ছবিটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। সব শক্তি হারিয়ে আমি থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখুনি বাইরে কোথাও বিকট সুরে ওঁয়াও ওঁয়াও করে বিড়ালগুলো আবার চোঁচাল কিছুক্ষণ।

মালীর চিৎকারে হুঁশ এল। আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল ও। — এ কি সাহেব, তুই ঘুমাসনি। কিছু হয়নি তো তোর? ছবিটা তুলে ও আবার ইজলে লাগিয়ে দিল। বলল, বাজ পড়ল বাইরে, তাই দেখতে এলাম তুই কেমন আছিস। কী হয়েছে তোর? অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

চূড়ান্ত ক্লান্তিতে আমার দেহ মন যেন ভেঙে পড়তে লাগল। কোনোমতে মালীকে বিদায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন বেলায় ছবিটা দেখে চমকে উঠলেন বিশ্বাস মশাই। বললেন এ ছবি আপনি আঁকলেন কেমন করে? এ তো মিসেস চৌধুরীর ছবি। নিজের রূপ সম্বন্ধে বড়ো অহংকার ছিল ওর মনে। স্বামীর সঙ্গে তাই খুব বেশি বনিবনা ছিল না। সামান্য ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেকে আর তার পোষা বিড়াল নিয়ে চলে আসেন এখানে। হয়তো বিচ্ছেদই হয়ে যেত ওদের মধ্যে। একমাত্র ছেলের জন্য তা হতে পারেনি। তবে শুনেছি, মিস্টার চৌধুরী নাকি রাগে তাঁর স্ত্রীর সব স্মৃতিচিহ্নগুলোই সরিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর ছেলের সামনে থেকে। এমনকী সব ছবিগুলোও নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এত কথা আপনি ওদের সম্বন্ধে জানলেন কী করে?

মিসেস চৌধুরীকে এখানে দেখাশোনা তো আমিই করতাম। বললেন বিশ্বাস মশাই, মিসেস চৌধুরী মারা যাওয়ার এক যুগ পর তো এ বাড়ি বিক্রি হয় দত্ত সাহেবের কাছে। বিক্রির আগে এসেছিলেন মিসেস চৌধুরীর সেই ছেলে—মাইকেল। এখানকার জিনিসপত্রের একটা ব্যবস্থা করতে। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার মার কোনো ছবি আছে কিনা আমার কাছে। মা যখন ওর

মারা যায়, তখন ওর বয়স যে মাত্র এক বছর। আমার সঙ্গে শেষবারের মতো ওর মার সমাধিতে ফুল দিতে গিয়ে ও বলেছিল, তোমাকে না দেখার দুঃখ আমি কোনোদিনও ভুলতে পারব না মা। মৃত্যুর পর যদি আত্মা বলে কিছু থাকে তবে আমাকে একবার দেখা দিও। না দেখা দিলে তোমার মুক্তি নেই মা।

আমি শিউরে উঠে বললাম, সে কী, এ তো একরকম অভিশাপ দেওয়া! একথা বলতে পেরেছিল মাইকেল।

যাক, এ ছবিই মাইকেলের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবে তার মাকে। বিশ্বাস মশাই শান্ত গলায় বললেন।

মালী তখনি এসে বলল, সাহেব রাতে বাজ পড়ে চৌধুরী মেমসাহেবের কবরটা ফেটে গিয়েছে।

বিশ্বাস মশাই একথা শুনে ওর বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন।

আমার নজর গেল টেবিলের দিকে। অবাক হয়ে দেখলাম, সেখানে ভিক্টোরিয়ার আমলের এক মুঠো টাকার নীচে একটা কাগজ চাপা রয়েছে। সেটা নিয়ে বিশ্বাস মশাইকে দিতেই উনি পড়লেন, লেখা আছে— একজনের অন্ধ স্নেহ আমাকে এক যুগ অন্ধ করে মাটির নীচে বন্দি করে রেখেছিল। তুমি আমাকে মুক্তি দিলে। তোমার মঙ্গল হোক। সেই স্নেহঅন্ধ মানুষটিরও সময় ফুরিয়ে এসেছে। দোহাই তার মনের কামনা এখুনি পূরণ করো। নইলে হয়তো আমাকে আবার ওই ভয়ংকর অন্ধকারে চিরকালের মতো বন্দি হতে হবে।

ঘন ঘন নিজের বুকের ওপর ক্রুশ আঁকতে আঁকতে বিশ্বাস মশাই বললেন, এ ছবি এখুনি মাইকেলকে পাঠাতে হবে। তাকে চিঠি দিয়ে দেব, হঠাৎই এটা খুঁজে পেয়েছি বলে। কে জানে কী অবস্থা তার। তারও তো বয়স নেহাত কম হল না।

[ভূত কুটুমের গল্প, উদয় প্রকাশন, ১৯৮২ (প্রথম প্রকাশকাল অজ্ঞাত)]

উত্তর সিকিমের ভূত বাংলা

সমরেশ বসু

এবার আমি তোমাদের গোগোলের গল্প শোনাতে পারলাম না। তাই ঠিক করেছি, এ বছরে, আমার নিজে চোখে দেখা একটা ভূতুড়ে ঘটনার কথা তোমাদের শোনাব। ভূতুড়ে ঘটনাটা সত্যি ভূতের কাণ্ডকারখানা কিনা, সেটা তোমরাই বিচার করবে।

প্রায় চৌদ্দো বছর আগে আমি প্রথম সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে বেড়াতে গিয়েছিলুম। কোথায় কোন হোটেলে উঠব, সেসব আগের থেকেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু সেখানে কারোকেই চিনি নে। আমি একলা মানুষ। গল্প করার কথাবার্তা বলার লোক নেই। একমাত্র হোটেলের মালিক আর তার মেয়ে বউ ছাড়া। হোটেলের মালিক ছিল একজন বাস্তুহারা তিব্বতী। চীনারা যখন তিব্বত দখল করে নিয়েছিল, তখন দলাই লামার সঙ্গে হাজার হাজার তিব্বতী ভারতবর্ষে চলে আসে, আর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখনও সেই সব তিব্বতীরা আমাদের দেশেই থেকে গিয়েছে।

গ্যাংটক শহরের সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য হল, প্রায় দু-কিলোমিটার জায়গা অনেকটাই সমতল। শহরের বাজার, দোকানপাট, হোটেল রেস্টুরেন্ট, সবই সেই সমতল রাস্তার দু-ধারে। আর এই রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে, নীল আকাশের গায়ে সবসময়েই দেখতে পেতাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার বেশ বড়ো একটা অংশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার রংও বদলাতে থাকত। সেই দিকে তাকালে, বাকিটা সবই নীচের পাহাড়ি অঞ্চল, গাছপালায় নিবিড় সবুজ আর নীল দেখাত। আবার অন্য দিকে পাইন দেবদারু নানা গাছের ফাঁকে ফাঁকে, পুলিশের ব্যারাক, সরকারি অফিসগুলো দেখা যেত। সমতল পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই চলে যেতাম, এককালের রাজা ছগিয়ালের প্রাসাদের দিকে। সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে দেখতাম, তিব্বতী লামা ও ভক্তরা গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। আর একটি অনির্বাণ প্রদীপ সবসময়েই জ্বলছে। অনির্বাণ প্রদীপ মানে হল, যে-প্রদীপ একবার জ্বালালে আর কখনো নিভবে না। তিব্বতী বৌদ্ধদের কাছে এ অনির্বাণ প্রদীপ খুবই পূণ্যের জিনিস।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

দু-দিন বাদেই এক বাঙালি ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা। জিজ্ঞেস করলুম, ‘কী করে জানলেন আমি এখানে এসেছি?’

সাংবাদিক ভদ্রলোক হেসে বললেন, ‘আমাদের কাছে কোনো সংবাদই চাপা থাকে না। কলকাতার এক খবরের কাগজের সাংবাদিক বন্ধু আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, আপনি গ্যাংটক বেড়াতে এসেছেন। খবর পেয়েই হোটেলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানলুম, আপনি এই হোটেলে উঠেছেন। তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম।’

আমিও ভদ্রলোককে পেয়ে খুশি হলুম। তিনি ওঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের একটি চার পাঁচ বছরের মেয়ে ছিল। হাসিখুশি মেয়েটির সঙ্গেও আমার খুব ভাব জমে গিয়েছিল। সে আমাকে গ্যাংটকের অনেক গল্প শোনাত। সাংবাদিক ভদ্রলোক গ্যাংটকের যা-কিছু দেখবার, সবই আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, মিলিটারি ক্যাপ্টেন টি. কে. বাসুর সঙ্গে। টি. কে. বাসু অর্থাৎ তাপসকুমার বাসু।

গ্যাংটকের মতো জায়গায়, একজন বাঙালি মিলিটারি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। ক্যাপ্টেন বাসু একদিনের আলাপেই আমার এমন বন্ধু হয়ে গেলেন, পরের দিনই তিনি আমাকে তাঁদের মিলিটারি মেসে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, ‘আপনি হোটেলেই তৈরি হয়ে বসে থাকবেন। আমি নিজে না আসতে পারলে, গাড়ি পাঠিয়ে দেব। মিলিটারি ড্রাইভার আপনার খোঁজ করে আপনাকে নিয়ে যাবে।’

গ্যাংটকের মতো জায়গায়, এরকম একজন ক্যাপ্টেনকে পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হল। পরের দিন একজন মিলিটারি পোশাক পরা সর্দারজী অর্থাৎ শিখ ড্রাইভার বেলা এগারটায় হোটেলে এলেন। আমি হোটেলের নীচের তলায় রেস্টুরেন্টে বসেছিলুম। ড্রাইভার সর্দারজী হোটেলের মালিককে আমার নাম বলতেই, তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। সর্দারজী আমাকে একটি ছোটো চিরকুট দিলেন। তাতে লেখা ছিল, ‘দাদা, ড্রাইভার যশোবন্ত সিং আপনাকে নিয়ে আসবে। আপনি এর সঙ্গে চলে আসবেন। ইতি, তাপস।’

আমি যশোবন্ত সিংয়ের সঙ্গে একটা জিপে চেপে বেরিয়ে পড়লুম। সমতল পাহাড়ি পথে গিয়ে, মিলিটারি মেসে যেতে আমার রীতিমতো ভয় হয়েছিল। মেসটা ছিল একটা পাহাড়ের মাথায়। রাস্তাটা এমন উঁচু আর খাড়া, একটু এদিক-ওদিক হলেই একেবারে সোজা যমালয়ে চলে যেতে হবে।

যাই হোক, মেসে পৌঁছোলুম। সামনে লন। একটা গাড়ির পক্ষে পুরোপুরি পাক খাবার মতো জায়গাও নেই। মেস রুমটা বেশ বড়ো। ক্যাপ্টেন টি. কে. বাসু

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ছাড়াও আরও বেশ কিছু ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা ছিলেন। ভদ্রলোকেরা সকলেই নানা স্তরের অফিসার। এবং যিনি মিলিটারি ডাক্তার ছিলেন, তিনি একজন ওড়িয়া। ক্যাপ্টেন বাসু ছাড়া আর কোনো বাঙালি না থাকলেও, সকলের সঙ্গেই আমার খুব ভাব হয়ে গেল।

অনেকরকম রান্না হয়েছিল। সবই দেশীয় রান্না। মাংসের বিরিয়ানি, কাবাবের কোনো তুলনা ছিল না। খাওয়া-দাওয়া মিটতেই প্রায় বেলা তিনটে বেজে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন বাসুই ছিলেন মেসের ইনচার্জ। আর মেসের গায়েই ছিল তাঁর ছোটো দুই কুঠরির থাকবার ঘর। সেখানে বিশ্রাম নেবার সময়েই ক্যাপ্টেন বাসু আমাকে বললেন, ‘উত্তর সিকিম হল মিলিটারির হাতে। সেখানে সাধারণ মানুষ, এখান থেকে যেতে পারে না। বিশেষ অনুমতি লাগে। আর উত্তর সিকিমে যারা বাস করে, তারাও কেউ এদিকে আসতে পারে না। এই সীমান্ত অঞ্চলে, সামরিক কড়াকড়ি খুব বেশি। তবে আপনি যদি উত্তর সিকিমে বেড়াতে যেতে চান, আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের সঙ্গে গেলে আপনার কোনো অনুমতির দরকার হবে না।’

আমি তো শুনে খুবই খুশি। তখনই রাজি হয়ে গেলুম।

দু-দিন পরেই, সকালবেলা একটা জোংগা জিপে চেপে আমরা উত্তর সিকিমের পথে রওনা হলুম। জোংগা জিপ এমন গাড়ি, যা খাড়া পাহাড়ি পথে চলতে পারে। ক্যাপ্টেন বাসু ছাড়া, আমি, আর ডাক্তার মেজর মোহান্তি, এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন। গাড়ির চালক ছিলেন সেই যশোবন্ত সিং।

উত্তর সিকিমের পথটা গিয়েছে তিস্তার উৎসের দিকে। অর্থাৎ তিস্তা যেখান থেকে, বরফ গলে, পাহাড় থেকে নেমে, শিলিগুড়ির পাশ দিয়ে সমতলে নেমেছে। আমরা সেই ওপরে উঠছিলুম। আর আস্তে আস্তে পাহাড় পর্বতের দৃশ্যও বদলে যাচ্ছিল। খুব সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে, খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমাদের জিপ চলছিল। আর তিস্তাকে একটা সরু নীল ফিতের মতো অনেক নীচে দেখা যাচ্ছিল। গাছপালা কমতে কমতে, আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম বরফের রাজত্বে। চারদিকের পাহাড়ই অধিকাংশ বরফে ঢাকা।

রাত্রে আমরা যেখানে থাকব, সেখানে রান্নার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু দুপুরের খাবার সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, একটা বাংলোয় আমরা দুপুরের খাবার খাব। সেখানেই একটু বিশ্রাম করব। বাংলোটা মিলিটারির অধীনেই ছিল। কিন্তু ডাক্তার মেজর মোহান্তির স্ত্রী মিসেস মোহান্তি ভয় পেয়ে বললেন, ‘আমি শুনেছি, ওটা ভূত বাংলো। আমি ওখানে ঢুকব না।’

মিসেস মোহান্তির কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। ক্যাপ্টেন বাসু বললেন, ‘দিনেরবেলা সেখানে আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া, বাংলোটা মিলিটারি পাহারা দেয়। বাইরের ঘরে অফিসাররা মাঝে মাঝে অফিসের কাজ নিয়েও বসেন। দুটি খুব ভালো শোবার ঘর আর বাথরুম আছে। আমরা আছি, আপনার কোনো ভয় নেই।’

প্রায় বেলা একটার সময় আমরা সেই বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকেই বরফে আবৃত পাহাড়। উত্তরে, আকাশের গায়ে তুষার ঢাকা পর্বত ছাড়া কিছু নেই। কোথাও কোনো শব্দ নেই। এমনকী একটা পাখির ডাকও শোনা যায় না। বাংলোর গেটেই দেখা গেল, বন্দুক হাতে একজন সিকিমি সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। আমাদের আসার সংবাদ নাকি আগেই দেওয়া হয়েছিল। সিকিমি সৈনিক মিলিটারি কায়দায় সেলাম ঠুকে, বাংলোর দরজার তালা খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকলুম।

বাংলোর বাইরের ঘরটা বেশ বড়ো। সোফা-সেট ছাড়াও রয়েছে মস্তবড়ো একটা টেবিল। অনেকগুলো চেয়ার। টেবিলের ওপর রাখা জলভরা কাচের জাগ। অনেক প্লেট থাকে থাকে সাজানো। আর ডজন খানেক জলের গেলাস।

আমি বাংলোর ভিতরের অন্যান্য ঘরগুলো দেখে এলুম। সত্যি বেশ সুন্দর সাজানো ঘর। খাটের বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার মোহান্তি নিজেই মিসেস মোহান্তিকে নিয়ে একটি শোবার ঘরে ঢুকলেন। ক্যাপ্টেন বাসু ড্রাইভাররের সাহায্যে গাড়ি থেকে খাবার নামিয়ে টেবিলের ওপর সাজালেন। ডাক্তার মোহান্তি বাইরের ঘরে এসে বললেন, ‘আমার স্ত্রীর ভয় কেটে গেছে। উনি বাথরুমে গেছেন। এখন বেশ খুশি।’

আমার খুব শীত করছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে একটা শোবার ঘরে গিয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম। এই সময়ে হঠাৎ মিসেস মোহান্তির একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল। তিনি ছুটতে ছুটতে বাইরের ঘরে এলেন। দেখলাম, তাঁর দু-চোখ ভয়ে ও আতঙ্কে বিস্তারিত। মুখে বোধ হয় জল দিয়েছিলেন। মুখটা ভেজা। আমরা সবাই তাঁকে একটা সোফায় বসিয়ে দিলুম। তিনি প্রথমে কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। তারপরে কোনোরকমে যা বললেন, তা হল, বাথরুমের জানলাটা নাকি হঠাৎ যেন বাতাসের ঝাপটায় খুলে যায়। জানলায় কোনো গরাদ ছিল না। জানলায় দেখা যায় বিকট দর্শন একটা মুখ। মাথায় লম্বা লম্বা চুলে বেগি পাকানো, অথচ মুখে ঝুলের মতো গোঁফ দাড়ি। সে হাসছিল না কী করছিল বোঝা যায়নি। কেবল তার মস্ত লাল জিভ আর বোগড়া বোগড়া বড়ো দাঁত দেখা গিয়েছিল। সে অদ্ভুত শব্দ করে, মিসেস মোহান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তখনই তিনি কোনোক্রমে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসেন।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

সব শুনে ক্যাপ্টেন বাসু তৎক্ষণাৎ সিকিমি সৈনিকটিকে নিয়ে বাইরে ছুটে গেলেন। ডাক্তার মিসেস মোহান্তির পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন। আমি মনে মনে অবাক হচ্ছিলুম। আশেপাশে কোনো মানুষের বসতি নেই। ওরকম অদ্ভুত মূর্তি এই বরফে ঢাকা পাহাড়ে কোথা থেকে এল?

মিসেস মোহান্তি আবার বললেন, ‘ক্যাপ্টেন বাসু আমার সব কথা না শুনেই চলে গেলেন। সেই মূর্তি দেখে, আমি যখন ছিটকিনিটা খোলবার চেষ্টা করছি, তখন হঠাৎ মূর্তিটার চেহারা বদলে গেল। দেখলাম, একটা মাথায় এলানো চুল পাহাড়ি মেয়ে খিলখিল করে হাসছে। তার গলায় অনেক রঙের পাথরের মালা। সে তার এমন লম্বা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, ছিটকিনি না খুলতে পারলে সে আমাকে নির্ধাত ধরে ফেলত। তোমরা কি সেই বিকট হাসি শুনতে পাওনি?’

ডাক্তার মোহান্তি মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমি কিছুই শুনতে পাইনি।’

মিসেস মোহান্তি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বললুম, ‘না, আমিও কিছু শুনতে পাইনি।’

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ক্যাপ্টেন বাসু ফিরে এসে জানালেন, কোথাও কিছু দেখতে পাননি। কাছে-পিঠের মধ্যে বাংলোর পিছনে, পাহাড়ের ওপরে একটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। সেখানে একটি আলাদা কাঠের বাড়িতে একটি তিব্বতী পরিবার রয়েছে। সেখানে ওরকম কোনো মানুষের মূর্তি দেখা যায়নি, তা ছাড়া, ক্যাপ্টেন বাসু সিকিমি সৈনিকটিকে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি গিয়েছিলেন, কেউ পালাতে গেলে তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন। তা ছাড়া সিকিমি সৈনিকটি বলল, পিছনের পাহাড়ে তিব্বতী পরিবারটি খুবই ভালো। তারা এই পাহাড়ে খুব কষ্ট করে কিছু ফসল করে, আর তা খেয়েই, বুদ্ধের সেবা করে বেঁচে আছে।

যাই হোক, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। খিদেও পেয়েছিল সকলেরই। বাইরের ঘরের বড়ো টেবিল ঘিরে আমরা সবাই খেতে বসে গেলাম। বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে বাইরে, ওপারের পাহাড়ে বরফের ওপর রোদের ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছিল। পরোটা, আলুর দম, শুকনো করে রান্না মাংস আর মিষ্টি ছিল দুপুরের খাবার। আর বড়ো ফ্লাস্কে ছিল গরম কফি।

ক্যাপ্টেন বাসুকে বলে আমি ভিতরে একটি শোবার ঘরে গেলুম। জোংগা জিপে অনেকটা পথ এসে, আর পেট ভরে খেয়ে, আমার যেন শীতটা আরও বেশি লাগল। কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমের দরকার ছিল না। ঘুম আসছিলও না। আমি একটু আরাম করতেই চাইছিলুম। শুয়ে শুয়ে মিসেস মোহান্তির দেখা ঘটনার কথা ভাবছিলুম।

ভাবতে ভাবতেই আমার যেন একটু তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল। শুনতে পেলুম, ঘরের মধ্যে যেন কেউ পাথরটারি ঝরছে। তারই তালে তালে ঠুং ঠুং শব্দ

হচ্ছে। আর আমার নাকে আসছে একটা মিষ্টি সুগন্ধ। আমার তন্দ্রা কেটে গেল। চোখ মেলে তাকালুম। দেখলুম, একটি অদ্ভুত দেখতে মেয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। কিন্তু বাথরুমের দরজাটা খোলাই রইল।

দরজাটা কি খোলাই ছিল? মনে করতে পারলুম না। হয়তো স্বপ্নই দেখছিলুম তন্দ্রার ঘোরে। কোনোরকমে কন্বলের ঢাকা খুলে, খাট থেকে নেমে, বাথরুমের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলুম। দিয়েই আবার গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এর পরেও আমাদের অনেকটা পথ যেতে রাত্রি হয়ে যাবে। এসব পাহাড়ি পথে রাত্রে চলাটা নিরাপদ নয়। কোথায় যে রাস্তায় ধস নেমে আছে, কেউ বলতে পারে না। আর আমরা এমন একটা সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে চলেছি, যেকোনো সময়েই বিদেশি সৈনিকের গুলি ছুটে আসতে পারে।

আবার বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রা এসেছিল। শুনতে পেলুম, ঘরের মেঝেয় কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলুম, গলা থেকে হাঁটু অবধি লাল পোশাক পরা একটি লোক ঘরের একটা জানলার কাছ থেকে দরজা অবধি হেঁটে বেড়াচ্ছে। পায়ে মোজা আর জুতো। মাথায় টুপি পরা থাকলেও, লম্বা চুল বেরিয়ে পড়েছে। আর তার ফর্সা মুখে গোঁফ দাড়িও রয়েছে। আশ্চর্য! এ কোথা থেকে এল? আমি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলুম, ‘কে আপনি? এ ঘরে এলেন কেমন করে?’

লোকটি আমার দিকে একবার তাকাল। তারপর বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিল। আশ্চর্য! সত্যিই ভূত বাংলো নাকি? আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। পায়ে জুতো গলিয়ে, বাথরুমের দরজা খুললুম। কেউ কোথাও নেই! কেবল বড়ো জানলার কাচের পাল্লা দুটো খোলা। জানলার বাইরে জংলি ঝোপঝাড়। আমি এগিয়ে গিয়ে জানলায় উঁকি দিতে গেলুম। তৎক্ষণাৎ দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে পাল্লা ধরে টানলুম। কিন্তু দরজাটা বাইরে থেকে কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি চিৎকার করে ডাকলুম, ‘ক্যাপ্টেন বাসু, দরজাটা খুলে দিন!’

তখনই জানলার কাছে খিলখিল হাসি শুনতে পেলুম। ফিরে তাকিয়ে দেখি, চুল এলো করা একটা পাহাড়ি মেয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে। মুখটা তার মোটেই খারাপ নয়। গলা থেকে তার বুক অবধি নানা রঙের পাথরের মালায় ঢাকা। তাকে আমার পাগলি ছাড়া কিছুই মনে হল না। আমি তার দিকে তেড়ে গেলুম। সে ভয় না পেয়ে তার একটা হাত ভিতরে বাড়িয়ে দিল। আমি সে হাতটা ধরতে গেলুম। অমনি সে হাতটা সরিয়ে নিল। আমি ওর এলো চুল ধরবার জন্য হাত বাড়ালুম। সে পেছিয়ে গেল, আর খিলখিল করে হাসতে লাগল।

আমি এমনই ক্ষেপে গেলুম, বড়ো জানলাটায় উঠে বাইরে লাফ দিয়ে পড়লুম। মেয়েটি বোধ হয় ভাবতে পারেনি, আমি এমন একটা কাণ্ড করতে পারি। সে দৌড় দিল। আমিও তার পিছনে পিছনে ছুটলুম। কিন্তু জংলি ঝোপঝাড়ের মধ্যে সে যে কোথায়, দেখতে পেলুম না। অথচ তার হাসি শুনতে পেলুম। হাসির শব্দ লক্ষ করে আমিও জংলি ঝোপে ঢুকে পড়লুম। এ নিশ্চয়ই কোনো মতলববাজ মানুষদের ব্যাপার। হাসির শব্দ লক্ষ করে ছুটতে ছুটতে, হঠাৎ একসময়ে আমি বাংলোর সামনে পাহাড়ের খাদের ধারের রাস্তায় এসে পড়লুম। তখন আর হাসি শোনা যাচ্ছে না। জংলি ঝোপও নেই।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আর একটু হলে আমি হাজার হাজার ফুট নীচে পড়ে যেতুম। উত্তরের আকাশে তুষারাবৃত পর্বতের গায়ে রোদে নানা রং খেলছে। আমি বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম সিকিমি সৈনিকটি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকে দেখলুম, ডাক্তার মেজর মোহান্তি আর ক্যাপ্টেন বাসু দুটো ছোটো সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজে আছেন। মিসেস মোহান্তি বড়ো সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দে ক্যাপ্টেন বাসু চোখ মেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, এর মধ্যে আবার বাইরে গেলেন কখন?’

বললুম, ‘ঘর থেকে এসে বলছি।’

আমি যে-ঘরে শুয়েছিলুম, সে-ঘরে ঢুকে বাথরুমের দরজাটা দেখলুম। অবাক কাণ্ড! সত্যি বাইরে থেকে বাথরুমের দরজাটার ছিটকিনি বন্ধ। কে বন্ধ করতে পারে?

আমি শোবার ঘর থেকে বাইরের ঘরে এলুম। ক্যাপ্টেন বাসুকে ইশারায় ডেকে ঘরের বাইরে গিয়ে সব কথা বললুম। তিনি শুনে খুব অবাক হয়ে বললেন, ‘আমরা কেউ আপনার শোবার ঘরে ঢুকিনি। কোনো মেয়ের হাসিও শুনতে পাইনি।’

আমরা দু-জনেই দু-জনের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলুম।

এ ভূতুড়ে ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যাই আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। আমার ধারণা, ওখানে এমন কিছু লোক হয় তো আছে, যারা চায় না, বাংলায় এসে কেউ থাকুক। ওখান থেকে চলে আসবার সময় সিকিমি সৈনিকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে কখনো কিছু দেখেছে কিনা। সে পরিষ্কার বলল, ‘না, সে রকম কিছু দেখলেই আমি গুলি চালিয়ে দিতুম।’

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার কাছে বন্দুক বা রিভলবার কিছুই ছিল না। কিন্তু ক্যাপ্টেন বাসু আর ডাক্তার মেজর মোহান্তির কাছে রিভলবার ছিল, সেইজন্যই কি ভূতেরা তাঁদের দেখা দেয়নি? কে জানে।...

গুপ্তধনের চাবি

কমল লাহিড়ী

চিঠিটা হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল অরিন্দম। আজ সারাদিন পরিশ্রমও হয়েছে। তারপর পরিতোষ বলেছিল, ওর সেজদির বাড়িতে নিয়ে যাবে। কিন্তু অফিস থেকে মেসে ফিরে পিসিমার এই চিঠিটাই সব গোলমাল করে দিল।

কিছুই ভালো লাগছে না। ‘চা-টাও ঠান্ডা হয়ে গেল। মেসের ঠাকুর চা দিতে এসে চিঠিটা দিয়েছে। পরিতোষটাও এখনও ফিরল না। একটু যে পরামর্শ করবে তার উপায় নেই।

নীল রঙের ইনল্যান্ডখানা আবার খুলে পড়তে লাগল অরিন্দম। প্রিয়নগর থেকে পিসিমাই লিখেছেন:

পরম কল্যাণবর,

বাবা অমু, এর আগের চিঠিতেও তোমাকে একবার তাড়াতাড়ি আসিতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ছুটি না পাওয়ায় তুমি আসিতে পারো নাই। সব কথা খোলাখুলি লিখিতেও পারি না। তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া বিশেষ দরকার। আমার মন ভালো না। যত সত্ত্বর পারো একবার আসিও। খুবই বিপদে পড়িয়াছি। আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি— পিসিমা

চিন্তার রেখা ফুটে উঠল অরিন্দমের চোখে-মুখে। একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। এই তো দু-মাস আগেই পিসিমার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। নতুন চাকরি। কথায় কথায় তো ছুটি পাওয়া যায় না। হঠাৎ যে পিসিমার কী এমন দরকার পড়ল!

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই একমাসের ব্যবধানে, বাবা-মা দু-জনকে হারিয়ে অরিন্দম নিঃসন্তান পিসিমার কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। পিসেমশাইও খুব ভালোবাসতেন। প্রিয়নগর গ্রাম হলেও, শহরতলির অনেক সুবিধে ছিল। কলকাতার এক বেসরকারি ফার্মে চাকরি করতেন পিসেমশাই। ভালোই কাটছিল

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

দিন। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরনোর দিন আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা এল ওর জীবনে।

গত বছরের ঘটনা। পরীক্ষার রেজাল্ট জেনে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলেন পিসেমশাই। আনন্দ আর উত্তেজনায় একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় দৈত্যের মতো বাসটা পিসেমশাইকে চাপা দিয়ে চলে যায়।

পুলিশের কাছে খবর শুনে প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিল অরিন্দম। পিসেমশাইয়ের পকেটের ডায়েরি থেকেই ঠিকানা পাওয়া গেছে। খবর শুনে পিসিমা অজ্ঞান হয়ে যান। শেষে অবশ্য সব কিছু পিসিমাই সামাল দেন। শক্ত হাতে হাল ধরে পিসেমশাইয়ের প্রভিডেন্স ফান্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, অরিন্দমের এই চাকরিটাও পিসেমশাইয়ের অফিসের লোকজনকে ধরে করে দিয়েছিলেন। প্রিয়নগর থেকে যাওয়া-আসার কষ্ট হবে বলে, কলকাতার মেসে থাকার ব্যবস্থাও করেছিলেন। ধীরে ধীরে সব কিছু অরিন্দমও মানিয়ে নিয়েছিল।

ঠাকুরকে আর এক কাপ চা দেবার কথা বলতে যেতেই পরিতোষের সঙ্গে দেখা হল। ওরা দু-জন এক ঘরে থাকে। চাকরিও এক অফিসে। ঘরে ঢুকেই পরিতোষ বলল, কী রে এখনও রেডি হোসনি, সাড়ে ছ-টা বাজে প্রায়। কথার জবাব না দিয়ে পরিতোষের দিকে পিসিমার চিঠিটা এগিয়ে দিল অরিন্দম।

বোকার মতো পিসিমার চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল পরিতোষ। তারপর অরিন্দমের কাঁধে হাত রেখে বলল, তাহলে তো তোর যাওয়া হবে না। তা এখন কি ট্রেন আছে?

রাত আটটায় একটা গাড়ি আছে। তবে প্রিয়নগর পৌঁছুতে বেশ রাত হয়ে যাবে। তাই ভাবছি।

আর ভেবে কাজ নেই। নিশ্চয়ই পিসিমার কোনো বিপদ-টিপদ হয়েছে। চিঠিতে তো সব লেখা যায় না। দেরি না করে তুই বরং আজই বেরিয়ে পড়। একটা দরখাস্ত শুধু লিখে দিয়ে যা। আমি কাল অফিসে বড়োবাবুকে দিয়ে দেব।

শেষ পর্যন্ত রাত্রে ট্রেনেই যাওয়া স্থির ঠিক করল অরিন্দম। জিনিসপত্র একটা ছোটো হাত ব্যাগে গুছিয়ে অরিন্দম ঠাকুরের নাম স্মরণ করে রাস্তায় নামল।

নির্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা দেরি করে ট্রেন ছাড়ল। ওভারহেড তারে কারেন্ট না থাকার ফলে সব ট্রেনই দেরি করে ছাড়ছে। প্রিয়নগর স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছোল তখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। রাত্রে ট্রেনে খুব বেশি লোকজন নামে না। আজ নামল শুধু তিনজন। দু-জন যাত্রী একসঙ্গে কথা বলতে বলতে অরিন্দমের সামনে দিয়ে চলে গেল।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটু দাঁড়াইয়া অরিন্দম। স্টেশন মাস্টারমশাই-এর

ঘরের দরজাও বন্ধ। সামনের দিকে একটা কুকুর কান্নার সুরে ডেকে উঠতে চমক ভাঙল অরিন্দমের। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। স্টেশনের বাইরে কাঠ-বাদাম গাছটার নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মনে সাহস এনে বাদাম গাছটার দিকে পা চালান অরিন্দম।

আকাশে সরু একফালি চাঁদ ছিল। কিন্তু একখণ্ড কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল। স্টেশন থেকে পিসিমার বাড়ি দু-মাইলের মতো রাস্তা। কয়েকটা সাইকেল রিকশাও থাকে। আজ ট্রেনের দেরি দেখে বোধ হয় চলে গেছে। বাদাম গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল অরিন্দম। তারপর সামনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। না চোখের ভুল তো নয়! বাদাম গাছের আড়াল থেকে ঠিক পিসিমার মতো কে একজন সরে গেল। অরিন্দম কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিসিমা ওর সামনে এসে বললেন, অমু এলি বাবা। ট্রেনটা যা দেরি করল। মুখপোড়া যতীনটা সেই যে আমাকে রেখে ভাড়া খাটতে গেল আর ফেরার নাম নেই। তা তুই আমার সঙ্গে হেঁটেই চল। এইটুকুন তো রাস্তা পারবি না হাঁটতে। পিসিমার কথা শুনে হেসে ফেলল অরিন্দম। কিন্তু পরক্ষণেই অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে মাথায় ভিড় করে এল। এত রাতে পিসিমা স্টেশনে এসেছেন। যতীন অবশ্য ওদের চেনা লোক রিকশা চালায়। ওদের বাড়ির কাছেই থাকে। কিন্তু সেই-বা গেল কোথায়?

প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু করল। পিসিমাকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি একটু সরে গিয়ে বললেন, থাক থাক, রাস্তায় প্রণাম করতে নেই। তুই আগে বাড়িতে চল।

তুমি এত রাত্রে স্টেশনে এলে কেন?

দেখ ছেলের কথা। তোকে চিঠি দিয়েছি না। আমার মন বলছিল তুই আজ ঠিক আসবি। তাই তো যতীনকে নিয়ে রাত্রে ট্রেন দেখতে এলাম। তা সে আবার আমাকে নামিয়ে দিয়ে পলাশপুরে ভাড়া খাটতে গেল। ট্রেন আসার দেরি আছে শুনে আমিও না করিনি।

পিসিমার কথা শুনে মাথার মধ্যে আবার ঝিম-ঝিম করে উঠল। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু প্রশ্ন নয়। খিদেও পেয়েছে। ব্যাগটা ভালো করে ধরে একটু হেসেই অরিন্দম বলল, তুমি না সত্যি পাগল। আমি আসতে পারি ভেবে, এই রাতদুপুর অবধি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি? নাও আর দেরি না করে চলো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ বাবা তাই চল, বাড়ি গিয়েই সব কথা হবে। তোর খাবার আমি ঢাকা দিয়ে এসেছি। অরিন্দমের সঙ্গে বাড়ির দিকে পা চালান পিসিমা।

স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে মাটির রাস্তা। পিসিমা আগে আগে হাঁটছেন। অরিন্দমের মনের মধ্যে অনেক কথার ভিড় জুমলেও কিছু বলতে পারছে না।

কী মনে হওয়ায় পিসিমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোর অফিসে বলে এসেছিস তো অমু। কয়েক দিন এখানে থাকতেও হতে পারে।

হ্যাঁ, পরিতোষের কাছে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়েছি। তা তোমার এমনকী দরকার পড়ল একটু খুলে বলো তো। অরিন্দম একটু বিরক্তভাবে প্রশ্ন করল।

এবার অরিন্দমের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে পিসিমা তাঁর বিপদের কথা বলতে লাগলেন। চাপা স্বরে ফিসফিস করে পিসিমা যা বললেন তার কিছুটা অরিন্দম আগেই আন্দাজ করেছিল।

শ্বশুরের আমলের পাঁচটা নবাবি মোহর ছিল পিসিমার কাছে। অরিন্দমকে কয়েক বার দেখিয়েওছেন সে মোহর। এখনকার বাজারদরে মোহরগুলোর বেশ কয়েক হাজার টাকা দাম হবে। অরিন্দমকে কয়েক বার বলেছিলেন পিসিমা মোহর ক-টা কলকাতায় নিয়ে বিক্রি করে টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিতে। কিন্তু অরিন্দম সেকথায় কান দেয়নি। গত সপ্তাহে পিসিমা নাকি নিজেই একটা মোহর নিয়ে হরেন স্যাকরার দোকানে গিয়েছিলেন দাম যাচাই করতে। সেখানে আবার তখন গ্রামের কয়েকটি বখাটে ছেলে বসেছিল। মোহর দেখে হরেন স্যাকরা চমকে উঠেছিল প্রথমে। তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে, চুপি চুপি মোহরটা পিসিমার হাতে দিয়ে পরে আসতে বলেছিল।

উৎপাত শুরু হল সেই রাত্রি থেকেই। হরেন স্যাকরার দোকানের সেই বখাটে ছেলেদের মধ্যে একজন রাজেন, পিসিমার কাছে এসে মোহরের কথা জিজ্ঞাসা করল। আর কলকাতায় গিয়ে বিক্রি করে দেবার কথাও বলল। পিসিমা তো অনেক বকাঝকা করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু রাজেন পরদিন থেকেই তার দলবল নিয়ে রাত্রে উৎপাত শুরু করল। গ্রামের মাতব্বরদের বলেও ফল হয়নি। পরশু নাকি রাজেন পিসিমাকে ভয় দেখিয়ে গেছে, ওকে মোহর বিক্রি করতে না দিলে পিসিমা খুব বিপদে পড়ে যাবেন। তাই ভয় পেয়ে পিসিমা অরিন্দমকে আসতে লিখেছেন।

কথা শেষ করে পিসিমা বললেন, এখন তুই এসে গেছিস, যা ব্যবস্থা করতে হয় কর।

ওরা যে এরকম করছিল, তুমি সুমনদের দিয়ে পুলিশে খবর দিলে না কেন? সুমন অরিন্দমের স্কুলের বন্ধু। ওর বাবাও পিসেমশায়ের বন্ধু ছিলেন। তাই সুমনের নামটা অরিন্দমের মাথায় এল! তা ছাড়া বিপদে-আপদে ওরাই তো আগে ছুটে আসে।

একগাল হেসে পিসিমা বলেন, ওমা পুলিশ আবার কী করবে। এসব কথা কি পাঁচকান করতে আছে। ওই রাজেন ছোঁড়াকে আমি টিট করে দিয়েছি কথায়। ও আমার আর কিছুই করতে পারবে না। তোর পিসের ছোটো সিন্দুকের চাবি আমি

লুকিয়ে রেখেছি। মোহরগুলো সেখানেই আছে। তুই বাবা চাবিটা নিয়ে ওগুলো উদ্ধার কর তাহলেই আমার শান্তি। শেষের কথাগুলো বলতে বলতে পিসিমার গলা ধরে এল।

রাগে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল অরিন্দমের মন। দিন দিন দেশটা কী হয়ে উঠছে! অসহায়া বৃদ্ধা মহিলার উপর অত্যাচার করছে বখাটে ছেলেরা আর গ্রামের বয়স্ক লোকেরা তা দেখছে।

কথা বলতে বলতে বাড়ির কাছাকাছি এসে গেল। আবার কয়েকটা কুকুর একসঙ্গে বিশ্রীভাবে ডেকে উঠল। সোজা রাস্তায় না গিয়ে পুকুরের পাশে বাঁশ ঝোপের দিকের রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছেন পিসিমা। কথা না বলে পিছনে হাঁটছে অরিন্দম। বাঁশঝোপের রাস্তা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে ঢুকল ওরা।

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বেলেই চমকে উঠল অরিন্দম। পিসিমা কোথায় গেলেন! এই তো একটু আগেই পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন।

—পি-সি-মা— কাঁপা কাঁপা গলায় ডেকে উঠল অরিন্দম।

হঠাৎ সামনের দিকে হাসির আওয়াজ হতে ভয় পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল অরিন্দম। বড়ো ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পিসিমা তখন ওকেই ডাকছেন, আচ্ছা ভীতু ছেলে তো তুই। উঠোনে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস? এতদিন এ বাড়িতে কাটালি আজ কি সব নতুন ঠেকছে! আয় ঘরে আয়— আমি তোর খাবার আনছি।

পিসিমা যে কখন গিয়ে ঘরের দরজা খুললেন সেটা বুঝে উঠতে পারে না অরিন্দম। ট্রেন থেকে প্রিয়নগরে নামার পর থেকেই একের-পর-এক অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে আজ। আর কিছু ভাবতেও পারছে না অরিন্দম।

ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে একটা মোমবাতি বের করে ধরাল। গ্রামে আসার জন্যই সঙ্গে এনেছিল। মোমবাতি জ্বেলে মুখ তুলতেই আবার চমকে উঠল। ঘরে তো পিসিমা নেই। এবার খুবই ভয় পেয়ে গেল ও; যদিও এখানকার সবই চেনা। ছোটোবেলা থেকে এই ঘরে পিসিমার কাছে থেকেছে, কিন্তু আজ পিসিমার হাঁটাচলা কথাবার্তা সবই যেন কেমন ধোঁয়াটে লাগছে।

মোমবাতি হাতে বাইরের বারান্দায় আসতেই আর একদফা চমক। হাতে খাবারের থালা নিয়ে পিসিমা ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। রান্নাঘরের দরজাটাও খোলা। এবারে হেসে ফেলল অরিন্দম। পিসিমা যে ওরই জন্য খাবার আনতে রান্নাঘরে গেছেন সেই কথাটাই মনে পড়েনি।

পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে নীচে নামে অরিন্দম। লেবুতলা পেরিয়ে পাতকুয়ো থেকে জল তুলে মুখ-হাত ধুয়ে আবার ঘরে ঢোকে। খাবারের থালা সাজিয়ে পিসিমা তক্তপোশের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চারখানা রুটি-তরকারি।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

একবাটি দুধ আর কলাও রয়েছে। রুটি ছিঁড়ে মুখে দিয়ে অরিন্দম বলল, তোমার খাবারটাই দিয়ে দিলে তো?

ওমা আমার যে একাদশী আজ। এগুলো তোর জন্যই করে রেখেছি। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। আরও কথা আছে। আমি যাই রান্নাঘরটা বন্ধ করে হাত ধুয়ে আসি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন পিসিমা। একঝলক ঠান্ডা শীতল হাওয়া এসে ঝাপটা মারল অরিন্দমের চোখে-মুখে।

খিদেও পেয়েছিল। চারখানা রুটি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। পিসিমা তো অনেকক্ষণ গেছেন। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অরিন্দম। রান্নাঘরের পাশে, ঘোড়া নিমগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে পিসিমা যেন কী করছেন। আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে নীচে নেমে একটু জোরে অরিন্দম বলল, অন্ধকারে ওখানে কী করছ পিসিমা?

অরিন্দমের ডাক শুনে ঘুরে তাকালেন পিসিমা। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে বিষণ্ণ করুণ সুরে বললেন, না রে নিতে পারেনি। যেমন রেখেছিলাম তেমনি আছে। তুই একটু এগিয়ে আয় অমু।

প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো এবার পিসিমার দিকে এগিয়ে যায় অরিন্দম। ঘোড়া নিমগাছের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে পিসিমা বলেন, ওই যে উঁচু মতো জায়গাটা দেখছিস, সিঁদুকের চাবিটা ওখানেই আছে। মাটি খুঁড়ে তুই ওটা বের করে নে অমু। আর দেরি করিস না।

কথাগুলো বলেই নিমেষের মধ্যে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন পিসিমা। নিমগাছের ডালটাও হাওয়ায় দুলে উঠল। একটা হিম শীতল হাওয়া আবার অরিন্দমের মুখে লাগল। নিমগাছের উপর পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ হল। অরিন্দমের কানে তখন পিসিমার চাপাস্বরে বলা কথাগুলোই বাজছে। ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে এবার পি-সি-মা— বলে ভীষণ জোরে ডেকে উঠল অরিন্দম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরের কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না অরিন্দম। জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে গেল মাটিতে।

আস্তে আস্তে ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও চোখ দুটো খুলতে পারছে না অরিন্দম। মাথাটা ভীষণ ভারী। ঘরের মধ্যে যেন কথার শব্দ। মনে জোর এনে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল অরিন্দম। মাথার কাছেই সুমন বসে আছে। পাঁচুকাকা শিবেন জেঠু আরও কয়েক জন দাঁড়িয়ে কী যেন বলছেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বিছানায় বসতেই চাপা গুঞ্জন ভেসে উঠল ঘরে। শিবেন জেঠুই এগিয়ে এলেন অরিন্দমের কাছে।

বোকার মতো তাঁর মুখের দিকে তাকাতে মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে শিবেন জেঠু বললেন, শক্ত হও অমু, এখন তোমার অনেক কাজ।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ধড়মড় করে উঠে বসে চিৎকার করে উঠল অরিন্দম, কী হয়েছে সুমন—
আমার পিসিমা কোথায়? অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল সুমন।
শিবেন জেঠু এগিয়ে এসে অরিন্দমকে ধরে ফেললেন।

সুমন আর শিবেন জেঠুর কাছেই ঘটনাটা শুনল অরিন্দম। পিসিমার সব কথাই
ঠিক। রাজেন নাকি সেই মোহরের জন্য ক-দিন পিসিমাকে ভয় দেখিয়েছিল। তবে
এতবড়ো অঘটন যে ঘটে যাবে সেকথা কেউ ভাবেনি। কাল দুপুরের দিকে রাজেন
নাকি পিসিমার কাছে এসে মোহরের কথা বলে। এক কথা দুই কথায় পিসিমা
চিৎকার করে উঠতেই দুই হাত দিয়ে রাজেন পিসিমার গলা টিপে ধরে। পিসিমাও
গায়ের জোরে লড়ছিলেন। গলা ছেড়ে রাজেন পিসিমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে
দেয়। চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে আসে। রাজেন তখন পালিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড
উত্তেজনায় পিসিমা হার্টফেল করে মারা যান।

পুলিশও এসেছিল। তবে ডাক্তারবাবু আর পঞ্চায়েত প্রধানের জন্য কোনো
ঝামেলা হয়নি। শিবেন জেঠুই সব ব্যবস্থা করেছেন। সুমন-কল্যাণ-পলাশদের
নিয়ে পিসিমার দেহ কাল রাতে দাহ করা হয়েছে। অরিন্দমকে খবর দিতেও লোক
পাঠিয়েছেন কলকাতায়।

সব কথা শুনে আবার চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল অরিন্দমের।
কিন্তু তার আগেই সুমন বলল, কাল যখন রাত তিনটের সময় আমরা পিসিমাকে
দাহ করে বাড়িতে ফিরে আসছিলাম, তখনই তোকে ঘোড়া নিমগাছতলার কাছে
পড়ে থাকতে দেখি। কিন্তু তুই গ্রামে এলিই বা কখন আর ওই ঘোড়া নিমগাছের
কাছে গিয়েছিলিই বা কেন?

সুমনের কথার জবাব না দিয়ে এবার তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামে অরিন্দম।
তারপর সবাইকে অবাক করে— পাগলের মতো ছুটে যায় সেই ঘোড়া নিমগাছের
কাছে। একটা লাঠি নিয়ে মাটির টিপিটা খুঁড়তেই একটা ছোটো মতো কৌটো
বেরিয়ে পড়ে। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কৌটোর মুখটা খুলতেই একটা চাবি
দেখতে পায় অরিন্দম।

চাবিটা বুকের কাছে চেপে ধরে এতক্ষণে অরিন্দম ছোট্ট ছেলের মতো ফুলে
ফুলে কাঁদতে থাকে।

[ভূত পেঙ্গী রক্তচোষা (দেব সাহিত্য কুটীর), ১৯৮৪]

কে?

আনন্দ বাগচী

সারাদিন গল্পের বই পড়ে দিব্যি কাটিয়ে দিলেও এখন এই বিকেলের মুখে আর ভালো লাগছিল না। রহস্য রোমাঞ্চের বইখানা একটু আগে শেষ হয়েছে। দম বন্ধ করা উত্তেজনায় এতক্ষণ বৃন্দ হয়েছিল, তাই নির্জনতাটা টের পায়নি। গল্পের ভেতরের লোকজন তখন সঙ্গে ছিল, এখন তারা গল্প ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। এই গোটা বাড়িটায় সমীর এখন একা। ফাঁকা মাঠের মধ্যে এই বাড়িটাও একা। পাড়াটা খুব নির্জন। বলতে গেলে পাড়াটা এখনো ভালো করে গড়েই ওঠেনি। এপাশে-ওপাশে দু-চারটে আধ-তৈরি, প্রায় তৈরি বাড়ি ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা তফাতে কিছু বসতি।

ঘর থেকে বেরিয়ে সমীর দোতলার বারান্দায় এল। ঘরের ভেতরটা ময়লা হয়ে এলেও বাইরে এখনও বেশ আলো। দূরের মাঠে একদল ছেলে ক্রিকেট খেলছে, তাদের এক-আধটা চিৎকার আর ব্যাটে-বলে হওয়ার শব্দ বাতাসে সাঁতার কেটে ভেসে আসছে মিয়োনো টিমে তালে। মাঠের ওপারে রেললাইন ছুঁয়ে এক সার তাল গাছ। তার ফাঁকে লাল ফুটবলের মতো সূর্যটা, মনে হচ্ছে বারপোস্টের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আর একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে যাবে দিগন্তের তলায়। শীতের সন্ধ্যা রূপ করে নেমে আসবে তখন।

দিনমানে বুঝতে পারেনি সে নিজের ফাঁদেই নিজে আটকে পড়েছে। ক-দিন এখন যথের মতো এত বড়ো বাড়িটা আগলাতে হবে কে জানে! অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও এমন মনে হয়নি। তখন একলা একটা গোটা বাড়ির দায়িত্ব পাওয়াটা একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো মনে হয়েছিল। সে যে বড়ো হয়েছে, সাবালক হয়েছে, সেটা হাতেনাতে প্রমাণ করার এত বড়ো একটা সুযোগ সে কোনোমতেই হাতছাড়া করতে চায়নি। মনটা চনমন করে উঠেছিল এই আনন্দে যে, ক-টা দিন সে এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, মাথার ওপর কেউ নেই। পুরো বাড়িটাই তার দখলে, তার জিন্মায়। সারাদিন সে যা খুশি করবে, কেউ তাড়া দিতে, তাগাদা দিতে আসবে না। যখন খুশি চান করবে, যখন খুশি যা খুশি রাঁধবে, খাবে, ঘুমবে। কলকাতার

অরাজিকতা একক্লিসিভ

সেই ঘিঞ্জি বাসার জীবন না। মাপা সময়ে মাপা কলের জলে কাকস্নান সারা নয়। দাদা আর ভাইয়ের সঙ্গে ভাগের বিছানায় শোয়া, ভাগের টেবিলের এক কোণায় বসে পড়া না। একখানা গল্পের বই নিয়ে টানাটানির দরকার নেই। পিসির দুই আলমারি ভরা বাংলা ইংরেজি গল্পের বই, যখন যেটা খুশি হাত বাড়িয়ে টেনে নাও। সব তোমার। শাওয়ার খুললেই জলের ঝরনা। বিরাট চৌবাচ্চা ভরতি জল টলটল করছে টাইলস বসানো ঝকঝকে বাথরুমে। কমোড, বেসিন, নকশাকাটা মসৃণ মোজাইক, কাচের শার্সি দেওয়া গ্রিলের জানালা, দেওয়ালে ডিসটেম্পার। সবই নতুন, সবই সুন্দর, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার মতো।

পিসি অনেকবার করে সমীরকে তাঁদের এই নতুন বাড়িতে বেড়াতে আসার জন্যে লিখেছিলেন, কিন্তু এতদিন নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এবার বড়োদিনের টানা দশ দিন ছুটি পাওয়ায় জামাকাপড় ব্যাগে ভরে বেরিয়ে পড়েছিল। একাই। এখন তো আর সে স্কুলের ছেলেটি নেই, স্কটিশ চার্চ কলেজে রীতিমতো ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র, ইংরেজিতে অনার্স পড়ছে। বাবা তাই আর আপত্তি করেননি একা ছাড়তে।

ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে আজ সকালেই আসানসোলের এই বাড়িতে এসে পৌঁছেছে সমীর। ওকে পেয়ে পিসি পিসেমশাই আর ছোটো ভাই-বোন দুটি তো মহাখুশি। এই ক-দিন কাছে-পিঠে কোথায় কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে তাই নিয়ে যখন হইচই চলেছে, তখনই এল সেই টেলিগ্রাম। একেই কপাল বলে। আসানসোলের মাটিতে মাত্র ঘণ্টা দুই হল পা দিয়েছে অমনি পিসেমশাইয়ে বাবা হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তক্ষুনি সবাই মিলে বর্ধমানে রওনা হতে হবে। কিন্তু বাড়িটা তো এভাবে খালি ফেলে যাওয়া যায় না। এদিকে খুব চুরিচামারি বেড়েছে, ডাকাতিও মাঝেমধ্যে। আগের দিনকাল তো আর নেই, এই ফাঁকায় বাড়ি তালাবন্ধ করে গেলে দামি জিনিসপত্র বাসন-কোসন তো যাবেই, দরজা জানলা খুলে নিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

পিসেমশাইয়ের তো মাথায় হাত। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই নতুন জায়গায় বাড়ি পাহারা দেবার মত বিশ্বাসী লোক কোথায় পাবেন! সব শুনে সমীর বলেছিল, পিসি, তোমাদের এত ভাবনার কি আছে, আমি থাকবখন।

পিসি-পিসেমশাই দু-জনেই চমকে উঠেছিলেন, তুই ছেলেমানুষ একা থাকবি এই বাড়িতে? বলিস কী!

সমীর সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, থাকব পিসি, ঠিক থাকব, দেখে নিও। আমি কি এখনও ছেলেমানুষ আছি নাকি, যে এত ভাবছ?

তবু ভাবনা কী যায়! দু-জনেই কিন্তু কিন্তু করেছিলেন অনেকক্ষণ। পরের ছেলে তায় ছেলেমানুষ। বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী থাকছে না। রাঁধুনি সতুর মা

থাকলেও না-হয় কথা ছিল, বাড়িতে আর একজন থাকত। তা ছাড়া রোঁধে বেড়ে দিতে পারত। ঠিকে ঝি তো সকালে বিকেলে ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে, চোখের পলকে বাসন ক-টা মেজে দিয়ে চলে যায়। সমীর জানিয়েছিল রান্না-খাওয়া কোনো ব্যাপার না। দুটো ডাল-ভাত কী ঝোল-ভাত সে রোঁধে নিতে পারবে। গত বছর মায়ের কঠিন অসুখ করেছিল। তখন তাদের তিন ভাইয়ের এ ব্যাপারে হাতেখড়ি হয়ে গেছে।

পিসি বলেছিল, সে না-হয় হল। সতুর মা দেশে গেছে, গতকালই তার আসার কথা ছিল, আজ হয়তো এসে যেতেও পারে। মানুষটা ভালোই, ভদ্রঘরের বউ, শুধু অবস্থার বিপাকে— এলেই দেখতে পারি, তবে মাথায় সামান্য একটু ইয়ে আছে। বলে পিসি হাসল।

সমীরও হাসল, বলল, ভালোমানুষদের মাথায় একটু ইয়ে থাকেই। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

—তা না হয় নিবি, কিন্তু বাবা রাত-বিরেতে শব্দ-টব্দ শুনলে গোঁয়াতুমি করে যেন হুটহাট দরজা খুলে বেরোস না। শুধু বাইরের আলোগুলো জ্বলে দিবি।

তোমরা নিশ্চিত থাক। সমীর হাসল। পিসি যাই ভাবুক সে কিছু গোবেচারা নয়। বক্সিং জানে, হালে ক্যারাটে শিখছে। তাদের পাড়ায় তো হইহল্লা লেগেই আছে। কথায় কথায় বোমাবাজি হয়। সমীর ডানপিটে না হোক, কিছু ভীতু টাইপের ছেলে না। দরকার হলে দু-একজন লোকের মহড়া নিতে পারবে।

প্রশংসার চোখে পিসি ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সমীর, ভূতের ভয়-টয় নেই তো তোর?

ভূত? —সমীর হাসল, ভূত বলে কিছু আছে নাকি পিসি? আমাদের নর্থ ক্যালকাটায় ভূত এখন ফুটপাথেও জায়গা পাচ্ছে না, একেবারে উদ্ভাস্ত হয়ে গেছে। শুধু গল্পের বইয়ের পাতায় এখনও দু-চারটে কোনোমতে টিকে আছে বটে, কিন্তু ওদের আর ইজ্জত নেই। তা তোমাদের এ বাড়িতে আছে নাকি এক-আধটা?

সমীরের কথা শুনে সবাই হো-হো হেসে উঠেছিল। পিসি বলেছিল, না বাপু, এ বাড়িতে ওসব ক্যারেকটার পায়ের ধুলো দেয়নি।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। মাঠ জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল তার আগেই। ঠান্ডাটা যেন অন্ধকারের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিল। চাদর জড়িয়েও বেশ শীত শীত করছিল সমীরের। আলোর মালা বুকে নিয়ে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে গেল মস্তুর গতিতে।

সমীর ঘরে ফিরে এসে আলোগুলো জ্বলে দিল। সন্দের মুখে সামান্য মন খারাপ হয়েছিল বটে; কিন্তু এখন আবার চাঙ্গা ভাবটা ফিরে এসেছে। আলমারি

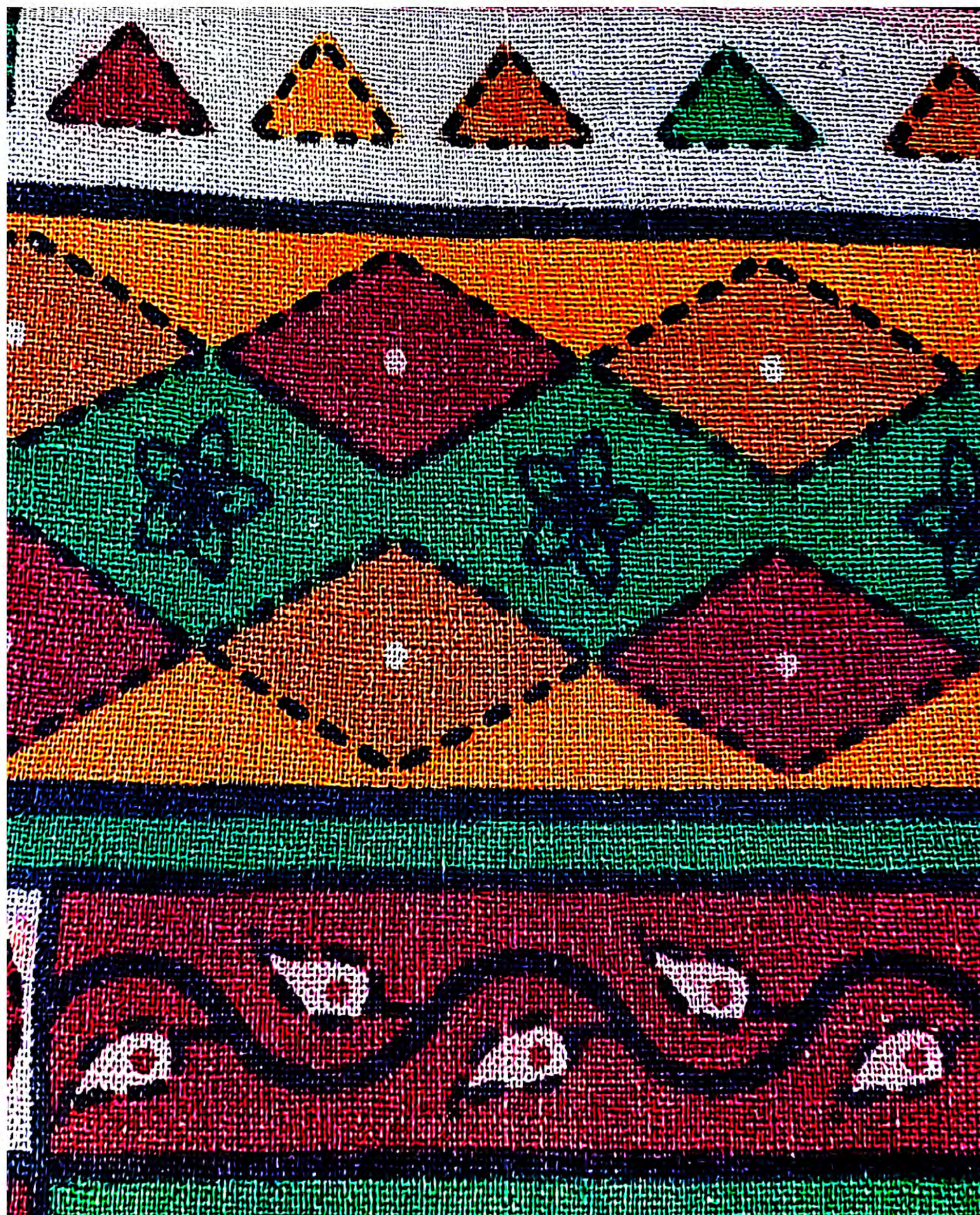
থেকে খানকয়েক গল্পের বই টেনে নিয়ে বিছানায় গিয়ে জুত হয়ে বসল। আজ রাতে আর হাবিজাবি রাঁধার মধ্যে যাবে না। বরং খিচুড়ি চাপিয়ে দেবে আর একটু রাত করে।

গল্পের বইয়ের পোকা সে। কিন্তু তবু কেন যেন বইয়ের পাতায় মন বসাতে পারল না। হয়তো প্রথম রাত্তির তাই। মনের মধ্যে কেমন একটা অস্থির চঞ্চলতা এসেছে। একটা রাত কেটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে রাতবিরেতের জন্যে একটু প্রস্তুতি চাই। হাতের কাছে হাতিয়ার মজুত রাখা দরকার। পিসেমশাইয়ের পাঁচ সেলের টর্চটা ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই রয়েছে। একবার জ্বেলে পরখ করে দেখল। না, নতুন ব্যাটারিই ভরা আছে। এঘর-ওঘর খুঁজে একটা ভোজালি আর লোহার ডান্ডা পেয়ে গেল সমীর। এবার সে সশস্ত্র। অস্ত্র জিনিসটা মানুষের মনের জোর অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। টর্চ আর ডান্ডা নিয়ে নীচের তলাটা এক চক্কর ঘুরে এল সমীর। দরজা জানালাগুলো ঠিক-ঠাক বন্ধই আছে দেখে নিশ্চিত হল।

গল্পের বইয়ে মন না বসুক, বসার ঘরে টিভি রয়েছে, সময় কাটানো কোনো ব্যাপার নয়। টিভি খুলে দিয়ে সোফার ওপর আরাম করে জাঁকিয়ে বসল সমীর। কলকাতায় তাদের ফ্ল্যাটে টিভি নেই, খেলা-টেলা থাকলে কিংবা ভালো সিনেমা যেদিন দেখানো হয় বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসে সমীর। গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে বসে দেখতে হয়। পুরোপুরি মন দিয়ে দেখা যায় না। ছবির মনোযোগ নষ্ট করে দিয়ে হয়তো কোনো বাচ্চা ছেলে কেঁদে ওঠে কিংবা দুষ্টুমি করতে শুরু করে। কেউ কাউকে চাঁচিয়ে ডাকে, কেউ হয়তো হঠাৎ উঠে যায় আবার ফিরে এসে বসে— এইরকমই চলে। এখানে সে একাই দর্শক, তন্ময় হয়ে টিভির স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। টিভি-র এই এক মজা। ঘর ভরে থাকে। মনে হয় সে একা নয়, আরও কেউ আছে। পাশে বসে আছে। রেডিয়ো চালালে কি এরকম হয়? বোধ হয় হয় না। অবিশ্যি কখনো তো আর একা একা ঘরে বসে রেডিয়ো শোনা হয়নি, তাই ঠিক বলতে পারবে না এরকম হয় কি না।

টেলিভিশনের ছবির ব্যাপারটা সত্যিই ভাবলে থই পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের এ একটা বিস্ময়। এই বন্ধ ঘরের মধ্যে কত দূর থেকে ছবি এসে পৌঁছোচ্ছে। কোথাও এতটুকু বাধা পাচ্ছে না। আশ্চর্য! ঠিক আত্মার মতো। শাস্ত্রে বলেছে আত্মারও নাকি শরীর আছে, সূক্ষ্ম শরীর। নিশ্চিহ্ন দেওয়াল ফুঁড়েও সে চলে আসতে পারে। আমাদের এই শরীরের মতো, না, তার কোনো ক্ষয় নেই, ক্ষতি নেই, বিনাশ নেই।...

টিভি দেখতে দেখতে কেমন মনে হল সেটায় কোনো গোলমাল আছে। নাকি টিভি ক্যামেরায় কোনো গণ্ডগোল ^{অরাজকতা} ^{প্রকল্লসিত} হয়েছে? ছবির পিছনে কেমন একটা



অরাজকতা এককুসিভ

ধোঁয়ার রিং ঘুরছে যেন, অস্পষ্ট ঝাপসা, কিন্তু ঘুরছে। প্রথমটা ঠাহর হয় না, কিন্তু একবার চোখে ধরে গেলে কেমন একটা অস্বস্তির মতো দৃষ্টি আটকে থাকে সেই ধোঁয়াটে আবছায়ায়। সমীর চোখ সরাতে পারছিল না। টিভিতে যে ছবিটা দেখানো হচ্ছিল সেটাকে পিছনে ফেলে আকাশের ছায়াপথের মতো ধোঁয়ার আবর্তটাই পাক খেতে খেতে গড়িয়ে আসছিল সামনের দিকে। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না সমীরের কাছে। সমীর কেমন হতবাকের মতো তাকিয়েছিল। মনে হয় ধোঁয়া নয়, ধোঁয়াটে একজোড়া চোখ, বরফের মতো শীতল, বরফের মতো কঠিন, তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। তারই চোখের দিকে। কেমন সম্মোহনের মতো টানছে। সমীরকে টানছে। আচমকা একটা ভয়ে সমীরের ঘাড়ের পিঠের লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল! কেমন অলৌকিক, কেমন অশরীরী একটা অস্তিত্ব। এতক্ষণ কেন যে নিজেকে একা মনে হচ্ছিল না, এই একলা ঘরখানাকেও ভরাট মনে হচ্ছিল এবার যেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া গেল।

সমীর তাড়াতাড়ি টিভিটা বন্ধ করে দিল। একরকম আতঙ্কিত হয়েই বলা যায়। তারপর কান খাড়া করল। হ্যাঁ, নীচে কলিং বেল বাজছে! টিভি-র আওয়াজে এবং অন্যমনস্কতার দরুন বোধ হয় এতক্ষণ ঠিকমতো কানে এসে পৌঁছোয়নি। এই অসময়ে কে এল রে বাবা! পিসি বার বার করে সাবধান করে দিয়ে গেছে হুট-হুট করে দরজা না খুলতে। আজকাল শহরের অনেক ফ্ল্যাটে কলিং বেল বাজিয়ে ডাকাতি হচ্ছে। ভোজালিটা কোমরে গুঁজে নিয়ে ডান্ডাটা হাতে তুলে নিল সমীর। ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করল সে।

বাইরের আলো জ্বলে দিয়ে নীচে নেমে এল সমীর। তারপর ‘ম্যাজিক আই’ দিয়ে দরজার বাইরে তাকাল। না, ডাকাত গুন্ডার দল নয়, বাইরে একজন বউ মতো কেউ দাঁড়িয়ে আছে। একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথম নজরে, কিন্তু পরের মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল, সতুর মায়ের আসবার কথা আছে, সে নয় তো? স্ত্রীলোকটির পরনে আধময়লা শাড়ি, বগলে একটা কাপড়ের পুঁটলি। হ্যাঁ, সতুর মা-ই হবে, চেহারা দেখে সে রকমই তো মনে হচ্ছে।

তালা খুলে দরজা খুলে ধরল সমীর, কে, সতুর মা?

মহিলা জবাব দিল না। শুধু বাঁ-হাতে ঘোমটাটা আরও কয়েক ইঞ্চি টেনে দিয়ে সমীরকে পাশ কাটিয়ে গুটগুট করে ভেতরে চলে গেল। সমীরের মনে পড়ল পিসি বলছিল, ওর মাথায় একটু ইয়ে আছে। কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। একটু নয়, ভালোই আছে।

কোনো প্রশ্ন করে লাভ নেই, হয়তো জবাবই দেবে না। অপরিচিত মানুষের সামনে তার ঘোমটার বহর দেখেই বোঝা গেছে, মানুষটার লজ্জার পরিমাণটা একটু বেশিই। দরজা বন্ধ করে ওপরে উঠে এল সমীর। একেবারে নিজের ঘরে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

চলে এল। মাকে একটা চিঠি দিতে হবে। কলকাতা থেকে আসবার সময় খাম পোস্ট কার্ড সঙ্গে করেই এনেছিল। ব্যাগ থেকে একখানা পোস্ট কার্ড বের করে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। চিঠি লিখতে লিখতে মনে পড়ল আজ বিকেলে চা খাওয়া হয়নি। কলকাতায় থাকলে এতক্ষণে দু-বার চা খাওয়া হয়ে যেত। টিভি খোলার আগে একবার ভেবেছিল এক কাপ চা বানিয়ে নেবে, কিন্তু ভুলে গিয়েছিল। এখন তো আর সে একা নয়, সুতরাং চা করতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তবে নীচে গিয়ে একবার সতুর মাকে বলে আসলে হয়। বললে হয়তো অখুশি হবে না, মানুষটা শুনেছে তো ভালোই। বার কয়েক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল তার টেবিলের এক পাশে কখন সতুর মা নিঃশব্দে এসে চা রেখে গেছে। বেশ চমকবার মতোই ঘটনা। কারণ সতুর মা এ ঘরে ঢুকেছে, টেবিলের ওপরে চায়ের কাপ নামিয়েছে, অথচ পাশে বসেও সমীর ঘুণাক্ষরে টের পায়নি। কখন এসেছিল?

কাপ-ডিশ কাছে টেনে নিয়ে আলগোছে একটা চুমুক দিল। না, এখনও গরম আছে। ভালোই বানিয়েছে চা-টা। আর একটা চুমুক দিয়ে সমীর একটা তৃপ্তির শব্দ করল। ভাবল, মনে মনে সে ভীষণভাবে চা চাইছিল অমনি চা এসে গেল। এটা কি টেলিপ্যাথি? নাকি কাকতালীয় ব্যাপার? বরাবরই এ সময়ে হয়তো সতুর মা এ বাড়িতে চা করে থাকে তাই আজও করেছে। কিংবা কিচেনে ঢুকেই টের পেয়েছে আজ চা হয়নি এ বাড়িতে, তাই।

তা সে যাই হয়ে থাক, সতুর মা আসায় সমীরের মনের ওপরের চাপ অনেক কমে গেছে। এ বাড়িতে এখন আর সে একা নয়। কথা বলুক আর না বলুক আর একটা মানুষ তো রয়েছে এই বাড়ির মধ্যেই। হোক একতলার কোণের ঘরটিতে কিংবা রান্নাঘরে, যেখানেই হোক, সে তো আছে।

অন্যমনস্কতার মধ্যে চিঠি লেখা হয়ে গিয়েছিল। একখানা মাকে লিখল, একখানা পাড়ার এক বন্ধুকে। পিসেমশাইরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে পৌঁছে গেছেন, ওর বাবার অবস্থা কীরকম কে জানে। একটু ভালো থাকলে উনি হয়তো কাল বা পরশুই চলে আসবেন। সেইরকমই বলে গেছেন।

সময় কাটানোই এখন একটা সমস্যা। এমন যে হবে, বিকেল পর্যন্তও ভাবা যায়নি। একটা লোকের যখন কিছুই করার নেই তখন গল্পের বইও মনে ধরে না। তবু সমীর আবার বইয়ের দিকেই মন ফেরাল। বিছানায় গিয়ে বসল। কিন্তু বইগুলোকে দেখতে পেল না। অবাক হল। বিছানার ওপরেই তো ছড়িয়ে রেখেছিল বইগুলো। ভারি আশ্চর্য তো! গেল কোথায়? টেবিলের দিকে তাকাল। না সেখানেও নেই। আবার উঠল। আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওই তো! আবার কখন বুঝি মনের ভুলে আলমারিতেই বইগুলো রেখেছে। কিন্তু কখন? মনে

পড়ল না। পছন্দ করে রাখা বইগুলো বের করে নিয়ে আবার বিছানায় ফিরে গেল।

কোমর অবধি লেপটা টেনে দিয়ে সেই বইখানাই ফের খুলল যেটা তখন সবে পড়তে শুরু করেছিল। গল্পের মধ্যে সবে ঢুকেছে, অমনি মনে হল খাটের তলা থেকে স্পষ্ট একটা শব্দ হল। এই নির্জন ঘরে এখন মেঝের ওপরে একটা ছুঁচ ফেললেও স্পষ্ট শোনা যাবে বোধ হয়। তাই শব্দটা কানের ভুল নয়, পরিষ্কার। কেউ যেন খাটের তলায় বসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। উত্তেজনায় শরীরের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল সমীরের। ঘরে নিশ্চয় কোনো লোক ঢুকেছে। চোর হওয়া আশ্চর্য নয়। অনেক সময় এভাবেই ওরা আগেভাগে বাড়ির ভেতরে ঢুকে বসে থাকে। কিন্তু ঢুকবে কোথা দিয়ে। সদরের দরজায় সতুর মা ঢোকান পরে নিজে হাতে তালা বন্ধ করে এসেছিল মনে আছে। ছাদের সিঁড়ির দরজায় তালা, দুপুরেই দেখে নিয়েছে। বারান্দা খিল দিয়ে ঘেরা। একমাত্র খিড়কির দরজাটা। তাতে তালা লাগানো নেই বটে; কিন্তু খিল এবং ছিটকিনি দুটোই তুলে দেওয়া আছে। তখনই দেখেছে। তবে কি সতুর মা কোনো কারণে দরজাটা খুলেছিল আর বন্ধ করেনি?

আবার নিশ্বাস ফেলার শব্দ হল। এবার আর একটু জোরে, আরও স্পষ্ট। লোকটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই। সে আছে, হয়তো ওত পেতেই বসে আছে। হয়তো সমীরকে আক্রমণ করার তাল খুঁজছে। সমীর সে সুযোগ ওকে দেবে না। নিঃস্পন্দ ভঙ্গিতে শুয়ে থেকেই সমীর আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাল।

ডান্ডাটা ঘরের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে। ভোজালিটাও নাগালের মধ্যে নেই, টেবিলের ওপরে। পরিস্থিতি খুব জটিল। খাটের তলায়, যে আছে সে নিশ্চয় শুধু হাতে আসেনি। সশস্ত্র হয়েই বসে আছে। খাট থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো আক্রমণ করে বসবে।

একমাত্র উপায় ওকে কিছু বুঝতে না দিয়ে এক লাফে যদি টেবিলের কাছে গিয়ে পৌঁছানো যায়। হাতের মুঠোয় একবার ভোজালিটা পেয়ে গেলে সমীর যেকোনো ষণ্ডাণ্ডার মোকাবিলা করতে পারবে। ভাবনা মাত্র কাজ। বিছানার ওপর থেকে সমীর হাত আর পায়ের ওপর ভর করে বিদ্যুৎ গতিতে ছিটকে চলে গেল টেবিলের সামনে। তারপর চোখের পলকে ভোজালিটা খুলে নিল খাপ থেকে। ঘুরে দাঁড়াল। খাটের তলা আধখানা দেখা যাচ্ছে, পুরোটা নয়।

দাঁতে দাঁত চেপে সমীর গর্জন করে উঠল, বেরিয়ে আয়! খাটের নীচে যে আছিস বেরিয়ে আয়!

গলার আওয়াজে ঘরখানা গমগম করে উঠল। কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না। সমীর নীচু হয়ে খাটের তলাটা দেখল। তাজ্জব! খাটের তলাটা বেবাক ফাঁকা। একটা বেড়ালের বাচ্চা পর্যন্ত সেখানে বসে নেই।

বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সমীর। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা তখনও উত্তেজনায় লাফাচ্ছে। এ যেন হাওয়ার বিরুদ্ধে তলোয়ার ঘোরানো। আসলে ভয়, তার অবচেতন মনের মধ্যে বুঝি হামাগুড়ি দিয়ে একটা ভয় কখন ঢুকে বসে আছে। পিসির কাছে যতই বড়াই করে থাকুক, আসলে সে একটা ভীতু। ভীতুর ডিম একটা! কাওয়ার্ড! তা না হলে ফাঁকা ঘরে নিশ্বাসের শব্দ শুনবে কেন! এ দুর্বল মনের কাজ। মানুষের মনটাই তো আসল। সে-ই মানুষকে খামোকা ভয় দেখায়। চোরের ভয় দেখায়, ভূতের ভয় দেখায়। ভয় একটা মনের রোগ ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেকে ধিক্কার দিল সমীর। মন থেকে আজীবাজে কল্পনা সবলে ঝেড়ে ফেলতে চাইল সমীর।

আর সেইজন্যেই আবার গিয়ে ঢুকল বসবার ঘরে। আবার টিভি চালাবে। চোখের ভুলের একটা এসপার-ওসপার করবে। অলৌকিক, অশরীরী বলে কিছু নেই। ভূত শুধু গাঁজাখুরি কল্পনা। গুল গল্প। ছেলে ভুলনো।

টিভির নব ঘুরিয়ে দিয়ে সোফায় গিয়ে বসল সমীর। ছবি আসতে একটু বিলম্ব হয়, সাউন্ডটা আসে আগে। এখন কী চলছে সে জানে না। বানবান করে একটা শব্দ শোনা গেল ছবি ভেসে ওঠার আগে। যেন একগাদা বাসন-কোসন পড়ে গেল টিভির মধ্যে। কিংবা দূরদর্শনের স্টুডিয়ার মধ্যে। আর তার পরেই ক্লোজ-আপে ভেসে উঠল এক জোড়া চোখ। বিশাল জ্বলজ্বলে! হালকা সাদা মেঘের জমিতে। ঐ, কুঁচকে তাকিয়ে আছে যেন। এত জীবন্ত যে চোখে এসে ধাক্কা লাগে সেই দৃষ্টি। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল সমীরের। ঘাড়ের পিঠের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল। কিন্তু সেই অতিকায় চোখ জোড়া তাকে ধরে থাকল চুম্বকের মতো। সে চোখ সরাতে পারল না। পলক ফেলতে পর্যন্ত যেন ভুলে গেল। সারা গায়ে কাঁটা দিয়েছে। এই শীতের রাতেও শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল সরীসৃপের মতো ঘামের ধারা নামছে যেন নীচের দিকে। সারা শরীর অসাড়, নড়বার ক্ষমতা লুপ্ত। প্রাণপণে সতুর মায়ের নাম ধরে চিৎকার করে ডাক দিল, কিন্তু গলা দিয়ে বোধ হয় আওয়াজ বেরলো না। জলের তলায় ডুবে গেলে যেরকম হয় সেইরকম একটা দমবন্ধ অবস্থার মধ্যে তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল। সমীর বুঝতে পারল সে মরে যাচ্ছে, চোখ মেলে তাকিয়েই মরে যাচ্ছে। একসময় চোখের আলো নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে ডুবে গেল।

কালপ্যাঁচার একটানা ককর্শ তীক্ষ্ণ ডাক যেন ছুরির ফলার মতো কানের পর্দায় এসে বিঁধে গেল। ঘুমটা ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু চোখ খুলে ঘুরঘুটি অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না সমীর। কেমন দিশেহারা ঠেকল। সে কোথায় কী বৃত্তান্ত কিছুই মনে পড়ল না। প্রথমে ভেবেছিল কলকাতায় তাদের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছে, হয়তো লোডশেডিং, তাই চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু হাত

দিয়ে স্পর্শ করেই বুঝতে পারল বিছানা নয়, খুব সম্ভব কোনো সোফার ওপরে সে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। সমস্ত শরীর শীতে কুঁকড়ে আছে। এমন সময় একটা নরম আলোর রেখা এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। মনে হল লণ্ঠনের আলো দোলাতে দোলাতে কেউ দরজার ওপাশে এসে দাঁড়াল। একটা অস্পষ্ট গলাখাঁকারি শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে সমীর দেখতে পেল ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সতুর মা। বিঘতখানেক ঘোমটার তলা দিয়ে তার নাকের ডগা আর চাপা ঠোঁট দুটো দেখা যাচ্ছে। চকিতে সব মনে পড়ে গেল। পেটের ভেতরটা খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে। অন্য চিন্তা ভুলে গিয়ে সমীর উঠে পড়ল।

মুখের ওপর রোদ এসে পড়ায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সমীর। দেখল অনেক বেলা হয়ে গেছে। কাল রাত্তিরটা দুঃস্বপ্নের ঘোরের ভেতর দিয়ে কেটেছে। আজ সতুর মাকে বসবার ঘরে শুতে বলতে হবে; কিন্তু তার আগে এককাপ চা চাই। সকাল আটটা বাজে। বার কয়েক গলা চড়িয়ে সতুর মাকে ডাকল। মানুষটার মাথায়ই শুধু ছিট নেই, কানেও বোধ হয় রীতিমতো খাটো।

আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে চায়ের সন্ধানে নীচে নামল সমীর। রান্নাঘরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভেতরে ঢুকে সতুর মাকে দেখতে পেল না। কলঘরেও নেই। ওর থাকার ঘরটার দরজায় শেকল তোলা। গেল কোথায় লোকটা? খিড়কির দরজা বন্ধ, সদর তো বন্ধই। কেমন ভয় ভয় করছিল। এমন সময় বাইরে কাদের গলা শোনা গেল, কলিং বেল বাজল। সেইসঙ্গে একটি কচি গলায় ডুকরে কেঁদে উঠল কেউ দরজার ওপিঠে।

সমীর হতভম্ব। সাড়া দিয়ে দোতলায় ছুটল চাবি আনতে। দরজা খুলে থ হয়ে গেল। তিন-চারজন গ্রাম্য গরিব গোছের মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে। ছেলেটা হাপুস চোখে কাঁদছে।

জানা গেল ছেলেটির নাম সতু। ওর মা সকালে রেল কাটা পড়ে মারা গেছে। মায়ের বাক্স-প্যাঁটরা যা-কিছু আছে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে।

[কিশোর মন ১, ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৬]

আতঙ্ক

মানবেন্দ্র পাল

হঠাৎ কলিং বেল বাজল। খুব আশ্চর্য। বেল বাজানোর ধরন শুনেই বোঝা গেল অপরিচিত কেউ। নিশ্চয়ই ভদ্র, বিনীত। তবু অনাদিবাবু অবাক হলেন। এই অসময়ে কে আসতে পারে?

জায়গাটা কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকার কুদঘাট। একসময়ে পরিত্যক্ত ছিল। এখন দিন যত যাচ্ছে ততই লোকবসতি বাড়ছে। তবু এখনও এখানে-ওখানে বাঁশঝাড়, জলাজঙ্গল। বাইরে থেকে এসে সে সময়ে অনাদিবাবু বুদ্ধিমানের মতো সামান্য টাকায় বাড়িটা করে ফেলেছিলেন। পাড়ার সকলেই পরিচিত।

এখন বেলা দুটো। অনাদিবাবু খেয়ে-দেয়ে কাগজ পড়ছিলেন। এমনি সময়ে কলিং বেল বাজল কি-রিং।

অনাদিবাবু উঠে দরজা খুলে দিয়ে প্রথমে কিছুটা অবাক হলেন। তারপরেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন আসুন।

সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীকে ডাকলেন, শুনছ? দেখে যাও কে এসেছেন।

ভদ্রমহিলাকে হঠাৎ দেখলে ভয় পেতে হয়। কুচকুচে কালো রং, মাথার চুল জট পাকিয়ে গিয়েছে। নাকটা থ্যাবড়া। চোখ দুটো গোল। একটু লালচেও। পরনে গেরুয়া কাপড়। কাছা দিয়ে পরা। হাতের ক্যান্সিসের ব্যাগটা মাটিতে রেখে হাতজোড় করে অনাদিবাবুদের নমস্কার করে ইংরিজিতে বললেন, দেখা করতে এলাম।

অনাদিবাবু আর তাঁর স্ত্রী দু-জনেই নমস্কার করে বললেন, আমাদের সৌভাগ্য।

মাদ্রাজি এই মহিলাটির সঙ্গে অনাদিবাবু আর তাঁর স্ত্রীর পরিচয় হয়েছিল বছর তিনেক আগে দক্ষিণ ভারতে তিরুনেলভেলিতে। ভদ্রমহিলা দীর্ঘদিন ধরে প্রেতচর্চা করেন। শুধু প্রেতচর্চাই নয়, মনোবিকারগ্রস্ত লোকদের ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে প্রভাব বিস্তার করতেও পারেন।

এঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অনাদিবাবুরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে আসবার সময়ে অনাদিবাবু বলেছিলেন, মাদ্রাজি, কলকাতায় যখনই আসবেন, আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবেন।

অরাজকতা একক্লুসিভ

মাতাজি কথা দিয়েছিলেন। গতবার দার্জিলিং যাবার পথে কলকাতায় এসে দেখা করেছিলেন। এবার যাচ্ছেন কাশ্মীর পহেলগাঁও। যাবার পথে তাই দেখা করতে এসেছেন।

দুপুরবেলায় বিশ্রামের পর বিকেলে ওঁরা তিনজন বসে গল্প করছেন, শুভা কলেজ থেকে ফিরল। তাকে দূর থেকে দেখেই মাতাজি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। অনাদিবাবু বললেন, আমাদের মেয়ে শুভা, একটিমাত্র মেয়ে।

শুভা ভুরু কুঁচকে মাতাজিকে একবার দেখেই চলে যাচ্ছিল, শুভার মা ডাকলেন, ও কী! চলে যাচ্ছ কেন? প্রণাম করো। সেবার সাউথে গিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

শুভা কোনোরকমে প্রণাম করে বেজার মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মাতাজি যেন কেমন একরকমভাবে শুভাকে দেখছিলেন।

—আপনাদের মেয়ে? তিরুনেলভেলিতে তো দেখিনি। আগের বার এসেও দেখিনি।

অনাদিবাবু বললেন, তিরুনেলভেলিতে ও যায়নি। আর যেবার আপনি এখানে এসেছিলেন তখন ও ছিল ওর মামার বাড়িতে।

মাতাজি শুভাকে দেখতেই লাগলেন। শুভার মা বললেন, শরীরটা ওর মোটেই ভালো যাচ্ছে না। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া একরকম বন্ধ। সবসময়ে কী ভাবে। আর মেজাজ—

মায়ের কথার মাঝখানেই শুভা বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল, মাতাজি স্নেহে ওর হাতটা চেপে ধরে ইংরিজিতে বললেন, রাতে তোমার বোধ হয় ভালো ঘুম হয় না। তাই না?

শুভা একমুহূর্তের জন্যে অবাক হয়ে মাতাজির দিকে তাকাল। তারপর ‘জানি না’ বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

শুভার মা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখলেন তো কীরকম অভদ্র! কিন্তু এরকম ও ছিল না। বছর চারেক থেকে ও যেন কেমন হয়ে উঠছে।

—বছর চারেক? এখন তো ও কলেজে পড়ছে। তাহলে তখন—

—তখন ক্লাস নাইনে পড়ত। পড়াশোনায় খুব ভালো। ধীর, শান্ত—

বাধা দিয়ে মাতাজি বললেন, ইস্কুলে কি ওর কোনো অশান্তি ছিল?

শুভার বাবা বললেন, না, অশান্তি আর কী! পড়াশোনা নিয়েই থাকত। তবে— এই পর্যন্ত বলে তিনি শুভার মায়ের দিকে তাকালেন।

শুভার মা বললেন, তবে অশান্তি বাঁধাত একটি মেয়ে— শিখা। গাজিয়াবাদ না কোথা থেকে নতুন এসেছিল। যেমনি রূপ, তেমনি দেমাক। সে শুভাকে একেবারে সহ্য করতে পারত না। ও পড়াশোনায় ভালো, দেখতে খারাপ নয়, সবাই ওকে ভালোবাসত। আর শিখা হিংসেয় ^{অরাজকতা এককুসিদ্ধ} জলেপুড়ে মরত। আশ্চর্য!

মাতাজি হেসে বললেন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এক ধরনের মানুষ থাকে যারা স্বভাবতই ঈর্ষাপরায়ণ। তারা কাউকে সুখী হতে দেয় না, নিজেও সুখী হতে পারে না।

একটু থেমে বললেন, মেয়েটিকে কি আপনি কখনো দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ, একবারই।

—মেয়েটি কি খুব বেপরোয়া?

—খুবই। টিচারদেরও নাকি মানত না।

মাতাজি টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, হাতে ছড়ি জাতীয় কিছু নিয়ে বেড়াতে ভালোবাসত। পায়ের কাছে টিল পেলে কুড়িয়ে নিয়ে অকারণে কুকুর, ছাগল মারত?

শুভার মা হেসে বললেন, অত বলতে পারব না। তবে বিরাট একটা কুকুর নিয়ে ঘুরত। একদিন শুভাকে রাস্তায় একা পেয়ে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যি ঠিক সেইসময়ে মেয়েটার দাদা এসে পড়েছিল। তাই শুভা বেঁচে গিয়েছিল।

—যাক, একটা বড়ো রকমের অ্যান্ড্রিডেন্ট থেকে আপনার মেয়ে বেঁচে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি আপনার মেয়েকে কোনোভাবে টিজ করত?

—নিশ্চয়। তার টিজ করার জ্বালায় তো শুভাকে ইস্কুল ছাড়তে হত।

—কীরকম টিজ করত একটু বলুন।

—সে আর কত বলব! দল পাকিয়ে ওর বিরুদ্ধে নানা কথা রটাত, অঙ্গভঙ্গি করে ভ্যাঙাত। সিঁড়ি দিয়ে হয়তো নামছে— শিখা ওপর থেকে এসে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে চলে যেত। এমনি কত! শুভা তো সব বলত না।

মাতাজি মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন— মেয়েটি এখন কোথায়? নিশ্চয়ই এখানে নেই?

শুভার মা বললেন, ঠিকই বলেছেন। ওরা এখন আর এখানে নেই। ইস্কুল ছেড়ে দেবার পরই চলে যায়।

—ইস্কুল ছেড়ে দিল কেন?

—সেও এক কাণ্ড। একদিন শিখা টিফিনের সময়ে আর একটা মেয়ের বই চুপি চুপি নিয়ে শুভার ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে চোর সাজাবার চেষ্টা করে। মেয়ে তো কেঁদে-কেটে অস্থির। এই নিয়ে তুলকালাম। একটি মেয়ে বুঝি শিখার কাণ্ডকারখান দেখে ফেলেছিল। সেই সব ফাঁস করে দেয়। শিখা ছুটে গিয়ে সেই মেয়েটার গলা টিপে ধরে। মেরেই ফেলত। ভাগ্যজোরে বেঁচে যায়। হেডমিস্ট্রেস শিখার গার্জেনের কাছে কড়া ভাষায় চিঠি লিখলেন। ব্যস! তারপরই শিখা ইস্কুল ছেড়ে দিল।

মাতাজি বললেন, কিন্তু তাতেও অশান্তি ঘুচল না, কি বলুন?

অরাজকতা একক্লুসিভ

—ওরে বাবা! অশান্তি ঘুচবে কী, আরও বেড়ে গেল! উড়ো চিঠি আসতে লাগল—
পড়াশোনা না ছাড়লে শুভাকে মরতে হবে। কী সাংঘাতিক কথা ভাবুন তো!
মাতাজি বললেন, শুভা নিশ্চয়ই ইন্সকুল ছাড়েনি?

—সে মেয়েই নয়।

—উড়ো চিঠির কথা পুলিশে জানিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওরা তখন এ তল্লাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছে।

মাতাজি চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

শুভার মা বললেন, মেয়ের যে তারপর কী হল— হাসি নেই— আনন্দ নেই—
দিন দিন যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

মাতাজি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি একবার আপনার মেয়ের সঙ্গে
কথা বলব। আমি নিজেই যাচ্ছি ওর কাছে। আপনারা এখানেই থাকুন।

টেবিলের ওপর দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল শুভা। মাতাজি ঢুকেই
বললেন, রাত্তিরে তোমার ঘুম হয় না। নিশ্চয় তুমি ভয় পাও?

শুভা বিরক্ত হয়ে মুখ তুলে তাকাল।

মাতাজি বলতে লাগলেন, আমি জানি যখনই তুমি একা থাক তখনই কিছু
দেখতে পাও। ঠিক কিনা?

শুভা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

—উত্তর দাও?

এবার শুভা নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়াল। কোনোরকমে বলল, হ্যাঁ।

—কী দ্যাখ, পরিষ্কার করে বলো।

শুভা একটু চুপ করে থেকে বলল, তেমন কিছু নয়, ঘরে হয়তো একা পড়ছি,
বাড়িতে কেউ নেই, মনে হল কেউ যেন চট করে সরে গেল। কখনো মনে হয় পিছনে
কেউ দাঁড়িয়ে আছে। রাতে প্রায় কীরকম একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি ঘরের
মধ্যে কী যেন নড়ে বেড়াচ্ছে। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে যাই। বুকের মধ্যে কীরকম করে।

—মা-বাবাকে একথা বলেছিলে?

—না।

—কেন?

—কেউ বিশ্বাস করবে না। উলটে ঠাট্টা করবে। নইলে বলবে মানসিক ব্যাধি।
আমি সায়েন্স-পড়া মেয়ে। আমি নিজেকে বুঝি। জানি এ আমার ব্যাধি নয়। কেউ
একজন আমাকে মারবার চেষ্টা করছে।

মাতাজি শান্ত গলায় বললেন, কে মারবে তোমায়?

শুভার মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। বলল, তা জানি না। তবে যে আমাকে
রোজ ভয় দেখাচ্ছে সেই-ই আমায় মারবে।

মাতাজি চুপ করে তাঁর নিজের আংটির মস্তবড়ো পাথরটা অকারণ নাড়তে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি শুধু আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তুমি কি এর মধ্যে কোনোদিন তোমার ইস্কুলের সেই মেয়েটিকে— শিখা যার নাম— স্বপ্নে কিংবা অন্য কোনোভাবে দেখেছ?

শুভা অবাক হয়ে বলল, তা কী করে দেখব! ও তো আর পাড়ায় নেই। কোথায় আছে তাও জানি না।

মাতাজি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, তাও হয়তো শিগ্গির জানতে পারবে। তবে আমার একটা কথা— কিছুতেই ভয় পেও না। মনে রেখো দুষ্ট আত্মা ভয় দেখাতেই পারে, সজীব মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, যদি না জীবিত মানুষ নার্ভাস হয়ে পড়ে।

— কি-নতু-দুষ্ট আত্মার কথা বলছেন কেন? শুভার গলা কেঁপে উঠল। শিখা কি তবে—

—ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি আজ যাচ্ছি পরে আবার দেখা হবে। বলে শুভার মাথায় হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুভার শরীরটা কেমন করে উঠল। যেন ইলেকট্রিকের শখ খেল।

তারপর একদিন।

গভীর রাত। আকাশে মেঘ থমথম করছে। শুভার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কেবলই এপাশ-ওপাশ করছে পাশের ঘরেই বাবা ঘুমোচ্ছেন। এখান থেকেই নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শুভার মনে হল সারাপৃথিবীর সমস্ত মানুষই বুঝি ঘুমোচ্ছে। জেগে শুধু সে একা।

ভাবতে ভাবতে কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল কতকগুলো কুকুরের ডাকে। কুকুর তো ডাকতেই পারে। অমন কত দিন কত রাত্রে কত কুকুর ডেকে গেছে। কিন্তু আজকের ডাকটা যেন কেমন। যেন প্রচণ্ড ভয়ে কুকুরগুলোর গলা কাঁপছে। কুকুরের ডাকটা ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। আর তারপরেই শুভার ঠিক মাথার জানলাটায় শব্দ হল খট খট খট। সেইসঙ্গে ঝড়ের গোঙানি।

ঝড়েই কি জানলা খট খট করছে?

শুভা ধড়মড় করে হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলে জানলার দিকে তাকাল। কী যেন দেখল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত দেহটা অবশ হয়ে গেল। একটা ছায়ামূর্তি। ঠিক যেন— ঠিক যেন—

—কীরে চিনতে পারছিস? জানলার গ্রিলটা ধরে বাইরে ঝুলছে শিখা! ঝোড়ো হাওয়ায় তার লম্বা চুলগুলো উড়ছে। মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গলার

স্বর পরিষ্কার। চিনতে না পারিস তো মনে করিয়ে দিই। আমি তোদের সেই শিখা।
তোর জন্যেই আমাকে ইস্কুল ছাড়তে হয়েছিল। তোর জন্যেই অনেক অপমান।
প্রতিশোধ তখন নিতে পারিনি। এখন নেব। আজ আমার মৃত্যুদিন। তাই দেখা
করে গেলাম।

শিখা একটু থামল। জানলার খিলে মাথাটা রেখে কেমন একরকম চোখ বের
করে তাকাল। তারপর বলল, আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে তোকে মারবোই!
কথাটা জানিয়ে গেলাম।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। সেইটুকু আলোয় শুভা দেখল কী-যেন একটা
হাওয়ায় সাঁতার কেটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুভা চিৎকার করে উঠল।

ব্যাপারটা সবাই শুনল। এটা যে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই হতে
পারে না সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। তবু সাতটা দিন সবাই শুভাকে সাবধানে
থাকতে বলল। শুভা বিমর্ষ গলায় বলল, কী আর সাবধান হব?

ছ-টা দিন কেটে গেল। এতটুকু অশুভ ছায়া নেই। রাত্তিরে সেই যে কুকুরের
ডাক শুনেছিল, সে ডাকও আর শোনা যায়নি। এমনকী ঘুমেরও ব্যাঘাত হয়নি।
কিন্তু পরের দিন—

দিনেরবেলা। ঘড়িতে তিনটে বাজল। রোজকার মতো শুভা দোতলার ছাদে
উঠল শুকনো কাপড় তুলতে। একমনে কাপড় তুলে যাচ্ছিল। লক্ষ পড়ল,
কয়েকটা বাড়ির পরে যে বাড়িটা তার ছাদে দাঁড়িয়ে তারই বয়সি একটি মেয়ে
তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মেয়েটিকে শুভা চিনতে পারল না। কোনোদিন
দেখেছে বলেও মনে হল না। সে একটা একটা করে শাড়ি, ব্লাউজ, ধুতি আলসে
থেকে তুলতে লাগল। কিন্তু মুশকিল হল বাবার গেঞ্জিটা নিয়ে। গেঞ্জিটা উড়ে
পড়েছে কার্নিসের ওপর। একটু জোর বাতাস পেলেই পড়বে রাস্তার নর্দমায়।
অথচ আলসে থেকে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালেও নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। শুভা
একটা লাঠি বা লম্বা কাঠি খুঁজল। কিন্তু তেমন কিছু পেল না। নীচে গিয়ে কিছু-
একটা নিয়ে এলেই হয়, কিন্তু শুভার আর নীচে নামতে ইচ্ছে করল না। ঠিক
করল গেঞ্জিটা নিয়ে তবে যাবে।

কিন্তু নেবে কী করে? ওটা যে নাগালের বাইরে। নিতে গেলে তাকে আলসে
টপকে ওই সরু কার্নিসের ওপর নামতে হয়। আর ওখানে নামা মানেই হয়
কার্নিস ভেঙে, না-হয় মাথা ঘুরে একেবারে রাস্তায় পড়ে যাওয়া। পড়লে আর
রক্ষে নেই!

শুভা আলসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে
লাগল। তার মনে হল পড়ে যাওয়া কি এতই সোজা? সার্কাসে সে শূন্যে দোল
অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

খাওয়ার কত খেলা দেখেছে। তারাও তো তারই মতো মেয়ে। তারা কি পড়ে যায়? তারা যদি অমন মারাত্মক খেলা খেলতে পারে তাহলে সে কেন কার্নিসে নেমে সামান্য একটা গোঞ্জি তুলে আনতে পারবে না?

কী করবে ভাবছে হঠাৎ লক্ষ পড়ল সেই মেয়েটার দিকে। সে হাসছে আর আশ্চর্য— হাত দিয়ে ক্রমাগত ইশারা করছে কার্নিসে নামার জন্য। এবার শুভা আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। লোকে যেমন করে ঘোড়ায় চাপে, তেমনি করে পরনের শাড়িটা গুটিয়ে আলসের ওপর চেপে বসল। সে যে কী অদ্ভুত দৃশ্য! তারপর যেই ডান পাটা বাড়িয়ে দিয়েছে মরণ ফাঁদের দিকে, অমনি কে যেন কঠিন স্বরে ডাকল— শুভা, নেমে এসো শিগ্গির!

শুভা চমকে উঠে দেখল ছাদে কখন বাবা উঠে এসেছেন। বাবাকে দেখে তার যেমন আনন্দ হল তেমনি ভয় হল। তার মনে হল সে যেন ইচ্ছে করে কত বড়ো অপরাধ করতে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি আলসে থেকে নেমে মাথা নীচু করে নীচে নেমে গেল।

ক-দিন মোটামুটিভাবে কাটল। শুভার মানসিক অবস্থার কিন্তু উন্নতি নেই। বরং আরও একটু খারাপ হয়েছে। যখন-তখন ছাদে যাচ্ছে। সেই মেয়েটাকে আর একবার দেখতে চায়। অনাদিবাবু শেষে বাধ্য হয়ে ছাদের সিঁড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

সেদিন গভীর রাতে আবার সেই কুকুরের ডাক। শুভার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার ঘর। তার কীরকম ভয় করল। পাশেই মা শুয়েছিলেন। শুভা অন্ধকারে মাকে একবার ছুঁল। একটু পরে মাথার কাছে জানলায় ঠুক ঠুক শব্দ। কে যেন বন্ধ জানলাটা খুলতে বলছে। শুভার দেহ হিম হয়ে গেল। মাকে ডাকতে গেল। স্বর বেরোল না।

—খুব বেঁচে গেলি সেদিন!

শুভা চমকে উঠল। শিখার গলা। —একেবারে ঘরের মধ্যে!

—ভাগ্যি তোর বাবা এসে পড়েছিল! কিন্তু এবার আর কারো সাধ্য নেই বাঁচায়। কালই তোকে মারব! বলতে বলতে স্বরটা যেন ফ্যানের হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন। সকাল থেকেই শুভা মা-বাবার কড়া পাহারায়। শুধু মা-বাবাই নন, পাড়াপ্রতিবেশীরাও বারে বারে আসছে-যাচ্ছে। কেবলই লক্ষ রাখছে শুভার ওপর। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! অথচ উড়িয়ে দিতেও পারছে না। শুভা কিন্তু বিরক্ত হচ্ছে। সে কি চিড়িয়াখানার নতুন কোনো জন্তু, যে সবাই তাকে দেখে যাচ্ছে? রাগ করে সে ঘরে খিল দিল। বেলা তখন প্রায় একটা। অনাদিবাবু পুরোনো খবরের কাগজ বিক্রি করছিলেন বাইরের ঘরে বসে। শুভার মা বাথরুমে।

হঠাৎ অনাদিবাবু শুনলেন রাস্তায় একটা হইচই গেল— গেল— গেল—

তিনি একলাফে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন দুটো ট্যাক্সি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আর সেখানে লোকের ভিড়। একটু পরেই কারা একটি মেয়েকে ধরাধরি করে নিয়ে এল।

—শিগগির একটু জল!

না, শুভা মরেনি। দুটো ট্যাক্সির মুখে পড়েও আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে।

জ্ঞান ফিরে আসার পর শুভা অল্প দু-একটা কথা যা বলল তা এই—

খিল বন্ধ করে জানলায় দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দেখল সেদিনের সেই মেয়েটা খুব সেজে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসছে। কে এই মেয়েটা, কোথায় তার বাড়ি, কেনই-বা তাকে দেখলেই হাসে জানার জন্যে সে তখনি খিড়কির দরজা দিয়ে ছুটে গিয়েছিল। তারপর আর কিছুই মনে নেই।

কয়েকটা মাস বেশ ভালোভাবেই কাটল। আর কোনো উপদ্রব নেই। শুভা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। আজকাল সবার সঙ্গে গল্প করে, হাসে। ওকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে ওর মা এখন ওকে সংসারের টুকিটাকি কাজ দেন।

সেদিন বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। অনাদিবাবু বললেন, শুভা, একটু চা করো তো। বলে নীচে নেমে গেলেন। শুভার মা গেলেন ঠাকুরঘরে। দোতলাটা একেবারে ফাঁকা। নিস্তব্ধ। শুভা রান্নাঘরে এসে স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। একটু পরে তার শরীরটা কেমন করে উঠল। মনে হল যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। শুভা উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘরের সামনের বারান্দাটার দিকে তাকাল— খাঁ খাঁ করছে। সামনের ঘরগুলোও ফাঁকা। এরকম তো রোজই ফাঁকা থাকে। কিন্তু আজ কেন এত ভয় করছে? মনে হচ্ছে যেন বাড়িতে কেউ নেই। সবাই তাকে ফেলে পালিয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে এটা যেন কোনো ভূতুড়ে বাড়ি।

শুভা কেমন যেন ভয় পেয়ে গোঙাতে লাগল। মনে হতে লাগল এখুনি সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

আর ঠিক সেইসময়ে সে স্পষ্ট দেখল তার সামনে শিখা দাঁড়িয়ে। রান্নাঘরের দোরগোড়ায়। দু-চোখে আগুন-ঝরা দৃষ্টি! একরাশ কালো চুল বাতাসে উড়ছে।

—দু-বার বেঁচে গেছ! এবার রেহাই নেই! বলে শিখা দু-হাত বাড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। আর শুভা পিছতে লাগল জ্বলন্ত স্টোভের দিকে। ক্রমশ আগুনের তাত তার গায়ে লাগল। তবু পিছোচ্ছে শুভা। না পিছিয়ে উপায় নেই। শিখা রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

চিৎকার করতে গেল শুভা, পারল না। ঠিক এই মুহূর্তে বাইরের ঘরের দরজায় কলিং বেল বাজল— কি-রিং-কি-রিং—

শুভা শুনতে পেল বাবা দরজা খুলে দিলেন। শুনতে পেল কাকে যেন সাদর অভ্যর্থনা করছেন— আসুন আসুন।

সেইসঙ্গে আরও শুনতে পেল কোনো মহিলার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, শিগ্গির আমায় ওপরে নিয়ে চলুন।

সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ। কে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে। শুভা যেন জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। দেওয়াল ধরে সামলে নিল কোনোরকমে। না, শিখা নেই। শুভা তবু ভয়ে ভয়ে তাকাল। দেখল সামনে ক্যান্ডিসের ব্যাগ হাতে মাতাজি দাঁড়িয়ে।

মাতাজি হেসে বললেন, ভয় নেই। ও আর কোনোদিন আসবে না। আজ ওর আত্মা মুক্তি পেয়ে গেল।

ততক্ষণে শুভার মা-বাবাও এসে পড়েছেন। তাঁরা অবাক হলেন, রান্নাঘরের কাছ থেকে ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভুরভুর করে আসছে।

[শুকতারা, শ্রাবণ ১৩৯৮ (জুলাই ১৯৯১)]

রাঙাদিদা ও ফুলকুমারী

বিরাজ ভদ্র

ভূতের গল্প তোমরা শুনতে ভালোবাস। কত নামেই না তোমরা তাদের চেন—ব্রহ্মদত্তি, মামদো ভূত, পেতনি, শাঁকচুন্নি। ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এ আবার ভূতের নাচও তোমরা দেখেছ। আমি একটা মেয়ে ভূতের কথা শুনেছি ছোটবেলায়। তার নাম সে বলেছিল ‘ফুলকুমারী’।

ভূত যদি পোড়োবাড়ি, বনেজঙ্গলে থাকে তবে থাক না। বিশেষ কিছু আসে যায় না। অমাবস্যার রাত্রে, ঘোর দুপুরে অথবা ভর সন্ধ্যাবেলায় তেনারা তোমাদের ভয় দেখাতেও পারেন। ওইসব জায়গায় যখন-তখন না গেলেই হল।

তবে বনের ভূতের থেকে মনের ভূতকে আমরা বেশি ভয় পাই। একদিন দুপুররাত্রে চাঁদের আলোয় একটা কলাগাছকে আমার মনে হয়েছিল সাদা শাড়ি পড়া একটা ভূত যেন। এদিকে-ওদিকে হাওয়ায় আবার হেলছিল দুলছিল। ওমা! ওটা যে বাগানের চেনা কলাগাছ সেটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড লেগেছিল। আর তার মধ্যেই বুকটা একবার ধক করে উঠেছিল।

লোকে বলে বিজলি-আলো আসার পর থেকে ভূতেরা কোথায় সব পালিয়ে গেছে। এখন আর ভূত দেখার বা ভূতে ধরার গল্প তেমন শোনা যায় না। কিন্তু বহু বছর আগে গ্রামে গ্রামে ভূতের বেশ দৌরাত্যা ছিল। মনে করো ষাট-সত্তর বছর আগে ভূতের রাজত্ব না থাকলেও তেনাদের খুব হস্তিত্বি ছিল।

আমার এক দূরসম্পর্কের ঠাকুমাকে একবার ভূতে ধরেছিল। বাবা-মার কাছে সেই ঘটনা শুনেছি। সেই ঠাকুমাকে আমরা ডাকতাম ‘রাঙাদিদা’ বলে। খুব ছোটবেলায় তাঁকে দেখেছি। বুড়ো বয়সেও তাঁর গায়ের রং ছিল রাঙা রাঙা ফর্সা। সেই রাঙাদিদাকে ভূতে ধরেছিল। তখন তাঁর বয়স কুড়ি-একুশ হবে।

আমাদের গ্রামের বাড়িটা আগে ছিল ছোটোখাটো একটা জমিদার বাড়ির মতো। অনেক লোকজন থাকত। একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাঙাদিদার বর রাঙাদাদু এক গ্লাস জল চাইলেন। ঘরে জল নেই তাই রাঙাদিদা একটু দূরে রান্নাঘরে জল আনতে গেলেন তাড়াতাড়ি।

সেই যে গেলেন রাঙাদিদা আর আসেন না। দু-একবার ডেকে রাঙাদাদু নিজেই বাইরে এলেন। কী কাণ্ড! রাঙাদাদু দেখলেন রাঙাদিদা বকুল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ। কাছে গিয়ে রাঙাদাদু বললেন, ‘কী হল এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

‘খবরদার! আমায় ছুঁবিনি’, খোনাগলায় রাঙাদিদা বকলেন। তারপর খিলখিল করে জোরে হাসলেন।

দাদু অবাক হয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন। অনেকে ছুটে এল। রাঙাদিদা বড়োদের দেখে ঘোমটা টানলেন না। বরং শাড়ির আঁচল গাছকোমর করে বেঁধে সবাইকে শাসাতে লাগলেন, ‘কেউ আমায় ছুঁবিনি! ছুঁলে শেষ করে দেব! আমায় তোরা চিনিস না!’

যাঁরা একটু বয়স্ক ছিলেন তাঁরা যা বোঝার বুঝে গিয়েছেন। তখনকার দিনে ভূতে ধরার প্রাথমিক লক্ষণগুলি এরকমই ছিল। রাঙাদিদাকে জোর করে ধরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু ঘরে তিনি থাকতে চাইলেন না। বার বার সকলকে সাবধান করছেন, বেরিয়ে যেতে চাইছেন। তখন তাঁকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল। সেসময় এত গায়ের জোর হয়েছিল রাঙাদিদার যে দু-তিন জনে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল তাঁকে বাঁধতে।

বাড়ির লোকেরা পরামর্শ করে ঠিক করলেন ভূত ছাড়াবার ওঝা ডাকতে হবে। সে রাত্রেই পাশের গ্রামের এক ওঝা এল। তাকে দেখে রাঙাদিদা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

‘তুই, তুই কেন এসেছিস? তুই কী করবি আমার? যা পালা নইলে মেরে ফেলব।’

ওঝা কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বলল, ‘না বাবু! এ আমার কস্ম নয়। আপনারা বড়ো ওঝা ডাকুন। এটা সহজ পাত্র নয়।’ ‘যা, যা। তোর গুরুকে নিয়ে আয়’—খিলখিল হাসি রাঙাদিদার।

পরদিন সকালে আরও দু-একজন ওঝা এল, তারাও হার মেনে গেল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। সারারাত ঘুম নেই বসেও নেই, সমানে বকবক করে যাচ্ছেন, তবু একটুও ক্লান্তি ছিল না রাঙাদিদার। সবসময় বাঁধন খোলার চেষ্টা করেছেন।

আমাদের গ্রাম থেকে দশ-বারো মাইল দূরে একজন বিখ্যাত ওঝা থাকত। তার নাম ছিল মহেন্দ্র শীল। তাকেও খবর দেওয়া হল। সন্কে হতে যায়, সবাই তার অপেক্ষায় বসে রইল। কখন আসে!

আমাদের বাড়ি ছিল আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে। বাড়ি থেকে এক মিনিটের পথ নদীর ঘাট। নৌকোয় করে ওঝা আসবে। কেউ দেখেনি কখন মহেন্দ্র ওঝা নদীর ঘাটে নেমেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকে রাঙাদিদা ঠিক চোঁচিয়ে উঠলেন— ‘ওকে কে আনলো? ওকে ফিরে যেতে বলো। ও আমার কিছুই করতে পারবে না।’

বার বার চিৎকার করছেন রাঙাদিদা। যত কাছে আসছে ওঝা তত বেশি ছটফট করছেন আর হাত-পা ছুড়ে চোঁচাচ্ছেন— ‘তুই কেন এসেছিস? তোকে মেরে ফেলবো!’

রাঙাদিদার কাণ্ডকারখানা দেখে মহেন্দ্র ওঝা এতটুকু ঘাবড়াল না। বরং গম্ভীর গলায় বলল, ‘হ্যাঁ! এলাম তুই আমায় আসতে বাধ্য করলি। দেখি, কে কাকে মারে!’

এবার সব জিনিসপত্র জোগাড় হল। ওঝা মস্ত্র পড়ে রাঙাদিদার গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাঙাদিদাও চিৎকার করে উঠলেন। সারারাত ধরে চলল ওঝা আর ভূতের ক্ষমতার লড়াই। না দেখলে, না শুনলে সেসব বিশ্বাস করা যায় না।

একসময় ওঝা রাঙাদিদার চারদিকে অদৃশ্য গম্ভীর কাটলেন মস্ত্র পড়ে। তারপর রাঙাদিদার বাঁধন খুলে দেওয়া হল। এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখা গেল তখন। রাঙাদিদা চোঁচাচ্ছেন, শাসাচ্ছেন, কিন্তু গম্ভীর বাইরে যেতে পারছেন না।

‘তুই গম্ভীর তুলে নে! তা নইলে ঘাড় মটকাবো! আমায় যেতে দে!’

‘তুই কে? কেন এসেছিস আগে বল, তবে তোকে যেতে দেব’, ওঝা বলে।

‘না না, বলব না, তুই আমার কী করবি?’

‘দেখ না, কী করি’, ওঝা মস্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিল।

‘জ্বলে গেলাম, পুড়ে গেলাম! আর দিবি না।’

‘তবে বল, কে তুই? কেন চেপেছিস মা লক্ষ্মীর ঘাড়ে? বল?’ ওঝা বলে।

‘না না, বলবো না, তুই কে রে আমায় প্রশ্ন করছিস?’

‘দেখাচ্ছি, আমি কে’, ওঝা মস্ত্রপড়ে ক্রমশ রাঙাদিদার চারদিকের অদৃশ্য গম্ভীর ছোটো করতে শুরু করল। একসময় গম্ভীর রাঙাদিদার দু-পায়ের পাতায় যতটুকু জায়গা ধরে, ততটুকু হয়ে গেল। অথচ বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও বলছে না সে কে, কেন ভর করেছে রাঙাদিদাকে।

প্রতিবার গম্ভীর ছোটো করার সময় ওঝা প্রশ্ন করছে কিন্তু উত্তর পাচ্ছে না। কয়েক বার এরকম করার পর ওঝার চোখ জবাফুলের মতো লাল হল রাগে। সে বলল, ‘যখন বলবি না তুই কে, তখন দাঁড়া এক পায়ে দাঁড়া। দেখি কতক্ষণ থাকতে পারিস।’

রাঙাদিদা একপায়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করে উঠলেন, ‘আমি আর পারছি না! উঃ কী কষ্ট! দু-পায়ে দাঁড়াতে দে।’

‘আগে বল, তুই কে? তবে দু-পায়ে দাঁড়াতে দেব।’

‘বলছি, বলছি।’

‘তবে দাঁড়া দু-পায়ে’, ওঝা বলে।

দু-পায়ে দাঁড়িয়েই রাঙাদিদা বললেন, ‘না বলবো না।’

অরাজকতা এককুসিভ

বার কয়েক এভাবে এক-পা থেকে দু-পায়ে দাঁড়াতে পেয়েই কিছু বলতে অস্বীকার করায় ওঝা ভয়ানক রেগে গেল।

‘অনেকক্ষণ জ্বালিয়েছিস! তুই একটা পেতনি। তোকে কী করে জব্দ করতে হয় আমার জানা আছে। দাঁড়া তুই, এবার বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়া’, ওঝা বলে।

ওঝার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই। বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়াতে হল রাঙাদিদাকে।

সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। কোনো নর্তকীও বেশিক্ষণ ওভাবে দাঁড়াতে পারে না।

‘আমি আর পারছি না। আমায় ভালোভাবে দাঁড়াতে দে। সব বলছি।’

‘নে, তবে দাঁড়া এক পায়ে’, ওঝা জল ছিটিয়ে দেয়।

‘দু-পায়ে দাঁড়াতে দে।’

‘নে, দু-পায়ে দাঁড়া’, ওঝা বলে।

দু-পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রাঙাদিদা বলেন, ‘আমার কী দোষ! আমি কী সাথে ওর ঘাড়ে চেপেছি। ও যখন বাপের বাড়ি গিয়েছিল এক দিন সন্কেবেলায় এলোচুলে বাইরে ঘুরছিল, তখন থেকে ওর দিকে আমার নজর পড়েছে। ওর সঙ্গে আমি এখানে আসি রান্নাঘরের পেছনে যে চালতে গাছ আছে ওর ডালে আমি থাকি। ওকে রোজ দেখি। কাল সন্কেবেলা আবার এলোচুলে রান্নাঘরে যাচ্ছিল। আমি তখন ওর ঘাড়ে চাপি। আমার কী দোষ।’

‘তা তো বটেই, তোর দোষ কোথায়। মা লক্ষ্মীর ঘাড়ে চেপেছিস তবু দোষ হয়নি, তাই না? কিন্তু কে তুই? এখন বল।’

‘বলবো না।’

‘আবার বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড় করাবো।’

‘না, না, না! আর না। আমি বলছি।’

‘বল, তাড়াতাড়ি বল’, ওঝা বলে।

‘আমি ফুলকুমারী। ওর বাপের বাড়ির দেশে ছিলাম।

‘বেশ! এবার তোকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। অনেক দূরে’, ওঝা আদেশ করে।

‘না না, তা কেন যাব?’

‘তবে দাঁড়া রে পেতনি, মজা দেখাচ্ছি’, ওঝা মস্তপূত জল গায়ে ছিটিয়ে দেয়।

‘মরে গেলাম, মরে গেলাম! যাব যাব! আমি যাব! আর কষ্ট দিস না!’

‘তুই এই গ্রামে থাকতে পারবি না। মা লক্ষ্মীর বাপের বাড়ির দেশেও না’, ওঝা আদেশ করে।

‘তবে কোথায় যাব?’

‘তা আমি কী করে জানবো। তবে আর যেন তোর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হয়। সাবধান করে দিচ্ছি।’ ওঝা বলে।

‘আমি তোকে দেখে নেব। আমি কোথাও যাব না। এখানেই থাকবো।’

‘তবে রে পেতনি! বার বার ওই এককথা। মজা দেখাচ্ছি!’ ওঝা অনেকক্ষণ মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দেয়।

‘উ! মরে গেলাম। মরে গেলাম। আমি যাব। রেহাই দে রেহাই দে। যা বলবি তাই করবো।’

‘তবে যা! দূর হয়ে যা! যাবার আগে কী প্রমাণ দিবি বল? যা, ওই চালতে গাছের মগডাল ভেঙে দিয়ে যা।’ ওঝা কঠিন আদেশ করে।

‘তাই হবে।’

ওঝা রাঙাদিদার চারদিকের গণ্ডি তুলে নিল। মন্ত্রপড়ে জল ছিটিয়ে দিল রাঙাদিদার গায়। রাঙাদিদা এক দৌড়ে ঘরের বাইরে যেতে গিয়ে দরজার বাইরে আছাড় খেয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দ করে বাইরে কোনো গাছ ভেঙে পড়ল।

রাঙাদিদাকে ধরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। এদিকে রাত ভোর হয়েছে। সকলে বাইরে এসে দেখল পুরোনো বিরাট চালতে গাছের মগডাল ভেঙে পড়েছে।

তারপর থেকে মেয়ে ভূত ‘ফুলকুমারী’র কথা আর কেউ শোনেনি।

[শুকতারা, শ্রাবণ ১৩৯৯ (জুলাই ১৯৯২)]

রাতটা ছিল দুর্যোগের

সমরেশ মজুমদার

দিনটা ছিল দুর্যোগের। আকাশে আলো ছিল না একফোঁটা। ঠাণ্ডা বাড়ছিল হু-হু করে। পোড়া কাঠের মতো মেঘগুলো চাপ হয়ে বুলছিল, যেন টোকা মারলেই ছড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। দিন ফুরোবার আগেই রাত নামল। সেইসঙ্গে দাঁতালো হাওয়ারা নেমে এল খোলা পৃথিবীতে। এখনও বৃষ্টি নামেনি, এই রক্ষে!

রাস্তায় এই আবহাওয়ায় মানুষ থাকার কথা নয় বলেই নেই। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো ডাইনির চোখ হয়ে জ্বলার চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল দ্রুত হাঁটতে। তাঁর বয়স চল্লিশের ওপরেই, একটু মোটাসোটা ভালোমানুষ গোছের চেহারা। হনহনিয়ে হাঁটছেন আর বারংবার পেছন ফিরে দেখছেন। যেন কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে। স্ট্রিটল্যাম্পের নীচ দিয়ে তিনি যখন হেঁটে গেলেন, তখন তাঁর মুখটা চকখড়ির মতো সাদা দেখাল। সেটা ঠাণ্ডায় যতটা নয়, আতঙ্ক ঢের বেশি। ওঁর শরীরে শীতের পোশাক আছে। তার ওপর একটা কালো চাদরে মাথা-গলা ঢেকে রেখেছেন। সম্ভবত কানে যাতে হাওয়া না ঢোকে, তাই সতর্কতা। হাতে একটা ব্যাগ। যেসব ব্যাগ নিয়ে মহিলারা অফিসে যান, সেই রকমের। পায়ে মোজা এবং পাম্প-শু গোছের জুতো।

দ্রুত চলার জন্যই ভদ্রমহিলা হাঁপাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেকোনো মুহূর্তেই বসে পড়বেন। দু-পাশের বাড়িগুলোর দরজা জানলা বন্ধ। একটুও আলো চোখে পড়ছিল না। বাঁক ঘুরতেই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনে একটা বাড়ির দোতলার জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। কাচের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে কথাও বলছে। ভদ্রমহিলা আর দেরি না করে ছুটে গেলেন একতলার দরজায়। প্রাণপণে বেলের বোতাম টিপে ধরলেন। সেই মুহূর্তেও তাঁর চোখ পেছন দিকে চলে গেল। দূরে কুয়াশায় কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে গলা ভেসে এল, ‘কে?’

‘দয়া করে দরজা খুলুন। প্লিজ। আমাকে বাঁচান!’ ভদ্রমহিলা আতর্জনাদ করলেন।

দরজাটা খুলে যেতেই একদঙ্গল আলো রাস্তায় ভদ্রমহিলার শরীর ভাসিয়ে লাফিয়ে নামল। একজন মধ্যবয়সি মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি?’

অরাজকতা এন্ডক্লসিভ

ভদ্রমহিলা বললেন, ‘একটু যদি ভেতরে আসতে দেন, তা হলে বলছি।’

ভদ্রলোকের স্ত্রী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘আসুন, নিশ্চয়ই আসবেন।’

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করলেন। ওঁরা ভদ্রমহিলাকে ওপরে নিয়ে এসে বসতে বললেন। সেটা খুবই প্রয়োজন ছিল ওঁর। একটা চেয়ারে বসে বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেললেন তিনি। ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি অসুস্থ?’

‘অ্যা? না, ঠিক, আসলে দৌড়ে আসছিলাম বলে, অভ্যেস তো নেই।’ ওঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

‘দৌড়চ্ছিলেন কেন?’

‘মনে হচ্ছিল, হচ্ছিল বলবো কেন, স্পষ্ট দেখেছি, কেউ যেন আমাকে ফলো করছিল। রাস্তায় তো আজ একটাও লোক নেই, তাই ভয়ে...’ ভদ্রমহিলা কথা শেষ করতে না পেরে দু-হাতে মুখ ঢাকলেন।

ভদ্রলোক বললেন, ‘সে কী! এ পাড়ায় কে অমন কাজ করার সাহস পাবে?’ তিনি সোজা জানলার কাছে চলে গিয়ে রাস্তাটা দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, ‘নাঃ, কেউ নেই।’

‘কিন্তু ছিল!’ ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করলেন।

‘বেশ, থাকেও যদি, তা হলে আর আপনার ভয় নেই। আমার স্বামী সরকারি অফিসার। সবাই ওঁকে চেনেন।’ স্ত্রী পরিচয় দিতেই স্বামী এগিয়ে এলেন, ‘শোনো, আমার মনে হয় ওঁকে এককাপ গরম দুধ দিলে ভালো হয়।’

ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেন, ‘না, না, দুধ আমি খাই না।’

ভদ্রলোক হাসলেন, ‘শৈশব থেকেই অনেকে এই বদ অভ্যেসটা করে ফেলে। বেশ, কফি চলবে?’

ভদ্রমহিলা আরও সংকুচিত হলেন, ‘না, না। আমার এসব লাগবে না।’

ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা, এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?’

ভদ্রমহিলা মুখ নীচু করে মাথা নাড়লেন, ‘কাজে। আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে অনুপস্থিত হলেই মাইনে কাটে। টাকার প্রয়োজন বলেই এই আবহাওয়াতেও সকালে বেরিয়েছিলাম।’

ভদ্রলোক সমব্যথীর গলায় বললেন, ‘সকালে অবশ্য আবহাওয়া এত খারাপ ছিল না।’

ওঁর স্ত্রী বললেন, ‘তা হলে আপনি চাকরি করেন। বাড়িতে আর যাঁরা আছেন...।’

‘আর কেউ নেই ভাই।’ ভদ্রমহিলা মুখ তুলছিলেন না। তিনি রুমালে চোখ মুছিলেন।

ভদ্রলোক ইশারায় স্ত্রীকে নিষেধ করলেন এ বিষয়ে কথা চালাতে। স্ত্রীর সেটা ভালো লাগল না। একটু সময় যেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার স্বামী...?’ প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই শেষ করলেন না।

‘তিনি মারা গিয়েছেন অ্যান্ড্রিডেন্টে। এইরকম খারাপ আবহাওয়ার সন্ধে ছিল সেদিন।’

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারপর?’

‘উনি অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন, এই সময় একটা কালো গাড়ি এসে ওঁকে চাপা দেয়।’

‘ইস!’

‘কিন্তু আমি জানি, উনি কখনো অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তায় হাঁটতেন না।’

‘তার মানে?’

‘আমার কথা পুলিশ বিশ্বাস করেনি। কালো গাড়িটাকেও ধরতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখেছি।’ ‘দেখেছেন মানে?’

‘যখনই আমি একা একা এই রাস্তায় হেঁটে যাই, তখনই দেখি একটা কালো গাড়ি আমার পেছন পেছন আসছে। যতক্ষণ না সেটা বেরিয়ে যায়, ততক্ষণ আমি, রাস্তা পার হই না।’

‘গাড়িতে কে থাকে দেখেছেন?’

‘না। মুখ দেখতে পাইনি।’

‘হ্যাঁ। প্রথমে গাড়িটাকে দেখলাম। একবার। তারপর মনে হল, কেউ যেন দরজা খুলে নেমে আমার পেছন পেছন আসতে লাগল।’

ভদ্রলোক আবার জানলায় চলে গেলেন। ভালো করে রাস্তাটা দেখে ফিরে এলেন তিনি, ‘আচ্ছা, আপনি কতদূরে থাকেন?’

‘সামনের রাস্তা ধরে মিনিট চারেক গেলে বাঁ-দিকের তিনতলা কাঠের বাড়িটায় থাকি আমি।’

‘ও। সামান্যই পথ। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।’

‘না, না। আপনি কেন যাবেন? ছি ছি, এসেই বিব্রত করেছি, তার ওপর।’

‘মোটাই বিব্রত করেননি।’ ভদ্রলোক বড়ো গলায় বললেন, ‘প্রতিবেশীকে যদি সাহায্য না করি, অন্যের প্রয়োজনে যদি না লাগি, তা হলে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?’

ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার শরীর এখন কেমন লাগছে?’

ভদ্রমহিলার মুখের সাদা ভাব এখন অনেকটাই চলে গিয়েছে। সোজা হয়ে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

বসে বললেন, ‘ভালো। আমি এখন যেতে পারব। শুনুন, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।’

‘তা হয় না। যে কালো গাড়ি আর তার ড্রাইভারের গল্প শোনালেন, তারপর আর আপনাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। হ্যাঁ, আপনাকে কথা দিচ্ছি, কয়েক দিনের মধ্যেই এই কালো গাড়ির রহস্য-সমাধান হয়ে যাবে। কাল থেকেই পুলিশকে বলবো ওয়াচ করতে।’

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, ‘আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো।’

‘কর্তব্য, বুঝলেন, এসব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।’ ভদ্রলোক উদার গলায় বললেন।

ওঁরা উঠে দাঁড়াতেই স্ত্রী স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে, চাপা গলায় বললেন; ‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?’

স্বামী অবাক হলেন, ‘কেন? কী করেছি?’

‘তুমি ওঁকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছ! এই আবহাওয়ায় একটা কুকুরও রাস্তায় নেই।’

ভদ্রলোক আড়চোখে বাইরের দিক দেখলেন, ‘তোমার কিস্সু মনে নেই।’

‘মানে?’

‘আমার একটা কালো গাড়ি ছিল এবং আমিও একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম।’

‘কিন্তু তুমি তো বলেছিলে লোকটা মরেনি।’

‘করার সময় তাই মনে হয়েছিল, পরে তো দেখতে যাইনি, খবরও নিইনি।’

‘তার মানে, তোমার গাড়িতেই...?’

‘নাও হতে পারে। শুনলে তো, এখনও সেই কালো গাড়িটা ওঁকে ফলো করে।’

স্ত্রীর উত্তেজনা কমল। তিনি মনে করে বললেন, ‘তুমি তখন বলতে, গাড়িটা যেন কীরকম!’

‘হ্যাঁ। সবসময় ড্রাইভারের কথা শুনত না। তাই তো বিক্রি করে দিলাম।’

ভদ্রলোক উশখুশ করলেন, ‘চলি। উনি অনেকক্ষণ বসে আছেন।’

‘শোনো, যেজন্যে তোমাকে ডাকলাম, তুমি রিভলবারটা নিয়ে যাও।’

‘রিভলবার?’

‘হ্যাঁ। যাচ্ছই যখন, তখন সাবধান হয়ে যাওয়াই ভালো।’

‘বেশ।’ ভদ্রলোক আলমারির দিকে এগোলেন।

ভদ্রমহিলা দরজার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেন এই ঘরেও তাঁর শীত লাগছে, এমন ভঙ্গি। ভদ্রলোকের স্ত্রী হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, ‘আপনার কোনো ভয় নেই। উনি পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আচ্ছা, আপনার বাড়ির ফোন নম্বর কত?’

‘আমার বাড়িতে তো ফোন নেই।’

‘ওঃ। বাড়ি পৌঁছে একটা ফোন করলে নিশ্চিত হতাম, তাই বললাম। ওই

অ্যান্ড্রিডেন্টটা কতদিন আগে ঘটেছিল?’ খুব সাধারণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। ‘বছর-দুই আগে।’

ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ওঁরা নীচে নেমে গেলে ভদ্রলোকের স্ত্রী বারংবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এখন রাস্তায় ঘন কুয়াশা। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলোকে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। ভদ্রমহিলা লজ্জিত গলায় বললেন, ‘দেখুন তো, আমার জন্যে আপনার কী কষ্ট হচ্ছে!’

‘কষ্ট কেন বলছেন! এটা কর্তব্য।’

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রমহিলা পেছন ফিরে তাকালেন। সেটা লক্ষ করে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তাঁর কোটের পকেটে রিভলবারটাকে আঁকড়ে ধরে লক্ষ করলেন, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। না পেয়ে বললেন, ‘কেউ নেই তো।’

‘পায়ের আওয়াজ শুনলাম।’

‘ঠিক আছে, আপনি এগোন, আমি একটু পিছিয়ে আপনাকে ফলো করবো। কেউ যদি কাছে এসে পড়ে, তা হলে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না।’

‘না, না। তার দরকার হবে না। ওই যে জুতোর দোকানটা এসে গেছে, আমি ঠিক যেতে পারব। আপনি চলে যান।’ ভদ্রমহিলা সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে বললেন।

এই সময় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই দুটো হেডলাইটকে কুয়াশা চিরে এগিয়ে আসতে দেখলেন ওঁরা। ভদ্রলোক রিভলবার বের করে তৈরি হলেন। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়াল না। সমান গতিতেই তাঁদের পেরিয়ে চলে গেল। দু-জনেই দেখতে পেলেন গাড়িটার রং সাদা।

ভদ্রমহিলা স্বস্তিতে বলে উঠলেন, ‘নাঃ!’

‘হ্যাঁ, আমিও...।’ ভদ্রলোক রিভলবার আর ঢোকালেন না, ‘চলুন, আপনাকে পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরব না।’

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার স্বামী কী করতেন?’

‘মাস্টারমশাই ছিলেন।’

‘কীরকম বয়স ছিল?’

‘এই, আপনারই বয়সি।’

ভদ্রলোক ঢোক গিললেন, ‘ও। উনি কি দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন?’

‘হ্যাঁ। পুলিশ তাই বলেছিল।’

কিছুদূর যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বললেন, ‘আমি এসে গিয়েছি। আর চিন্তা নেই।’

‘ও। বাড়িটায় আলো জ্বলছে না।’

‘পুরোনো বাড়ি। দোতলায় আমি ছাড়া কেউ থাকে না। তিনতলাটা বন্ধ।’

‘চলুন, আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসি।’

অরাজকতা এককুসিভ

‘না, না। কোনো দরকার নেই। আমি ওই সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেই ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে যাব। আর আমার কোনো ভয় নেই।’

‘বেশ। তা হলে চলি।’

‘হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ।’ বলেই ভদ্রমহিলা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তিনি যতক্ষণ না চোখের আড়ালে না গেলেন, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বাড়ির পথ ধরলেন।

কয়েক পা হাঁটার পরই মনে হল, কেউ যেন তাঁর পেছনে আসছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছেন তিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলেন। কুয়াশা এখন এমন ঘন হচ্ছে যে, কাউকেই দেখতে পেলেন না। রিভলবারটা উঁচিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই গাড়ির শব্দ কানে এল। একটা গাড়ি যেন আসছে, কিন্তু তার হেডলাইট নেভানো। সেটা জ্বললে তিনি দেখতে পেতেন। দ্রুত ফুটপাথের শেষপ্রান্তে চলে এলেন তিনি। গাড়িটা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাক, তারপর তিনি যাবেন। কিন্তু সরে আসামাত্র শব্দটা থেমে গেল। কুয়াশারা এখন পাক খাচ্ছে সর্বত্র। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলোকেও গিলে ফেলেছে তারা। তিনি আবার পা ফেলতেই গাড়ির শব্দ শুনলেন। যেন গাড়িটা ওত পেতে ছিল একপাশে, তাঁকে চলতে দেখেই সক্রিয় হয়েছে।

ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল। ওই ঠান্ডায় কুয়াশায় দাঁড়িয়েও হাতের মুঠোয় ধরা রিভলবারটা ভিজে উঠল। তাঁর মনে হল, এগোনোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তিনি এক দৌড়ে পেছন দিকে চলে এলেন। ভদ্রমহিলার বাড়ির কাঠের সিঁড়িটা দেখতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর মনে হল একা ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। থানায় একটা ফোন করে সাহায্য চাইতে হবে। ফোন কোথায় পাওয়া যায়? ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। তিনি দ্রুত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, দোতলায় উনি একা থাকেন। অতএব ওঁকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।

দোতলায় উঠে পা বাড়াতে গিয়ে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক। সিঁড়ির সামনে বারান্দা বা করিডোর বলে কিছু নেই। কাঠগুলো অনেক, অনেক আগেই খসে পড়ে গিয়েছে। ওপাশের দরজাটা ভাঙা এবং অন্ধকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভদ্রমহিলা এই শূন্য দিকে হেঁটে গিয়েছেন!

[আনন্দমেলা, ২০ জানুয়ারি ১৯৯৩]

যমজ বোন

বরুণ দত্ত

রাণার মাসিমার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। রাণাই তাঁর নয়নের মণি। আর সেই সুবাদে আমরা রাণার দু-তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও যথেষ্ট স্নেহ আদর নিমন্ত্রণ পাই রাণার মাসিমার কাছ থেকে।

মাসিমাদের বাড়ি আছে বিহার আর উড়িষ্যাতে— সব স্বাস্থ্যকর স্থানে। উত্তরবঙ্গে জমিজমা ছিল, এবার একটা বাড়িও কিনেছেন সেখানে। গরমের ছুটিতে সেই নতুন বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। মাসিমার সঙ্গে মায়েরও খুব ভাব হয়ে গেছে। ঠাকুমাও খুব স্নেহ-সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন মাসিমাকে। মাসিমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুমা বলেছেন, এমন ধনী ও রূপবতী অথচ এমন অমায়িক ভালো মানুষ দেখিনি।

যাই হোক আমরা বেড়াতে যাবার ব্যাপারে বাবার আপত্তি টিকল না। ঠাকুমাই আমার পক্ষ নিয়ে বলে দিয়েছেন— কী এমন জজ ম্যাজিস্ট্রেটের পড়া পড়ছে! সবে তো ক্লাস এইট। যাক, বেড়িয়ে আসুক। এরপরে উঁচু ক্লাসে উঠলেই বরং যেতে দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া মেয়ে অমন করে বলে গেছে। মাসিমা তাঁর আন্তরিকতা দিয়ে ঠাকুমাকে এমন মুগ্ধ করেছেন যে ঠাকুমা তাঁকে মেয়েই বলেন।

নির্দিষ্ট দিনে দার্জিলিং মেল-এ আমরা রওনা হলাম। বেড়াতে যাবার আনন্দে উত্তেজনায় সারারাত ঘুমোতেই পারলাম না। পরদিন ভোরে নামা হল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। তারপর জনবহুল রাস্তা ছেড়ে প্রায় মাইলটাক পথ এসে খোয়ামাটির রাস্তার উপরেই মাসিমাদের নতুন বাড়ি।

দোতলা, বেশ বড়ো বাড়ি, কিন্তু পুরোনো। সঙ্গে আম, জাম, কাঁঠাল, কত রকমের লেবু, পেয়ারা, বেল, কমলালেবু, দুটো বড়ো স্বর্ণচাঁপার গাছ নিয়ে বিশাল বাগান। চাঁপাফুলের গন্ধ তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে আরও যেন একটা মিষ্টি কী গন্ধে সারাশ্রবণ ম-ম করছে বাতাস। একটু দূরে একা একা দাঁড়িয়ে আছে একটা শিমুল গাছ। কলকাতার ছেলে আমরা এত বড়ো বাগান পেয়ে আত্মহারা।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

এই বিশাল এলাকাসহ বাড়িটা নাকি মেসোমশাই কিনেছেন প্রায় জলের দামে। বাড়িটা অল্পে অব্যবহারে পড়ে ছিল। তাই সারানো, রং করা ইত্যাদিতে অনেক খরচ হয়েছে। জল ইলেকট্রিকের ব্যবস্থাও করেছেন নতুন করে।

এত সুন্দর বাড়ি, কিন্তু এ বাড়িতে কাজ করার লোক একটাও পাওয়া গেল না। অল্প কয়েক দিনের ব্যাপার বলে হয়তো কেউ গরজ দেখাচ্ছে না। মাসিমার সঙ্গে সবসময়েই দু-জন কাজের লোক, রাম আর বাসনা থাকে। এখানেও তারা এসেছে, তাই কোনো অসুবিধা হল না।

নতুন বাড়িতে ঢোকা মানেই তো পুজোপাঠ খাওয়া-দাওয়া। প্রয়োজনের চাইতে মাসিমার আয়োজন থাকে সবসময়েই বেশি। আজও তাই হয়েছে। অথচ অতিরিক্ত খাবার-দাবার বিলিয়ে দেবার মতো গরিব মানুষও পাওয়া যাচ্ছে না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে মেসোমশাই কী কাজে দার্জিলিং চলে গেলেন। ফিরে আসবেন আজই। আমরা কলকাতা ফেরার আগে যে দার্জিলিং যাব, সে ব্যবস্থাও করে আসবেন। এটাও দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার। কারণ খুব ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে কবে দার্জিলিং এসেছিলাম, তা এখন আর মনে নেই।

সন্ধ্যার মুখে পাওয়ার কাট হল। মাসিমার কাজের লোক রাম পেট্রোম্যাক্স জ্বলে ফেলল, বাসনা জ্বালল দুটো বড়ো হারিকেন। একটা রেখে এল সিঁড়ির মুখে। অন্যটা ড্রইংরুমে। পেট্রোম্যাক্স থাকল ঠাকুরঘরের সামনে। মেসোমশাই আগেই বলেছিলেন জেনারেটরের কথা, মাসিমাই বারণ করেছেন। বলেছেন, পরের বার একটা কিনে নিও। এই ক-টা দিনের জন্য আর এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

মাসিমা ঠিক কথাই বলেছেন, পরে লাগবেই। কারণ মেসোমশাই তাঁর এরিয়া অফিস করবেন এই বাড়িটা ভবিষ্যতে।

বাড়িতে এখন আমি, রাণা, সৌরভ— তিন বন্ধু, মাসিমা আর তাঁর রাম ও বাসনা। এরই মধ্যে বাড়ির সব ক-টা আলোই একসঙ্গে হঠাৎ টুপ করে নিভে গেল। আমরা অন্ধকারে ডুবে গেলাম যেন। মাসিমা চৈঁচিয়ে উঠলেন, ও রাম, দেখ তো আলোগুলোয় তেল-টেল আছে কিনা! তোরা একটা কাজও ঠিক করে করতে পারিস না। বাবুর ঘরের বড়ো টর্চটা নিয়ে আয় চটপট। আলোগুলোর সঙ্গে ক-টা বড়ো মোমবাতিও জ্বলে দিস। প্রথম দিনেই দেখ তো কী অবস্থা!

রাম আর বাসনা ব্যস্তহাতে আলোগুলো ফের জ্বলে ফেলল। সেইসঙ্গে ইয়া বড়ো তিন-চারটে মোমবাতিও। তারপর রাম বলল, মা তেল তো সব বাতিতেই ভরাভরতি রয়েছে।

মাসিমা ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল প্রদীপটা কে যেন তুলে নিয়ে গেছে। মাসিমা বিরক্ত হয়ে ভাবলেন এ নিশ্চয়ই বাসনার কাজ। হাতের কাছে দেশলাই না পেয়ে ওইটাই তুলে নিয়েছে। কিন্তু ফিরিয়ে

অরাজকতা এককুসিত

দেবে তো। যতসব অলক্ষুণে কাজকর্ম! ঠাকুরঘর অঙ্ককার করে কেউ প্রদীপ নেয়। বিরক্ত কণ্ঠে তাই ডাকলেন, বাসনা, বাসনা?

মাসিমার ডাকে বাসনা রান্নাঘর থেকে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল, বলল, কী বলছ মা?

কী বলছি? প্রদীপটা কোথায় রেখে এলি?

আমি প্রদীপ নিয়েছি! কী যে তুমি বলো না মা! তখনই বলেছিলুম, এই শরীলে তুমি এত ধকল নিওনি, কী দেখতে কী দেখছ!

মাসিমা একটু থতমত খেয়ে বললেন, নে আর খবরদারি করতে হবে না, প্রদীপটা কোথায় রেখে এলি তাই দেখ।

ওই তো পিলসুজের উপরেই রয়েছে মা। বলতে বলতে বাসনা চলে গেল।

বাসনার কথা অবশ্য মিথ্যে নয়, কাজের লোক না পাওয়ায় মাসিমার পরিশ্রম হয়েছে খুবই। না হয়েছে বিশ্রাম, না হয়েছে সময়মতো খাওয়া-দাওয়া। ভুল তো তাঁর হতেই পারে।

আমরা তিনবন্ধু বাগানের দিকের দোতলার বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। মাসিমা, বাসনা ও রামের কথোপকথন কম-বেশি শুনেছি, যদিও আমাদের দৃষ্টি ছিল আধো জ্যোৎস্নামাখা বাগানের দিকে। ভারি সুন্দর দুটি মেয়ে, হয়তো আমাদের মতোই বয়স হবে অনেকক্ষণ থেকে চাঁপাগাছের ওদিকটায় খেলা করছিল। এখন তাদের দেখতে পাচ্ছি না। আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কী দুষ্ট আর সাহসী মেয়েরে বাবা! কখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তবু বাড়ি ফেরার নাম নেই। ওদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।

একটু পরে পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারিদিক। শুনেছি এখান থেকে নাকি এমন জ্যোৎস্নারাতে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যায়। কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না! কী জানি হয়তো তিন-চারতলা বাড়ির ছাদে উঠলে দেখা যায়।

এতক্ষণে কারেন্ট ফিরে এল। এবার আমরা ঠিক করলাম ছাদে উঠে নগাধিরাজ হিমালয়ের তুষার শোভিত শৃঙ্গগুলো দেখার চেষ্টা করবো।

সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম সেই মেয়ে দুটি ছাদ থেকেই নেমে আসছে। ছাদের দরজায় তালা দেওয়া। রাণা গেছে রামের কাছ থেকে চাবিটা আনতে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে যাব— ওরা ওপরে কী করছিল, না মেয়ে দুটি আমাদের ধাক্কা দিয়েই নীচে নেমে গেল। আর তক্ষুনি রাণাও চাবি নিয়ে দৌড়ে এল। বলল— কী জোর একটা হাওয়া বইল রে! ছাদে আর গিয়ে কাজ নেই, বৃষ্টি আসতে পারে।

ছাদে যাওয়ার গরজ কারুরই আর থাকল না। বসার ঘরে চলে এলাম তিনজনে।

ওদিকে মাসিমা রান্নায় ব্যস্ত টের পাচ্ছি। বাসনা মাসিমার হাতে হাতে জোগান দিচ্ছে। রাম বিছানাপত্র রেডি করছে। এক ঘরে শোব আমরা তিনবন্ধু একই

খাটে, সেই ঘরের মেঝেতে একপাশে রামের বিছানা। অন্যঘরে মাসিমা আর তাঁর বাসনা। মেসোমশাইয়ের ঘর আলাদা।

মাসিমা একপ্লেট ফিস ফ্রাই নিয়ে এলেন, বললেন, খেয়ে দেখো কেমন হল? এখন আর বেশি খেয়ে কাজ নেই। তোমাদের মেসোমশাই এলে খেতে দিয়ে দেবো, নাকি আগে খাবে?

না না, মেসোমশাই ফিরে এলে একসঙ্গে খাবো, দার্জিলিংয়ের গল্প শুনতে শুনতে। আমরা প্রায় একই সুরে বলে উঠলাম তিনজনেই।

বেশ, তবে তাই হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাদের সঙ্গে ওদের পরিচয় হয়েছে? ভারি মিষ্টি মেয়ে দুটি। কী লাজুক! মাসিমার কথায় আমরা মাথা নাড়লাম, হয়নি। রাগা বলল, বাগানে ওদের আমরা দেখেছি।

মাসিমা নিজের কাজে চলে গেলেন। কিন্তু আমাদের সবারই কেমন যেন একটা গা-ভারী অবস্থা, সবাই সবাইয়ের গা ঘেঁষে বসতে চাইছি। কেন এমন হচ্ছে! গাছগাছালির মধ্যে এতবড়ো বাড়িতে মাত্র এই ক-জন লোক বলে হয়তো এমন একটা হতেও পারে।

পরে জানতে পারি আমাদের চোখ এড়িয়ে মেয়ে দুটো কখন মাসিমার কাছে ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাসিমা ওদের দু-খানা থালায় সাজিয়ে দিয়েছিলেন প্রসাদ মিষ্টি পায়ের। কিন্তু এত লাজুক যে মাসিমার সামনে খেতে বসছিলই না। মাসিমা তাই হেসে ওখান থেকে সরে এসেছিলেন যাতে ওরা ভালো করে খেতে পারে। বাসনাকে বলেছিলেন, বাসনা যা তো, বলে আয় ওরা যেন যাবার সময় দেখা করে যায়।

বাসনার খুব ভুলো মন। সে তক্ষুনিই ঠাকুরঘরে গিয়েছিল, কিন্তু মেয়ে দুটিকে দেখতে পায়নি। মাসিমাকে সেকথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। কাজের ব্যস্ততায় ব্যাপারটাও চাপা পড়ে গিয়েছিল; ঠিক এরকম সময় মেসোমশাই ফিরে এসেছিলেন আর আমরা দার্জিলিংয়ের গল্পে কথায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম।

মাসিমা যে একা হাতে কত বান্না করেছেন। কোনটা ফেলে কোনটা খাই!

খেতে দিতে দিতেও মাসিমা বার দুয়েক বললেন মেয়ে দুটির কথা। মেসোমশাইকে বললেন, কালই মেয়ে দুটির মা-বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে হবে। হাজার হোক প্রতিবেশী তো।

আমরা তিনবন্ধু নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। ভাবলাম মাসিমার পুষ্টি বাড়ল আর কী। একটু হিংসেও যে হল না মনে মনে তা নয়। তবে ভালোও লাগল, ভারি সুন্দর পরি পরি দেখতে। বোধ হয় যমজ বোন। যদি বন্ধুত্ব হয় ভালোই।

প্রথম দিন খাওয়া-দাওয়া চুকতে বেশ রাতই হয়ে গেল। সবাই যে-যার ঘরে ঢুকলাম নিশ্চিন্ত ঘুমের আশায়। কিন্তু কেউই ঘুমোতে পারলাম না। প্রথমে মনে হল

যেন বাড়িতে অনেক লোক ঢুকে পড়েছে, দুপদাপ পায়ের শব্দ। রাম তো ‘চোর চোর’ বলে চোঁচিয়েই উঠেছিল। মাসিমা মেসোমশাইকে আমরা ডেকে সব বললাম। সারা বাড়ির সব আলোগুলো জ্বালা হল, তন্নতন্ন করে খোঁজা হল চারদিক; কেউ কোথাও নেই। দরজা জানালার ছিটকিনি, খিল, চাবি সব ঠিক আছে।

মেসোমশাই মাসিমাকে বললেন, খাটাখাটনি করে রাম বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন-টপ্প দেখে থাকবে। কোথায় কী! চলো শুয়ে পড়া যাক।

মাঝরাত পেরিয়ে আবার ঘটল একই ঘটনা। এবার শুধুমাত্র ঠাকুরঘরের দিকেই। আবার সব পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা হল কোথাও কিছু নেই। মাসিমা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বাসনাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন আমাদের ঘরে। মেসোমশাইকেও বাধ্য করলেন। আমাদের ঘরে শুতে। একটা কেমন গা ছমছম ভাব, একটু একটু করে সবাই তবু ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভাঙল সারাবাড়ি জুড়ে দাপাদাপির আওয়াজে। তারপর কখনো দরজা খোলার শব্দ, কখনো পাতকুয়োয় বালতি ফেলে জল তোলার আওয়াজ হতে থাকল। সবাই জেগে উঠেছে, ঘরে হল ঘরে আলো জ্বলছে। কী যে করা যায়, করা উচিত আমরা কেউই ভেবে পাচ্ছি না। হাতের কাছে একটা ছোটো লাঠি রেখে মেসোমশাই জেগে বসে রইলেন। রামের তো ভয়ে মুখ কালো, বাসনার মুখ ফ্যাকাশে, মাসিমা গুরুর নাম করছেন। আকাশটাও থমথম করছে মেঘে, বৃষ্টি আসবে নিশ্চয়ই। বাতাসে বেশ ঠান্ডার আমেজ।

কখন দু-চোখের পাতা এক হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। আচমকা মাথার বালিশটা কেউ টেনে নিতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি সৌরভ আর রাণা একে অপরের দিকে উলটো মাথা করে শুয়ে আছে। ওদের মাথায়ও বালিশ নেই। এ কী রে বাবা! আমাদের বালিশগুলো গেল কোথায়? যেই না এই কথা ভাবা, অমনি সেই মেয়ে দুটো খাটের পাশে উঁকি দিয়ে হেসে উঠল। স্বপ্ন দেখছি নাকি। তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে তাকাতেই দেখি কেউ নেই! তক্ষুনি আবার সেই দুপদাপ শব্দ। এবার ভয়ে কাঁঠ হয়ে গেলাম। রান্নাঘরে কারা যেন বাসনপত্র এলোপাখাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলছে। একটু পরে সব শান্ত হয়ে গেল।

মেসোমশাই বললেন, তোমরা শুয়ে পড়। আমি তো জেগেই আছি। রাম বরং টর্চটা নিয়ে আমার সঙ্গে থাক।

পরদিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। দিনের আলোতে কাল সন্ধে থেকে প্রায় সারারাত যে তাণ্ডব গেছে বাড়ির উপর দিয়ে তা সবই যেন স্বপ্ন বলে মনে হল। মাসিমা মেসোমশাইয়ের চোখে-মুখেও রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ছাপ। দুশ্চিন্তাগ্রস্তও বটে।

আমরা তিনবন্ধু ব্রেকফাস্ট করছি এমন সময় মেসোমশাইয়ের এক বন্ধু এলেন। তাঁকে চা দিয়ে মাসিমা মেসোমশাই তাঁর সঙ্গে নীচু গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

হঠাৎ শুনতে পেলাম ভদ্রলোক বলছেন, বাড়ি কিনছ বলেছিলে।। কোথায় কিনছ, কী বৃত্তান্ত তা তুমিও বলোনি। আমিও বাস্তবতার মধ্যে জিজ্ঞেস করিনি। ভেবেছিলাম অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলে, পেয়েছ, বাস। কিন্তু এই বাড়ির ব্যাপার জানলে নিশ্চয়ই বারণ করতাম।

কথাটা শুনে কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। একটা গা ছমছম ভাব যেন ঘিরে ধরল। এই দিনের বেলায়ই একঘরে বন্ধুরা একসঙ্গে থেকেও খালি মনে হচ্ছে, কে যেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে! এ অবস্থা শুধু আমার একার নয়, বাড়িসুদ্ধ সবার।

তারপর শুনলাম, আজ বিকেলেই তিনটে নাগাদ আমরা দার্জিলিং রওনা হব। শুনে মানসিক চাপটা কিছুটা হালকা হল। তবু চলছি-ফিরছি, মনে হচ্ছে যে কারুর সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগছে। পাছে বন্ধুরা আমাকে ভীতু ভাবে, তাই মনের কথা প্রকাশ করছি না। আর কতক্ষণই-বা আছি এ বাড়িতে। রাণাকে দেখলাম সারাক্ষণই রামকে ছুঁয়ে আছে।

দুপুরে আমরা তিনবন্ধু আর মেসোমশাই এক টেবিলের চারদিকে খেতে বসেছি। হঠাৎ টেবিলটা খুব জোরে নড়ে উঠল। যেন ভূমিকম্প হল। গ্লাস থেকে জল চলকে পড়ল। মাসিমার মুখ চিন্তায় কালো। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে চোখে চোখে যেন কিছু একটা ভাব বিনিময় হল।

গোছগাছ শেষ। বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল একটা স্টেশন ওয়াগন। সবাই চড়ে বসলাম। সকলের হাতেই একটা করে গরম পোশাক। ঘন্টা দেড়েক পরেই, অর্থাৎ কার্শিয়াং থেকেই তো গায়ে চাপাতে হবে।

মেসোমশাই আর তাঁর বন্ধু সব বন্ধ-টন্ধ করে এলেন। অনেকক্ষণ সময় লাগল ওঁদের। কী জানি কেন।

গাড়ি চলছে। আমরা সবাই নীরব। সব চাইতে বেশি মনমরা অবস্থা মাসিমার। এক-একবার আমাদের এক একজনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন যেন এক পরম নিশ্চিততায়।

এক সময় আমরা সেবক ব্রিজ পেরিয়ে শুকনা ফরেস্টের দিকে এগিয়ে চললাম। মাসিমার একটু বোধ হয় তন্দ্রা মতন এসেছে কাল সারাদিনরাত যা ধকল শরীরে আর মনের উপর দিয়ে গেছে ওঁর।

মাসিমার কান বাঁচিয়ে রাণা বলল, রামের কাছে আমি সব শুনেছি। আমরা খুব বেঁচে গেছি। ওটা ভূতের বাড়ি। ওই দুই যমজ বোনকে ডাকাতরা মেরে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল। ওখানে আর ফিরব না আমরা। দার্জিলিং থেকে সোজা কলকাতা।

পাপি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

বাদলার দিনে আকাশটা যেন মুখ ভার করে নীচের দিকে নেমে এসেছিল। দু-দিন থেকে নাগাড়ে বৃষ্টির পর অবিরল ধারাটা একটু ধরলেও চারদিক কেমন যেন থমকে রয়েছে আবার বর্ষণের আশঙ্কায়। দিনেরবেলাও অন্ধকার অন্ধকার ভাব। আজ অলি, তুলির স্কুল হয়নি, ‘রেনি ডে’ হয়ে গেছে। স্কুলের জামা জলে ভিজে সপসপে, জুতোর অবস্থাও সেই রকমই। বাড়ি ফিরে এসে গরম গরম খিচুড়ি আর বেগুনি খাওয়ার পর ওরা দু-জনেই মাকে ধরে বসেছে একটা গল্প বলতেই হবে। আর যেমন-তেমন গল্প নয়, আজকে এই বাদলার দিনে একটা ভূতের গল্প শুনতে চায় ওরা, যা শুনলে দিনের আলোতেও গা ছমছম করবে। মা সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ভাবছিলেন একটু ঘুমিয়ে নেবেন, কিন্তু অলি, তুলি কী সেকথা শুনবে! তার ওপর মজাটা হয়েছে, দু-দিন ধরে দুই মাসির দুই মেয়ে তিতলি আর চিকুলিও তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে বৃষ্টির জন্য আটকা পড়ে গেছে। অলি, তুলিরাও তাদের দু-দিন ধরে বাড়ি ফিরে যেতে দেয়নি। ওরা যখন অলি, তুলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আবদার ধরল, ‘ও মাসিমণি, ভূতের গল্প বলো, সত্যিকারের ভূতের গল্প’, তখন আর মা না বলেন কী করে।

মা বলতে শুরু করলেন, ‘আচ্ছা, আমি একটা ভূতের গল্প বলছি যেটা শুনেছি তোদের দিদার কাছে। এটা দিদার ছেলেবেলার গল্প। তোরা তো আমার কাছে শুনেছিস আগেই, তোদের দিদা ছেলেবেলায় থাকতেন বেরেলিতে। সেখানেই থাকতেন তাঁর বাবা-মা। বাবা-মায়ের আদরে খুব আনন্দে কেটে যেত তাঁর দিনগুলো। আমার দাদু ছিলেন সেখানকার একটা বিরাট দেশলাই কারখানার জেনারেল ম্যানেজার। বিশাল বাগানওলা বাড়ি, অনেক কাজের লোকজন, এমনকী তখনকার দিনে দাদুর একটা মোটরগাড়িও ছিল। মা যখন যা আবদার করতেন, তাই পেতেন। কিন্তু আমার দাদু ও দিদার ভাবনা হল তোদের দিদার পড়াশোনা নিয়ে। বেরেলিতে স্কুল থাকলেও সেখানে তো বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা

নেই, আর মেয়েকে বাংলা শেখাবেন না— এ-কথা আমার দাদু, দিদিমা চিন্তাও করতে পারতেন না। দাদু তো সুদূর বেরেলিতে থেকেও ডাকযোগে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই আনাতেন কলকাতা থেকে। দিদিমাও সেইসব বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন। দাদু বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এলে সন্ধ্যাবেলা দু-জনে একসঙ্গে বসে পড়তেন বাংলা বই। কাজেই তাদের দিদা একটু, বড়ো হতেই তাঁরা ঠিক করলেন তাঁকে ইলাহাবাদের স্কুলে ভরতি করে দেবেন। সেখানে বাংলার চর্চা আছে। বকুলবাসিনী বালিকা বিদ্যালয় তো ছিল খুবই নামকরা। যেসব জায়গায় বাংলা পড়ার ব্যবস্থা নেই সেসব জায়গার মেয়েদের অভিভাবকরা বকুলবাসিনীর হস্টেলে পাঠিয়ে দিতেন পড়াশোনার জন্য। হস্টেলের ব্যবস্থা ভালো ছিল, পড়ালেখাও ভালো হত, সেইসঙ্গে মেয়েরা বাংলাও শিখত।

‘এদিকে তাদের দিদার তো কী কান্না, বাবা-মাকে ছেড়ে থাকবার কথা তো তিনি ভাবতেই পারতেন না। দাদু, দিদিমারও খুব মনখারাপ। তাঁরাও লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে মেয়েকে বাংলা শেখানোর ব্যাপারটা সবচেয়ে আগে। কাজেই মন শক্ত করে তাঁরা তাদের দিদা অর্থাৎ আমার মাকে ইলাহাবাদে বকুলবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে মা থাকতে লাগলেন হস্টেলের মেয়েদের সঙ্গে। হস্টেলটা ঠিক অন্য পাঁচটা হস্টেলের মতো ছিল না, সব মিলিয়ে ছিল একটা ঘরোয়া ভাব। ছিল নানা বয়সের মেয়েরা। কেউ এসেছে জব্বলপুর থেকে, কেউ-বা মিরাট থেকে, কেউ-বা গোয়ালিয়র থেকে। হস্টেল দেখাশোনা করেন একজন মাসিমা, আর আছেন স্নেহময়ী নিত্যপ্রিয়াদি। সকলের প্রতি তাঁর এত যত্ন, এত প্রখর মনোযোগ যে, কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। রবিবার সকালে আসেন স্বাস্থ্যদিদিমণি সুশীলাদি। তিনি বাংলা জানেন না। তাঁর নিয়মকানুন কড়া ধরনের। ছোটো-বড়ো সকলকেই লাইন করে দাঁড়াতে হয়। সুশীলাদি এসেই মিলিটারি কায়দায় হাঁক পাড়েন, “নাখুন কি সফাই কে লিয়ে হাত উপর।” অমনই সকলে দু-হাতের পাতা উলটো করে উঁচুতে ধরে রাখে। সুশীলাদি কড়া চোখে তাকিয়ে দেখেন কার নখ অপরিষ্কার। সুশীলাদি খাতায় নোট করে নেন। তিনি চলে যাওয়ার আগে নেলকাটার দিয়ে নখ কেটে তাকে দেখাতে হয়— হাত আর অপরিষ্কার নেই। এইরকমই ব্যাপার হয় দাঁতের ক্ষেত্রে, এমনকী, অনেক সময় চুলের ব্যাপারেও।

‘এইভাবেই সকলের সঙ্গে মিলেমিশে দিদার আর ততটা মনখারাপ লাগছিল না, বিশেষত অতজন সঙ্গী তিনি কখনোই পাননি, বেরেলির বাড়িতে তাঁর একলা সময় কাটত। এর ওপর আবার ছিল হস্টেলের মেয়েদের বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম। কোনো রবিবারে চড়ুইভাতি হত খুসরুবাগের পেয়ারাবাগানে। শীতকালে সেখানে কত বড়ো বড়ো গোলাপ আর গাছে গাছে সাদার ওপর লালচে ছিট দেওয়া মিষ্টি

পেয়ারা। বাগানরক্ষককে বড়োদিদিমণি পৃথাদি বলেই রাখতেন মেয়েরা ইচ্ছেমতো পেয়ারা পেড়ে খাবে গাছ থেকে। পরে হিসেব করে দাম দেওয়া হবে।

‘কোনোদিন-বা নৌকো চড়ে চলে যাওয়া হত ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও লুপ্তধারা সরস্বতী এসে মিশেছে। সরস্বতী ঘাটের পাশে গভীর যমুনার জলের ওপর এসে পড়েছে সম্রাট আকবরের তৈরি দুর্গের ছায়া, ওপাশে মাঘমেলার সাধুসন্তদের ভিড়। দিদা ক্রমশই অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন হস্টেলের জীবনের সঙ্গে। সবচেয়ে আনন্দ হত বড়োদিদিমণি পৃথাদি যখন প্রত্যেকের জন্মদিন ঠিক ঠিক মনে রেখে জন্মদিনের কার্ড ও ছোটো ছোটো উপহার পাঠাতেন। পৃথাদি থাকতেন হস্টেলের কম্পাউন্ডের পাশের একটি খুব পুরোনো আমলের বাড়িতে। স্কুলটা তাঁর বাবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পৃথাদির যত্নেই স্কুলটার এত নামডাক হয়েছিল।

‘গরমের ছুটি হত দীর্ঘ দু-মাসের; মেয়েরা যে-যার বাড়ি চলে যেত। দিদাও বাড়ি গিয়ে দু-মাস ধরে দুপুরবেলা খসখসের পর্দা ঘেরা ঠান্ডা ঘরে শুয়ে, গল্পের বই পড়ে এবং রাত্তিরে বাড়ির লনে চাঁদের আলোয় চারপাইয়ে পাতা বিছানায় শুয়ে তরমুজের শরবত ও কুলফি মালাই খেয়ে আরাম করতেন। তারপর জুলাই মাসে আবার ইলাহাবাদের বকুলবাসিনীর হস্টেল। গোলমালটা বাঁধল ঠিক তখনই। সাধারণত এই সময়ে এত বৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু বৃষ্টি চলল দিনে-রাতে নাগাড়ে সাতদিন। হস্টেলটা ছিল একটা একতলা বাড়ি। ছাত থেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে জল পড়ে দিদাদের বিছানা ভিজে যেতে লাগল। আলকাতরা, পিচের চট, সিমেন্টের প্রলেপ সবই ধুয়ে যেতে লাগল বৃষ্টির তোড়ে। তখন উপায় বের করলেন পৃথাদি। বললেন, “আমার বাড়ির একতলাটা তো খালিই পড়ে থাকে। হস্টেলের মেয়েরা ওখানেই থাকবে বর্ষা কালটা। তারপর বৃষ্টি ধরলে, ছাত সারাই হলে আবার হস্টেলে ফিরে যাবে।” দিদারা তো সকলে দল বেঁধে চলে গেলেন পাশের কম্পাউন্ডে পৃথাদির বাড়ি। পুরোনো আমলের বাড়ি, সামনে গাড়িবারান্দা, চারপাশের কম্পাউন্ড ঘিরে পাঁচিল।

‘দিনেরবেলাটা তো স্কুলেই কেটে যেত, বিকেলবেলা সবাই এসে জড়ো হত পৃথাদির বাড়ির একতলার বিরাট বড়ো হল ঘরে। সেখানে সারি সারি খাট পাতা, মেয়েরা সেই ঘরেই শোয়। বর্ষার রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যেত তাড়াতাড়ি। সকলেই যে-যার খাটে বসে বই পড়ত। একসময় সকলেরই চোখ ঢুলে আসত ঘুমে। কেউ আগে, কেউ-বা একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ত। মাসিমা এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে যেতেন। প্রথম দু-এক রাত দিদার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। তৃতীয় দিন একটা কুকুরের একটানা ঘেউ ঘেউ ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের খাটে দীপালিরও ঘুম ভেঙেছে বোঝা গেল। ঘুম ভেঙেছে রূপারও। দিদা শুনলেন দীপালি আর রূপা বলাবলি করছে, “রোজ রাত্তিরে কুকুরের ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ঠিক ঘরের বাইরেই ডাকছে। দিনের বেলায় তো

অরাজকতা এলকুসিভ

কোনো কুকুর দেখি না এখানে। পৃথাদির তো কোনো পোষা কুকুর নেই।” দিদার যেন কেমন একটা অস্বস্তি হতে লাগল। এমন সময় জানলার পাশের খাটে শুয়ে থাকা বাণী হঠাৎ হাউমাউ করে চোঁচিয়ে উঠল, কে যেন তার বুকের ওপর চেপে বসেছে, উঠছে না কিছুতেই! দীপালি সকলের চেয়ে একটু বড়ো। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল। কেউ কোথাও নেই। যে-যার খাটে যে যেমন ছিল ঠিক তেমন ভাবেই শুয়ে আছে। কেউ বলল, হজম হয়নি তাই বুকচাপা হয়েছে, কেউ বলল সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে শ্বাস আটকে গেছে। বাণী কিন্তু আর জানলার ধারের খাটে শুতে রাজি হল না। দীপালির খাটে এসে দীপালির হাত জড়িয়ে ধরে তবেই ঘুমোল। দিদার তো সারারাত আর অস্বস্তিতে ঘুমই এল না, শুধু এপাশ আর ওপাশ করলেন।

‘পরের রাঙিরে মেয়েরা যে-যার খাটে শুয়ে ছিল। সকলেই যেন উৎকর্ণ হয়ে আছে কুকুরের ডাক শোনবার অপেক্ষায়। এর মধ্যে মিনতির আবার একটু টয়লেট যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। টয়লেট থেকেই ওর তীব্র চিৎকার শোনা গেল। দীপালি, রূপা আর অন্য মেয়েরাও ছুটে গেল সেদিকে। জানলা দিয়ে অস্পষ্ট তারার আলোয় যেন দেখা গেল একটা লাল শাড়ি পরা মেয়ে, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে চেনে বাঁধা একটা কুকুর, মিশে যাচ্ছে অন্ধকারের গভীরে। কুকুরের অস্পষ্ট ডাক শোনা যাচ্ছে, ঘেউ ঘেউ...।

‘মিনতি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, “ওই মেয়েটা। তার চোখ দুটো অন্ধকারে ধকধক করে জ্বলছে, যেন কুকুর নিয়ে তার বুকে চেপে বসতে চাইছিল।” এই কথা ক-টা বলে মিনতি যেন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। কাঁপছিল।

‘গোলমাল শুনে পৃথাদি দোতলা থেকে নেমে এলেন। সব শুনে কিন্তু মেয়েদের ভীরা বলে উপহাস করলেন না। বরং বললেন, “সব ঠিকই তো মিলে যাচ্ছে। তোমরা যে বর্ণনা দিচ্ছ, তা ঠিক আমার বোন বকুলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তার নামেই হয়েছে আমাদের এই বকুলবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়। তার পোষা কুকুরের নাম ছিল পপি। লাল শাড়ি ছিল বকুলের খুব প্রিয়। রোজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা অবধি সে লাল শাড়ি পরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল খুলে ঘুরে বেড়াত পপিকে নিয়ে। সেই পপিই একদিন পাগল হয়ে কামড়ে দিল বকুলকে। বকুলের মৃত্যু হল জলাতঙ্কে। পপিকে গুলি করে মেরে ফেলা হল। আমার বাবা তার নামেই গড়ে তুলেছিলেন এই বকুলবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়। আমি তাকে আর কোনোদিন দেখিনি, কিন্তু অনুভব করি সে যেন আছে কাছে-কাছেই।”

‘পৃথাদির কথায় সকলেই আরও ভয় পেয়ে গেল। ওদিকে বাইরে তখন অন্ধকারের বুক চিরে আবার পড়তে শুরু করেছে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। ক্রমশ মুখলধারে। পৃথাদি সকলকে সাহস দিয়ে বললেন, “কোনো ভয় নেই। ঘরের আর

টয়লেটের আলো জ্বালা থাকুক, আমি আজ তোমাদের সঙ্গেই থাকব সারারাত্তির। চলো, লুডো আর ক্যারম খেলা যাক। যাদের ঘুম পাবে, ঘুমিয়ে পড়বে। আমি জেগে আছি।”

‘পৃথাদির দেওয়া এই সাহসে মেয়েরা ক্যারম, লুডো এইসব খেলতে খেলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর ঘুম ভেঙে দেখে সকাল হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। সূর্যদেব উঁকি মারছেন। গতকাল রাত্তিরের অন্ধকারের আর ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

‘পৃথাদি কিন্তু আর কোনো ঝুঁকি নেননি। পরের দিন থেকেই হস্টেলের মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয় স্কুলের নতুন বাড়িতে। তারপর বর্ষার পরে ছাত সারাই হওয়ার পর পুরোনো হস্টেলে ফিরে যাওয়া। সে তো আর এক কাহিনি।’

এতক্ষণ একটানা গল্প বলার পর মা এবারে থামলেন। বাইরে আবার যেন একটা ঘোর লাগা কাজল কাজল ভাব। তুলি, অলি, তিতলি, চিকুলি সকলেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ছিল আর মন দিয়ে গল্প শুনছিল। তিতলি হঠাৎ একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘ও মাসিমণি, এখানে কোনো কুকুর নেই তো। ওই যে ঘেউ ঘেউ একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি।’

মা বললেন, ‘ও তো রাস্তার কুকুর, পোষা কুকুর নয়। ওর নাম পপি নয়, ওর নাম ভোম্বল। ওকে আমরা বাসি রুটি খেতে দিই, খিদে পেয়েছে তাই ডাকছে।’

[আনন্দমেলা, ২৭ এপ্রিল ১৯৯৪]

জলজ্যোত্তো ভূত

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ভূত নেই! কোন ভূতে একথা বলে র্যা?

কথাটা বলবার সময় একবার আড়চোখে তাকিয়ে ছিল টাকুমামা, তারপর আগের মতোই নিবিষ্ট মনে ফাঁকা মাঠে খালি হাতে স্কোয়ার কাট মারার ভঙ্গি করতে লাগলো।

সত্যি কথা বলতে কী, মাঠে নেমে খেলতে-টেলতে আমরা বিশেষ দেখিনি টাকুমামাকে; সবই ওই শ্যাডো প্র্যাকটিস! ক্রিকেটের সময় ক্রিকেট, ফুটবলের সময় ফুটবল, এমনকী ওলিম্পিক বা এশিয়াডের সময় শ্যাডো বক্সিং পর্যন্ত করতে দেখেছি মামাকে আমরা। অবশ্য খেলাধুলো যে করবে, সময় কোথায় টাকুমামার! সারাটা বছর তো চরকির মতো ঘুরছে, স্থির হয়ে বসবার সময় পায় একটা দিন!

না না, তাই বলে যদি ভাবো টাকুমামা চাকরি-বাকরি করে কী ব্যাবসা-ট্যাবসা দেখে, তাহলে কিন্তু ভুল করবে। সেসব ও কিসসু করে না, অথচ ফুরসত যে কাকে বলে সেকথাও জানে না টাকুমামা। কী করে জানবে বলো, রাজ্যের সমস্ত দায় তো টাকুমামারই ঘাড়ে! কার জমি বেহাত হয়ে যাচ্ছে, বড়ো উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, কার অসুখে একজন বড়ো ডাক্তার দরকার, কার মেয়ে কলেজে ভরতি হতে পারছে না, তার একটা ব্যবস্থা করা— সব কিছুই তো টাকুমামার মাথাব্যথা। আজ এখন আমাদের সঙ্গে গল্প-টল্প করছে বটে, কিন্তু গত সাত-আটটা দিন কি একবারও টিকি দেখা গেছে টাকুমামার! কে দু-জন বন্ধু বাঁকুড়ায় কীসব কাজকর্ম নিয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে ওই আদি অকৃত্রিম টাকুমামা। এমন লোক আর পাবে কোথায় বলো!

কীরে, বললি না, ভূত-টুত নেই বলে কে যেন লাফাচ্ছিল!

শ্যাডো প্র্যাকটিস করতে করতেই টাকুমামা একবার আমাদের দিকে ফিরল। কথাটা সত্যি যে বলেছিল— মানে ভোটকা, সে তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বসে আছে। পেটে একটা আচমকা খোঁচা খেয়ে মুখ দিয়ে ক্যাঁক করে আওয়াজ করে বললে, বারে! বাবা-কাকা সবাই তো বলে ভূত-টুত সব বাজে কথা, সব আমাদের চোখের ভুল!

বটে! বাজে কথা? আমাদের চোখের ভুল! তাহলে পরশুদিন যে ব্যাপারটা ঘটল সেটা কী শুনি? টাকুমামা শূন্যে ব্যাট হাঁকড়ানো ছেড়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, বাঁকুড়ায় গিয়ে যে এবার স্বচক্ষে দেখে এলুম র্যা! বল সেটাও আমার চোখের ভুল?

দূর, ছাড়ো তো ওর কথা, তাড়াতাড়ি বলে উঠল ফটিক। কারণ সত্যিই বলুক আর মিথ্যেই বলুক, টাকুমামার গল্পগুলো শুনতে কিন্তু দারুণ লাগে। সেই জন্যেই তো আমরা টাকুমামার এত ভক্ত। আসলে টাকুমামা তো আমাদের কারোরই নিজের মামা নয়, পিকুর মামা— তা পিকু তো নড়েই না পড়ার ঘর ছেড়ে। তা সত্ত্বেও আমরা সবাই মিলে যে টাকুমামাকে আমাদের মামা বানিয়ে ফেলেছি সে কি আর অমনি অমনি! কাজেই এবার তিন-চার জন প্রায় একসঙ্গে বলে ফেললাম, বলো না টাকুমামা কী দেখলে স্বচক্ষে? ভূত!

সেই রকমই তো মনে হয়েছিল! কিন্তু ভোটকা আবার যখন এসব বিশ্বাস করে না— ছাড়ো তো ওসব! বলো মামা, কী দেখলে বলো, রসিক বললে।

আড়চোখে একবার ভোটকার মুখটা দেখে নিল টাকুমামা, তারপর পাশের ভাঙা গাছের গুঁড়িটার ওপর জমিয়ে বসতে বসতে বললে, কথাটা অবশ্যি আমি এসে থেকেই তোদের বলবো বলবো ভাবছি, কারণ ব্যাপারটা আমার মাথাতেও ভালো ঢোকেনি। যত বারই ভাবতে যাচ্ছি, সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আসলে ওখানে গিয়ে দু-দিন ধরে প্রচণ্ড ঘোরাঘুরি হয়েছিল তো, শরীরটাও ছিল বেজায় ক্লান্ত। কাজেই সত্যিই সব ঠিকঠাক দেখেছি কিনা—

আঃ! পুটে অধৈর্য হয়ে বললে, তুমি বলোই না ব্যাপারটা গোড়া থেকে।

না না, গোড়া থেকে বলবার অতো সময় নেই আমার। বাঁকুড়ায় গিয়েছিলুম দুই বন্ধুর সঙ্গে, তোরা জানিস। তো, তিন দিনের দিন প্রচণ্ড ক্লান্ত শরীরে রাত দশটা নাগাদ গিয়ে হাজির হলুম একটা হোটেলে। তখন বিশেষ কিছু খুঁটিয়ে দেখবার মতো অবস্থা ছিল না আমাদের কারোরই, তবে এটুকু মনে আছে হোটেলের চেহারাটা মোটেই সুবিধের নয়। এমনিতে অবশ্য দোতলা বাড়ি, কিন্তু একেবারে আদ্যিকালের— চুনবালি খসে পড়ছে কোথাও, কোথাও ছোপ ছোপ স্যাঁতাপড়া দাগ। কিন্তু অত বাহবার সময় তো আর ছিল না তখন। রাতও হয়েছে অনেক, তার ওপর সারাদিন ঘুরে শরীরেও আর বিশেষ কিছু নেই। তাই আমি যদিও একটু কিন্তু কিন্তু করছিলুম, বন্ধুরা বললে মরি-বাঁচি এখানেই থাকবো, এখন আর নতুন করে হোটেল খোঁজা সম্ভব নয়।

অগত্যা ওখানেই উঠতে হল। মালিক বললে, খাওয়া-দাওয়াটা আগে সেরে নিন, নইলে বুঝতেই তো পারছেন, ছোটো হোটেল—

তা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কারোরই তখন তত উৎসাহ নেই, আমরা চাই একটু শুতে। টেনে একটা ঘুম মারতে না পারলে কি আর পরের দিন

কাজের ধকল সামলাতে পারবো! তাই নীচে যাহোক দুটো পেটে পুরেই ওপরে উঠলুম লম্বা হবার জন্যে।

কিন্তু বলবো কী তোদের, ঘর দেখেই আমার মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল। ওদের জন্যে একটা ডাবল বেডের ঘর, সেটা তবু চলে যায়, কিন্তু আমার ঘরখানা কী! এ যে একেবারে গারদখানা! একে এই গরমের দিন, তার ওপর পিনপিন করে সাবেক আমলের যে ফ্যান ঘুরছে সেটার দিকে তো ঘণ্টাখানেক তাকিয়ে থাকতে হয় ঘুরছে কিনা বুঝবার জন্যে।

বললুম সেকথা মালিককে। বললুম, এর চেয়ে একটা শতরঞ্চি দিন, দিবা ছাদে চলে যাই, ফুরফুরে হাওয়ায় চমৎকার ঘুম এসে যাবে।

মালিক ভাবে বুঝি ঠাটা করছি আমি। সেও রাজি নয়, আমিও ছাড়ব না। শেষকালে বললে, দেখুন ছাদে শোওয়ার কথাই যদি বলেন তাহলে আর একটা প্রস্তাব দিতে পারি আপনাকে। ছাদে একখানা ঘর তুলছি, সেটা সব প্লাস্টার করা হয়েছে আজ। জানলা দরজা বসেছে, ঘরটাও বড়ো, তবে ইলেক্ট্রিকের কাজ-টাজ কিছু হয়নি। এই অবস্থায় যদি শুতে পারেন—

প্রস্তাবটা একেবারে লুফে নিয়ে আমি বললুম, আরে চলুন তো মশাই! এই গুমোট গরমে আপনার গারদঘরে পচে মরার চেয়ে তিনতলার অন্ধকার ঘর অনেক ভালো। রাত্তিরে আবার আলো কী হবে!

কথাটা যে নেহাত মিথ্যে বলিনি, ওপরে উঠেই টের পেলুম সেটা। হালকা তোশকের ওপর চাদর আর একটা সস্তামার্কী মশারি— ব্যস। গা ঠেকিয়েছি কি ঠেকাইনি, দু-চোখ জুড়ে এল একেবারে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল আচমকা!

চুপ করলে টাকুমামা। বিকেলে খেলতে এসে টাকুমামার দেখা পেয়েছিলাম। গরমের দিন, তাও এখন সন্ধে হয়ে এসেছে— এম্মুনি না উঠতে পারলে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। তবু দেখি কারোরই ওঠার বেশি গা নেই। সন্টে বললে, সেকী টাকুমামা, ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল কেন?

আরে সেইটাই বুঝতে পারিনি রে প্রথমে। টাকুমামা রহস্যময় হাসি হেসে বলল, মনে করছিলুম স্বপ্ন দেখছি বুঝি। এমন সময় গায়ে যেন ছপাৎ করে জল এসে পড়ল খানিকটা। বারকতক এইরকম হতেই ঘুমজড়ানো চোখে ধড়মড় করে উঠে বসতেই বোঝা গেল সেটা স্বপ্ন নয়।

কেন, কেন? মুহূর্তের অবকাশ সহ্য করতে পারেনি রসিক, কী দেখলে তুমি? কী করে আর দেখব, আলো ছিল ওপরে! একটা মোমবাতি রেখে গিয়েছিল মালিক, সে তো শোবার সময়ই নিবিয়ে রেখে দিয়েছি। তবে দেখার অবশ্য দরকার ছিল না, ততক্ষণে বালিশ বিছানা সব একেবারে ভিজে সপসপ করছে।

অরাজকতা এককুসিভ

সেকী! সত্যি সত্যি জল? ভোটকা থাকতে না পেরে বলে উঠেছে।

জল! শুধু বিছানা নয়, আমার গা নয়— উঠে মোমবাতি জ্বলে দেখি ঘরের মেঝে, দেওয়াল, এমনকী ছাদে পর্যন্ত জল। জল সেখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে তখনও।

বৃষ্টি-ফিস্টি হয়নি তো! আমি বলে ফেলেছি।

আমিও তো সেটাই ভেবেছিলুম। জানলা-টানলা সব খোলা ছিল তো! টাকুমামা বললে, কিন্তু মোমবাতি হাতে ছাদে এসেই ভুল ভাঙল। বৃষ্টি কোথায়, আকাশে দিব্যি একেবারে তারা ফটফট করছে। আর তার চেয়েও বড়ো কথা, সমস্ত ছাদ তো শুকনো খটখটে, যত জল তো সব আমারই ঘরের মধ্যে।

ভালো করে ঘুমের ঘোর কাটেনি তখনও, ভাবলুম ঠিক দেখছি তো! নাকি এখনও সেই স্বপ্নের মধ্যেই রয়েছি! না, তাই বা কী করে হবে! ওই তো রাতের আকাশ, খোলা ছাদ, মোমবাতি হাতে আমি।

মাথার ভেতরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। ঘড়ি দেখলুম, বারোটা বেজে গেছে। এই সময় নীচে নেমে বন্ধুদের ডাকলে নির্ঘাত ওরা আমাকে ভীতু ভাববে। তা ভাবুক, ভূতের ভয় থাকুক আর না-ই থাকুক, জলের উপদ্রব সামলাবার জন্যে নীচে তো আমাকে যেতেই হবে। মেঝেয় এইরকম জলের সমুদ্র নিয়ে তো আর কেউ শুয়ে থাকতে পারে না!

ছাদের দরজা মালিক যাবার সময় ওদিক থেকে বন্ধ করে গিয়েছে। জানি না আওয়াজ করলে ওদের ঘুম ভাঙবে কিনা, কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে!

দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েই বুঝতে পারলুম সেটা আলগা, ঠেলতেই খুলে গেল। আর তারপরই যা দেখলুম, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার।

দরজার ঠিক পেছনটিতেই দাঁড়িয়েছিল সে! একেবারে ছায়ামূর্তির মতো, নিঃশব্দে।

না, মেয়েটার বয়স বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না। চোখগুলো কোটরে ঢুকে গিয়েছে, রুম্ম চুল উড়ছে মাঝে মাঝে। চোখে চোখ পড়লেই কেমন শিরশির করে ওঠে বুকের ভেতরটা।

সত্যি কথা বলতে কী, বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম কিছুক্ষণ ওই অবস্থাতেই। সংবিৎ ফিরতেই বন্ধুদের নাম করে চিৎকার করে ডেকে উঠলুম।

এতক্ষণ একেবারে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। আমাকে ওইভাবে এসে দাঁড়াতে দেখেও কিছু বলেনি। এবার আমি চিৎকার করার পর প্রথম ওর ঠোঁট দুটো নড়তে দেখলুম। ফিসফিস করে কথা বলছিল, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম। ও বললে, ছাদে গিয়ে দাঁড়ান বাবু, আপনার বিছানা আমি পালটে দিচ্ছি।

মানে? গায়ে জল ঢেলেছ তাহলে তুমি?

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

হ্যাঁ, বাবু, আমিই ঢেলেছি।

আশ্চর্য তো! ঘরে জল, বিছানায় জল—

আপনি ভাবলেন বুঝি ভূতপেরেতের কাজ, তাই না? তা নয়, আমিই ঢেলেছি বটে। আপনি যে ঘরে ছিলেন আমি জানবো কেমন করে বলুন! মেনেজারবাবু তো বলেনি আমাকে।

তুমি হঠাৎ জলই বা ঢালতে যাবে কেন! পাগল নাকি তুমি!

পাগল হব কেনে! মেনেজারবাবু যে বলেছিল, পেলেস্টার হইছে, কামিনী, তু ভালো করে জল ছিটাই দিবি। তা কাজ সারা হতে তো রাত হয় বাবু, তাই দিলোম এখন দু-বালটি জল! এই নিন বাবু গামছা, আপনি গাটো মুছে ফেলান, আমি ঘর নিকিয়ে বিছানা পালটে দিয়ে যাচ্ছি।

না, শুধু বলা নয়, পালটেও দিল। সবে গা-টা মুছেছি কি মুছিনি, ঘর একেবারে ঝকঝকে তকতকে হয়ে গেল। আর তারপর যা ঘুম একখানা হল না! বুঝলি রসকে, ভাঙল একেবারে সকাল আটটা নাগাদ।

চুপ করল টাকুমামা। তারপর যেন হঠাৎই খেয়াল হয়েছে এইভাবে বললে, দেখেছিস কাণ্ড, চল, চল, রাত হয়ে গেল যে রে! ইস, এতক্ষণ তোদের—

তুমি থামো তো! গলা বেরোল ভোটকার এবার, প্রায় সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, এটা কী হল শুনি?

কোনটা?

এই গল্পটা! ভোটকার মুখে ব্যঙ্গের হাসি আমরা অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি। এটা ভূতের গল্প হল?

হল না?

ছাই হল! এটা হল হাসির গল্প।

আমিও তাই ভেবেছিলুম, একটু অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে টাকুমামা বলল, ভুলটা ভাঙল দুপুরের খাওয়া সেরে হোটেল ছেড়ে চলে আসবার সময়।

কেন, কী হল তখন?

ম্যানেজারবাবুকে রাতের ব্যাপারটা সব খুলে বললুম, মানে একটু ধন্যবাদ জানানোর জন্যে আর কী! তখন তিনিই বললেন কথাটা।

কী কথা?

কামিনী সেই হোটেলে ঢুকেছিল তিরিশ বছর আগে, মানে হোটেলটা যখন খোলা হয় প্রথম। বছর দশেক আগেই সে মারা গেছে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে।

বাঁশবনের বামনি

মঞ্জিল সেন

অনেক চেষ্টা করেও নিখিলেশ সাড়ে তিনটার আগে আপিস থেকে বেরুতে পারল না। মাড়োয়ারি ফার্ম, কাজ শেষ না করে বেরুবার উপায় নেই, শনিবারের হাফ-ডে বলেও কিছু নেই। বেরিয়েই ছুটল হাওড়া স্টেশনে, সোয়া চারটায় লোকাল ট্রেনটা ওকে ধরতেই হবে, নইলে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

নিখিলেশের আপিসপাড়ার বন্ধু হল অখিল। পাশাপাশি আপিসে চাকরি করে, টিফিনের সময় বাইরের ফুটপাথে খাবার খেতে গিয়ে আলাপ। তা আপিসপাড়ায় ফুটপাথে দোকানিরা খাবারের যা পসরা সাজিয়ে বসে, তা দেখে জিভে জল এসে যায়। অস্বাস্থ্যকর কিনা সেটা আর ভেবে দেখার সময় থাকে না। যার পকেটে যেমন পয়সা তেমন বেছে নাও। নিখিলেশ সাধারণত দু-পিস টোস্ট আর একটা সিঙ্গাপুরী কলা দিয়েই টিফিন সারে। কিন্তু ডিমের ডালনা কি চপ-কাটলেট মাঝে মাঝে যেন হাতছানি দেয়, টানাটানি থাকলেও লোভ সামলাতে পারে না। এই খেতে গিয়েই অখিলের সঙ্গে আলাপ। নিখিলেশ লক্ষ করেছিল ভদ্রলোক প্রায় দিনই ওই সব দামি খাবার খান, জামাকাপড় দেখেও বোঝা যায় ভালোই চাকরি করেন। ওরই সমবয়সি।

আলাপ হবার পর অখিল জোর করে ওকে চপ-কাটলেট খাইয়েছিল। নিখিলেশের কোনো আপত্তি শোনেনি। অখিল একটা ভালো সওদাগরি আপিসে চাকরি করে, গ্রামে বাড়ি-জমি সব আছে। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। নিখিলেশ মেসে থাকে শুনে বলেছিল, তবে তো আপনার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট, গিন্নির হাতের রান্না কপালে জোটে না।

নিখিলেশ হেসে জবাব দিয়েছিল, সে সব বালাই ওর নেই। মেদিনীপুরে মাথা গুঁজবার একটা চালা আছে, আর আছে বিধবা মা, এক অবিবাহিতা বোন আর বেকার এক ভাই। এই সব ভালো ভালো খাবার ওর কাছে যে বিলাসিতা সেকথা ও গোপন করেনি। অখিল ওর বাড়ির অবস্থা জানার পর মনে মনে দুঃখ পেয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে আপিসে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

নিয়ে আসত, নিখিলেশকে বলত ওর বউ পাঠিয়েছে— ওদের দু-জনের জন্য। নিখিলেশের আত্মসম্মানে যাতে যা না লাগে, তাই এই ব্যবস্থা করেছিল অখিল। আসলে নতুন বন্ধুটিকে খুব ভালো লেগেছিল ওর। নিখিলেশ যে ব্যাপারটা বুঝত না তা নয়, কিন্তু চুপ করে থাকত। প্রতিবাদ করতে গেলে যদি বন্ধুবিচ্ছেদ হয়! তা ছাড়া বছরের পর বছর মেসে থেকে মোচার ঘন্ট, ধোঁকার ডালনা এসবের স্বাদ তো ও ভুলেই যেতে বসেছিল।

ওদের বন্ধুত্বটা কিন্তু বেশিদিনের নয়, এক বছরের কি দেড় বছরের। এর মধ্যে কয়েক বারই অখিল তার বন্ধুকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু নিখিলেশ সময় করে উঠতে পারেনি। বেকার ভাইকে গত মাসে একটা মুদির দোকান করে দিয়েছে, তাই নিয়ে কিছুদিন ব্যস্ত ছিল। তা ছাড়া বোনের বিয়ের ব্যাপারে ছুটি-ছটার দিন ছুটোছুটি করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় কথা অনেকটা এগিয়েছে, পাত্রপক্ষের তেমন কিছু দাবিদাওয়া নেই। নিখিলেশের মন অনেকটা হালকা।

অখিল দিনকয়েক আপিসে আসছিল না। নিশ্চয়ই অসুখ-বিসুখ করেছে। নিখিলেশ ভাবছিল একবার গিয়ে দেখে আসবে কিনা। এই সময় অখিলের চিঠি এল। ওর ম্যালেরিয়া হয়েছে, খুব কাহিল হয়ে পড়েছে, যদি সম্ভব হয় নিখিলেশ একবার যেন তাকে দেখে আসে। তাই এই শনিবার নিখিলেশ চলেছে বন্ধুর বাড়ি।

হাওড়া স্টেশন থেকে দেড় ঘণ্টার পথ। লোকাল ট্রেন ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি থামে না বলেই সময়টা একটু বেশি লাগে। পৌঁনে ছ-টায় ও যখন ট্রেন থেকে নামল তখন শেষ বিকেলের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তার পরেই ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসবে।

স্টেশনে বেশ কিছু লোক নেমেছিল। তাদের দু-একজনকে অখিলের বাড়ির রাস্তাটা জিজ্ঞেস করতেই একজন বলল সে ওই পাড়াতেই যাবে, অখিলের বাড়ি ছাড়িয়ে দুটো বাড়ির পর, নিখিলেশ তার সঙ্গে নিল।

কাঁচা রাস্তা, আশেপাশে দালান-কোঠা চোখে পড়লেও জায়গাটার তেমন উন্নতি হয়নি, পাড়াগাঁই বলা চলে। পথের দু-পাশে ঝোপঝাড়, রাস্তায় আলো নেই। গোটা দুয়েক মোড় পেরোতে হল, সঙ্গে লোকটি না থাকলে অসুবিধেই হত। ওকে দেখে অখিল তো মহা খুশি। বেচারা ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগা হয়ে গেছে, গলা দিয়ে চিঁচিঁ করে শব্দ বেরুচ্ছে, কিন্তু নিখিলেশকে দেখে ওর শরীরে যেন বল ফিরে এল। বউয়ের সঙ্গে আর পাঁচ বছরের মেয়ে মিনুর সঙ্গে বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিল।

অখিলের স্ত্রী নিখিলেশকে রাতটা থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করল, কিন্তু নিখিলেশ বলল ওকে রাতে ফিরতেই হবে। সুকালবেলা বোনের বিয়ের ব্যাপারে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

পাকা কথা বলতে ওকে সোনারপুর যেতে হবে। এর পর অবিশ্যি অখিল আর তার বউ আর পীড়াপীড়ি করল না।

অল্প সময়ের মধ্যেই অখিলের বউ গরম গরম লুচি, বেগুন ভাজা আর ডিমের ডালনা দিয়ে ওকে পেট পুরে খাইয়ে দিল। সব শেষে আগে থেকে বানানো এক বাটি ঘন দুধ ওর সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, ‘এ কলকাতার জল দেওয়া দুধের ক্ষীর নয়, আমাদের নিজেদের গোরুর দুধের, খেয়ে দেখুন।’

সত্যিই অপূর্ব!

অখিলের মুখেই নিখিলেশ শুনল ওদের যা জমি-জমা আছে তাতে বছরকার ধান, তরি-তরকারি হয়েও উদ্ভৃত থাকে, তা বিক্রি হয়। একটা পুকুরও আছে, তাতে মাছ ছাড়া হয়, সেই মাছও বিক্রি হয়। গোয়ালে দুটো গোরু আছে। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল।

ওখান থেকে বেরুতে বেরুতে রাত আটটা হয়ে গেল। অখিলই বলল, ‘নতুন জায়গা, সাবধানে যেও। পথ ভুল হয়ে গেলে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে নিও, কেমন?’ স্টেশন থেকে অখিলের বাড়ি বেশ দূরেই, হাঁটা পথে আধঘণ্টার কম নয়।

বাইরে ফুটফুটে জোছনা। কলকাতা শহরে জোছনার আসল রূপটা চোখে পড়ে না। মফঃসসলে, গ্রামেগঞ্জে রূপালি আলোর যেন বন্যা বয়ে যায়। ধানের খেতের ওপর, ঝোপঝাড়ের ওপর, বাঁশঝাড়ের ওপর জোছনার আলো যেন গা হুমহুম করা এক মায়া সৃষ্টি করে।

নিখিলেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। পেটটা বেজায় ভরে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে অখিলের কথাই ভাবছিল নিখিলেশ। বেশ সুখী পরিবার। লক্ষ্মীমতী গৃহিণী। অল্প সময়ের মধ্যে কত কিছু খাইয়ে দিলেন, আর কী যত্ন! ওদের মেয়ে মিনুও খুব মিষ্টি। নিখিলেশ যখন বেরোচ্ছে, বলেছিল, ‘আবার এসো কাকু।’ ভগবান ওদের অভাব রাখেননি।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওর হঠাৎ মনে হল ও বোধ হয় ঠিক পথে যাচ্ছে না। এতক্ষণে প্রথম মোড়টা পেরিয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু এখনও সেই মোড়ে ও পৌঁছোল না কেন! তা ছাড়া বাঁ-দিকের ওই মস্ত বাঁশঝাড়টা তো আসার সময় চোখে পড়েনি। না, ওর পথ ভুল হয়েছে। কিন্তু ধারে-কাছে জন-মনিষ্যও চোখে পড়ে না, যাকে ঠিক রাস্তাটা জিজ্ঞেস করবে। এদিকে ন-টার ট্রেনটা না ধরতে পারলে আজ আর ট্রেন নেই, সারারাত এখানেই কাটাতে হবে। রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়ল নিখিলেশ। বড়ো নির্জন জায়গা, আশেপাশে একটা বাড়ি চোখে পড়ছে না; এখন কি আবার উলটো পথ ধরবে!

ঠিক তখুনি ও দেখতে পেল বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে কে যেন আসছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে একটা সাদা মূর্তি। কাছে আসতেই বুঝতে পারল সাদা কাপড়

অরাজকতা এককুসিদ্ধ

পরা একটি বউ, ঘোমটায় মুখ ঢাকা। এমন লজ্জাবতীর কাছে পথের হৃদিস পাওয়া যাবে কি! তবু ও বলল, ‘স্টেশনের পথটা কোনদিকে বলতে পারেন? আমি ভুল পথে চলে এসেছি।’

বউটি থমকে দাঁড়াল, তারপর হাতের ইঙ্গিতে ওকে তার অনুসরণ করতে বলে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগল। নিখিলেশ নিশ্চিত মনে তার অনুসরণ করল। যাক, ওকে আর গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে বউটির পেছন পেছন একটা প্রান্তরে এসে পড়ল নিখিলেশ। ওর কেমন যেন সন্দেহ হল। এ কোথায় নিয়ে এল তাকে বউটি! প্রান্তর পেরিয়ে স্টেশনের আলোর কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কাছেই কয়েকটা শেয়াল ডেকে উঠল! গা হুমহুম করে উঠল নিখিলেশের। কে এই বউটি, এমন জায়গায় তাকে নিয়ে এল কেন!

‘আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?’ নিখিলেশ বলে উঠল, ‘এদিকে তো স্টেশন নয়।’

এবার বউটি ঘুরে দাঁড়াল। নিখিলেশের থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই ঘোমটা খুলে ফেলল বউটি আর ভীষণ চমকে উঠল নিখিলেশ। আলুখালু কেশ, ভাঁটার মতো চোখ, মুলোর মতো দাঁত— এ তো মানবী নয়, পেতনি!

ভীষণ আতঙ্কে হিম হয়ে গেল ওর শরীর, তারপরই অন্ধের মতো ও দৌড়ল। কোথায় যাচ্ছে, কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই খেয়াল নেই, ওর শুধু একটাই চিন্তা, যেমন করেই হোক এই প্রেতিনির কাছ থেকে দূরে যেতে হবে। ও ছুটছে আর মনে মনে মা কালীকে জপ করছে। ওর পেছনে ভেসে আসছে খল খল হাসি, ওটা ওকে ছাড়ছে না, পেছন পেছন আসছে।

হঠাৎই এক জায়গায় আলোর চিহ্ন চোখে পড়ল ওর। কেউ যেন আগুন জ্বালিয়ে কিছু করছে। পড়ি-মড়ি সেই আগুন লক্ষ্য করে ও ছুটল আর জোরে জোরে মা কালীকে ডাকতে লাগল।

আগুনের কাছে এসে ও আবার চমকাল। একজন জটাধারী মানুষ আগুন জ্বালিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। একটা হরিণের ছালের ওপর তিনি বসে আছেন, সামনে কমণ্ডলু আর একটা...একটা মড়ার মাথার খুলি। আরও কিছু পূজার উপাচার সাজানো রয়েছে আর সামনে রয়েছে ভীষণদর্শনা শ্মশানকালীর একটা ছোটো মূর্তি। নিখিলেশ বুঝতে পারল ও একটা শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছে আর যিনি ধ্যানমগ্ন তিনি একজন কাপালিক। স্টেশনের পথ দেখাবার ছলে ওকে এই শ্মশানে নিয়ে এসেছে প্রেতিনিটা, বোধ হয় ওকে সাবাড় করার মতলব ছিল। আশেপাশে কিছু মানুষের হাড়ও চোখে পড়ল ওর।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ও সেই কাপালিকের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, আর দাঁড়াবার ক্ষমতা ওর নেই।
ধ্যানে বাধা পড়ায় ভীষণ বিরক্ত হয়ে তাকালেন সেই কাপালিক, জবাফুলের মতো
তার দু-চোখ লাল।

‘কে তুমি? কী করছ এখানে?’ প্রায় গর্জন করে উঠলেন তিনি।

নিখিলেশ একনিশ্বাসে তার বিপদের কথা খুলে বলল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে
থাকা সেই শ্বেতবসনা মূর্তিকে দেখিয়ে বলল, ‘ওই দেখুন, এখনও দাঁড়িয়ে আছে,
আমাকে রক্ষা করুন!’

কাপালিকের কপালে গভীর রেখা পড়ল। তিনি কমণ্ডলু থেকে হাতে জল
নিয়ে বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়লেন তারপর সেই মূর্তির দিকে ছিটিয়ে বললেন,
‘দূর হা’

চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই মায়াবিনী মূর্তি। কাপালিক বললেন,
‘এই রাতটা এখানেই থেকে যাও, ওটা ওই বাঁশঝাড়েই থাকে। নতুন কোনো মানুষ
রাগ্তিরে ওখানে এসে পড়লে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শ্মশানে নিয়ে আসে, তারপর—’

কাপালিক কথাটা শেষ করলেন না, কিন্তু নিখিলেশের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল।
ও বলল, ‘কে ও?’

‘যখন বেঁচে ছিল’, কাপালিক বললেন, ‘ওর নাম ছিল সদু বামনি। বিধবা,
ছেলে-মেয়ে ছিল না। খুব ছিল দুষ্ট স্বভাবের আর ওর ঝগড়ার চোটে গাঁয়ের লোক
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ওকে একঘরে করা হয়। ও নাকি বলেছিল
পেতনি হয়ে সবার ওপর শোধ নেবে। পুরুষ মানুষের ওপরেই ছিল ওর যত
রাগ। ওই বাঁশঝাড়েই গলায় কাপড় দিয়ে ঝুলেছিল। যাক, আর কথা নয়। তুমি
এখানেই শুয়ে পড়ো।’ তারপরই তিনি দু-চোখ বুঁজলেন।

ভীষণ উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল নিখিলেশ। ওই মাটির ওপরেই ও
শুয়ে পড়ল, গাঢ় ঘুম আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। যখন ঘুম ভাঙল, পূর্ব আকাশ
লাল। কাপালিক তখনও ধ্যানমগ্ন, একটু পরেই তিনি চোখ খুললেন। হেসে
বললেন, ‘আর ভয় নেই, দিনের বেলায় ওদের কোনো ক্ষমতা থাকে না। তুমি
এবার যেতে পারো।’

দিনের আলোয় গত রাত্রির ঘটনা মনে হচ্ছিল যেন দুঃস্বপ্ন। তবু ওই
বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় গা ছমছম করে উঠল নিখিলেশের। একটু
জোরেই পা চালিয়ে পার হল জায়গাটা।

[শুকতারা, বৈশাখ ১৪০৪ (এপ্রিল ১৯৯৭)]

আলোক ভাষা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখেছিলাম ওয়ালটেয়ারে। যে-বাড়িতে উঠেছিলাম, সেটিকে বাড়ি না বলে অটালিকা বলাই বোধ হয় ভালো। ওয়ালটেয়ার রেলস্টেশনে নেমে ঘোড়ায় টানা যে গাড়িতে উঠেছিলাম, সে গাড়ির গাড়োয়ান আমার কাছ থেকে ‘কোথায় যাব’ সেই ঠিকানা শুনে এরাস্তা-সেরাস্তা করে এই অটালিকারই পিছনের উঠানে এনে নামিয়ে বলল, এই সেই বাড়ি।

আমি নতুন এসেছি, কাগজে লেখা ঠিকানাটা আবার দেখে নিয়ে বললাম, এই যে রাস্তায় এসে পড়লাম, এটাই কি বিচ রোড?

সে তার ভাষায় যা বললে তার বাংলা হল, না বাবু, এটা বিচ রোড নয়, সেটা গেছে বাড়ির সামনে দিয়ে। সেদিকে যেতে গেলে একটু ঘুর হত বলে এই রাস্তায় এলাম, এটাই সংক্ষিপ্ত পথ।

আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ওয়ালটেয়ার নামটা শুধু জানা ছিল, এ সম্বন্ধে আর কিছু ধারণায় ছিল না। তাই ওর ভাড়া মিটিয়ে আমার সুটকেস-বেডিং হাতে নিয়ে একটু এগিয়েই আমার চেনা লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার এখানে এসে ঐরই সঙ্গে দেখা করার কথা। ইনিই আমার কোম্পানির মালিকদের একজন। আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন, এসেছ? এসো। এই গলি দিয়ে সামনে চলে যাও। সামনের দিকেই আমাদের ঘর। বাস-বেডিং নামাও, ওসব রামলু নেবে খন।

পরে জেনেছিলাম রামলু হচ্ছে চাকরের নাম। ওঁর হাঁক ডাকে সে এসে গেল। ছোকরা চাকর, বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি নয়। সে আমাকে পথ দেখিয়ে সামনের দিকে নিয়ে চলল। মালিকদের যিনি একজন, তিনি বললেন, তুমি যাও, আমি মিনিট দশেক পরে আসছি একটা দরকারি কাজ সেরে। উনি চলে গেলেন।

আমি যে পথটি ধরলাম সেটি ‘পথ’ নয়, সাড়ে তিন ফিট চওড়া ভিতরের বারান্দা। তার ডান দিকে সারি সারি ঘরের দরজা, যেখানে অন্য ভাড়াটেরা থাকে।

রামলুর পিছন পিছন পা ফেলতে গিয়ে বুঝলাম, সামনে একটু এগোলেই আমাদের ঘরে পৌঁছে যাব। ডান দিকে পড়ল অন্য দুটি ঘরের দুটি দরজা, তাদের সামনে পর্দা টাঙানো আর বাঁ-দিকে নিরেট দেওয়াল, ওটা নিশ্চয়ই কোনো ঘর তার দরজা সামনের দিকে। রামলুকে দেখলাম সামনের ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। বুঝলাম ওটাই আমাদের ঘর। সরু বারান্দাটা শেষ হয়েছে ওই ঘরের দরজা ছাড়িয়ে দু-পা ফেলবার পর। এখানে একটা রেলিং, রেলিং-এর বাঁ-দিক দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। সেটা ভালো করে দেখবার জন্য রেলিং-এর কাছে এগিয়ে যেতেই সামনে যে দৃশ্য পড়ল, তা দেখে চমকে গেলাম।

সেই আমার প্রথম সমুদ্র দর্শন। রেলিং-এর বাঁ-দিকে যে সিঁড়ির কথা বলেছিলাম, সেই সিঁড়ি দিয়ে আট-দশটা ধাপ নামলেই সবুজ ঘাসে-মোড়া চমৎকার ‘লন’ একটি। তার বাঁ-পাশ দিয়ে পাথরে-গাঁথা অট্টালিকাটির প্রশস্ত সিঁড়ি নেমে গেছে একটা পিচ ঢালা রাস্তার ওপর, চওড়ায় যেটা যোলো ফিটের বেশি হবে না। পরে জেনেছিলাম, এরই নাম ‘বিচ রোড।’ এই বিচ রোডটি পার হলেই সমুদ্রের অপরিসর বালুবেলা। তারপরেই সমগ্র দিগন্ত জুড়ে সমুদ্রের বিস্তার হয়েছে। বালুবেলার ওপর ঢেউ এসে পড়ছে সাদা সাদা ফেনা নিয়ে। অদূরে বিশাল সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে, যাকে বলে ‘ব্রেকার’। আর ভাঙার পরেই শব্দ হচ্ছে, যেন কোনো ক্রুদ্ধ সিংহ গর্জন করছে! সমুদ্র জুড়ে রং-ই বা কী! আকাশটা ফিকে নীল। দিগন্তের কাছে সমুদ্র যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে, সেখানটা একটু কালো। যেন দিগন্ত জুড়ে কেউ একটা কালো সরলরেখা টেনে দিয়েছে। তার ওপরে আকাশে শোভা পাচ্ছে সাদা সাদা মেঘ; তারা যেন দলবেঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে।

সমুদ্রের রং ঘোর নীল, কিন্তু তীরের দিকে যেখানে ঢেউ ভাঙছে, সেখানকার রং সবুজ-সবুজ আর ঢেউয়ের মুখে সাদা ফেনা। সেই সাদা রং তার সঙ্গে মিশে সবুজ, নীল ঘোর নীল, আর দিগন্তে কালোর আভাষ— সব মিলিয়ে রঙের যে সমাবেশ ঘটিয়েছে, তা দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

এই পরিবেশে আমি সাত বছর কাটিয়েছিলাম। মাঝে কিছু কালের সমুদ্র ভ্রমণ বাদ দিলে ওই অট্টালিকার ডান পাশের সামনের দিককার ঘরখানায় আমার কেটেছিল সমস্তটা সময়। অট্টালিকার ডান পাশের বর্ণনা দিয়েছি, বাঁ-পাশেও ঠিক ওইরকম ঘর রয়েছে। রয়েছে ওইরকম সবুজ ঘাসে মোড়া লন। ডাইনে-বাঁয়ে সামনের ঘরগুলিকে রেখে চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা পর্যন্ত। বাড়িটা দোতলা। বিচরোডে বা সমুদ্রের অপরিসর বালুবেলায় দাঁড়ালে বাড়িটাকে চমৎকার দেখা যায়। সামনে, মাঝখানে মূল সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে মূল বাড়িটিতে ঢুকলে একটা বাঁধানো চাতাল পড়বে। তার দু-পাশে অর্থাৎ ডাইনে-বাঁয়ে দুটি বিশাল দরজা।

সামনে সিঁড়ি, একটু ঘুরে একটা ল্যান্ডিং বা পাঠাতন তৈরি করে দোতলায় উঠে গেছে। দোতলায় ওঠবার আগে যে চাতালটির কথা বললাম, তার ডাইনে-বাঁয়ের যেকোনো দরজা দিয়ে ঢুকলেই পড়বে চওড়া বারান্দা। তার একপাশে পড়বে একটা করে বেশ বড়ো ঘর। তার সামনেও আর একটা ঘর। সমুদ্রের দিক থেকে তাকালে বাঁ-দিকে পড়বে আমাদের সেই শোবার ঘরখানা। আর আমাদের দিকে চওড়া বারান্দার ধারের যে ঘরটার কথা বললাম, সেটা ছিল আমাদের অফিস ঘর। শোভা পাচ্ছে চওড়া একটা টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন ইত্যাদি। তার মানে আমাদের শোবার ঘর থেকে বেরুলেই সামনে চওড়া বারান্দা, তার বাঁ-দিকে আমাদের অফিস ঘর। ডান দিকে রেলিং, ওখানে পরে একটা ইজিচেয়ার পেতে রেখেছিলাম বসে বসে সমুদ্র দেখার জন্য। এই বারান্দার পরেই দরজা, যেটা খুলে চাতালে পা দিয়ে ডান দিকে ঘুরে চওড়া পাথরের সিঁড়ি ভেঙে বিচ রোডে নেমে যাওয়া যায়। আবার আমাদের শোবার ঘরের ডান দিকেও একটা অপারিসর সিঁড়ি আছে রেলিং দেওয়া। অনায়াসে সিঁড়ি দিয়ে আমাদের দিককার সবুজ ‘লনে’ নেমে যাওয়া যায়, যার কথা আমি সবার আগেই বলেছি।

এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের শোবার ঘর আর অফিস ঘর খুব কাছাকাছি। অফিস ঘরের কথা আমাদের এ-কাহিনিতে অনাবশ্যক, কিন্তু শোবার ঘরটার কথা একটু বলতে হবে। এ-ঘরটার সামনের দিকটা একটু গোলাকার, তাতে বড়ো বড়ো তিনটি জানলা বসানো। সমুদ্র দেখা যায় শুয়ে শুয়ে। ছুটির দিনে দুপুরে একটু ঘুমোবার পর যখন চোখ মেলেছি, তাকিয়ে দেখি, সমুদ্রশিয়রী জানালগুলিতে যেন নীল পর্দা ঝুলছে! ঝড়-বাদলের দিনে আরও চমৎকার। ঢেউগুলি আরও উঁচু উঁচু হয়ে এসে ভেঙে পড়েছে। তার জলের কণা এসে লেগেছে আমার বিছানায়, আমার শরীরে।

এই ঘরে আমার একা কেটেছিল পুরো একটি বছর। দ্বিতীয় বছরেই আমার বাড়ির লোকজন এসে ঘর ভরিয়ে ফেলল, হইচই চিংকার! এটা আসেনি, ওটা নিয়ে এসো, এঃ! এ আবার কী মাছ! এ আবার খাওয়া যায় নাকি! দে ফেলে দে, নিয়ে আয় নতুন মাছ! কিংবা এ আবার কীরকম দেশ বাবা! এখানে পটল পাওয়া যায় না— ইত্যাদি। সবই খাওয়া পরার গল্প, দেওয়া-নেওয়ার হিসেব।

কিন্তু যখন আমি একা ছিলাম, আমার মালিকদের একজন যিনি ছিলেন, তিনি আমাকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে দিয়েই চলে গেলেন। কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। অফিস ঘরে চলছে অফিসের কাজ। অফিস ঘরের পিছনেই ছিল বিরাট রান্নাঘর, তার এক পাশে খাবার টেবিল। তার পিছনের বারান্দার অংশটা আমি কাঠের তক্তা দিয়ে ঘিরে স্নানের ঘর-টর করিয়ে নিয়েছিলাম। ফলে, আমার শোবার ঘরের লাগোয়া যে ঘরখানা স্নানের ঘরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেটা আর একটি শোবার

ঘরে পরিণত হল। সেখানেও বড়ো একখানা খাট পাতা বাড়তি বিছানা বিছানো, অন্য কেউ এলে ওখানে থাকতে পারে। আমার শোবার আসল ঘরখানাও আমি মনের মতো সাজিয়ে নিয়েছিলাম। এখানেও ছিল বড়ো খাট বা পালঙ্ক, ছিল বই রাখার আলমারি, ছিল আমার লেখবার টেবিল ও চেয়ার। চেয়ারে বসে একটু লিখি আর একটু তাকাই জানালা দিয়ে নীল সমুদ্রের দিকে। দিনেরবেলা অফিসের লোকজন আসে, আসে আমার রান্নার লোক আর কাজের লোক। রাত আটটা-সড়ে আটটার মধ্যেই তাদের কাজকর্ম সেরে চলে যায়, তারপরে আমি একেবারে একা। ছুটির দিনে যদি সিনেমা দেখতে যাই, তাহলেও ন-টার পরে ফিরে আসি। বাকি রাতটাও আমার কাটে একা। আমি, আর জানলার বাইরে আমার সমুদ্র।

সমুদ্রকে দিনেও যেমন দেখি, রাতেও তেমনি দেখি। চাঁদ যখন ওঠে, সমুদ্র জুড়ে যখন অব্যবহিত জ্যোৎস্না ঝিকমিক করতে থাকে, তখন এক দৃশ্য। আবার অন্ধকার রাতে তারায় ভরা আকাশের নীচে সমুদ্রের আর এক দৃশ্য। ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলানো সবুজ আলো যখন ঝিলিক দেয়, তখন সব দেখে-টেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

কখনো কখনো আমার ঘুম ভেঙে যেত রাত তিনটে নাগাদ। কোণের দিকের একটা জানালাই ছিল আমার সব থেকে পছন্দের। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতাম। জ্যোৎস্নারাতে মনে হত সমুদ্র আর আকাশের মাঝখানটা যেন আলোয় আলোয় ভরে গেছে। একধরনের চাপা স্নিগ্ধ আলো। জ্যোৎস্নার আলো। মেঘের কোলে আকাশে সাঁতার দিচ্ছে চাঁদ। আর তার স্নিগ্ধ নরম আলো যেন পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে সারা সমুদ্রের বুক জুড়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

এরকমই একটি দিনে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অস্তুত আমার কাছে— অদ্ভুত। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। কালো আকাশ জুড়ে তারার মেলা। রাত তিনটে হবে, ঘুম ভেঙে উঠে সেই আমার প্রিয় কোণের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, একটা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আকাশের এক প্রান্তে একটা একটু বড়ো তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তার থেকে একটা আলোর রেখা ঠিকরে পড়েছে সমুদ্রের বুক, আর সেখান থেকে সেই আলোর রেখা এসে সমুদ্র পার হয়ে ঠিক যেন এসে ছুঁয়েছে আমাকে।

এরকম হয়তো আগেও হয়েছে এই এক বছরের মধ্যে, কিন্তু আমার লক্ষ পড়ল সেদিন সেই প্রথম। স্নিগ্ধ তারাটির দিকে অপলক তাকিয়ে আছি। একসময় মনে হল সে যেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তার আলোর সংকেত পাঠাচ্ছে আমার কাছে। আলোর সেই সরলরেখা সমুদ্র স্পর্শ করে সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে আমার অন্তরে এসে প্রবেশ করছে। আজও সে কথা ভাবতে অবাক লাগে। সেদিন সেই আলোর ভাষায় আমি যেন অনেক কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। যেন

অনেকে মিলে একসঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কেউ তারা থেকে আমার সঙ্গে কথা বলছে না। আমার নিজেরই মনের মধ্যে কথাগুলি যেন সরব হয়ে উঠছে। চারদিক নিস্তব্ধ, সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, শুধু আমারই কানে বাজছে একসঙ্গে অনেক কণ্ঠের কাকলি। কিন্তু কথাগুলো যে কী তা বুঝতে পারছি না।

একসময় বিরক্ত হয়ে নিজেই বলে উঠলাম আঃ!

বলতে বলতে হাত দিয়ে কান দুটো চেপেও ধরলাম।

মুহূর্তে সব চুপ হয়ে গেল। কানের ওপর থেকে হাত সরালাম। সমুদ্রের সংগীত শুধু শোনা যায়। শুনতে শুনতে মনে হল, এ সংগীতেও একটা ছন্দ আছে। যেন তালে তালে বাজছে সমুদ্রের এই সংগীত! দিনেরবেলা যাকে গর্জন বলে ধারণা হয়, নিশুতি রাত্রে কান পেতে শুনছি বলে তাকেই এখন সংগীত বলে মনে হচ্ছে। কণ্ঠসংগীত নয়— যন্ত্রসংগীত। তবলা অথবা পাখোয়াজের তাল সমৃদ্ধ বোলের মতো। তালটাকেও মনে হচ্ছে ‘যৎ’ তাল। যেন সে অশ্রুত মহান সংগীতের সঙ্গে সমুদ্র তাল রেখে যাচ্ছে।

এই সব ভাবছি আর সংগীত শোনবার চেষ্টা করছি, এমন সময় মনে হল, সেই আলোর ভাষা যেন আবার মুখর হয়ে উঠেছে। এবার অনেকের কণ্ঠস্বর নয়, একটিমাত্র কণ্ঠ। যেন আমার ছেলেবেলাকার ডাকনাম ধরে কে যেন বহুদূর থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল!

চমকে উঠলাম। এ যে অত্যন্ত চেনা গলা ওয়ালটেয়ারের যে সময়কার কথা বলছি, তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। আর যার কণ্ঠস্বর শুনলাম, তার কণ্ঠস্বর শেষ শুনছি আমি দশ বছর বয়সে! যখন আমার দশ বছর বয়স, তখনি তো আমার দিদি মারা গিয়েছিল।

আবার দিদি ডেকে উঠল আমার নাম ধরে। এবার গলা আরও স্পষ্ট, তবু আমার সন্দেহ গেল না। নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম, কে তুমি? সত্যি বলো।

সে বললে, আমি স্মৃতি।

তুমি আমার দিদি নও?

হ্যাঁ, দিদি। তবে, স্মৃতি। বলতে পারো, তোমার দিদির স্মৃতি।

আমাকে ডাকছ কেন?

সে বলল, এখানে কী করতে এসেছিস?

চাকরি।

হ্যাঁ রে, আমার সেই হারমোনিয়ামটা আছে না?

হ্যাঁ আছে। কলকাতার বাড়িতে।

কেউ বাজায়?

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

না।

বাজাবেই বা কী করে? সময় কোথায়?

বলে, দিদির স্মৃতি আবার সরব হল, গান গাইতে কত ভালোবাসতুম। রেকর্ড শুনে রেডিয়ো শুনে গান তুলতুম। মাস্টার রেখে গান শেখাবার পয়সা কোথায় বাবার? অতি কষ্টে আমার আবদার রাখতে গিয়ে বাবা একটা হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিল। যখন-তখন সেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসতুম বলে মা কত বকত।

সঙ্গে সঙ্গে সব আমার মনে পড়ে গেল। বাবা হচ্ছেন সামান্য স্কুল মাস্টার। ক-টা টাকাই বা তখন মাস্টারদের মাইনে ছিল? আমরা সব ছোটো ছোটো, বাবার একার আয়েই সংসার চলে। পাঁচ-পাঁচটি ভাই-বোন আমরা। দিদি সবার বড়ো, তারপরে আমি। দিদি আর আমার মধ্যে ছিল ছয় বছরের ব্যবধান, আমাদের দু-জনের মধ্যে আরও দুটি ভাই ছিল, তারা জন্মেই মারা গিয়েছিল। তাদের বাদ দিয়েই আমাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ। আমাদের সংসারে দেওয়া-নেওয়ারই হিসেব ছিল বেশি। বাবা স্কুলে পড়ানো ছাড়াও টিউশানি করতেন। কিন্তু তাতেও কুলোত না। এটা চাই ওটা চাই শুনে শুনে বাবা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। তার ওপরে ছিল আমাদের আবদার। দিদির অবশ্য কোনো চাহিদা ছিল না। সে যখন হারমোনিয়াম পেয়ে গেল, তখন যেন হাতে একেবারে স্বর্গ পেল। আর তার কিছু চায় না। সত্যি, আমার দিদিটা ছিল একেবারে অন্যরকম। বিভোর হয়ে গান গাইত। কখনো মীরার ভজন, কখনো রবীন্দ্রনাথ, এক এক করে কম গান গলায় তোলেনি আমার দিদি। স্কুলে যেত, বইও পড়ত, কিন্তু সময় ও সুযোগ পেলে গানই ছিল তার চর্চার বিষয়। কিন্তু কতটুকু সময় সে দিতে পারত? হয়তো তন্ময় হয়ে গাইছে, ‘শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে’, —অমনি রান্নাঘর থেকে ভেসে এল মায়ের দাবড়ানি, রাখ এখন তোর পাগলামি, আগে এসে কচিটাকে ধর, ককিয়ে সারা হচ্ছে।

গান থামিয়ে দিদিকে ছুটতে হত আমার সব থেকে ছোটো ভাইটাকে ধরতে, শান্ত করতে। কিছুক্ষণ পরে ভাই শান্ত হলে দিদি হয়তো হারমোনিয়াম ছেড়ে খালি গলাতেই গুন গুন করছে, ‘মৈনে চাকর রাখো জি’, —মার বকুনি শুরু হল আবার, ওসব ছেড়ে রান্না ঘরে একটু এসো না! এদিকে যে হিমসিম খেয়ে গেলুম! দাওনা রুটি ক-খানা একটু বেলে!

আমার সন্দেহ হত, মা কি দিদিকে দেখতে পারে না? উঠতে-বসতে দিদিকে বকত মা। অথচ দিদি কখনো টু শব্দটি করত না। আমি যখন আরও একটু বড়ো হলাম, তখন বড়ো মায়া হতে লাগলো দিদির ওপর। ওকে বাবাও বকে পড়া ঠিকমতো না করলে, মা-ও বকে মার হাতে হাতে কাজে সাহায্য না করলে। তবু ওরই মধ্যে ওর গুনগুনানি শেষ হত না। কতদিন দিদির কাজ আমি গিয়ে করে দিতাম। ঝি আসেনি, দিদি বাসন মাজছে। আমি গিয়ে হাত লাগাতাম। দিদি

আঁতকে উঠত, বলত, পড়া ছেড়ে তুই উঠে এলি? মা কী বাবা দেখতে পেলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

তা হোক, তুই সর তো, আমি ঠিক মেজে দেবো।

কথা হত আমাদের দুই ভাই-বোনে রাত্রিবেলায়। মা-বাবা আর ভাই-বোনরা ঘুমিয়ে পড়লে মাঝে মাঝে আমরা পা টিপেটিপে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতাম। আমাদের বাড়িটা ছিল ছোটো, আর একতলা। আমার ছোটোবেলায় ধারণা ছিল বাড়িটা বুঝি আমাদের। কিন্তু বড়ো হয়ে জানলাম, তা নয়। বাড়িটা ভাড়াবাড়িই বটে। কিন্তু সে যাক। সেসব রাত্তিরে হয়তো ছিল এমনি তারায় ভরা কালো আকাশ। আজ ঠিক মনে করতে পারছি না। দিদি আর আমি এক কোণে বসেছি, দিদি চাপা গলায় গুনগুন করে গাইত, ‘তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই!’

আমি ওর গান শুনতে শুনতে এক-একদিন বলতাম, হ্যাঁ দিদি, তুই সবসময় এত দুঃখের গান গাস কেন?

দুঃখের গান বুঝি। দিদি বলত, অতশত জানি না, এসব গাইতেই আমার ভালো লাগে। ওসব চটুল গান আমার একটুও পছন্দ নয়। জানিস, আমাদের ক্লাসের কবিতা? কবিতা কর? সে একটা গান শিখেছে। কী সুন্দর সে গান! আমি সবটা এখনও তুলতে পারিনি। সুরটা শুনবি? ‘আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে। দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে!’

সেই আমার দিদি— আমার গান-পাগল দিদি হঠাৎ চলে গেল মাত্র ষোলো বছর বয়সে আমাদের সবাইকে ছেড়ে। খুব জ্বর হল, তারপরে বলত, মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা! ডাক্তার এসে ওষুধ দিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে। তারা বলল, এখন এনেছেন? অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এখনকার দিন হলে হয়তো বাঁচানো যেত, কিন্তু তখনকার দিনে সন্ধ্যাস রোগের তেমন কোনো চিকিৎসা ছিল না। গোড়ায় ধরা পড়লে হয়তো বাঁচানো যেত, কিন্তু যখন হাসপাতালে দেওয়া হল, তখন আর করবার কিছু ছিল না। হাসপাতালের ডাক্তাররা খুবই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুতেই আর শেষ রক্ষা হল না। দিদি যখন গেল, তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর। কতটুকুই বা বুঝতাম সংসারকে?

যাই হোক, দিদির স্মৃতি মনে পড়ার জন্যই হোক আর তার আলোর ভাষায় তার কণ্ঠস্বর শুনেই হোক, ভিতরটা যেন মুচড়ে উঠল! নিজেকে সামলাতে একটু দেরি হল।

কী ভাবছিস? —আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

বললাম, ভাবছি? তোর সব কথাই। দিদি, তুই হঠাৎ চলে গেলি কেন রে? ও রোগটা তোর হল কেন? ওই বয়সে?

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

দিদি বলল, রোগটা কেন হল জানি না। কিন্তু চলে আসতে হল কেন, সেটা জানি।
বল না শুনি?

দিদি বলল, আমার গান ছিল আমার প্রাণের জিনিস। সেটা কেউ বুঝল না,
সেটার কেউ কদর করল না, তাই আমাকে চলে আসতে হল।

বললাম, দিদি, তোর একটা গান এখন খুবই মনে পড়ছে। সেই যে গাইতিস
না? আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে। সত্যি বল, ফিরতে তোর ইচ্ছা
করে না?

দিদির কণ্ঠস্বর বললে, আমি তো ফিরেছিলুম। কিন্তু—

দিদি ‘কিন্তু’ বলেই চুপ করে গেল, আর কথা বলল না।

আমি বললাম, ‘কিন্তু’ কী? বল? এই দিদি?

দিদি উত্তরে সেকথা এড়িয়ে গেল, বললে, হ্যাঁ রে, আমাদের বাড়ির পশ্চিম
দেওয়ালের পিছনে যে কদম্ব গাছটা ছিল, তাতে আজও ফুল ফোটে, তাই না?
আহা, বাদলার কালে যখন ফুল ফুটত, সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য হত বটে!
একটু হাওয়া বাড়লে আমাদের সারা বাড়ি জুড়ে কদমফুলের কেশর ছড়িয়ে পড়ত।

বললাম, একবার হল কী জানিস? ফুলে ফুলে গাছটা একেবারে ভরে গেল।
অত ফুল কোনো বার হয় না। সেবার হল। ছাদে উঠে দেখি, গাছটা যেন সর্বাঙ্গ
দুলিয়ে নিঃশব্দে হাসছে। ফুলে ফুলে ছড়িয়ে পড়েছে সে হাসির রেশ! সেদিনই মনে
হয়েছিল, গাছটা বুঝি জীবন্ত, তার মুখে কথা ফোটে না, কিন্তু সে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে—
সারা ডালপালা জুড়ে ফুল ফুটিয়ে সে তার ভাব প্রকাশ করতে জানে। ছাদে আমাকে
দেখামাত্রই যেন আমাকে বলল, দেখো তুমি। কত ফুল এবার ফুটিয়েছি।

কিন্তু সে-ই শেষবার। এরপরেই যাদের গাছ তারা গাছটাকে কুড়ুল দিয়ে
কুপিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলল। কোথায় গেল তার হাসি, কোথায় গেল তার
অমন খুশি হওয়ার বহিঃপ্রকাশ!

দিদি শুনে বললে, ইস!

তারপরে কিছুক্ষণ কাটল নীরবতার মধ্যে, তারপরে আবার শোনা গেল তার
কণ্ঠস্বর, হ্যাঁ রে, আমাদের দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁষে যে বাতাবি লেবুর গাছটা
উঠেছিল, সেটা কাটা পড়েনি তো?

না। সে এখন ফল দিচ্ছে, জানিস দিদি?

দিদির কণ্ঠস্বরে খুশির আবেশ লাগলো, আহা, তাই বুঝি? হ্যাঁ রে, লেবু গাছের
গা জড়িয়ে একটা তেলাকুচো উঠেছিল, সেটার কী খবর? কী সুন্দর সাদা সাদা
ফুল ফোঁটাত সে। তাই না?

আজও ফোঁটায় দিদি। হাওয়ায় হাওয়ায় সে ফুলগুলি যখন দোলে, তখন মনে
হয় নীরব কোনো সংগীতের সঙ্গে তারা যেন তাল রাখছে।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

হ্যাঁ, ওই তাল। ছন্দ। সমস্ত জগৎ জুড়েই এই ছন্দের দোলা। ছন্দহীনতা এই জগতের নিয়ম নয়। হ্যাঁ রে, সেই পেয়ারা গাছটা আছে? আজও ফল দেয়?

বললাম, হ্যাঁ দিদি। আজও দেয়। তুই কত ভালোবাসতিস ওই পেয়ারা খেতে! দিদি বলল, কত পাখি আসত, না রে?

পাখি? বললাম, কদম গাছে কত পাখিই না আসত! দুর্গা-টুনটুনি, দোয়েল, শ্যামা, এ ছাড়া শালিকের দল তো ছিলই। তা ছাড়া, নাম না-জানা কত পাখি আসত। একটা পাখির বুক ছিল টকটকে লাল। পাখি এখনও কিছু কিছু আসে, লেবু গাছটায় গিয়ে বসে, কিংবা পেয়ারা গাছটায়। কিন্তু তেমন সমারোহ আর নেই।

দিদি বলল, একটা বুলবুল পাখি আসত মনে আছে? মাথার ঝুঁটি? ভোরবেলায় কদম গাছে বসে বসে গান গাইত। কী তার সুরেলা গলা! তোদের ঘুম ভাঙতে রোজ সে আসত, তোর মনে পড়ে?

হ্যাঁ, তা পড়ে বই কী!

দিদি বলল, কদম গাছে সে এসে বসত, গান গাইত, তবু তোদের ঘুম ভাঙত না বলে সে চলে আসত তোদের জানালার কাছে লেবু-গাছটায়, কখনো-বা পেয়ারা গাছটায়। প্রাণ ঢেলে সে গান গাইত। আরও তো বাড়ি ছিল ও অঞ্চলে, আরও তো কত গাছ ছিল। সেসব জায়গায় সে যেত না, যেত শুধু তোদের বাড়িতেই। তোদেরকেই গান শোনাতে সে ভালোবাসত। তার গান যদি তোরা মন দিয়ে শুনতিস। তো বুঝতে পারতিস, অনেক গানই ওর গানের ছন্দের সঙ্গে মিলে যায়! তুই যদি গাইতিস, 'মৈনে চাকর রাখো জি', দেখতিস মিলে যেত। যদি গাইতিস, 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে', দেখতিস সে-ও মিলে যেত। এমনকী 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই', কিংবা 'আবার যদি ইচ্ছা করে আবার আসি ফিরে' গাইলে তা-ও মিলে যেত।

সত্যি দিদি!

একেবারে সত্যি। যদি ধৈর্য ধরে কান পেতে শুনতিস, তাহলে ওর ছন্দটাকে ধরতে পারতিস। দেখতিস ওইসব গানগুলিই মিলে যাচ্ছে।

তখন যে ছোটো ছিলাম, ছটফটে ছিলাম। বুঝতাম না কিছুই। খেলায় মত্ত হতাম, কখনো ড্যাংগুলি খেলছি, কখনো গুলতি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

দিদি বললে, আমি চলে যাবার পর দুটি বছর কেটে গিয়েছিল। তখন তোর বারো বছর বয়স, বুঝলি? যখন বুলবুলি পাখিটা তোদের কাছে আসত, তখন তোর বারো বছর বয়স। তখন একটু বুঝে চলবার বুদ্ধি তোর হয়েছিল। ওর গান শুনতে শুনতে আমার কথা যদি একটু ভাবতিস, তাহলে ওই গানগুলি তোর ঠিক মনে পড়ত। আর যদি মনে পড়ত, তাহলে তুই যা করেছিলি, তা কি করতে পারতিস?

কী করেছিলাম দিদি!

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ভুলে গেলি! —দিদির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কদম্ব গাছটার ডালে বসে ভোরবেলা সে বিভোর হয়ে গান গাইছে, অন্য কোনো দিকে তার দৃষ্টি ছিল না। সে যদি বুঝত গুলতি নিয়ে তুই তাকে তাক করছিস, তাহলে সে ঠিক উড়ে পালাত। তোর কি মনে আছে? তুই তাকে গুলি দিয়ে গুলতি ছুড়লি, লাগলো গিয়ে ঠিক তার মুখে। যে ঠোঁটে সে গান গাইছিল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত, সে টপ করে মাথা ঘুরে রক্তবমি করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। তুই তোর এক বন্ধুর সঙ্গে দেওয়াল টপকে কদম্ব গাছটার তলায় এসে ওকে তুলে নিলি দুই হাতে। তখনও ওর প্রাণটা যায়নি, বুকের কাছটা ধুকপুক করছে, তোর নাম ধরে ডাকবার চেষ্টা করছে, বলছে, তুই! তুই আমাকে মারলি! আমাকে! যে আমি তোকে ভালোবাসি বলে তোকেই ভোরবেলা গান শোনাতে আসতাম।

কী বলছ তুমি, দিদি!

দিদি বলল, আমিই আবার ওই বুলবুল হয়ে জন্মেছিলাম। বিশেষ করে তোর মায়া কাটাতে পারিনি বলে তোর কাছে গিয়ে প্রাণমন ঢেলে তোকে গান শোনাতাম। কে যে কীভাবে তোদের আশেপাশে আসে, তা তোরা জানবার চেষ্টা করিস না, বুঝবার চেষ্টা করিস না। ওই কদম্ব গাছটারও প্রাণ ছিল, সেও এক জন্মে আমাদের আত্মীয় ছিল। ওই পেয়ারা গাছ, ওই লেবু গাছ, ওরাও আমাদের পরমাত্মীয়। শুধু আমরা চিনতে পারি না। তাই ভুল করি। কেন ভুল করিস ভাই? যখন তোদের ‘দিদি’ হয়ে ছিলাম, আমাকে গান গাইতে দেওয়া হল না, মর্মে মর্মে দুঃখ অনুভব করেছিলাম বলে চলে এলাম তোদের ছেড়ে। কিন্তু মায়া যাই কোথা? পাখি হয়ে আবার গেলাম তোদের গান শোনাতে। কোনো ক্ষতি তো করিনি? তবু আমাকে অমন করে হঠাৎ মেরে ফেললি কেন ভাই, এক অসৎ বন্ধুর প্ররোচনায়?

আমি ওর কথা শুনে ডুকরে উঠলাম, দিদি!

চমকে চোখ তুলে দেখি কখন ভোর হয়ে গেছে! বিচ রোডে বেড়াতে বেরিয়েছেন একটি মানুষ, তিনি হঠাৎ আমার ওই কান্নাভরা চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়েছেন, মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখছেন, ভাবতে চেষ্টা করছেন। কী হল ব্যাপারটা?

আমি চট করে জানালা থেকে সরে এলাম। ওঁকে মুখ দেখাতে পারলাম না।

[সেরা ভূত সেরা গোয়েন্দা, আনন্দ প্রকাশন, ১৯৯৯ (প্রথম প্রকাশকাল অজ্ঞাত)]

ঋণ শোধ

গৌরী দে

মিহির বিজ্ঞানের ছাত্র। কোনো অলৌকিক ব্যাপারে সে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার তাকে বড়ো অস্থির করে তুলেছে। আজ ক-দিন ধরে রাত্তিরে ঘুমোলেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে ক্রমান্বয়ে। ছোটোবেলায় ‘নিশিডাকা’র গল্প শুনেছিল মিহির। এ কি সেই নিশির ডাক? নিজের মনেই হেসে ওঠে মিহির। সব তার অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া। এর বাইরে কিছু আছে বলে তার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এক-আধদিন নয়, প্রায় দশদিন ধরে চলছে এসব। মিহির কাউকে না জানিয়ে একজন মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করে। তাকে জানতে হবে এমন কেন হচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানী ডা. জয়ন্ত দত্ত সব শুনে একটু চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন মিহিরকে। শেষে রায় দিলেন, ক-দিনের জন্যে একটু বাইরে কোথাও ঘুরে আসুন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

সেই রাতেই মিহির ক্লাবে গিয়ে কথাটা পাড়ল। বলল, সামনে পৌষমেলা, চল শান্তিনিকেতনে ঘুরে আসি।

নেচে উঠল প্রবাল, স্বপন, অলকেশ— রাজি। কিন্তু ওখানে তো এখন সব ভরতি, উঠব কোথায়?

মিহির ভ্র নাচিয়ে বলে, সেটা আমার দায়িত্ব। ওখানে আমার মামাতো ভাইয়ের বাড়ি আছে। খুব বড়ো বাড়ি। গিয়ে উঠতে পারলে দারুণ মজা।

অলকেশ বলে, কিন্তু আর তো মাত্র তিন দিন হাতে রয়েছে, খবর পাঠাবি কী করে?

মিহির বলল, নো প্রবলেম, আমি আজই জানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার একটা শর্ত ছিল।

তিন বন্ধু বেশ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বলে, কী শর্ত?

ট্রেন কিংবা বাসে নয়, আমরা যাব সাইকেল চালিয়ে। কলকাতা থেকে

শান্তিনিকেতন রীতিমতো লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার হবে। দেখ রাজি তো বেরিয়ে পড়ি কালই। নয়তো ছেড়ে দাও।

কলকাতা থেকে সাইকেলে অতটা রাস্তা, মিহির বলে কী! বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ। তারপর হঠাৎ নীরবতা ডেঙে কথা বলে স্বপন। বলে, ঠিক আছে আমি রাজি।

অলকেশ স্বপনের দিকে তাকিয়ে বলল, যাওয়া যায় কিন্তু থামতে থামতে। দিনে বারো ঘণ্টার বেশি কিছুতেই সাইকেল চালানো হবে না।

প্রবাল হাতে গুনে গুনে হিসেব করে বলল, ঠিক। ভোর ছ-টা থেকে বারোটা পর্যন্ত চালাবার পর দু-ঘণ্টা রেস্ট। তারপর আবার দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চালিয়ে কোনো হোটেলে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার...

মিহির বলল, আমিও তাই বলতুম, তবে আমার মনে হয় একনাগাড়ে ছ-ঘণ্টাও অনেক। এই ছ-ঘণ্টায় অন্তত তিন বার থামা উচিত।

প্রবাল বলল, সেটা অবস্থা বুঝে, কোথায় কীরকম জায়গা বা গ্রাম পাব, তার ওপর নির্ভর করবে।

মিহির জোর গলায় বলে ওঠে, তাহলে আর দেরি নয়, কালই ভোর ছ-টায় স্টার্ট। পরদিনই বেরিয়ে পড়ল ওরা। সন্কে গড়িয়ে রাত হতে চলল। রাতের মতো থামতে হয়। সামনে দুটো পথ দু-দিকে বেঁকে গেছে। কোনটা কোথায় গেছে কে তা জানে! প্রবাল বলল, আমার মনে হয় বাঁ-দিকেরটা গ্রামের দিকে গেছে।

সবাই বলল, হতে পারে। চল না একটু এগিয়ে দেখা যাক।

ওরা বাঁ-দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। মিহির ছিল একদম পেছনে, আশ্চর্য, হাজার চেষ্টা করেও সে বাঁ-দিকে বেঁকতে পারল না। বন্ধুদের চিৎকার করে ডাকতে গেল, স্বর বেরোলো না। সাইকেলের প্যাডেল থেকে সে পা সরিয়ে নিল।

কিন্তু এ কী ব্যাপার! তার সাইকেল ডান দিকে বেঁকে ছুটছে, বিদ্যুৎ গতিতে। সমস্ত শক্তি হারিয়ে পাথরের মতো বসে রইল মিহির সাইকেলের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে। চলছে তো চলছেই। অনেকক্ষণ পরে মিহির দেখল সাইকেলটা এসে একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিহিরের সামনে দাঁড়িয়ে এক শননুড়ি বুড়ি। কত বয়স দেখলে বোঝা যায় না। হাতে একটা প্রদীপ, তার ক্ষীণ আলোয় বুড়ির মুখটাও ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। বুড়ি বলল, এসো, তোমার জন্যে কবে থেকে বসে আছি বাবা, এবার আমায় মুক্তি দাও।

মিহির অবাক হয়ে বলল, আপনি কে? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

বুড়ি বলল, সব বলব, তুমি আগে ঘরে এসে বোসো।

মিহির ছটফট করে উঠল। বলল, বসব? সেকী? আমার বন্ধুরা যে আমায় খুঁজছে। আমার জন্যে ওরা অপেক্ষা করে থাকবে যে।

ড উত্তর দিল, আর আমি? আমি যে কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছি এই দিনটার জন্যে! আমি তোমার কাছে মুক্তি চাই বাবা।

মিহির বিরক্ত হয়ে বলল, তখন থেকে কী মুক্তি মুক্তি করছেন? আমি মুক্তি দেব কী করে!

বুড়ি কোনো কথা না বলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। মিহির পালাতে গেল, পারল না। কে যেন তাকে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

আধো অন্ধকার ঘর। মিহির দেখল মাটিতে একটা আসন পাতা। আসনের সামনে থালায় কত রকমের ফল সাজানো। পাশে এক গেলাস শরবত। বুড়ি আসন দেখিয়ে বলল, তুমি ক্লান্ত। আগে খাও তারপর সব বলছি।

মিহিরের পেটে সত্যিই আগুন জ্বলছিল। খাবার দেখে সে নিজেকে সামলাতে পারল না। আসনে বসে পড়ে গোত্রাসে খেতে লাগল। তারপর খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল পাশেই রাখা বালিশ আর মাদুরের ওপর।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে! হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে মিহির দেখল, অন্ধকার হালকা হয়ে এসেছে, ভোর হতে আর দেরি নেই। সেই আলো-আঁধারিতে সামনে তাকাতেই চমকে উঠল সে। একটা অবয়ব। বুড়িটা ঠায় বসে আছে, ঘরের প্রদীপ কখন নিভে গেছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল মিহির। মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। এ সে কোথায় এসে পড়ল! বুড়ি একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সব লক্ষ্য করছিল। এবার সে বলল, ভয় পেও না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব বলে আনিনি। তোমাদের একটা গচ্ছিত ধন আছে আমার কাছে। সেটা তোমার হাতে দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাই বাবা। তুমি নিয়ে আমায় মুক্তি দাও।

মিহির অবাক হয়ে বলল, আপনি কোনো ভুল করছেন না তো!

বুড়ি মিহিরের কথার কোনো উত্তর দিল না। নিজের মনে বলতে লাগল, তখন আমার বয়স কম। একটা নার্সিং হোমে নার্সের কাজ করে সংসার চালাই। বাড়িতে একমাত্র আপনার জন আমার বাবা, তাও অসুস্থ। একদিন ওই নার্সিং হোমে তোমার মা ভরতি হলেন। তুমি হলে। তোমার বাবা নার্সিং হোমের মালিকের সঙ্গে কথা বলে তোমাকে দেখাশোনা করার জন্যে আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। একটা বছর তোমাকে বুকে জড়িয়ে কাটিয়েছি। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসে বাবাকে দেখে যেতাম। হাতে দুটো পয়সা এল। বাবাকে ভালো করে চিকিৎসা করা ব বলে কলকাতায় নিয়ে এলাম। সাহেব ডাক্তার দেখালাম। ডাক্তার দেখে-শুনে বললেন ছোট্ট একটা অপারেশন করলে বাবা ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু এর জন্যে চাই হাজার পাঁচেক টাকা। তোমার বাবা ছিলেন খুব রাশভারী। টাকার কথা বলতে ভয় হল। কী করবো ভাবছি এমন সময় দেখলাম, তোমার বাবা পাঁচ হাজার টাকা এনে তোমার মায়ের কাছে দিয়ে বললেন, সাবধানে রাখো। এটা খোকার অনুরোধের টাকা।

টাকাটা তোমার মা তাড়াতাড়িতে আলমারিতে না তুলে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলেন। আমি আর লোভ সামলাতে পারলাম না। ভাবলাম হাতের লক্ষ্মী কেন পায়ে ঠেলি। চাইলে অত নাও দিতে পারে। আবার ভাবলাম এ তো চুরি। ছিঃ! শেষ পর্যন্ত আমি চোর বদনামের ভাগি হব? কিন্তু আশ্চর্য, বার বার মন থেকে কে যেন বলতে লাগল, না না, এ তো চুরি নয়, প্রয়োজনে নেওয়া। ক-দিন পরে তো পুরো টাকাই শোধ দিয়ে দেব।

দুপুরবেলা চুপি চুপি টাকা নিয়ে পালিয়ে এলাম। আমি যা বলেই মনকে সান্ত্বনা দিই না কেন, না বলে নেওয়া তো চুরিই। টাকা নিয়ে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে হারালাম। এ টাকা বাবা ছুলেনও না। আমি এতবড়ো অন্যায় করে আর ফিরে যেতে পারলাম না। টাকাটা একটা কাপড়ে মুড়ে তুলে রাখলাম। রোজ ভাবতাম কী করে ফেরত দেওয়া যায় ওটা।

ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল কতগুলো বছর। হঠাৎ একদিন গ্রামে ওলাওঠা হল। ঘরকে ঘর উজাড় করে দিল। আমারও দিন শেষ হয়ে গেল। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে টাকাটাকে আগলে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ইতিমধ্যে তোমার বাবা-মা দু-জনেই মারা গেলেন, যার টাকা তাকে দিতে পারলাম না। অপেক্ষা কবে রইলাম করে তুমি আসবে। সোজাসুজি যাবার ক্ষমতা থাকলেও, টাকা ফেলে যেতে পারতাম না। তাই স্বপ্নে তোমায় টানতে লাগলাম।

মিহির বলল, মা-বাবা ছাড়া একথা আর কে জানে?

বুড়ি হাসল, বলল, যাচাই করে নেবে? বেশ তো। তোমাদের বাড়িতে যে অল্পবয়সি দারোয়ান ছিল, সে এখন বুড়ো হয়েছে, সে ব্যাপারটা জানে। তবে আমিই নিয়েছি একথা ভারতে পারেনি। বুড়ি মিহিরের হাতে শতচ্ছিন্ন একটা কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে বলল, বলো, এর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম।

মিহির সেটা হাত পেতে নিতেই বুড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিহির সবিস্ময়ে দেখল সে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে, পাশে পড়ে তার উলটোনো সাইকেল। প্রথমটা কিছুই বোধগম্য হল না তার। তারপর মনে পড়তে লাগল ধীরে ধীরে। তখনও সূর্য ওঠেনি। মিহির ভাবল তাহলে কি সবটাই স্বপ্ন! অথচ বন্ধুদের কী হল! গা ঝেড়ে সাইকেলটা তুলতে গিয়ে হাতে লাগল সেই ছেঁড়া ময়লা পুটলিটা। মিহির খুলে দেখল পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া পুরো পাঁচ হাজারই রয়েছে।

একটা ব্যাপার তার খুব আশ্চর্য লাগছে। সে এমন একটা জায়গায় কী করে এল! লোক নেই জন নেই এ কেমন জায়গা! সাইকেলে চেপে মিহির উলটো দিকে চলল। ওর মনে আছে একটা মোড়ের মাথায় রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ওখান থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, রোদের তেজটাও প্রখর হচ্ছে, সেই মোড়টা আর আসে না। আরও খানিকটা যাবার পর

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

কিছু লোকের বসতি পাওয়া গেল। মিহির খানিকটা আশ্বস্ত হল। সামনেই একটা চায়ের দোকানের ছাউনির তলায় বসেছিল কয়েক জন লোক। মিহির তাদের কাছে গিয়ে বলল, দেখুন, কাল আমরা চার বন্ধু সাইকেলে করে একসঙ্গে আসছিলাম। পথে একটা বাঁক পড়ল, আমি ওদের থেকে আলাদা হয়ে পড়লাম। তারপর আর ওদের দেখতে পাচ্ছি না। এরকম কয়েক জনকে আপনারা কি দেখেছেন?

চায়ের দোকানে একজন অল্পবয়সি ছেলে ছিল। সে বলল, কাল রাত্তিরে তিনজন লোক সাইকেল চড়ে এসেছিল। আমার দোকানে চা খেল। ওরা বলাবলি করছিল ওদের একজনকে খুঁজে পাচ্ছে না...

ছেলেটিকে প্রায় থামিয়ে দিয়ে মিহির ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, আমি... আমিই সে! ওরা কোনদিকে গেছে কিছু বলতে পারো ভাই?

ছেলেটি বলল, ঠিক জানি না। তবে ওদের বলতে শুনেছিলাম আজ ভোরে ওরা আপনার জন্যে রাস্তাতেই অপেক্ষা করবে। মনে হয় ওরা অপেক্ষা করে করে চলে গেছে।

একজন বয়স্ক লোক বলে ওঠে, তাহলে ওঁরা এগিয়েই গেছেন, তা আপনারা যাচ্ছিলেন কোথায়?

শান্তিনিকেতন... সাইকেলে, বলল মিহির।

বয়স্ক লোকটা বলল, এখানে তো হারাবার মতো ভিড়ভাড়া নেই। তবে হারালেন কী করে?

মিহির সাইকেল থামিয়ে বসল। বলল, একটু চা দেবে ভাই, গলাটা শুকিয়ে গেছে। তারপর বয়স্ক মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, একটা মোড় পর্যন্ত একসঙ্গেই তো ছিলাম। ওরা ঘুরল বাঁয়ে, আমার সাইকেল আমাকে নিয়ে ছোটাল ডান দিকে—।

লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর বয়স্ক মানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঈশ্বরের অনেক কৃপা আপনি আস্ত ফিরে এসেছেন।

কেন? একথা বললেন কেন? মিহির অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

ওরা বলল, আপনি যে রাস্তার কথা বললেন, দশ বছর আগে ওইরকম বাঁকের পাশ দিয়ে ডান দিকে ঘুরলেই ছিল হরিনারায়ণপুর। ছোট একটা গ্রাম। প্রায় সব ঘরেই খেটে খাওয়া মানুষের বাস ছিল। এদের স্ত্রী-পুরুষ সব কলকাতা যেত চাকরি করতে। হঠাৎ একদিন ওলাওঠায় গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই থেকে...

ওরা চুপ করে যেতেই, মিহির উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে, বলুন, আমায় শুনতে হবেই।

ওরা বলতে লাগল, সেই থেকে ওই রাস্তা দিয়ে কেউ যায় না। আর গেলেও ফিরে আসতে পারে না প্রাণ নিয়ে।

রাজকতা এককুসিত

মিহির বিংশ শতাব্দীর ছেলে, বিজ্ঞানের ছাত্র। যুক্তি-তর্কের আড়াল সরিয়ে সত্যকে উদঘাটন করা তার কাজ। মৃত্যুর পরের অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার মনের কোণে জমা হয়েছে সন্দেহের কালো মেঘ। পাঁচ হাজার টাকার অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতে পারছে না। সমস্ত ব্যাপারটা যাচিয়ে না দেখলে সে শান্তিও পাবে না।

মিহির সাইকেলে চড়ে বসল। একনাগাড়ে ঘণ্টা তিনেক চালাবার পর সে যে গ্রামে এসে পৌঁছোল, তাকে গ্রাম না বলে ছোটোখাটো শহর বলা চলে। অন্য বন্ধুরা এখানেই অপেক্ষা করছিল। মিহিরকে উদ্ভাস্তের মতো আসতে দেখে ওরা এগিয়ে এল। মিহিরের কোনো ক্রম্বেপ নেই। সে খুঁজছে কোথাও যদি একটা ফোনের ব্যবস্থা থাকে। ওকে জানতেই হবে এর শেষ কোথায়। বন্ধুরা ওকে অনেক বুঝিয়ে নিয়ে এল শান্তিনিকেতনে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামছে। মিহিরের কলকাতার বাড়িতে ফোন বেজে উঠল। বুড়ো দারোয়ান ছুটে এল ফোন ধরতে।

হ্যালো!

কে রামদীন?

হ্যাঁ সাব—।

শোনো রামদীন, সত্যি কথা বলো। আমার জন্যে একজন আয়া রাখা হয়েছিল ছোটোবেলায়, তোমার মনে আছে?

জি, আছে।

সে কি টাকা চুরি করেছিল?

ওদিক থেকে কোনো উত্তর নেই। অস্থির হয়ে মিহির চেষ্টা করে উঠল, কী হল তাড়াতাড়ি বলো—

গড়গড় করে বলে যায় রামদীন। তার তখন অল্প বয়েস। সবে মিহিরদের বাড়িতে ঢুকেছে। হঠাৎ একদিন খুব হইহই। কর্তামার ঘর থেকে পাঁচ হাজার টাকা চুরি গেছে। সেইসঙ্গে খোকাবাবুর জন্যে রাখা আয়াটাও নিরুদ্দেশ। অনেক খোঁজখবরের পর অবশেষে সকলেই স্বীকার করল এ কাজ ওই আয়ারই। তবে সবটাই আন্দাজ। প্রমাণ নেই। তাই হঠাৎ কাউকে সন্দেহ করে চোর প্রমাণ করা যায় না।

মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে মিহিরের কোনোদিন আস্থা ছিল না। আজকের ঘটনা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেল। তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিশ্বাসের এই দ্বন্দ্ব তাকে এবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলল।

ভূত বলে কিছু নেই

মনোজ সেন

শ্রীকান্ত বসু আর প্রদীপ গুপ্ত অভিন্নহৃদয় বন্ধু, যদিও দু-জনের স্বভাবে কিছুমাত্র মিল নেই। শ্রীকান্ত বা কানু চটপটে, হাসিখুশি, চঞ্চল। আর প্রদীপ বা ভোলা গম্ভীর প্রকৃতি, শান্ত। একটু সুযোগ পেলেই যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। দু-জনেই কলকাতার কাছে একটা কারখানায় চাকরি করেন। প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। কানুর একটা পুরোনো মডেলের হিন্দুস্থান গাড়ি আছে, সেটি হল ওঁদের বাহন। এই দু-জন, নাকি তিনজন যতবারই বেড়াতে বের হন, ততবারই কোনো-না-কোনো মারাত্মক অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরেন। কত কী যে ঘটেছে ওঁদের এই ঘোরার সময়— বাঘে তাড়া করেছে, হাতি পথ আটকেছে, ডাকাতে ধরেছে। কোনোরকমে প্রাণ হাতে করে ফিরে এসেছেন প্রত্যেকবার।

সেবার ওঁরা স্থির করলেন নাগাল্যান্ড যাবেন। কোহিমায়ে ভোলাবাবুর মেজদার বন্ধু পরিতোষ হালদার চাকরি করেন। অনেকদিন থেকেই যেতে বলছেন দু-জনকে। মস্ত বাংলায় থাকেন, একা মানুষ। কাজেই কোনো অতিথি এলে অত্যন্ত খুশি হন, আতিথেয়তার কোনো অভাব হয় না।

পুজোর ছুটির সঙ্গে আরও কিছুদিনের ছুটি যোগ করে, সপ্তমীর দিন দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়লেন। কোহিমা পর্যন্ত যেতে কোনো অসুবিধে হল না তেমন। কানুবাবুর গাড়ি চালানোর কষ্ট ভুলিয়ে দিল গুয়াহাটি থেকে কোহিমা যাবার রাস্তার দু-পাশের অপূর্ব দৃশ্য। বর্ষার পর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের যে রূপ তা যেকোনো মানুষেরই সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিতে পারে। ভোলাবাবু অবশ্য সমস্ত রাস্তাটাই ঘুমিয়ে কাটালেন। কানুর বেসুরো গলায় উদ্ভট গানগুলো তাঁকে কিছুমাত্র বিরক্ত করতে পারল না।

গোলমাল বাধল ফেরার সময়। পরিতোষবাবুর দিলদরিয়া স্বভাব আর অকৃপণ অতিথিসৎকারের ফলে দু-জনে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তেই রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু

ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই নামল তুমুল বৃষ্টি। যদিও রাস্তা জনহীন, কোনো গাড়ি বা লরির চিহ্নমাত্র নেই, তবুও এরকম বর্ষায় গাড়ি চালানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। কানুবাবু কিন্তু গাড়ি চালিয়েই যেতে থাকলেন; কারণ থামতে তাঁর মোটেই ভালো লাগছিল না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথায় গাড়ি দাঁড় করাবেন? যদিও তখন সকাল আটটা, কিন্তু জঙ্গলের নিশাচর জন্তুজানোয়াররা সবাই যে নিয়ম মেনে গুতে গেছে সে রকম কোনো স্থিরতা তো নেই। তার ওপর বিপজ্জনক মানুষেরও কোনো অভাব নেই। কাজেই খুব সাবধানে হেডলাইট জ্বেলে প্রায় আন্দাজে রাস্তার নিশানা রেখে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলেন কানুবাবু। ভোলাবাবুর কোনো বিকারই নেই। তিনি অকাতরে ঘুমোতে লাগলেন।

কিছুটা যাবার পরেই এমন একটা দৃশ্য দেখলেন কানুবাবু যে তাঁকে গাড়ি দাঁড় করাতেই হল। রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে একটি নাগা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরনে স্কুল ইউনিফর্ম, পিঠে স্কুল ব্যাগ, বয়েস এগারো-বারো হবে। হাপুস নয়নে কাঁদছে মেয়েটি। তার সর্বাঙ্গ ভিজ়ে গেছে আর সেইজন্যেই বোধ হয় থরথর করে কাঁপছে।

কানুবাবু গাড়ি দাঁড় করালেন বটে, কিন্তু মেয়েটি এগিয়ে এল না। যেখানে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়েই উদ্বিগ্ন চোখে গাড়িটাকে দেখতে লাগল। কানুবাবু ইঞ্জিন বন্ধ করে জানলা নামিয়ে বললেন, ‘তুমি কি ইংরিজি জানো?’

মাথা নেড়ে মেয়েটি জানাল যে সে জানে।

‘এরকম নির্জন জায়গায় এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি একা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? কোথায় যাবে তুমি?’ জিজ্ঞেস করলেন কানুবাবু।

এইবার মেয়েটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। কানুবাবুকে দেখে আর তাঁর কথা শুনে একটু বোধ হয় ভরসা পেল। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলল, ‘আমি ইস্কুলে যাচ্ছিলুম। দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই বন্ধুরা আগে চলে গেছে। ভেবেছিলুম দৌড়ে ওদের ধরে ফেলব। এখন এমন বৃষ্টি নামল! এ অবস্থায় আমি ইস্কুলেও যেতে পারছি না, বাড়িও ফিরতে পারছি না।’ বলে আবার কান্না শুরু করল।

‘কোথায় তোমার বাড়ি?’ জিজ্ঞেস করলেন কানুবাবু।

‘এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে আমাদের গ্রাম। ওইদিকে।’ বলে মেয়েটি কানুবাবুরা যদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকে আঙুল তুলে দেখাল। ‘ওই টিলাটার ওপাশে।’

‘তবে তো আমাদের পথেই পড়বে। তুমি গাড়িতে উঠে এসো। আমরা তোমাকে পৌঁছে দেব। তোমাদের গ্রাম পর্যন্ত গাড়ি যাবে?’

‘যাবে। মাঝখানে একটা নদী আছে তবে তার ওপরে একটা ব্রিজ আছে।’

‘তবে তো ভালোই হল। উঠে এসো।’

মেয়েটি ইতস্তত করছিল। কানুবাবু বললেন, ‘কী হল? দেরি করছ কেন?’

অরাজকতা এককুসিভ

‘তোমার সঙ্গে ওই লোকটি অমনভাবে পড়ে আছে কেন? মাতাল?’

‘আরে না না। ও ঘুমোচ্ছে। সবসময়েই ঘুমোয়।’ বলে কানুবাবু ভোলাবাবুকে এক ধাক্কা মেরে বললেন, ‘এ্যাই ভোলা ওঠ। দ্যাখ, এই মেয়েটি তোকে দেখে মাতাল ভাবছে। ভাববেই। এই সকালে কেউ ঘুমোয়।’

ভোলাবাবু আড়মোড়া ভেঙে উঠে বললেন, ‘মেয়ে? আরে তাই তো, এ কে? বৃষ্টিতে আটকে গেছে বুঝি?’

কানুবাবু বললেন, ‘ওকে বাড়ি পৌঁছে দেব। কাছেই গ্রাম। ভালোই হল, একটা নাগা গ্রামও দেখা হয়ে যাবে।’

মেয়েটি তখনও ইতস্তত করছে দেখে কানুবাবু একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, ‘আবার কী হল? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কোনো লাভ আছে?’

মেয়েটি বলল, ‘আপনার গাড়ির সিট কিন্তু ভিজে যাবে।’

‘ভিজুক। সে তোমাকে ভাবতে হবে না।’

অত্যন্ত সংকুচিতভাবে মেয়েটি গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসল। বলল, ‘আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আপনাদের এরকমভাবে বিব্রত করলুম।’ কানুবাবু বললেন, ‘ওসব কথা ছাড়ো। এখন আমাদের রাস্তা দেখাও।’ বলে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করবার জন্যে চাবি ঘুরিয়ে সেন্স স্টার্টারের বোতাম টিপলেন। গাড়ি স্টার্ট হল না। যত বার বোতাম টেপেন কানুবাবু, তত বারই গাড়ি চ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ করে আর্তনাদ করে থরথর করে কাঁপে। কিন্তু তার ইঞ্জিন আর চালু হয় না।

খেয়েছে। ইঞ্জিন নির্যাত ঠান্ডা হয়ে জমে গেছে। ভাবলেন কানুবাবু, কিন্তু স্টার্ট তো করতেই হবে। এরকমভাবে রাস্তার মাঝখানে তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি থেকে বেরুতে বাধ্য হলেন কানুবাবু। ভোলাবাবুকে বলে লাভ নেই কারণ তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বনেটের ডালা খুলে স্পার্ক প্লাগগুলো নাড়াচাড়া করলেন; কিন্তু তাতে আর কী লাভ! আগুন জ্বলে সেগুলো গরম করা দরকার। কোথায় আগুন জ্বালবেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন আর কী করা যায় ভাবছেন কানুবাবু।

এমন সময় দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। এইদিকেই আসছিল গাড়িটা। বৃষ্টির প্রায় নিশ্ছিদ্র পর্দার পেছনে একজোড়া হেডলাইটের স্নান আলো দেখা গেল। গাড়ি যখন, তখন নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে, এই ভেবে কানুবাবু এগিয়ে গেলেন পেছনের গাড়িটার দিকে। দু-হাত তুলে থামতে বললেন। গাড়িটা থামল। দেখা গেল সেটা একটা জিপ— স্থানীয় পুলিশের।

পুলকিত চিত্তে কানুবাবু জিপের কাছে চলে গেলেন। জানলা খুলে মুণ্ড বের করলেন একজন অফিসার। বললেন, ‘কী হয়েছে? গাড়ি খারাপ?’

নাক-চোখ থেকে জল ঝেড়ে ফেলে কানুবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ। স্টার্ট নিচ্ছে

না, তবে সেটা বড়ো কথা নয়। আমার গাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে সে বাড়ি ফিরতে পারছে না এইরকম আবহাওয়ায়। আপনারা যদি দয়া করে ওকে পৌঁছে দেন আর সেইসঙ্গে একজন গাড়ির মিস্ট্রিকে যদি খবর দিয়ে দেন তো বড়ো উপকার হয়।’

‘মেয়েটির বাড়ি কোথায়?’

‘ওই টিলাটার ওপাশে এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে।’

‘ওই টিলাটার ওপাশে। মেয়েটি এখনও রয়েছে আপনার গাড়িতে? বলতে বলতে প্রবল বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে লাফ দিয়ে জিপ থেকে নামলেন পুলিশ অফিসার। কোমরের খাপ থেকে রিভলবার বের করে উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘চলুন তো।’

কানুবাবু বেশ আশ্চর্যই হলেন। বললেন, ‘আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? মেয়েটির নিতান্তই অল্প বয়েস, স্কুলে পড়ে।’

অফিসার বিরক্ত গলায় বললেন, ‘কোনো কথা বলবেন না। চুপচাপ আসুন।’

অফিসারের পেছনে পেছনে জিপ থেকে তিনজন বন্দুকধারী কনস্টেবলও নেমে এসেছিল। তারা চারজনে মিলে কানুবাবুর গাড়িটা ঘিরে ফেলল। অফিসার গাড়ির ভেতরে উঁকি মেরে বললেন, ‘কোথায় মেয়ে? আর এ কে? মরে গেছে না কি?’

কানুবাবু বললেন, ‘মেয়েটি নেই? তাহলে আপনাদের দেখে পালিয়েছে। আর ও আমার বন্ধু। মারা যায়নি, ঘুমোচ্ছে।’

‘বাব্বা, এমন ঘুম? মেয়েটিকে ঠিক দেখেছিলেন তো?’

‘নিশ্চয়ই ঠিক দেখেছি। দেখুন না পেছনের সিট আর তলায় পা রাখার জায়গা ভিজে রয়েছে কিনা।’

অফিসার করলেন, ‘না, একেবারেই ভিজে নেই।’ বলে কনস্টেবলদের বললেন, ‘তোমরা জিপে গিয়ে বসো। আমি আসছি।’

দরজা খুলে পেছনের সিটে বসলেন অফিসার। কানুবাবুকে বললেন, ‘আপনি উঠে আসুন। আর আপনার বন্ধুকে ঘুম থেকে তুলুন। ওঁকে বলুন যে আজ সান্ধাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন দু-জনে।’

এইবার ভয় পেলেন কানুবাবু। ধাক্কা মেরে ওঠালেন ভোলাবাবুকে। বললেন, ‘শোন একবার ইনি কী বলছেন।’

অফিসার ভোলাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি মেয়েটিকে দেখেছিলেন?’

ভোলাবাবু বললেন, ‘কোন মেয়ে? ও সেই যাকে কানু বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল? দেখেছি বই কী! কোথায় সে?’

‘সেটা পরে বলছি। আচ্ছা, মেয়েটি কি লাল আর সবুজে চৌখুপি ডিজাইনের স্কার্ট আর সাদা রঙের জামা পরে ছিল? কাঁধে ছিল গাঢ় নীল রঙের স্কুলব্যাগ?’

‘ঠিক তাই। গেল কোথায় সে?’

‘কোথাও যায়নি। এখানেই সে রয়েছে। একটা শিকার ফসকেছে, আর একটার আশায় বসে রয়েছে।’

‘কী যে বলেন তার ঠিক নেই। শিকার আবার কী? ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে...’

‘তাহলে শুনুন। ওই যে টিলাটি দেখছেন যার ওপাশে মেয়েটির গ্রাম, ওটার পেছনে যাবার কাঁচা রাস্তাটি এই হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছু দূর গিয়েই একটা সূচ্যগ্র বাঁক নিয়ে বিপজ্জনকভাবে খাড়া নেমে গেছে নীচে পাহাড়ি নদীতে। যারা এইসব পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষেও সেই উতরাইতে সামলে চালানো প্রায় অসম্ভব। আর যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের পক্ষে হুড়মুড় করে গিয়ে অনেক নীচে নদীর প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে আছড়ে পড়া ছাড়া অন্য গতি নেই। আর, সেই পড়ার অর্থ অবধারিত মৃত্যু।’

‘ব্রেক কষলে লাভ হয় না?’

‘না। গাড়ি তাহলে ডিগবাজি খেয়ে নদীর মধ্যে পড়বে। আর ব্রেক কষবেন কখন? বাঁকটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই তো উতরাই। তার ওপর এই বৃষ্টি। একহাত দূরের গাছটাই ভালো দেখা যায় না তো রাস্তা। ওই মোড়ে যানবাহনকে সতর্ক করতে বড়ো বোর্ডও আছে। এই বৃষ্টিতে সেটাই কি কারো নজরে পড়তে পারে?’

কানুবাবু বললেন, ‘মেয়েটি যে বলল নদীর ওপর একটা ব্রিজ আছে।’

‘ছিল। বছর পনেরো আগে সেটা বন্যায় ভেঙে যায়। এখন একটা দড়ির সাঁকো আছে। তার ওপর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাওয়া চলে, আপনার এই গাড়ি নয়।’

‘নদীর ওপারে গ্রামটা?’

‘সেটা আছে। মেয়েটি ওই গ্রামেই থাকত।’

‘থাকত?’

‘হ্যাঁ। প্রায় বারো বছর আগে এমনি এক বর্ষার সকালে স্কুলে যাবার সময় দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে। ড্রাইভারের খুব-একটা দোষ ছিল তা বলা যায় না। বৃষ্টিটা হচ্ছিল খুব জোরে, বেচারি দেখতে পায়নি। যখন দেখেছে তখন আর সামলাতে পারেনি। তারপর থেকে, এই বারো বছরে প্রায় আট-দশটা গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে নেমে গিয়ে নদীতে ভেঙে পড়েছে। প্রায় চোদ্দো-পনেরো জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। কেবল একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েও বেঁচে ছিল কিছুদিন। মারা যাবার আগে সে যে বয়ান দিয়েছিল, তার থেকেই আমরা জানতে পারি কেন এই গাড়িগুলো প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হাইওয়ে ছেড়ে ওই দুর্গম রাস্তায় ভয়াবহ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। তা না হলে হয়তো এই ঘটনাগুলো একটা রহস্যই থেকে যেত। আমাদের ওপর ওয়ালারা অবশ্য এ বয়ানে বিশ্বাস

করেননি। তাঁরা বলেন দুর্ঘটনার ফলে লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই উলটোপালটা বকেছে। তাঁরা এই ব্যাপারটায় একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপও বাদ যায় না।’

‘অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে মেয়েটি ভূত? আর এসব ভূতের প্রতিহিংসার ব্যাপার?’

‘অফিসিয়ালি সেকথা আমি আপনাকে বলতে পারি না।’

‘আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।’ ব্যাজার মুখে বললেন কানুবাবু।

‘না করতে পারেন। আপনার গাড়িটা কিষ্ট্ব করে। আর সেইজন্যেই সে ভয়ে স্টার্ট নেয়নি যে কারণে আপনারা এখনও জীবিত আছেন। যাক গে, এখন বনেটটা একবার খুলুন, দেখি একে স্টার্ট করানো যায় কিনা।’ বলে গাড়ি থেকে নামলেন অফিসার।

বনেট খোলার দরকার হল না। কানুবাবু চাবি ঘুরিয়ে সেন্স স্টার্টার টেপা মাত্র গাড়ি চড়াং করে চালু হয়ে গেল। পুলিশ অফিসার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, ‘দেখেছেন? কি বলেছিলাম?’ বলে পেছনে জিপের দিকে চলে গেলেন।

কানুবাবু সন্নেহে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত বুলিয়ে বললেন, ‘দূর ব্যাটা ভীতুর ডিম! ভূত বলে কিছু নেই, জানিস না? ভয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেলি?’

[শুকতারা, আষাঢ় ১৪০৮ (জুন ২০০১)]

কিশোরী ভূতের বয়ফ্রেন্ড

শিবতোষ ঘোষ

বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে অর্ণবের সঙ্গে গল্প করছিলাম। আমরা ছুটিতে বাড়ি এসেছি।

অর্ণব জিজ্ঞেস করল, ‘কাল একটা জায়গায় যাবি?’

‘কোথায়?’

‘কাপালিক দর্শনে।’

অর্ণব নিশ্চয় ভয়ে ‘দেখতে’ বলল না, ‘দর্শন’ বলল।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাপালিকের বাইরে কাপালিক সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই। ‘কপালকুণ্ডলা’র কাপালিক ভয়ানক, নবকুমারকে বলিই দিত, কপালকুণ্ডলা ছিল বলে... কিন্তু আমাদের জন্য কি আর কোনো কপালকুণ্ডলা থাকবে !

অর্ণব বলল, ‘তুই কী রে, এখন আগের মতো কিছু আছে? গিয়ে দেখবি সে আর তার বউ টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখছে।’

অর্ণবের বাবা বড়ো পুলিশ অফিসার, ও নিজেও ক্যারাটে শিখেছিল বেশ কিছুদিন, এই দুই শক্তির উপর ভর করে আমি কিছুটা সাহসী হয়ে উঠলাম। পরের দিন দক্ষ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করে, প্রায় আট কিলোমিটার অর্ণবের পিছন-পিছন শালবনির জঙ্গুলে রাস্তায় হেঁটে, কাপালিকের আশ্রমে পৌঁছোলাম।

অর্ণবের কথাই সত্যি, উনি একেবারে আমাদের দাদু-জেঠুর মতো। আমরা প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানাতে, উনিও চিবুক স্পর্শ করে স্নেহ জানালেন।

আমরা দুজনেই মেডিক্যালের ছাত্র শুনে খুশি হয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, ‘তোমরা যেন অসুস্থ মানুষের বন্ধু হতে পারো।’ উনি তাঁর এক সেবককে দিয়ে গাছ থেকে কলা, পেঁপে, পেয়ারা, শশা পাড়িয়ে এনে যত্ন করে আমাদের খাওয়ালেন। একসময় জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি কোনো মনস্কামনা নিয়ে এসেছ?’ আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল,

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে অনেকদিন ধরে কাপালিক সম্পর্কে ভীষণ কৌতূহল ছিল, এজন্যই...। আমাকে বলতে হল না, তার আগেই অর্ণব বলল, ‘আমরা আমেরিকা যেতে চাই, বিখ্যাত ডাক্তার হতে চাই।’ আমেরিকা শুনে আমারও আবেগ এসে গেল, এক লাইন জুড়ে দিলাম, ‘ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসায় বেশ-কিছু রোগী মারা যান। আমরা এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করব, ভুল চিকিৎসার শুরুতেই যন্ত্রে লাল আলো জ্বলে উঠবে।’ কাপালিক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, ‘সাধু, সাধু! কিন্তু বাবা, আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই, সবই মা-ভৈরবীর করুণা। আমি মায়ের পায়ে তোমাদের নামে ফুল চাপাচ্ছি, যদি মায়ের আশিস পাও, তা হলে ওই ফুল নীচে গড়িয়ে আসবে, আর যদি না পাও...ওঁ মা ভৈরবী, হিং-দ্রিং...।’

মায়ের পা থেকে দুটো জবাফুলই গড়িয়ে এসেছিল, আমরা সেই আনন্দে ফেরার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। ফুলটিকে বুকপকেটে নয়, যেন অপারেশন করে হৃৎপিণ্ডে সেলোটেক দিয়ে আটকে নিয়ে অন্ধকার নামার মুখে আশ্রম ছেড়ে বেরোলাম।

বাইরে বেরিয়ে প্রায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এমনিতে জঙ্গলের অন্ধকার, আর নিশ্চয় ঘোর কৃষ্ণপক্ষ, অমাবস্যাও হতে পারে। অর্ণব বলল, ‘দেখার দরকার কি, শুধু কদম-কদম বাড়ায়ে যা।’

একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, ‘তোর কি ভয় করছে?’

‘করবে না!’

‘তা হলে একটা গান গা।’

‘মজা করিসনে তো!’

‘মজা নয় রে, “যদি তোর ডাক শুনে” গা, দেখবি ভয় কেটে গেছে।’

আমাকে গাইতে হল না, হঠাৎ দেখি একটা মৃদু টিমটিমে আলো জঙ্গলের ভিতর থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। অর্ণব আমাকে টেনে নিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

আলোটা যখন কাছাকাছি এল তখন দেখলাম লঠন হাতে এক মহিলা। সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা, মাথায় একহাত ঝোলানো ঘোমটা। আমরা তাকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু টিমটিমে হলেও একটু আলোরও তো দেখা পেয়েছি। অন্ধকার যে কীভাবে মানুষের দম শুষে নেয় তা এই প্রথম টের পেলাম। তাই এখন এই আলোটুকুকেও হারাতে চাইলাম না। আমরা আলো-হাতে মহিলার পিছন-পিছন হাঁটতে লাগলাম।

ওই আলোর পিছনে কতক্ষণ হেঁটেছি খেয়াল নেই। কীরকম যেন একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটেছি। আলোটা হঠাৎ একটা দুর্জয় বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে

পড়ল। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। মহিলা প্রথম কথা বলল। জিজ্ঞেস করল, ‘তোমরা কোথায় যাবে?’

অর্ণব বলল, ‘শালবনির বাসস্ট্যান্ড।’

‘সেকী, তোমরা তো পুরো উলটো রাস্তায় এসেছ!’

‘কিন্তু আমরা তোমার পিছনে-পিছনে আসছি!’

‘আমি তো বাসস্ট্যান্ডে যাচ্ছি না। বাবা অসুস্থ, খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, এখন ঘরে ফিরছি। তোমরা খেয়াল করোনি একটা জায়গায় রাস্তা দু-দিকে ভাগ হয়েছে, একটা গেছে জঙ্গলের ভেতরে, একটা বেকে গেছে বাসস্ট্যান্ডে। পিছন দিকে তিন-চার কিলোমিটার হাঁটলে ওই বাঁকটা পাবে। সেখান থেকে আট কিলোমিটার।’

আমি ধপাস করে বটতলায় বসে পড়লাম।

অর্ণব জিজ্ঞেস করল, ‘তা হলে কী করবি?’

মহিলা বলল, ‘এখন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে কোনো লাভ হবে না, লাস্ট বাস বহু আগেই চলে গেছে। আর ওখানে থাকারও কোনো হোটেল নেই।’

অর্ণব বলল, ‘সেখানে কোনো রকে বা গাড়িবারান্দায় তো রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব।’

আমি বললাম, ‘হোঁচট লেগে বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে গেছে, জ্বালা করছে, এত অন্ধকারে অতখানা আর হাঁটতে পারব না। এই গাছতলায় রাত কাটিয়ে দেব!’

মহিলা বলল, ‘দ্যাখো, আমাদের পোড়ো বাড়ি, ভাঙা ঘরদোর, তবু যদি... গাছতলার চেয়ে তো কম কষ্ট হবে।’

তাকে আর বেশিকিছু বলতে হল না, আমরা সঙ্গেসঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। এই বাঁকড়া বটগাছের তলার অন্ধকার যেভাবে তার ছায়াবাজির খেলা দেখাতে শুরু করেছে, তা দেখে এই সামান্য সময়েই আমি ঘামছি। আমি অর্ণবকে কিছু বলতে না দিয়ে মহিলার পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলাম।

দুই

মহিলা পোড়োবাড়ি বলে আমাদের যেখানে নিয়ে এল, তা কীরকম পোড়ো, এফুনি মাথায় ইট খসে পড়বে কি না, অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেকখানা জায়গা জুড়ে স্তূপীকৃত অন্ধকারকে এখানে যেন জমাট বেঁধে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ংকর লাগছে এ-বাড়িটায় কোনো আলো নেই। ওই আলো-হাতে মহিলার টিমটিমে আলোর মতো একটা কী দুটো...

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

জোনাকিও হতে পারে, আবার বেড়ালের মতো কোনো জন্তুর চোখও হতে পারে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, এ-বাড়ির মানুষজনের হাঁটাচলা কী কাজকর্মে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। উঠোনে কয়েকজন ছেলে মিলে বল খেলছে, গোল-গোল চিৎকার করছে। আমি অর্ণবকে বললাম, ‘আমার কিন্তু অন্যরকম সন্দেহ হচ্ছে, ভয় করছে!’

সে বলল, ‘দ্যাখ, এসব জায়গায় ইলেকট্রিক নেই, এক-একটা ফ্যামেলি বড়োজোর হাফ লিটার করে কেরোসিন পায়। ব্ল্যাকে তো সকলে কিনতে পারে না, প্রচণ্ড দাম। তাই অন্ধকারে এদের সব কিছু করার অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে ওদের মেলাতে যাস না, মিলবে না।’

অর্ণবের কথা শুনে চুপ করে গেলাম বটে, কিন্তু ভয় গেল না।

বটতলা থেকে এই পোড়োবাড়িতে আসার পথে ওই আলো-হাতে মহিলাকে অর্ণব হঠাৎ পিসিমণি বলে ডাকতে লাগল। পিসি ডাকলে হয়তো বেশি যত্নআত্তি পাওয়া যাবে।

সে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?’

বললাম।

শুনে সে অবাক হয়ে বলল, ‘তোমাদের কপাল ভালো যে জান নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছ!’

আমি বললাম, ‘না-না, তিনি খুব ভালো, গাছ থেকে ফল পেড়ে, কত যত্ন করে আমাদের খাওয়ালেন। আমাদের গায়ে-মাথায়...।’

আমাকে আর বলতে দিল না, আমাদের দিকে একপাক ঘুরে কীরকম অদ্ভুত ধরনের হাসি হেসে উঠল পিসিমণি। অন্ধকারে তাকে দেখা গেল না; কিন্তু তার দাঁত থেকে হঠাৎ এমন একটা বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল, যা দেখে আমি চমকে গেলাম।

‘তোমরা ওই জোচ্চোর, ডাকাত, নরখাদকের ডেরায় গিয়েছিলে? ওখানে যে যায় সে আর ফেরে না। তাকে মেরে জঙ্গলে পুঁতে দিয়ে তার যা টাকাপয়সা থাকে নিয়ে নেয়। ওর শাকরেদগুলো তো এক-একজন নামকরা ডাকাত।’

হতে পারে, স্থানীয় মানুষজনই ভালো জানবে। কিন্তু আমার কাছে কাপালিকের চেয়ে অনেক বিপজ্জনক মনে হল মহিলার দাঁতে বিদ্যুৎ খেলে যাওয়া। ওর দাঁতে যেন বিদ্যুতের কারখানা আছে। অর্ণবকে বলতে সে হেসে উড়িয়ে দিল, ‘মানুষের দাঁতে কখনো... তোর যত সব উদ্ভট!’ তবে বাঁচোয়া হয়েছে। এখানে ওই মহিলাকে বিশেষ দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো ভাইপোদের জন্য ভালো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছে।

অরাজকতা এককুসিভ

এখন আমাদের সামনে ঘুরঘুর করছে একটি কমবয়সি মেয়ে। অক্ষকরে কিছু বোঝার উপায় নেই, শুধু মনে হচ্ছে অর্ণবের পিসিমণির চেয়ে হাইটে ছোটো, আর গলার স্বর কর্কশ নয়, অনেক মোলায়েম।

মেয়েটি থায়ই এসে পীড়াপীড়ি করছে আমাদের, হাত-পা ধোওয়ার জন্য।

‘এত गरমে জামা-প্যান্ট পরে বসে আছো কী করে? যাও, সব ছেড়ে রেখে হাত-পা ধুয়ে নাও। আমি জল তুলে এনে রেখেছি। আমাদের জল খুব ভালো, খুব ঠান্ডা।’

অর্ণব জামা খুলতে যাচ্ছিল, আমি নিষেধ করলাম। জামাটা মা খুলে রেখে গেলে আর কিছুই থাকবে না, দুজনের পকেটে সাত-আটশো টাকা তো আছে। আমি শেষ পর্যন্ত হাতের ব্যাগটাও রেখে যেতে সাহস পেলাম না, ওটা নিয়েই হাত-পা ধুতে গেলাম। ওতে এমন কিছু ছিল না। জলের বোতল, প্যাকেট-দুই বিস্কুট, তোয়ালে...। ব্যাগ নিয়ে যাওয়াটা একটু বেশি দৃষ্টিকটু হয়ে গেল।

আমি ফিরে এসে হাত-পা মুছে বসেছি, অর্ণব তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছে। ওদের হাসাহাসিও শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ এই সময়ই আমার মাথার ওপরে ছাদ কাঁপিয়ে একটা আওয়াজ হল। শুনতে পেলাম একদল লোকের ছাদ-ফাটানো দাপাদাপি। অর্ণবকে চিৎকার করে ডাকতে যাব, কিন্তু স্বর বেরোল না। আমার পিছনেই এক মহিলার গলা-ফাটা আর্তনাদ। আমিও ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম। আমার গলা শুনে অর্ণব দৌড়ে এল। সব বললাম। উলটে সে আমাকেই বকল, ‘তোমার নাভ এত উইক! তুমি ডাক্তারি করবি কী করে? ডাক্তারদের নাভ খুব ঝুং হতে হয়।’

আমি রেগে বললাম, ‘তখন থেকে মেয়েটার সঙ্গে তোর এত কী গল্প?’

অর্ণব বলল, ‘জানিস, মেয়েটি কিন্তু খুব ভালো, কত কথা বলল। ওকে নাকি ওর বর গলা টিপে মেরে ফেলেছিল। তারপর ওর মা-বাবা খবর পেয়ে ওকে এখানে নিয়ে আসে। ওরা খুব গরিব, নাকি পাঁচ-ছ’দিন হল কেউ কিছু খেতে পায়নি। ভাবছি ওকে ডেকে কিছু টাকা দিই, কিছু খাবারদাবার আনুক। কিন্তু এত রাতে কি দোকানটোকান খোলা পাবে?’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওকে মেরে ফেলেছিল তো ও বেঁচে উঠল কী করে?’

‘আরে বোকা, একেবারে কী আর মেরে ফেলেছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তুলে এনেছিল, চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে গেছে।’

‘আমার কিন্তু অন্যরকম...!’

‘কী অন্যরকম?’

হঠাৎ অর্ণবের পিসিমণি এল, অনেকক্ষণ পর এল, এসেই তীব্র বাঁঝালো গলায় বলল, ‘তোমরা ভেবেছ কী? মেয়েটা এত কষ্ট করে জল তুলে আনল, তোমরা ভালো করে গাও ধুলে না, স্নানও করলে না!’

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘পা হাত ধুয়ে নিয়েছি। বাতাস দিচ্ছে তো, তাই আমাদের অসুবিধে হচ্ছে না।’

‘ওসব শুনছি না। মেয়েটা এত কষ্ট করল... নাও-নাও ওঠো।’

‘আমাদের জন্য শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছে, কোনো দরকার নেই।’

মহিলা গর্জন করে উঠল, এবারও দেখলাম তার দাঁতে বিদ্যুতের ঝিলিক। বলল, ‘দেখছি কীরকম দরকার নেই!’ বলে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গেসঙ্গে ঘরের ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকতে লাগল গায়ে আগুন ধরার মতো গরম বাতাস। আমরা পুড়ে যাচ্ছি, গোটা গায়ে যেন ফোঁস্কা পড়ে যাচ্ছে। খুব অল্পক্ষণই ছিল এই আগুনে বাতাস, কিন্তু এতেই আমরা ঘেমে-নেয়ে... এবার অর্ণবও ভয় পেয়েছে, সে আমার কানে-কানে বলল, ‘খুব সাবধান, আমরা এক রহস্যজনক চক্রান্তের মধ্যে পড়েছি।’

কিশোরী মেয়েটি কাছাকাছিই ছিল, কাছে এসে বলল, ‘কী, এবার গরম লাগছে তো? নাও, জামা-প্যান্ট ছেড়ে স্নান করে নেবে চলো। গরম নেই। আর কত গরম হলে জামা-প্যান্ট ছাড়বে?’

‘আচ্ছা, এত করে আমাদের জামা-প্যান্ট ছাড়াতে চাইছ কেন? টাকার জন্য তো? এই নাও।’ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে অর্ণব ছুড়ে মারল ওর দিকে। সেও সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সপাটে ছুড়ে মারল অর্ণবের গালে, বলল, ‘টাকার গরম দেখাচ্ছ!’ ব্যাগে শুধু নোট ছিল না, কিছু খুচরো কয়েনও ছিল, ফলে গালপাটায় এমন লাগল যে গাল ধরেই থেকে গেল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ দেখা গেল আমাদের মাথার ওপরে একটা-কিছু যেন অনবরত পাক খাচ্ছে। ভয়ে তাকাতে পারছি না। অর্ণব ভয়ে-ভয়ে ভাঙা-চোখে কোনোরকমে দেখে বলল, ‘মনে হচ্ছে কালো পরি!’ আমি রেগে বললাম, ‘তুই এখনও পরি দেখছিস? আমি তো দেখছি বিশাল-বিশাল নখ বের করে শকুন উড়ছে।’ শাঁ-শাঁ শব্দ হচ্ছে, এমনভাবে ঠোঁট-নখ বের করেছে যেন এফুনি আমাদের ছিঁড়ে খাবে।

একসময় এটা থামল। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে শুরু হয়ে গেল আমাদের ঘিরে কতকগুলো কালো-কালো ছায়ার কাচ্চাবাচ্চার চেষ্টানি। তারা চেষ্টাতে চেষ্টাতে অনবরত বলছে, ‘খাবো-খাবো, খাবো-খাবো!’ এরকম ভয়ংকর সমবেত সংগীত সহ্য করতে না পেরে আমরা কানে আঙুলচাপা দিয়ে হাঁটুতে মুখ

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

গুজলাম। আর এ-সময়ই আছড়ে পড়ল প্রায় দেড়শো কিলোমিটার বেগের ঘূর্ণিঝড়। থরথর করে কাঁপতে লাগল গোটা বাড়িটা। এবার ছাদ খসে পড়বে মাথায়, একটা আধলা ইট খসে পড়লেও তো ভবলীলা সাজ। আমাদের চারপাশের কালো ছায়াগুলো তখন খুশি হয়ে লাফাতে-লাফাতে বলছে, ‘ছোটোদাদু এসেছে, ছোটোদাদু এসেছে!’

আমাদের সামনেই একটা বজ্রপাতের মতো শব্দ হল, ‘হয়েছেটা কী?’

আলো-হাতে মহিলা তার কর্কশ গলা আরও কর্কশ করে বলল, ‘এই দ্যাখো না, ছোঁড়া দুটো...।’ বাকি কথাগুলো তার কানে ফিসফিস করে বলল।

‘ও, এই!’ বলে প্রচণ্ড জোরে হাসল। ‘তোরা সবাই সরে যা! আমি দেখছি।’

নিমেষের মধ্যে ওই ছোটোদাদু হয়ে গেল এক ছঁদো বাঘ, আমাদের হাত-তিনেক দূরত্বে বসে হাঁ করে হুংকার ছাড়ছে। যখন আমাদের ঘাড় লক্ষ্য করে লেজ তুলে লাফ দিল, তখন আমরা মুখ খুবড়ে পড়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে কাঁপতে লাগলাম।

এতসব করেও আমাদের উপর শেষ আঘাতটা কিন্তু করতে পারছে না, একটা জায়গায় এসে ওদের থেমে যেতে হচ্ছে। যে ছোঁড়া তালাইয়ের উপর আমরা বসেছি, ওতে কীভাবে পা লেগে গিয়েছিল একটা বাচ্চার, সে প্রায় আধঘণ্টা ধরে কাতরেছিল যন্ত্রণায়। এইসব কারণে সকলে আমাদের উপর দারুণ খেপে গেল। একজন ভারী গলায় বলল, আর দেরি নয়, চলো, সবাই মিলে গিয়ে দাদাকে ধরে নিয়ে আসি। এ আমাদের মান-সম্মানের প্রশ্ন, দুটো ছোকরা এভাবে... আমরা সমাজে মুখ দেখাব কী করে?’

কর্কশকণ্ঠী মহিলা বলল, ‘শুধু মান-সম্মান নয়, আজ পাঁচ-ছ’দিন হয়ে গেল বাচ্চাকাচ্চা কারও পেটে দানাপানি পড়েনি, হাতের কাছে এমন নখর খাবার থেকেও বাছারা আমার...!’

যাওয়ার সময় মহিলা আমাদের শাসিয়ে গেল, ‘কথা শুনলি না তো, এবার দ্যাখ তোদের কী অবস্থা হয়!’

দেখতে-দেখতে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। একটু-একটু করে বাতাস স্বাভাবিক হয়ে এল। আমরাও মাথা সোজা করলাম। কিন্তু দুজনেই বুঝে গেছি, মৃত্যু আমাদের শিরে দাঁড়িয়ে, শুধু সময়ের অপেক্ষা।

হঠাৎ এসময় কিশোরী মেয়েটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, ‘এখান থেকে এন্ফুনি পালাও! বাবা এসে গেলে আর নিস্তার নেই তোমাদের! সে এ-অঞ্চলের রাজা, গোদাপিয়াশালের জঙ্গলের ভাঙা নীলকুঠি তার রাজধানী, সে সেখানে থাকে। সবাই মিলে গেছে তাকে ডেকে আনতে। এই হল সুবর্ণ সুযোগ!’

অরাজকতা এন্ড ক্লুসিভ

আমি বললাম, ‘একটু আগে তুমিই আমাদের মাথার উপর শকুন হয়ে উড়তে-উড়তে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিলে। তোমাকে বিশ্বাস করব কী করে?’

‘বিশ্বাস করো আর নাই করো, তোমাদের মিনতি করছি তোমরা পালাও! বাবাকে তো জানি, যেকোনো উপায়ে তোমাদের মেরে ফেলবে।’

অর্ণব বলল, ‘কোনদিকে পালাব? অন্ধকারে রাস্তাঘাট কিছু বুঝতেও পারব না।’

‘চলো, আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বর্ডার লাইন পার করে দিয়ে আসছি।’

আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘বর্ডার লাইন মানে?’

‘ভারত-পাকিস্তানের মতো। লাইন পেরিয়ে ওপারে চলে গেলে আমাদের কোনো জারিজুরি চলে না। আমাদের যত জোর সব এজ্জিয়ারের মধ্যে।’

হঠাৎ অর্ণব অন্যরকম গলায় বলল, ‘তুমি ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের মেরে ফেলবে না তো?’

‘আমি তো কোন ছার, আমাদের কেউ তোমাদের মেরে ফেলতে পারবে না। তোমাদের বুক পকেটে কী আছে জানো? বের করে দ্যাখো।’

‘এ তো ভৈরবীমায়ের পায়ে ঠেকানো ফুল।’

‘এর জোরেই এখনও বেঁচে আছো তোমরা। কিন্তু তোমাদের উপর যে অত্যাচার গেছে, আবার বাবা এসে যদি তার উপর... তোমরা নিজেরাই হার্টফেল করবে।’

আমরা ভূতের ডেরা থেকে পালাচ্ছি। সামনে দৌড়ছে ভূত-কিশোরী। আমরা তার পিছনে-পিছনে। দৌড়তে-দৌড়তে অর্ণবের সঙ্গে টুকরো টুকরো কথা হচ্ছে আমার কানে আসছে।

কিশোরী : আমার বর তো গলা টিপে আমাকে মেরে ফেলেছিল।

অর্ণব : কেন, তুমি কী করেছিলে?

কিশোরী : বাবা পণের পুরো টাকা দিতে পারেনি। তাই একদিন রেগে...। আচ্ছা, এখনও কি পণ আছে?

অর্ণব : পেপারে তো মাঝেমধ্যেই দেখি। যারা অর্থপিশাচ, অমানুষ তাদের মধ্যে আছে।

কিশোরী : তোমরা পণ নেবে না তো?

অর্ণব : ছিঃ, কী যে বলো!

কিশোরী : জানো, আমার কী ইচ্ছে করছে— তোমাদের সঙ্গে চলে যেতে। আমি যদি মানুষ হতাম, তা হলে...!

কিশোরীর দীর্ঘশ্বাস আমি এত পিছন থেকেও শুনতে পেলাম।

বেশ খানিকক্ষণ দৌড়ানোর পর রাতের সেই বিশাল ভয়ংকর বটগাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোরী। বলল, ‘এই বটগাছটাই হল আমাদের বর্ডার লাইন। তোমরা আর দাঁড়িয়ে থেকো না, এগিয়ে যাও, যেকোনো মুহূর্তে দলবল এসে পড়তে পারে।’

আমি বললাম, ‘আমাদের না দেখতে পেলে ওরা তো তোমাকেই...।’

‘হ্যাঁ, মারবে। হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। কিন্তু কী করব, তোমরা যে এখন আমার বয়ফ্রেন্ড। তোমাদের উপর অত্যাচার যে আমাকে আরও কষ্ট দিত। এখন আমি সব সহ্য করতে পারব!’

হঠাৎ শোনা গেল ভূতগুলো সব হই-হুল্লোড় করতে-করতে বটগাছের দিকে এগিয়ে আসছে। কিশোরী বলল, ‘পালাও-পালাও, ওরা এসে গেল!’

আমরা বটতলা পেরিয়ে এসে একবার পিছনে ফিরলাম। কিশোরী হাত নাড়ছে।

হঠাৎ সে চোঁচিয়ে বলল, ‘আমাকে ভুলে যাবে না তো?’

আমরাও চোঁচিয়ে বললাম, ‘কক্ষনো না!’

আমরা দৌড়ছি। দৌড়তে-দৌড়তে অর্গব জিজ্ঞেস করল ‘হ্যাঁ রে, মানুষ মারা গেলে ভূত হয়, ভূত মারা গেলে সে আবার মানুষ হতে পারে না?’

এর উত্তর আমরা জানি না। আমাদের দুজনেরই চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

[আনন্দমেলা, ৬ অক্টোবর ২০০২]

তুতুলের মা

সুকুমার ভট্টাচার্য

অবনীৰ চাকৰি হাওড়াতে। একটা নামকৰা কাৰখানায়। আটটা-পাঁচটা ডিউটি। বাড়ি থেকে বার হয় সেই সাত সন্ধ্যাকালে। ফেৰে বিকেল ছ’-টার তারকেশ্বৰ লোকালে। শ্যাওড়াফুলিতে নেমে বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধ্যা উতৰে যায়।

ষ্টেশন চত্বৰ ছেড়ে রাস্তায় একটু হাঁটলেই পড়ে বংশীর চায়ের দোকান। পাড়ারই ছেলে। লেখাপড়া করেছে। চাকরি-বাকরি তেমন না পেয়ে চায়ের দোকান দিয়েছে রাস্তার ধারে। অবনী প্রতিদিন সন্ধ্যায় ট্রেন থেকে নেমে ঢোকে বংশীর চায়ের দোকানে। এক কাপ নিয়ে একটু বসে। এটা-ওটা কথা হয়। তারপর উঠে পড়ে।

সেদিন বংশীর দোকানে যেতেই বংশী বললে, ‘থাক, আজ আর বসতে হবে না অবনী। বাড়ি চলে যা। ছেলেটাকে নিয়ে তোর মা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। তোর বাড়ি ফেৰার অপেক্ষায় ঘৰবার করছেন দেখে এসেছি।’

‘সে কী! কী হল আবার?’ ব্যস্ত হয়ে উঠল অবনী।

‘তেমন মারাত্মক কিছু না। ব্যাপারটা সামলে গেছে। না হলে বেশ ভালোই ঝামেলা বাধতো।’

‘মানে?’

‘মানে আর কী? দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, তোর মা ছেলেটাকে নিয়ে একটু শুয়ে ছিলেন। বুড়ো মানুষ, যাকে বলে একটু চোখ লেগে গেছিল আর কী! সেই ফাঁকে ছেলে একেবারে বিছানা ছেড়ে বাইরে। বাইরে মানে, একেবারে বাড়ির বাইরে। তোদের বাড়ির সামনে রঞ্জিতবাবুদের জমিটায় যে ফ্ল্যাট বাড়িটা উঠছে— তার ইট এসেছিল এক লরি। মাল খালাস করে মজুররা গেছিল চা খেতে। বোধহয় দুলু ঘোষের দোকানে। এর ফাঁকে তোর ছেলে গিয়ে চড়ে বসেছে লরির পেছনে। তারা তো কিছুই

জানে না। বেশ কিছু দূর চলে যাবার পর দেখে, একটা বাচ্চা বসে। মহা বিপদ! কাদের ছেলে, কোথা থেকে এল, কী ঠিকানা— হাজার জিজ্ঞাসা। ছেলে কিছুই বলতে পারে না।’

‘তারপর?’ রুদ্ধশ্বাস অবনী।

‘এদিকে তোর মা চোখ খুলে দেখেন, ছেলে নেই। এঘর-ওঘর, দালানে না পেয়ে হইচই ফেলে দিলেন। নীচের ভাড়াটীদের ছেলে-বউরা গিয়ে তাঁকে সামাল দেয়। এদিকে হইচই পড়ে যায় পাড়ায়। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায় চারদিকে। কোথাও না পেয়ে সবার মুখই আমসি। তুই ফিরলে, তোর মা মুখ দেখাবেন কী করে— এই ভেবে শুরু করে দিলেন কান্না। এমন সময় সেই লরি এসে হাজির। তখন দেখা গেল, তোর ছেলে সেই লরি থেকে নামছে। বলছে, এটাই আমাদের বাড়ি। পাঁচজনকে জিগ্যেস করে লরি ড্রাইভার নিশ্চিত হয়ে, ছেলেকে তোর মায়ের হাতে তুলে দেয়।’

‘বলিস কী, এত কাণ্ড হয়ে গেল?’

‘হ্যাঁ। এখন যত তাড়াতাড়ি পারিস বাড়ি যা। তোকে দেখলে তোর মা হয়তো একটু সুস্থির হবেন।’

অবনী নেমে পড়ল দোকান থেকে। প্রতিদিনকার মতো হাঁটতে আর ভালো লাগল না। একটা রিকশা ধরে নিল। মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। মাথা ঘুরতে লাগল সব কথা ভেবে। এখনও দু-মাস হয়নি বিশ্রী অঘটন ঘটে গেছে বাড়িতে। বীণা, মানে তুতুলের মা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আবার এরই মধ্যে সবার চোখ এড়িয়ে ছেলেটা নিপাত্তা হয়ে যাবার দাখিল হয়েছিল।

অঘটনের সেই দিনটা ছিল সোমবার। আগের দিন ছিল রবিবার, অফিস ছিল না। অনেকদিন ধরেই বীণা বলে আসছিল, ‘বারান্দার আলোটা জ্বলছে না। ওটা ঠিক করে দাও।’ কিন্তু অবনীর আর সময় হয় না সারাবার। সেদিন কী মনে হল, আড্ডা দিতে না বেরিয়ে, বারান্দার গোটা ওয়ারিংটাই বদলে দিয়েছিল। অনেকদিনের কিছু পুরোনো তার ছিল, তাই দিয়েই করে দিয়েছিল। সেই তারে নিশ্চয় কোথাও কিছু গোলমাল ছিল। পরের দিন অবনী অফিস বেরিয়ে যাবার পর, বীণা চানটান সেরে ভিজে কাপড় শুকোতে দিতে গেছিল। ভিজে কাপড়ের ছোঁয়া লাগে সেই তারে। সঙ্গেসঙ্গে শক খেয়ে আছড়ে পড়ে বারান্দার রেলিং-এর ওপর।

সাবেক কালের পুরোনো বাড়ির রেলিং, বীণার শরীরের ভার নিতে পারেনি। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সবেগে নীচের দিকে মাথা করে বীণা গিয়ে আছড়ে পড়ে নীচের উঠোনে। অফিসে টেলিফোন পেয়ে ছুটে আসে অবনী। বাড়ি ফিরে দেখে সব শেষ। বীণা আর নেই।

তারপর দিন যায়। পারলৌকিক কাজকর্মও মিটে যায় এক সময়। অবনী তার মায়ের ওপর ছেলে তুতুলের সব ভার দিয়ে, আবার অফিস করতে শুরু করে। দিন একরকম চলে যাচ্ছিল। তারপর এই এক ব্যাপার ঘটল। তুতুল যদি সত্যি সত্যিই আর না ফিরতো, তাহলে কি হত? উঃ ভাবতে পারে না অবনী!

মাকেও কোনো দোষ দেওয়া যায় না। ছেলেরা, এমনিতেই একটু বেশি মাত্রায় দস্যি হয়। আর মায়েরও যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তিন-চার বছরের দস্যির দস্যিপনার সামাল দেওয়া রীতিমতো কষ্টকর তাঁর পক্ষে। কী যে করা যায়!

বাড়ি পৌঁছে ক্লান্ত শ্লথ গতিতে উঠে গেল দোতলায়। একেবারে নিজের ঘরে। তাকে দেখে তুতুল হইচই করে ছুটে এল। বাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল। অবনী গিয়ে বসল সোফা কাম বেডটার ওপর। তুতুল কলবল করে বলল, ‘জানো বাপি, আজ কি হয়েছে?’

অবনী গম্ভীরভাবে বলল, ‘জানি। আমি কোনো কথা বলব না তোমার সঙ্গে। অনেকবার বলেছি, ঠাকুমার বয়েস হয়েছে। একা সব দিক সামলাতে পারেন না। তার ওপর তুমি যদি অমন এক একটা ঝামেলা পাকাও, তাহলে উনি কী করবেন?’

‘বাঃ রে! আমি তো ঘুমিয়েই ছিলাম।’

‘ঘুমিয়ে আর রইলে কোথায়?’

অবনীর কথার ভাব দেখে থমকে গেল তুতুল। চোখ ছল ছল করে উঠল। সোজা গিয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছানায় বাপির ওপর অভিমানে।

অবনীর মা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘শুনেছিস, আজ কী হয়েছে?’

অবনী ঘাড় নেড়ে বললে, ‘শুনেছি। প্রতিদিন এরকম কিছু-না-কিছু ঘটতে থাকলে, আমায় চাকরি-বাকরি ছেড়ে ঘরেই বসে থাকতে হবে।’

এ কথার আর কী জবাব আছে! চুপ অবনীর মা। চুপ অবনী। অনেক পরে মা বললেন, ‘তোকে একটা কথা বলব?’

মায়ের গলায় একরাশ কুষ্ঠা। অবনী তাকাল তাঁর দিকে। মা বললেন, ‘কথাটা বেশ ক-দিন ধরে বলব বলব করছি। বলে উঠতে পারিনি। বউমার ব্যাপারে তোর কী মনে হয়?’

অবাক অবনী। বলে, ‘বউমার ব্যাপারে!’

‘হ্যাঁ।’

‘কই তেমন কিছুই তো মনে হয় না। তুমি কী বলতে চাইছ?’

‘হাজার হলেও অপঘাতে মৃত্যু তো?’

‘হ্যাঁ, তা কী হয়েছে?’

‘না, এমন কিছু হয়নি।’ বলে একটু ইতস্তত করেন অবনীরা মা। তারপর সরাসরি জিগ্যেস করেন, ‘সত্যি কথা বল তো, তুই কি কোনোদিন বউমাকে দেখেছিস? একা ঘরে ছেলেটাকে নিয়ে তো রাত কাটাস!’

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল অবনীরা। মাথা নেড়ে বললে, ‘না তো! কেন, তুমি দেখেছ নাকি তাকে?’

মাথা নাড়লেন মহিলা, ‘না দেখিনি, তবে—’

‘তবে কী?’

‘সারা দিন তো প্রায় একা একাই থাকি ছেলেটাকে নিয়ে। সময়ে-অসময়ে কেমন যেন মনে হয়। মনে হয়, তারই মতো কেউ যেন এঘর-ওঘর করছে। অনেকদিন ধরেই লক্ষ করছি। তোকে বলব বলব করেও বলিনি।’

‘ওঃ এই কথা!’ স্বস্তি বোধ করল অবনী, ‘ও তোমার মনের ভুল। অনেক দিন তো একসঙ্গে ছিলে, তাই মনে পড়লেই মনে হচ্ছে, সে ঘরের মধ্যেই আছে।’

‘তাই কি!’ বলে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন অবনীরা মা, বললেন, ‘কিন্তু সেই গন্ধটা!’

‘গন্ধ!’ আবার চোখ বড়ো বড়ো হল অবনীরা।

‘হ্যাঁ, গন্ধ। বউমা মাথায় কী যেন একটা তেল মাখত, সেই গন্ধটা। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকলেই, সেটা পাওয়া যায়। ঘরের বাতাস একেবারে ভারী।’

‘সে-ও একটা অভ্যাসের ব্যাপার!’ উড়িয়ে দেয় অবনী, ‘আগে পেতে গন্ধটা, তাই এখনও মনে হয় পাচ্ছে। ও কিছু নয়, মনের ভুল।’

‘ভুল!’ চুপ করে গেলেন অবনীরা মা। রান্নাবান্না পড়ে আছে। উঠে গেলেন তিনি।

অনেক রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে অবনী ঘরে ঢুকল। দেখল, কোলবালিশের ওপর পা তুলে দিয়ে তুতুল ঘুমোচ্ছে। আগেও ওইভাবে মায়ের গায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোত। অভ্যেসটা যায়নি। অপলকে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অবনী। এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার পাশে শুয়ে পড়ে। আর ঠিক সেদিনই, ‘মা মা’ করে ককিয়ে কেঁদে উঠল তুতুল।

ঘুম ভেঙে গেল অবনীরা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন চকিতে উঠে পড়ল তুতুলের পাশ থেকে। দ্রুত নেমে দাঁড়াল মেঝের ওপর। আচমকা একটা শিরশিরানি বয়ে গেল সারা শরীরে। ‘কে আপনি?’ গোছের কিছু-একটা জিগ্যেস ~~করবার আগেই~~ ^{অবনী} ছায়ামূর্তির মতো অস্পষ্ট

অবয়বটা মিলিয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা তখন জুঁই ফুলের গন্ধে ম-ম করছে।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল অবনী। মনে হলো, সে কি কিছু ভুল দেখেছে? সত্যিই কি কেউ বসেছিল তুতুলের পাশে? যখন ভাবছে, ঠিক তখনি তার নাকে এসে পৌঁছোল একটা গন্ধ। অবনী'র মনে হলো, হ্যাঁ ঠিক, এই গন্ধটাই বীণার মাথা থেকে পাওয়া যেত। কী যেন নাম, সেই তেলটার? ওই মুহূর্তে মনে এল না। কিন্তু মনে পড়ল মায়ের কথা। মা এই গন্ধটার কথাই বলেছিলেন সন্কেবেলা।

হাসি মুখে তাকিয়ে আছে বীণা।

সে আমল দেয়নি।

বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল অবনী। পায়ে পায়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। রাত শেষ হয়ে এসেছে। তবুও মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। চারপাশের ঘরবাড়ি সব নিব্ব্বুম। অনেকদিন পর নতুন করে মনে পড়ল বীণাকে। কি জানি কেন, তার মনে হল, বীণা যায়নি কোথাও। সে হয়তো এখানেই আছে।

পূব আকাশ আলো করে দিবাকরের আগমন প্রকট হল। অবনী হাত-মুখ ধুতে কলতলায় নেমে গেল। চোখে-মুখে জল দেওয়ার পর সচেতন মন আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। গত রাতের ঘটনাটাকে আর কিছুতেই বুদ্ধি দিয়ে মেনে নিতে পারে না। যে নেই, তার উপস্থিতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভাবনাটাকে বাড়তে দেওয়া মানেই, নিজের দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলা।

এই ভাবনায় সকালটা প্রায় গুম হয়ে রইল সে। পরে সময় হলে চান-খাওয়া করে অফিস বেরিয়ে গেল। বেরোবার সময় শুধু বলে গেল মাকে, ‘তুতুল রইল। একটু সজাগ থেকো। আর হ্যাঁ, সেই গন্ধটক্ক কী যেন পাও বলেছিলে, দেখো তো সে সব পাও কিনা?’

সারাটা দিন একটা উদ্বিগ্ন মন নিয়ে কেটে গেল। কোনো কাজেই তেমন মন লাগে না। ছুটির পরেই বেরিয়ে পড়ল বাড়ির দিকে। ট্রেন থেকে নেমে প্রতিদিনকার মতো ঢুকল বংশীর চায়ের দোকানে। যদি কোনো খবর থাকে, সেটা বংশীই কানে তুলে দেবে। কিন্তু না, বংশী কোনো কিছুই বলল না। নিশ্চিত হল অবনী। তাহলে বলার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। চা খেয়ে নিশ্চিত মনে পথে নেমে পড়ল সে।

বাড়িতে ঢোকার কিছু পরেই কিন্তু মায়ের অভিযোগ পেল। সেই একই ব্যাপার। তুতুল সেদিন দুপুরেও ঠাকুমাকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল বাড়ি থেকে। খাওয়ার পর অবনীর মা তাকে নিয়ে একটু শুয়েছিলেন। যথারীতি ^{অরাজকতা এককুসিদ্ধ} চোখ লেগে গেছিল। এক সময় জেগে

ওঠে তুতুল। কোনোরকম শব্দ না করে, পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায়। কিন্তু ভাগ্যি ভালো নীচের ভাড়াটীদের এক বউয়ের চোখে পড়ে যায়। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বলেন, ‘এই ভরদুপুরে কোথায় যাচ্ছিস রে তুতুল?’

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলে। বলে, ‘মার কাছে।’

বুক ধড়াস করে ওঠে মহিলার, বলেন, ‘মার কাছে! সেকী, কোথায় তোর মা?’

‘ওই তো।’ বলে ছেলে সদর দরজা দেখিয়ে দেয়।

সে বউ বড়ো বড়ো চোখ করে তাকায় সদর দরজার দিকে। কোথায় কে? দুপুরের কাঠফাটা রোদে চারদিক তখন জ্বলছে। বিস্ময় কাটিয়ে মহিলা তখন বলেন, ‘ঠিক আছে, বিকেল হোক, তখন যাস। এত রোদে কেউ বাড়ির বার হয় না।’

বলে তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন দোতলায়। ঠাকুমার কাছে। বলেন, ‘কাকিমা, এবার তোমার দুপুরের শোয়া ছাড়ো। এই দ্যাখো, ছেলে আজও ফাঁকতালে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাড়ি থেকে।’

শুনে গুম হয়ে গেল অবনী। একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। ঠাকুমার পিছু পিছু এসে তুতুলও দাঁড়িয়েছিল। তাকাল তার দিকে অবনী। সরল শিশু সোজা মনে বলে দিয়েছে, মায়ের কাছে যাচ্ছিল। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব, সে জানেই না। তবু একটা প্রশ্ন রয়েই যায়, ওর মা কি সত্যিই এসেছিল? তুতুল কি সত্যিই দেখতে পেয়েছিল তার মাকে?

এরকম হাজার প্রশ্ন মাথা চাড়া দিল অবনীর মনে। কাল রাত্তিরের ঘটনাটা নতুন করে মনকে নাড়া দিয়ে গেল। কাল রাত্তিরেও তো প্রায় অমনি ব্যাপার ঘটেছিল।—তুতুলের দেখা কিংবা বলায় হয়তো ভুল আছে, কিন্তু অবনীর দেখায় কি কিছু ভুল ছিল? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে অবনী।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে গেল অবনী। এটা-ওটা কথার পর সরাসরি তুতুলকে জিগ্যেস করে, ‘হ্যাঁরে তুতুল, আজ নাকি তোর মা এসেছিল দুপুরে?’

তুতুল বলে, ‘মা তো রোজই আসে দুপুরবেলায়। ঠাকুমা যখন ঘুমোয়!’

‘তাই নাকি। তুই ঠিক দেখেছিস তো?’

‘হ্যাঁ।’

রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন অবনীর, ‘না কি তোকে ডেকেছিল?’

‘না।’ মাথা নাড়ে তুতুল, ‘আমিই যাই মার কাছে। কিন্তু ধরতে পারি না। মা পালিয়ে যায়।’

চুপ অবনী। তুতুলের মাথায় বিলি কাটতে কাটতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হঠাৎ একটা কিছু মনে হতেই বলে, ‘হাঁরে তুতুল—’

তুতুল ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু অবনীর চোখে আর ঘুম আসে না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে চোখ পড়ল দেওয়ালে। বীণার এনলার্জ করা ফটোটার ওপর একটা শুকনো মালা ঝুলছে ছবিটাতে। হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে বীণা। উঠে বসল অবনী। অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকার পর অস্ফুটে একটা কথাই বার হয়ে এল তার মুখ দিয়ে— ‘তুমি হাসছ! ভাবতে পারো আমাকে কী বিপদে ফেলেছ? তুমি কী কিছুই পারো না! যাতে আমি একটু স্বস্তিতে থাকতে পারি?’

এ কথাটা শেষ হওয়া মাত্র এক বলক এলোমেলো হাওয়া জানলা দিয়ে এসে আছড়ে পড়ল ঘরের ভেতর। তার পরেই সেই গন্ধ। সেই জেসমিন হেয়ার অয়েলের সুবাস। বিস্ময়ে অবনীর দেহ-মন যেন অবশ হয়ে এল। পরদিন মাকে সব কথা খুলে বলল অবনী।

‘দেখো, এসব কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কি জানি কেন, আমার মনে হয় তুতুলের মায়ের ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। আমার ধারণা, মানুষ মারা যাওয়ার পর তার কোনো অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দেখছি উলটো। তুমি সেদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি তাকে দেখতে পাই কিনা? বলেছিলাম না, কিন্তু আজ বলছি, ওই গন্ধের ব্যাপারটা আমি টের পেয়েছি। ওই তেলটা বীণা ব্যবহার করত। জেসমিন হেয়ার অয়েল।’

শুনে গম্ভীর হলেন অবনীর মা। বললেন, ‘কি জানি, কাজকর্ম তো ভালোভাবেই করেছি। তবু কেন যে এমন হচ্ছে, কিছু মাথায় ঢোকে না।’

‘তার উদ্দেশ্যটাই বা কী? বার বার এভাবে তুতুলকে দেখা দেওয়া বা ডাকা— আমার মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। আর সে ছেলেও বেরিয়ে পড়ছে বাড়ি থেকে।’

মাথা নাড়লেন অবনীর মা, ‘না, আমিও এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। তবে—’

অবনীর মা হঠাৎ থেমে গেলেন। অবনী তাঁর দিকে তাকাতে বললেন, ‘তবে ছেলে-মেয়ের ওপর মায়ের একটা টান থাকে। হয়তো ছেলেটার টানেই বার বার ছুটে আসে দেখতে!’

‘তাও কি সম্ভব?’

‘জানি না। কিন্তু একটা জিনিস ভেবে দেখ, মা মারা গেলে, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা কত অসুখ-বিসুখে ভোগে। মায়ের কথা ভেবে ভেবে

হেদিয়ে পড়ে। সেদিক থেকে আমাদের ছেলে কিন্তু ভালোই আছে।’

‘হঁ। এক পালাই পালাই ভাব ছাড়া, ও কিন্তু আমাদের অন্য কোনো অসুবিধেয় ফেলেনি।’

এর পর আর কথা হয়নি। অফিস বেরোতে হবে। উঠে পড়ে অবনী।

গতানুগতিকভাবে কটা দিন পার হয়ে গেল। এমন কিছুই ঘটেনি যা নিয়ে উৎকণ্ঠা বা ভাবনা হতে পারে। অবনী ও অবনীর মা অনেকটা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

কিন্তু একদিন, তখন বেলা বারোটা-সাড়ে বারোটা হবে, হঠাৎ বেয়ারা এসে বলল, ‘অবনীবাবু, আপনার ফোন।’

বুকটা ধড়াস করে উঠল অবনী। তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভারটা কানে তুলতেই, পেল বংশীর গলা, ‘কে বলছেন? অবনী ঘোষকে একবার দিন না।’

‘হ্যাঁ, আমি অবনী বলছি।’

‘এই আমি বংশী বলছি। শেওড়াফুলি থেকে। তুই এখনি বাড়ি চলে আয়। না না, বিপদ তেমন কিছু হয়নি। সামলে গেছে। কিন্তু মাসিমা, হ্যাঁ, তোর মা খুব ভেঙে পড়েছেন। তোর এখনি বাড়ি আসা দরকার।’

‘হলোটা কী?’

‘ফোনে অত কথা বলা যায় না। তুই চলে আয়, আমি দোকানে তোর জন্যে অপেক্ষা করছি।’

এমন কি হল যার জন্যে অফিসে ফোন? উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠল অবনী। ছুটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু পথ তো কম নয়। যাই হোক, এক সময় গিয়ে পৌঁছোল শেওড়াফুলি। স্টেশন থেকে বেরোতেই দেখল, বংশী।

‘তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি।’

‘বুঝতে পারছি। তা কী ব্যাপার?’ কৌতূহল আর উদ্বেগ অবনীর গলায়।

‘না, তেমন কিছু নয়। তবে হলে আর রক্ষে ছিল না। তোর বউয়ের যে দশা ঘটেছে, প্রায় তেমনি ব্যাপার। দোতলার যে জায়গাটায় সেই অঘটনটা ঘটেছিল, ঠিক সেই জায়গাটায় গিয়েই, ছেলেটা পড়ো পড়ো হয়েছিল দোতলার বারান্দা থেকে।’

‘ব-বলিস কী রে!’ চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল অবনী, ‘তারপর?’

‘অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। বলেছি তো, অবস্থাটা সামলে গেছে এবারের মতো। বারান্দাটার ওই ভাঙা জায়গাটা আজ পর্যন্ত সারাসনি। বাচ্চা ছেলে নিয়ে ঘর। কখনো অমন করে রাখে?’

মনে মনে ক্রটি মেনে নেয় অবনী। পথ চলতে চলতে বংশী বলে,
অরাজকতা একক্লমিভ

‘বেলা এগারোটা নাগাদ রান্নাবান্না সেরে তোর মা তুতুলকে বলেন চান করে আসতে। কিন্তু সে ছেলে বলে, মা চান করাবে। ঠাকুমার কাছে সে চান করবে না। একেবারে জিদ ধরে বসে। তখন তিনি জোর করে জামা-প্যান্ট ছাড়িয়ে, তেল মাখিয়ে কলঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলে কিছুতেই যাবে না। তিড়িং-বিড়িং লাফায় আর ঠাকুমা জোর করে টেনে নিয়ে যান। বারান্দার ওই ভাঙা জায়গাটার পাশ দিয়ে যাবার সময়, তুতুল ঠাকুমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাবে কোথায়? সামনেই তো সেই রেলিং-ভাঙা জায়গাটা। টাল সামলাতে না পেরে সেখানেই গিয়ে পড়ল মুখ খুবড়ে। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটা বারান্দার বাইরে। মাথাটা নীচের দিকে। তোর মা খুব জোরে একটা পা চেপে ধরেছিলেন দু-হাত দিয়ে। শুরু করে দেন পরিত্রাহি চিৎকার। বাঁচাও, বাঁচাও!

‘আওয়াজ শুনে নীচের ঘরের মেয়ে-বউরা বেরিয়ে পড়ে। দেখে ওই অবস্থা। তারা সঙ্গে সঙ্গে দুদাড়িয়ে উঠে আসে ওপরে। চেপ্-পে ধরে তুতুলের পা দুটো। তারপর আস্তে আস্তে টেনে তোলে বারান্দার ওপর! ওঃ, কী বিপত্তি হত বলতো, যদি না তোলা যেত ছেলেটাকে?’

ঘটনার বিবরণ শুনে পা যেন আর চলতে চায় না। অনেক পরে কোনোরকমে জিগ্যেস করে, ‘এখন কী অবস্থা?’

‘এখন আর কি, সবই ঠিক আছে। কিন্তু তোর মা খুব মুষড়ে পড়েছেন। খাওয়াদাওয়া করেননি। মুখ গুঁজে শুয়ে আছেন বিছানাতে। ছেলেটাকে অবশ্য খাইয়ে দিয়েছে নীচের ঘরের বউরা। তিনি শুধু একটা কথাই জিগ্যেস করেছেন সবার কাছে, ছেলেটা অমন অদ্ভুত বায়না ধরল কেন? মায়ের কাছে চান করব। মা-যে অনেকদিন নেই— সেটা তো সে জানেই। তা এ কথার কি উত্তর দেবে লোকে?’

অবনীরও সেই একই জিজ্ঞাসা। হঠাৎ এমন বায়নায় পেয়ে বসল কেন তুতুলকে? তবে কি বীণা আবার দেখা দিয়েছিল তাকে? এ কথা বলা যায় না বংশীর কাছে। চুপ করে চলতে লাগল সে বংশীর পাশে পাশে।

বাড়ি পৌঁছোতে অনেকেই এগিয়ে এল। যে যেমনভাবে পারল, ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেল। বলতে গেলে সে এক কলরব। বিশেষ করে তারা, যারা উদ্ধারের কাজে এগিয়ে এসেছিল। অবনী চুপ করে সব শুনল। সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উঠে গেল দোতলায়। বসল গিয়ে নিজের ঘরে।

তুতুল ঘুরঘুর করছিল ঘরের ভেতরেই। এক সময় ডেকে জিগ্যেস করল, ‘হ্যাঁরে, কি ব্যাপার বল তো? তোর মা কি আজ এসেছিল? দেখেছিস তাকে?’

বেচারি এমনিতেই খুব মুষড়ে পড়েছিল। বাবাকে সামনে পেয়েও তাই চুপ করে ছিল। এখন চোখ তুলে তাকাল অবনীর দিকে। বলল, ‘এসেছিল তো। বলল, ঠাকুমা ডাকছে, যাচ্ছিস না কেন চান করতে? চল, আমি তোকে চান করিয়ে আনি।’

কথা শেষ হওয়ার পরে পরেই অবনীর মা ঘরে ঢুকলেন। হাতে চায়ের কাপ। বললেন, ‘তোকে একটা কথা না বললেই নয়। নীচের বউমারা যে যাই বলুক, তুতুলকে অমন বিপদের হাত থেকে আজ বাঁচিয়ে দিল বউমা।’

চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল অবনীর, ‘বউমা!’

‘হ্যাঁ। হাজার হলেও ছেলের মা তো? নিয়তির টানে ফেলে চলে যেতে হয়েছে অসময়ে। কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারছি, সে যায়নি কোথাও। এখানেই, এই বাড়িতেই সে আছে।’

অবনীর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। বললে, ‘বুঝলে কী করে?’

‘বুঝতে আমি পেরেছি। দেখ, ওই ছেলে যখন পড়ে গেল, আমি কি পারি তাকে টেনে রাখতে? আমি স্পষ্ট দেখলাম, একটা হাত, আমার হাতের পাশ দিয়ে তুতুলকে টেনে রেখেছে। নীচের বউমাদের ওপরে উঠে আসতে যে সময়টা লেগেছে, সে সময়টা বউমাই তাকে রক্ষা করেছে।’

অবনী বোকার মতো তাকিয়ে রইল তার মায়ের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে কোনো জবাব বার হল না।

[শুকতারা, আষাঢ় ১৪১০ (জুন ২০০৩)]

কী দেখলাম...

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

যাব না যাব না করেও শেষপর্যন্ত বেরিয়ে পড়লাম আমরা দু-জন— সনৎ আর আমি। হাওড়া থেকে বর্ধমান কড লাইনের লোকাল ট্রেনে চেপে সোজা শিবাচল্টী স্টেশন। সেখান থেকে রিকশায় ধনেখালি ডাকবাংলো। রিকশাওয়ালা গেটের সামনে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। গেট বন্ধ।

বেলা তখন একটা। ভর দুপুর। ভাদ্র মাসের কড়া রোদুর পিঠে চড়চড় করে ফুটছে আলপিনের মতোন। এই ভর দুপুরে সূর্যের গনগনে আঁচের মধ্যে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়! তাই আমরা দুজনেই গেটটা খুলে দেবার জন্যে একসঙ্গে হাঁক পাড়লাম। মিনিট তিনেকের মধ্যে দারোয়ান এসে আমাদের নাম জিজ্ঞেস করে খুলে দিল গেটটা। দারোয়ানের কথা মতোন তার পিছু পিছু গেলাম কেয়ার-টেকারের কাছে বুকিং স্লিপটা দেখাতে। স্লিপটা দেখে ঘর খুলে দেবার নির্দেশ দিলেন তিনি। দারোয়ান ঘর খুলল।

ঘরটা দেখে আমাদের খুব ভালো লাগল। প্রকাণ্ড ঘর। সাজানো গোছানো। আসবাবপত্রও বেশ ভালো। নতুন দু-খানা বড়ো খাট। ঘরের এক কোণে খাবার টেবিল-চেয়ার। আর একদিকে সুন্দর একটা ওয়্যারড্রোব। বাথরুমও বেশ ভালো। তা ছাড়া পূবে আর দক্ষিণে বারান্দা। বারান্দা দুটিও প্রশস্ত।

এই বিল্ডিং থেকে অফিসের দূরত্ব বেশ খানিকটা। তবে অফিসেও বেশি লোকজন আছে বলে মনে হয় না। দারোয়ান আর ‘কেয়ারটেকার’ ছাড়া আর কাউকে তো চোখে পড়ল না এখনও। এইরকম একটা নির্জন জায়গাই আমরা চাইছিলাম।

তা ছাড়া বাংলোটাও বেশ সুন্দর। সামনে সাজানো ফুলের বাগানে ফুটে আছে নানা রঙের ফুল। চারদিকে পাতাবাহার গাছের সে কী বাহার! গেট

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

থেকে বিন্দিং পর্যন্ত সুরকির পথ। পেছন দিকে গাছ-গাছালি আর একটা প্রকাণ্ড পুকুর। বাংলোটা আমাদের মনের মতোনই পেয়েছি। যে জন্যে এসেছি তার উপযুক্ত পরিবেশ।

সবই ঠিক আছে। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিছু জানা হয়নি। তাই জিজ্ঞেস করতে দারোয়ান বলল— সামনেই সুপার মার্কেট। ওখানে দু-তিনটে হোটেল আছে। ভাত-রুটি, ডাল-তরকারি, মাছ-মাংস সবই পাবেন আর সামনে ওই যে রাস্তার ওপারে চায়ের দোকান দেখছেন, ডাকলেই লোক চলে আসবে। ডিম, কেক, বিস্কুট, টোস্ট, চা— সব কিছু পেয়ে যাবেন।

জোর খিদে পেয়েছিল। তাই আর দেরি না করে সুপার মার্কেটে চলে এলাম।

হোটেল খেতে খেতে আমরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিলাম। মনে হয় হোটেল-মালিক কিছু কিছু শুনতে পেয়েছেন। তাই ক্যাশ-কাউন্টারে পেমেন্ট করার সময় জিজ্ঞেস করলেন— আপনারা কোথায় উঠেছেন?

—ডাকবাংলোয়। সনৎ বলল।

—ওঃ! বলে কেমন যেন চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। বাংলোয় ফিরে এলাম আমরা। সেই একই নির্জনতা। অফিসেও ওই দু-জন ছাড়া আর কোনো নতুন মুখ দেখা গেল না। বেশ ভালোই হল। এরকম পরিবেশ না হলে কি কাজে মন বসে।

তাহলে এবার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা খুলেই বলি। আসলে আমরা দুজনেই লেখক। সামনে পুজো। পুজো সংখ্যার লেখা তো আছেই। তা ছাড়াও আছে কয়েকটি কিশোর সংকলনে লেখার চাপ। এরকম কিশোর সংকলন ইদানীং পুজোর আগে অনেকগুলো প্রকাশিত হয় কলেজস্ট্রিট পাড়া থেকে। কলকাতায় হাজার বামেলায় লেখালেখি ঠিকমতন হচ্ছে না দেখে এখানে চলে আসা। কিন্তু শেষপর্যন্ত লেখা শিকেয় উঠল। পাঁচ দিন থাকা তো দূরের কথা, দু’দিনেই আমরা একেবারে ঠান্ডা। য পলায়তি স জীবতির মতন অবস্থা তখন আমাদের। দু’দিন পরেই বাংলো ছাড়তে বাধ্য হলাম। সেই কথাই বলব এখন।

খেয়ে-দেয়ে বাংলোয় ফিরে লেখার তোড়জোড় শুরু করতেই সনৎ জিজ্ঞেস করলো— আপনি কি এখন লিখতে বসবেন, অলোকদা?

—হ্যাঁ। তুমি বসবে না?

—একটু বিশ্রাম নিয়ে বসব ভাবছি।

—এখন আবার বিশ্রাম কী? এসেছি তো মাত্র পাঁচ দিনের জন্যে। এর মধ্যে অনেক লিখতে হবে। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কী?

—গুরুর আদেশ শিরোধার্য।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

সনৎ আমাকে কখনো গুরু, কখনো অলোকদা বলে ডাকে।
লিখতে বসে আমি হঠাৎ সনৎকে জিজ্ঞেস করলাম— এখন কী লিখবে
ঠিক করেছ?

—ভূতের গল্প।

—ভূতের গল্প! বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

—হ্যাঁ। তা ছাড়া উপায় কী?

—কেন?

—আপনি তো জানেন কতদিন আগে থেকে প্রকাশিত কিশোর সংকলনের
জন্যে লেখা চাইছে। আপনাকেও তো খুব তাগাদা দিচ্ছে।

—তো কিশোর-সংকলনে ভূতের গল্প কেন লিখবে। আরও তো অনেক
বিষয় আছে।

—তা আছে। তবে এখন ভূতের গল্পের বাজার ভালো। তা ছাড়া এটাও
তো একটা বিষয়।

—বিষয় না ছাই। ভূত আছে বলে তুমি বিশ্বাস করো?

—কেন, আপনি করেন না?

—না।

—কিন্তু একটা কিছু আছে বলে মনে হয়।

—কী আছে?

—আপনি তো জানেন আত্মা অমর। এ কথা আমাদের বেদ-উপনিষদ-
পুরাণে আছে। ভারতীয় ধর্ম সাধনায় হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে
এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও অনেক আছে। সুতরাং, আত্মার পুনর্জন্ম যেমন
হয় তেমনি অতৃপ্ত আত্মাও ভূত-প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

—বোগাস। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাব কী
করে? তোমার মাথায় এই সব উদ্ভট চিন্তাভাবনা ঢুকল কী করে?

—তা হলে যা শোনা যায়, সব মিথ্যে?

—সব শোনা কথা সত্যি হয় নাকি?

—তবুও ‘যত রটে কিছু বটে’ বলে তো একটা কথা আছে।

—ও সব কথা আজকালকার দিনে অচল।

—তবে কি ভূত-টুত বলে কিছু নেই?

—নো। ভূত-টুত সব কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

—আমারও অনেক সময় তাই মনে হয়।

—তবুও ভূত নিয়ে লেখা চাই?

—প্রকাশকের দাবি। কথাও দিয়েছি। এবারই শেষ। এরপর আর লিখছি না।

অরাজকতা এককুসিদ্ধ

—যাক, অনেক কথা হয়েছে। আর কথা নয়। এবার কাজে মন দাও।
টানা তিনঘণ্টা লেখার পর আমরা চায়ের অর্ডার দিলাম। চা খেতে
খেতে সনৎকে জিজ্ঞেস করলাম— ভূতের গল্প কদর এগোলো? ভূত কি
এসে গেছে, না আসি-আসি করছে।

—আসি-আসি করছে।

—চালিয়ে যাও।

—গুরু, আপনি কী লিখছেন?

—বধূহত্যা নিয়ে গল্প। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে
বাধ্য হল বউটি।

—বাঃ, সাথে কী আর গুরু বলি! গুরু-শিষ্যের কি অদ্ভুত মিল দেখুন
তো। আমার ভূতের গল্পেও বউটা গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাবে। তারপর...

—ভয় দেখাবে। সনতের কথা শেষ হবার আগেই বললাম আমি।

—ঠিক তাই।

ব্যস, এবার লেখা শুরু করল।

আবার লেখায় মন দিলাম আমরা। রাত ন-টা পর্যন্ত লিখে হোটেলে
খেতে গেলাম।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে সনৎ বলে— মাথাটা ধরেছে। আজ
আর লিখব না। সকাল-সকাল শুয়ে পড়ব।

আমারও তাই হচ্ছে। একে প্রথম দিন, তারপর নতুন জায়গা। তা
ছাড়া শরীরটাও বেশ ক্লান্ত।

বাংলোয় ফিরে শুতে যাবার সময় হাসতে হাসতে বললাম— সনৎ,
তোমার ভূত কি এসে গেছে?

—ভূত না, পেতনি।

—একই কথা। তো পেতনি কি ফিল্ডে নেমেছে?

—প্রায়।

—শোনাও তাহলে।

শুরু করল সনৎ—

বউটার চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামী প্রায়ই
মারধোর করে। প্রতিদিনই মদ খেয়ে আজীবনে জায়গায় যায়। কোনোদিন
মাঝরাতে বাড়ি ফেরে, কোনোদিন ফেরে না। আজ বাড়ি থেকে বেরুবার
সময় বউটা বাধা দিয়েছিল। কিন্তু কে কার কথা শোনে! উলটে বউটাকে
বেধড়ক ঠেঙিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে লম্পট স্বামীটা। বউটার হাতে
মোটা শক্ত দড়ি। উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে পায়চারি করছে। ওপর দিকে

তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে। বারান্দা থেকে খুব উঁচু একটা টুল আনল ঘরে। তারপর গলায় দড়ি দিল। ঘরের কড়িতে দেহটা ঝুলছে। মাথাটা একদিকে একটু কাতও হয়ে পড়েছে। জিভটা বেরিয়ে আছে। জিভ কেটে টপ টপ করে তাজা রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। আর লাল চোখ দুটো ঠেলে বাইরে এসেছে, ঝুলে পড়েছে। দেখলে মনে হয় ডাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে আছে।’

সনৎ থামতেই আমি বলে উঠলাম— দারুণ বর্ণনা! একেবারে মাতিয়ে দিয়েছ।

—এরপর প্রেতাঙ্গা আসবে। সনৎ বলল।

—প্রেতাঙ্গা আসার আগেই যে ভয়ের বর্ণনা দিয়েছ তাতে আমারই বেশ ভয়-ভয় করছে।

—তা হলে ঠিক আছে, গুরু?

—বিলকুল ঠিক। আজ আর রাত করা ঠিক হবে না। শুয়ে পড়া যাক।

দু-খানা খাটে দুজনে আলাদা শুলাম। বাথরুমের দরজাটা খুলে রাখা হল। নাইট বাল্ব জ্বালিয়ে টিউবটা নিভিয়ে দিলাম। মিনিট দশেক যেতে না যেতেই সনতের নাসিকা গর্জন কানে এল। আমার কিন্তু ঘুম আসছে না। চুপচাপ চিত হয়ে পড়ে আছি। হঠাৎ বাথরুমে কীসের যেন একটা শব্দ হল। ভাবলাম, ছুঁচো বা ইঁদুর-টিদুর কিছু হবে। পাশ ফিরে শুলাম। একটু পরে আবার বাথরুমের দরজার কাছ থেকে শব্দটা এল। এবার দরজার দিকে তাকাতেই মনে হল কে যেন বাথরুমে ঢুকে পড়ল। চোর-টোর নয় তো? নতুন জায়গা। হতেও পারে। তাই বিছানা থেকে সোজা উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকতেই আমার চোখে-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস। শরীরটা যেন শিরশির করে উঠল। বাথরুমের আলো জ্বাললাম। না, কেউ নেই। তা হলে আমারই ভুল।

ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। সনতের নাক ডাকা একইভাবে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটু তন্দ্রার মতন এসেছে, এমন সময় দেখি জানালার পর্দা উথাল-পাথাল করছে। আশ্চর্য, বাইরে তেমন হাওয়া নেই, অথচ দূরন্ত বেগে পর্দা উড়ছে। চোখ রগড়ে ভালো করে দেখি যেমন পর্দা তেমন আছে। বিন্দুমাত্র নড়ছে না। ঘুমের বারোটা বেজে গেল। হল কী আজ! এত ভুলভাল দেখছি কেন? মনে মনে ভাবলাম নিশ্চয়ই ভূতের গল্প শোনার জন্য এরকম হচ্ছে।

এবার আর কোনোদিকে দ্রক্ষেপ না করে চোখ বুজলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল, রাত তখন অনেক। সুনৎ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই

অরাজকতা এককুসিভ

ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। আমার ঘুম ভেঙেছিল শব্দ শুনে। এখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি বাথরুমে জোরে জল পড়ার শব্দ। এ নির্ঘাত সনতের কাজ। কী জ্বালা রে বাবা! বাথরুমে গিয়ে কল খুলবে, বন্ধ করবে না। আর ঘুমোতেও পারে বটে।

হঠাৎ জল পড়ার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। এবার ঘরের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করে পায়চারি করার শব্দ শোনা গেল।

এই প্রথম আমি ভয় পেলাম। অদ্ভুত ব্যাপার। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কতরকম আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। একবার একটা ছায়ামূর্তিকে বাথরুমে ঢুকতেও দেখেছি। সবই চক্ষু-কর্ণের ভুল মনে করেছি। কিন্তু এবার তো বেশ কয়েক মিনিট ধরে স্পষ্ট বাথরুমে জল পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি। জল পড়া আবার আপনা-আপনি বন্ধও হয়ে গেল। এখন ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ। কী ব্যাপার! রহস্যটা কী?

তাই যেদিক থেকে শব্দ ভেসে আসছিল সেদিকে তাকাতেই আমার সারা দেহের রক্ত হিম হয়ে গেল।

একটা বউ হাতে দড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল!

কোনোক্রমে বিকৃত কণ্ঠে বললাম— কে, কে ওখানে?

বউটা আমার দিকে তাকাল। সেকী পলকহীন জ্বলন্ত দৃষ্টি! যেন চোখ দিয়ে আমায় গিলে ফেলে আর কী! সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল। হার্টফেল করার মতন অবস্থা আমার। ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে গিয়ে আমার গলার স্বর ফুটল না। সনৎকে জানাব, তাও পারছি না। মনে হল দেহটা ভারী হয়ে গেছে, নড়তে পারছি না। বউটা একইভাবে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হাতে তার শক্ত দড়ি। আঁ-আঁ করতে করতে হঠাৎ আমার গলা দিয়ে খুব জোরে অস্বাভাবিক আওয়াজ বেরিয়ে পড়ল।

—কী হল, কী হল বলে ধড়মড় করে জেগে উঠল সনৎ।

প্রচণ্ড কাঁপা গলায় ওই যে— ওই যে ছাড়া আর কোনো শব্দই বেরুল না আমার মুখ থেকে।

—ওই যে কী? বলে সনৎ আমার কাছে এল।

সনৎকে হাত দিয়ে দেখাতে গেলাম। না, কেউ নেই। আমি অবাক। বাথরুমে আর ঘরে কি আপনা-আপনি ম্যাজিক হচ্ছিল?

সব কথা খুলে বললাম সনৎকে। এ-ও বললাম তোমার বর্ণনার সঙ্গে ছবছ মিল বউটার। বাকি রাতটুকু আমরা একই খাটে জেগে কাটালাম।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

আশ্চর্য, তারপর আর কোনো শব্দ হয়নি বা কোনো কিছু দেখাও যায়নি।

পরের দিন। সকালে চা খেতে খেতে সনৎ বলল— গুরু, কাল তো প্রায় সারারাত আপনার ঘুম হয়নি। আপনি আবার দিনেও ঘুমোন না। আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়বেন। তা ছাড়া কাল রাতে যা ধকল গেছে আপনার।

—সত্যি ধকল গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী, বলো তো শিষ্য?

—আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—কী দেখলাম?

—সত্যিই তো এটা ভাবার বিষয়, কী দেখলেন?

—শুনেছি প্রেতাত্মা নাকি ঘুরে ফিরে দেখা দেয়?

—আমিও তো তাই জানি।

—তাহলে আজই তো ওদের আনাগোনার বিশেষ দিন। আজ একে শনিবার, তার ওপর ভরা অমাবস্যা।

—ঠিকই বলেছেন। দেখাই যাক না আজ কী হয়।

সত্যি রাত্রে যা ঘটল তা শুনলে অতি বড়ো সাহসীরাও বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে।

ন-টার মধ্যেই আমি শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতেও বড়ো একটা দেরি হল না। মাঝরাতে অবশ্য ঘুম ভেঙে গেল সনতের গোঙানির শব্দে। সেকী অদ্ভুত আওয়াজ!

সনৎ প্রায় অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গোঙাচ্ছে। কোনোক্রমে তুলে খাটের ওপর বসালাম ওকে। স্বাভাবিক হতে ওর সময় লেগেছিল প্রায় আধঘণ্টা। ভয়ে চোখ-মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। বললাম— চলো, বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে আগে জল দাও। তারপর সব শোনা যাবে।

—আবার বাথরুম! আঁৎকে উঠল সনৎ।

—কেন, বাথরুমে কী হল?

—তবে শুনুন, সেই কথাই বলছি। রাত বারোটা পর্যন্ত আমি জেগেই ছিলাম। তার মধ্যে কিছু দেখিনি, শুনিনিও কোনোরকম শব্দ। তাই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম আপনার কথা। এরকম ভুল তো আপনার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হল কী করে। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙল বাথরুমে যাবার প্রয়োজনে। খাট থেকে নেমে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাথরুমে যাবার জন্যে দু-চার পা এগিয়েছি, হঠাৎ মাথায় ঠক করে কী একটা লাগল। কিন্তু মাথায় লাগার মতোন কোনো জিনিস তো ঘরে নেই। তা হলে কী এটা! উপরের দিকে তাকালাম। নাইট বাল্বের আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

সনৎ থামল।
অরাজকতা এককুসিদ্ধ

লক্ষ করলাম সনতের মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ঠক ঠক করে কাঁপছে।

—কী দেখলে, কী দেখলে? বলে আমি ওকে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিলাম। ঝাঁকুনি খেয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হল সনৎ। তারপর চোখ দুটো বড়ো করে আন্তে আন্তে বলল— কড়িতে সেই বউটার দেহ ঝুলছে।

—কোন বউটা? আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম।

—কাল রাতে আপনি যে বউটাকে দেখেছিলেন, সেই। গলায় দড়ির ফাঁস। জিভটা বেরিয়ে আছে। জিভ কেটে টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। আর ওই রক্তবর্ণ চোখে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হল, আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে। আমি চেষ্টা করে উঠলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। সেই অবস্থায় হঠাৎ দেখি বউটার হাতের মতোন দু-খানা হাত বাথরুমের দিক থেকে আমার কাছে এগিয়ে আসছে। হাতে সেই দড়ি। তখনি একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটায় মেঝেতে পড়ে গেলাম।

অদ্ভুত ব্যাপার তো! কাল আমি দেখলাম, আজ সনৎ। না, এখানে থাকাটা আর ঠিক নয়। ঠিক করলাম, কাল সকালেই কলকাতা ফিরে আসব। বাকি রাতটা বিছানায় বসে গল্প করে কাটলাম।

সকালে ‘কেয়ার টেকার’ আর দারোয়ানকে সব ঘটনা খুলে বললাম। ওদের মুখ গম্ভীর হল। কোনো কথা বলল না। আমরা কলকাতা ফিরে এলাম।

আজকালকার দিনে ভূত আছে বললে লোকে হাসবে। আমিও ভূতের অস্তিত্ব মানি না। তবে সেদিন আমরা দুজনে কী দেখলাম?

[ছুটির দুপুর (নির্মল বুক এজেন্সী), ২০০৪ (প্রথম প্রকাশকাল অজ্ঞাত)]

বন্ধ দরজা

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

সর্বাণী আর মৃন্ময়ী দুই জা। সর্বাণীর ছেলে অপূর্ব। মৃন্ময়ীর ছেলে সৌরভ। পড়াশুনায় অপূর্ব খুবই ভালো। কোনোবার পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেনি। এ ব্যাপারে অপূর্বর মা সর্বাণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পড়ার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। একটু এদিক-ওদিক হলেই ছুটে আসে সর্বাণী, অপু, অপু ছ-টা বাজতে চলল, এখনও উঠিসনি। ওঠ, ওঠ। কত বেলা হয়ে গেছে বল তো?

শুধু পড়ার ব্যাপারেই নয়, অপূর্বর স্বাস্থ্য, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, বিশ্রাম সবদিকে সর্বাণীর সজাগ দৃষ্টি।

সৌরভ লেখাপড়ায় তত ভালো নয়। পরীক্ষায় পাস করে ঠিকই কিন্তু গর্ব করার মতো নয়।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করা যায় ছেলেদের প্রতি দুই মা-এর আচরণের মধ্যে। সর্বাণী পড়াশুনার ব্যাপারে সৌরভকেও ছেড়ে কথা বলত না। পড়াশুনার ব্যাপারে সে খুবই স্ট্রিক্ট। মৃন্ময়ী কিন্তু ঠিক উলটো। সর্বাণী অপূর্বকে কড়া কথা বললেই মৃন্ময়ী আশ্বাস দেয়। আহা, একটু ঘুমোবে না। বাচ্চা ছেলে। খেলে আসতে দেরি হলে বলত, তা একটু খেলবে বই কী! দিনরাতই তো পড়ছে। টিভি-র কাছে গেলেই সর্বাণী বকাবকি শুরু করে। আর মৃন্ময়ী? ছুটে এসে বলে, দেখুক না টিভি। ছেলেটার তো একটু বিশ্রামের দরকার। ওরও তো একটু আনন্দ করতে ইচ্ছে করে।

দেখে সর্বাণী ছাড়া সবাই ভাববে অপূর্বর প্রতি মৃন্ময়ীর ভালোবাসা নিজের ছেলে সৌরভের চেয়ে কম নয়। সবাই বলাবলি করে, কাকিমা নয় যেন নিজের মা। অপূর্বর বাবা নিরঞ্জনও মৃন্ময়ীকে একটুও সন্দেহ করত না। বরং সর্বাণীর কড়াকড়ির জন্যে মনে মনে রাগ হত। বকাঝকা করলে নিরঞ্জন সামনে থাকত না। সেখান থেকে সরে পড়ত।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

সর্বাণী কিন্তু বুঝতে পেরেছিল অপূর্বর প্রতি মৃন্ময়ীর বাড়াবাড়ি রকমের ভালোবাসার পিছনে আছে ঈর্ষা। ওর আস্কারা অপূর্বর পা পিছলে যাবার পথ। অথচ কেউ বুঝতে পারবে না মৃন্ময়ীর মনের কথা, এমনকী অপূর্বও নয়। মৃন্ময়ী চায় অপূর্বর ভবিষ্যৎকে রক্ত-মাংসসমেত চিবিয়ে খাওয়া। সর্বাণীর মুশকিল হল কী, ও কাউকে এমনকী অপূর্বর বাবা নিরঞ্জনকেও বোঝাতে পারত না যে মৃন্ময়ী অপূর্বর ক্ষতিই চায়, ভালো চায় না মোটেই। সর্বাণী যখন নিরঞ্জনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলে মৃন্ময়ী আড়াল থেকে সব শোনে আর সাফল্যের আনন্দে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

সেদিন অপূর্ব স্কুল থেকে ফিরে খেলতে গিয়েছিল। ফিরতে মিনিট কুড়ি দেরি হয়েছে। ছুটে যায় সর্বাণী, অপু, কত দেরি করে ফিরলি বল তো! ছ'টা থেকে পড়তে বসার কথা।

ছুটে আসে মৃন্ময়ী, তা বলে একটু খেলবে না? তুমি অযথা ওকে বকাবকি করো। আমি সৌরভকে বলেছি। নিশ্চয়ই খেলবি। একটু-আধটু খেললে কী ক্ষতিটা হবে শুনি?

একটু-আধটু নয়, কুড়ি মিনিট। আরাম, আলস্যকে প্রশ্রয় দিলে ওরা ঘাড়ে চেপে বসবে।

নিরঞ্জনও বাদানুবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, না, না, সর্বাণী। ওটা ঠিক নয়। বউমা তো ঠিক কথাই বলেছে।

সর্বাণী গম্ভীর হয়ে যায়, ঠিক নয়। একটা রুটিন অনুযায়ী না চললে ক্ষতিই হবে।

মৃন্ময়ী হারবে না, একটু-আধটু এদিক-ওদিক হলে কিছু হবে না। রাগ করো না দিদি, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

—আমারও ওই একই কথা। অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। বলে নিরঞ্জন। সামান্য ব্যাপারটা ক্রমশ আরও খারাপের দিকে যখন এগোতে লাগল তখন নিরঞ্জন ক্লাবে চলে গেল। অপূর্ব ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়তে বসল। সৌরভ ওর বাবার সঙ্গে টিভি দেখতে লাগল।

সর্বাণী যখন নিরঞ্জনকে আসল ব্যাপারটা বোঝাতে ব্যর্থ হল তখন একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে লাগল। মৃন্ময়ী এটা লক্ষ করল তারপর সর্বাণীর সামনে জয়ের গর্বে এমন হাসতে শুরু করল যে সর্বাণীর সারা গা-টা চিড়বিড় করতে লাগল। মৃন্ময়ীকে দেখে ওর মনে হল ও একটা রাক্ষসী। ও মায়াবিনী। স্নেহের ছদ্মবেশ ধরে অপূর্বর হাড়গুলোকে চিবোচ্ছে। মৃন্ময়ীর হাসিটা কী বিশী! কী ভীষণ সাংঘাতিক! দাঁতগুলো ভয়ংকর।

অরাজকতা এককুসিত

আর তার মাঝে মাঝে রক্ত লাল টুকটুকি। সর্বাণীর ভয় হয়। একটা দারুণ আতঙ্ক যেন ওকে গ্রাস করে।

মৃন্ময়ী হাসি থামায় তারপর ক্রুর দৃষ্টিতে সর্বাণীর দিকে চায়। চোখ দিয়ে ঝরছে আগুন, কী হল? জিততে পারলে না তো? তুমি কী ভেবেছ অপূর্বকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে? কারও সাধ্য নেই তোমার ছেলেকে রক্ষা করে।

শিউরে ওঠে সর্বাণী, কে তুই সর্বনাশী? কী চাস তুই?

—আমি চাই তোমার অপূর্বর জীবনটাকে কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে। হ্যাঁ, আমি তাই চাই। ও পথে পথে ভিক্ষে করবে আর তাই দেখে আমি দু-হাত তুলে নাচব। তারপর একদিন যখন বাড়িতে কেউ থাকবে না, ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে যাবে চারধার আমি চুপি চুপি ওর ঘরে ঢুকব তারপর—

চিৎকার করে ওঠে সর্বাণী, চুপ কর, চুপ কর শয়তানি! সত্যি বল কে তুই?

অপূর্ব পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, মা, তুমি চিৎকার করলে?

মৃন্ময়ী সর্বাণীকে কথা বলতে দেয় না, দেখ না বাবা, তোর মাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে পড়াশুনার সঙ্গে একটু-আধটু আনন্দও করতে হবে বই কী। তা ছাড়া যারা পড়াশুনা করে তারা খেলাধুলাও করে। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?

অপূর্ব বলল, মা, আমি পড়তে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়তে যা বাবা। বলছি সেই থেকে অত চিৎকার চেষ্টামেচি করো না, অপু পড়ছে, তা তোর মা কিছুতেই শুনবে না।

দিন দুই পরের কথা। রাত তখন সাড়ে দশটা। এক আকাশ মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে সন্ধে থেকে। একটা কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। যে-যার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। শুধু সর্বাণী খাওয়া-দাওয়ার পর রান্নাঘর পরিষ্কার করছে, আর অপূর্ব পড়ছে। এক সময় ওরও দু-চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। টেবিলের উপর মাথাটা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঠিক তারপরই মৃন্ময়ী ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চুপি চুপি ঢুকে পড়ল অপূর্বর পড়ার ঘরে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল অপূর্বর টেবিলের কাছে। এরপর মাথাটা ওর চোখের কাছে নিয়ে যায়। স্থির দৃষ্টিতে সর্বাণী রান্নাঘরের কাজ সেরে অপূর্বর পড়ার ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল মৃন্ময়ী অপূর্বর মাথার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওর দিকে চেয়ে আছে কটমট করে।

—মৃন্ময়ী!

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

তড়িৎ গতিতে মৃন্ময়ী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে সর্বাণীর চোখ দুটোর সামনে মুখটা নিয়ে যায়। কী ভয়ংকর চাহনি! চোখ দুটো যেন জ্বলছে! এরপর হাওয়ার বেগে ঢুকে পড়ে নিজের ঘরে। ঘরে খিল দেওয়ার শব্দ বাইরের বাতাসের গর্জনকেও ছাপিয়ে যায়। সর্বাণী নিরঞ্জনকে ঘটনাটা বলল। নিরঞ্জন হাসল, তোমার মৃন্ময়ীফোবিয়া হয়েছে। বউমা অপুকে সৌরভের চেয়ে কম ভালোবাসে না।

সর্বাণীর মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে যায়। কেউ ওর কথা বুঝতে চাইছে না।

সকালে জলখাবার দেওয়া হল। মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজা। অপূর্বর বাটিতে বেশ ক-টা চপ। অপূর্ব তেলেভাজা খুব ভালোবাসে।

মৃন্ময়ী বাটিটা সামনে রেখে অপূর্বর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, অপু, খেয়ে নে বাবা। তোর কাকা এনেছে। তুই ভালোবাসিস তো, তই তাড়াতাড়ি খা। এখনি—

মৃন্ময়ীর কথা শেষ হতে না হতেই সর্বাণী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে। হৌঁ মেরে বাটিটা কেড়ে নিয়ে বলে, এতগুলো। তোর শরীর খারাপ করবে। সামনেই পরীক্ষা।

মৃন্ময়ী সোহাগ দেখায়, খেলেই বা দিদি। একদিন দুটো চপ বেশি খেলেই কি শরীর খারাপ করবে? ছেলটাকে দুটো খেতেও দেবে না?

নিরঞ্জন হাসে, বউমা আমার সাক্ষাৎ অন্তর্পূর্ণ। অপুকে কারও চেয়ে কম ভালোবাসে না।

অপূর্ব গৌ ধরে। দাও, ওমা দাও না। আমি সবকটা খাব।

—অসুখ করবে, বাবা।

—তুমি কী আমাকে খেতেও দেবে না?

মৃন্ময়ী সর্বাণীর হাত থেকে বাটিটা কেড়ে নিয়ে অপূর্বকে দেয়, তুই খা বাবা। বেচারী চপ কত ভালোবাসে। আমি বলছি তুই খা। কিছু হবে না।

রান্নাঘরে এল সর্বাণী। একটু পরেই ঢুকল মৃন্ময়ী।

নিজের দাঁড়িয়ে থেকে অপুকে খাইয়ে এলাম। সবগুলো।

এরপর সর্বাণীর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে, কী হবে বুঝতে পারছ?

অপূর্বর শরীর খারাপ হল। সর্বাণীর যত্নে সেরে উঠল ঠিকই, তবে পড়াশুনার কিছুটা ক্ষতি হল।

দিন সাতেক পরের কথা। গণিতে অপূর্ব একটু পিছিয়ে পড়ছে। সর্বাণী নিরঞ্জনকে বলল, ওর একজন গণিতের মাস্টারমশাই চাই। তুমি একবার জনার্দনবাবুর কাছে যাও। সপ্তাহে একটা দিনও যদি অপুকে বাড়িতে এসে পড়ান তাহলে গণিতে ভালোই করবে।

অরাজকতা এককুসিভ

নিরঞ্জন জনার্দনবাবুকে ধরে সব বন্দোবস্ত করল। সামনের মাস থেকে পড়াতে আসবে। কথাটা চাপা থাকে না। মৃন্ময়ী সব শুনল। কিছুক্ষণ কী সব ভাবল। ঈর্ষায় মনটা জ্বলে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করতেই হবে, মনে মনে ভাবে মৃন্ময়ী।

নির্দিষ্ট দিন এল। নিশ্চিত্ত সর্বাণী। নিরঞ্জনও উদ্বেগমুক্ত। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও জনার্দনবাবুর দেখা নেই। সর্বাণী টেনশনে ঘরবার করে। নিরঞ্জন বলে, আসবে গো আসবে। উনি আমাকে কথা দিয়েছেন।

ঠিক এই সময় জনার্দনবাবু বাড়িতে ঢোকে। নিরঞ্জন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে, দেখলে তো। বললাম আসবে।

নিরঞ্জন আর সর্বাণী এগিয়ে যায়, আসুন মাস্টারমশাই আসুন।

চলুন। বৈঠকখানায় পড়বে তো?

সর্বাণী বলে, হ্যাঁ, বৈঠকখানায়।

—না, শোবার ঘরে।

মৃন্ময়ী বেরিয়ে এসে বলে।

সর্বাণী বলল, বৈঠকখানাতেই ভালো। নিরিবিলি হবে।

মৃন্ময়ী সর্বাণীর দিকে একবার তাক্সিল্যের ভঙ্গিতে চেয়ে বলে, না, না, শোবার ঘরে।

জনার্দনবাবু বলে, তাই হবে। শোবার ঘরেই পড়বে।

জনার্দনবাবু মৃন্ময়ীর ঘরের দিকে এগোতেই সর্বাণী বলে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন! অপু এ ঘরে আছে।

—অপুকে তো নয়। মৃন্ময়ীদেবী বললেন, অপু পড়বে না। সৌরভকে পড়াতে হবে। আচ্ছা নমস্কার। চলুন মৃন্ময়ীদেবী।

থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিরঞ্জন আর সর্বাণী।

সপ্তাহ দুয়েক কাটল না হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল সর্বাণী। সংসারটা যেন চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাবার উপক্রম হল।

সুবিধে হল মৃন্ময়ীর। নিরঞ্জন বাইরে যায় কাজে। রাহুর মতো সে ধীরে ধীরে অপূর্বকে গ্রাস করতে এল। লাটাইয়ের সুতোর মতো প্রশ্রয়ের মাত্রাটা বাড়তে লাগল। ফলে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে বসল অপূর্ব। বন্ধুবান্ধব জুটতে লাগল। টিভি খুলে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে বসে সন্কেবেলা। খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসতে দেরি হয়। মৃন্ময়ীর আঙ্কারায় জোঁকের মতো প্রলোভন ওর রক্ত চুষতে শুরু করল। ওর দুর্বলতা ক্যান্সারের মতো বেড়ে চলল। গণিতে ফেল করল অপূর্ব।

মাথায় হাত দিয়ে বসল নিরঞ্জন। সর্বাণীর অভাবটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে

পারল। সজল চোখে স্ত্রীর ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার অপূর্বকে আমি মানুষ করতে পারছি না সর্বানী। তুমি ওকে দেখ।

অ্যালার্ম ঘড়িটার মাথাটা টিপে টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল অপূর্ব। ঘুমটা আজকাল আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। ভোরবেলা আর ওঠাই হয় না।

ভোর পাঁচটা। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। বাইরে তখনও ফিকে অন্ধকার। ভেতরে রাত। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বেজে উঠল অ্যালার্ম। ধড়মড় করে উঠে পড়ে অপূর্ব। দু-হাতে চোখ রগড়ায়। ঘুম ভাঙানো ঘড়িটার দিকে চোখ যায়। ত্রস্তপায়ে এগিয়ে যায় ঘড়িটার দিকে। না, তো। মাথাটা রাতে যেমন টিপে বসিয়ে দিয়েছিল সেইরকমই আছে। অথচ ওর মনে হল অ্যালার্ম বাজছিল আর সেই শব্দেই ওর ঘুমটা ভেঙে গেছে। মায়ের ছবিটার দিকে তাকায় অপূর্ব। আজই ওর প্রথম মনে হচ্ছে মায়ের দু-চোখে যেন স্নেহ, ভালোবাসার বন্যা। আপন মনেই বলল, পড়তে বসছি, মা। আগে তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। আর তোমায় কষ্ট দেব না।

মৃন্ময়ী লক্ষ করল অপূর্ব আবার আগের মতো সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। মনে মনে প্ল্যান আঁটে কী করে ওর উন্নতির পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এক ডিশ তেলেভাজা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাবে হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় ডিশটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল, আর নাকে হাত দিয়ে ‘বাবাগো মাগো’ বলে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

অপূর্বর স্কুলে থেকে ফেরার সময় হয়েছে। মৃন্ময়ী টেবিলের উপর খাবার রেখে দিল, আর এক গ্লাস জল। জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিল ঘুমের ট্যাবলেট। মনে মনে ভাবে, দেখব কীরকম পড়াশুনা করে।

অপূর্ব এসে ওর জন্যে রাখা হালকা খাবার খেয়ে গ্লাসের ঢাকা খুলে দেখল, জল নেই। ভাবল কাকিমা জল রাখতে ভুলে গেছে। ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে খেলতে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে পড়তে বসল।

মৃন্ময়ী মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়। রান্নাঘরে বসে বসে ভাবে। এমনটা তো হবার কথা নয়। এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। ঠিক এই সময় লোডশেডিং। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মৃন্ময়ী দেশলাই নেবার জন্যে হাত বাড়ায়, কিন্তু ওর মনে হল দেশলাইটা সরে গেল। উঠে পড়ে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের কোণে গেল। ওইখানেই লণ্ঠন থাকে। কিন্তু অনেক খুঁজেও পেল না। হঠাৎ একটা দারুণ আতঙ্ক ওকে গিলতে এল। ও উঠে পড়ে দরজা খুঁজতে লাগল। রান্নাঘর থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কোথায় দরজা!

চারদিকে শুধু দেওয়াল। জানলা নেই, দরজা নেই, বেরোবার কোনো পথই নেই। হঠাৎ মনে হল কে যেন হাসছে। চিৎকার করে মৃন্ময়ী, কে তুমি? কে হাসছে? কান খাড়া করে শোনে। না, কেউ হাসছে না তো। অপূর্ব পড়ছে। তাহলে কারেন্ট তো যায়নি! এখানেই শুধু অন্ধকার। রান্নাঘরের বাল্বটা কেটে গেছে। কিন্তু দরজা? দরজা কই? এই অন্ধকার থেকে ওধারের আলোর মধ্যে যাবার দরজাটা যখন কিছুতেই খুঁজে পেল না তখন চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

আজও মানসিক হাসপাতালের ঘরে মৃন্ময়ীর চিৎকার শোনা যায়, দরজা কোথায়? আমি ঘর থেকে বেরোতে চাই। কোথায় দরজা? কে আমার ঘরের দরজা নিয়ে গেল? আমার ঘরের দরজা?

[ছুটির হাসি (নির্মল বুক এজেন্সী), ২০০৫ (প্রথম প্রকাশকাল অজ্ঞাত)]

চৌধুরীবাড়ির অয়েলপেন্টিং

অশোক বসু

আমার বন্ধু মানিকের সঙ্গে গিয়েছিলাম ওর দেশের বাড়ি সেই গোকুলগঞ্জ। জমিজমার কী একটা গুণ্ণগোলের ব্যাপার ছিল। মানিকের এক মেসো সেখানে থাকেন। তাঁর কাছেই উঠেছিলাম।

জমির সমস্যা মিটতে মিটতে দিন তিনেক লেগে গেল। পরের দিন ফিরব। ট্রেন সন্ধে সাতটায়। তাও গোকুলগঞ্জ থেকে এক ঘণ্টা বাসে। বিশ-পঁচিশ মিনিট রিকশায় গেলে তবে রেল স্টেশন। সন্ধের মুখে আমরা যখন স্টেশনে এসে পৌঁছোলাম, তখন চারদিক রাতের মতো অন্ধকার হয়ে এসেছে। সময়টা ভরা বর্ষার। সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘ এখন-তখন করছিল। আমরাও স্টেশনে পৌঁছোলাম, বৃষ্টিও নামল।

বেশি পয়সা দেব বলে রিকশাচালককে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজি করিয়েছিলাম। ভাড়া পেয়েই সে ওই বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যেই রিকশা ছুটিয়ে ফিরে গেল।

আসল অসুবিধেটা কী অপেক্ষা করছে, তখনও জানতাম না। জানলাম, স্টেশনে এসে। বৃষ্টি না হয় মানা গেল। বর্ষার মাসে বৃষ্টি তো হবেই। অসুবিধেয় পড়লাম, মাথা বাঁচানোর জন্য প্ল্যাটফর্মে কোনো টিনের শেড নেই বলে। স্টেশনে ঘর বলতে পাশাপাশি দেড়খানা ঘর। একটা স্টেশনমাস্টারের, অর্ধেকটা বোধ হয় টিকিট কাটার জন্য। আগেকার দিনে বাংলা সিনেমায় যেমন দেখা যেত— কৃষ্ণচূড়া কিংবা অন্য কোনো বড়ো গাছের নীচে লাল রঙের স্টেশনঘর, কুচিপাথরের একটুখানি প্ল্যাটফর্ম, চারদিকে জনবসতিহীন ফাঁকা মাঠ, ঠিক সেইরকম। প্যাসেঞ্জার বলতে আমি আর মানিক, সাকুল্যে এই দুজন। বৃষ্টি বেশ জোরেই পড়ছিল। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়েই স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে পড়লাম। এদিকে ইলেকট্রিক লাইট এখনও আসেনি। স্টেশনমাস্টারের ঘরে হারিকেনের আলো জ্বলছে! দুজন মানুষকে

অরাজকতা এতকুসিদ্ধ

ঘরে দেখলাম বসে থাকতে। পোশাক দেখে বুঝলাম, একজন স্টেশনমাস্টার, অন্যজন স্টেশনমাস্টারের স্টাফ-টাফ কেউ হবে।

স্টেশনমাস্টার কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দেখলেন। সুটপ্যান্টপরা শহুরে যাত্রী এই স্টেশন দিয়ে খুব বেশি যাতায়াত করে না বোধ হয়! মানিক তাঁকে বলল, ‘খুব বৃষ্টি হচ্ছে তো, বাইরে থাকলে ভিজে যাব, তাই। আমরা সাতটার ট্রেনটা ধরব।’

স্টেশনমাস্টার বললেন, ‘কী বললেন, সাতটার ট্রেন ধরবেন?’

মানিক রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘পাবেন না। শুধু সাতটার ট্রেন কেন, আপ-ডাউন কোনো ট্রেনই কাল সকালের আগে পাবেন না।’

‘সে কী! ট্রেন পাব না?’

‘না, লাইন বন্ধ। আগের স্টেশনে একটা গুডস ট্রেন ডিরেলড হয়েছে।’

মানিক আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, আতাত্তরে পড়ে গিয়েছি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ট্রেন না পেলে এই দুর্ঘোণে কোথায় কাটাব, কে জানে! মানিকও বহু বছর দেশছাড়া। এদিককার কিছুই এখন সে জানে না। গোকুলগঞ্জে যে ফিরে যাব, তারও উপায় নেই। যে রিকশায় এসেছিলাম, সেটাও ফিরে গিয়েছে। তা ছাড়া রাতে নাকি এদিকে বাসও চলে না।

মানিক বলল, ‘ভারি মুশকিল হল তো। এই বৃষ্টিতে সারারাত থাকব কোথায়? কী করব?’

স্টেশনমাস্টার বললেন, ‘সে তো বুঝতেই পারছি। স্টেশনঘরে যে থাকবেন, দেখতেই পাচ্ছেন কেমন স্টেশন। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই।’

দ্বিতীয় লোকটি এতক্ষণ কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার বললেন, ‘একটা কাজ করতে পারেন। আধ মাইল দূরে চৌধুরীদের একটা পুরোনো বাড়ি আছে। কেউ থাকে না। ওই বুড়ো ভবানীখুড়োই দেখাশোনা করেন। দেখুন, তাঁকে বলে-কয়ে, যদি কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আমিই না হয় সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দেব। ভবানীখুড়োকেও বলব। বৃষ্টিটা থামুক। আপনাদের সঙ্গে তো ছাতাও দেখছি না।’

স্টেশনমাস্টার বললেন, ‘ব্রিজমোহন ঠিক কথাই বলছে। ওই বাড়িতে থাকতে পারেন। বাড়িটার অবশ্য বদনাম আছে। তা, আপনারা ইয়ং ম্যান, ওসব ভূতুড়ে গালগল্পো বিশ্বাস করবেন কেন?’

একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। শুধু বৃষ্টিই থামল না, মেঘও সরে গেল। আকাশে চাঁদ দেখা গেল। চৌধুরীবাড়িতেই থাকা ঠিক করে আমরা ব্যাগ

হাতে করে চললাম ব্রিজমোহনের পিছুপিছু। আলাপ-পরিচয়ে জানলাম, ব্রিজমোহন স্টেশনের টিকিটবাবু। বিহারের লোক, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই পশ্চিমবাংলায় আছেন। কথাবার্তায় আলাপী, ভালোমানুষই মনে হল। বাংলা বলেন বাঙালিদের মতোই।

তিথিটা সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষের শেষের দিকের। বৃষ্টিভেজা মেঠোপথ চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ব্রিজমোহনের হাতে টর্চ ছিল, কিন্তু জ্বালানোর কোনো দরকারই হল না।

জল-কাদার রাস্তা পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চৌধুরীদের সেই বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। এত রাস্তা পার হলাম, কিন্তু পথে একটা লোকেরও দেখা পেলাম না। এখানে কেউ থাকে না নাকি?

রাস্তার ঠিক পাশেই একটা পুরোনো একতলা বাড়ি। সময়ের ভাঙাগড়ায় অনেক কিছুই পুরোনো, বুরবুরে হয়ে গেলেও বাড়িটা এখনও ভেঙে পড়েনি। বট অশথ শেকড় ছড়ালেও বাড়ির ছাদ-দেওয়াল অটুট আছে। আশপাশে আর কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়ল না। এককালে হয়তো ঘরবাড়ি ছিল, এখন নেই। চাঁদের আলোয় যত দূর দেখা গেল, বহু দূর ছড়ানো জনহীন ধু-ধু প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

আমি আবার বাড়িটার দিকে তাকালাম। তাকাতেই বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল। মনে হল, বাড়িটা যেন হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মানিকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

ব্রিজমোহন বেশ জোরে ডাক দিলেন, ‘ভবানীখুড়ো, ও ভবানীখুড়ো!’

বাড়ির ভিতর থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর এল, ‘কে?’

‘আমি গো, আমি,’ বললেন ব্রিজমোহন।

একটু পরেই লঠন হাতে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ মানুষ। একমুখ সাদা গৌফ দাড়ি, উলোঝুলো চুল, কোটরাগত চোখ, ভগ্নস্বাস্থ্য, শীতল, স্থবির মুখ। ভাঙাচোরা বিবর্ণ বাড়ির সঙ্গে ভবানীখুড়োকে বেশ মিলিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল। তিনি লঠনটা তুলে ধরে ব্রিজমোহনকে দেখলেন, দেখলেন আমাদেরও। তারপর থমথমে গলায় বললেন, ‘এরা?’

কেমন যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল তাঁর গলার স্বর!

ব্রিজমোহন বললেন, ‘খুড়ো, তোমার বাড়িতে এক রাতের জন্য এই দুজনকে একটু আশ্রয় দিতে হয় যে। খুব মুশকিলে পড়েছেন এঁরা। সেই গোকুলগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরতে স্টেশনে এসেছিলেন, কিন্তু তা আজ পাওয়া যাবে না। এই বৃষ্টিবাদলায় কোথায় যাবেন! কী, থাকা যাবে তো?’

ভবানীখুড়ো সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললেন, ‘যাবে।’

প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম, ভবানীখুড়ো কম কথা বলেন। যেটুকু দরকার, শুধু সেটুকুই বলেন।

বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। মানিক বলল, ‘আমাদের কাছে টর্চ আছে। মোমবাতি কিনতে পাওয়া যাবে এখানে?’

ব্রিজমোহন বললেন, ‘এখানে আধ ক্রোশের মধ্যে কোনো দোকান নেই। খুড়োর কাছে অবশ্য দু-একটা মোমবাতি থাকতে পারে। কী খুড়ো, আছে তো?’

ভবানীখুড়ো বললেন, ‘আছে।’

মানিক বলতে গেল, ‘দামটা অবশ্য আমরা...’

তাকে থামিয়ে দিয়ে ভবানীখুড়ো বললেন, ‘দাম লাগবে না।’

ব্রিজমোহনের আর থাকার দরকার ছিল না। বললেন, ‘আমি তা হলে স্টেশনে ফিরে যাই। রেলের অফিসাররা আসতে পারেন। আগের স্টেশনে মালগাড়ি উলটে গিয়েছে যখন!’

আমি আর মানিক হাত তুলে ব্রিজমোহনকে জানালাম, ‘ঠিক আছে।’

‘আসুন,’ ভবানীখুড়ো বললেন। আমাদের নিয়ে গেলেন একটা ঘরে। লঠন উঁচিয়ে দেখালেন। ঘরটা বেশ বড়োই। একটা তক্তাপোশ রয়েছে ঘরের এক পাশে, উপরে শতরঞ্চি পাতা। মোটামুটি পরিষ্কার ঘর। ঘরের দেওয়ালে দেখলাম, একটা অয়েল পেন্টিং টাঙানো আছে। লঠনের অল্প আলোতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল একজন খুব অল্প বয়সের মেয়ের একটি শাড়িপরা ছবি। হাসিহাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন জীবন্ত ছবি আগে কখনো দেখিনি। মনে হল, এখনই যেন কথা বলে উঠবে।

তখনই আমাদের চমকে দিয়ে আকাশে কড়কড় শব্দ করে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ। মেঘ আবার জমতে শুরু করেছে। রাতে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হবে।

মানিক বলল, ‘ঠিক আছে খুড়ো। এই ঘরেই তক্তাপোশের উপর রাতটা দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারব। আমাদের সঙ্গে খাবারও আছে। আসার সময় মাসি দিয়েছে, ট্রেনে খাওয়ার জন্য। জলও আছে এক বোতল।’

ভবানীখুড়ো বললেন, ‘মোমবাতি?’

‘ও, হ্যাঁ, মোমবাতি। থাকলে একটা দিতে পারেন।’

ভবানীখুড়ো লঠনটা ঘরের মেঝেয় রেখে, অন্ধকারে চলে গেলেন মোমবাতি আনতে।

আমি বললাম, ‘লোকটা কেমন! ঠিক তোর-আমার মতো এই জগতের কোনো মানুষ নন যেন! এই জনমানবহীন জায়গায় এমন একটা

পোড়োবাড়িতে কীসের জন্য একা একা পড়ে আছেন, কে জানে?’

মানিক বলল, ‘চৌধুরীরা বোধ হয় এই অঞ্চলের জমিদার-টমিদার ধরনের কেউ ছিলেন এককালে। এখন জমিও নেই, জমিদারও নেই। লোকজন যারা থাকত, তারাও চলে গিয়েছে অন্য জায়গায়। পড়ে আছে শুধু এই বাড়িটা। ভবানীখুড়ো বোধ হয় বাড়িটার কেয়ারটেকার।’

ভবানীখুড়ো মোমবাতি নিয়ে এলেন। উনি নিঃশব্দে আসেন, নিঃশব্দে যান। পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরের মেঝেয় রেখে বললেন, ‘আমি আসি।’

কিন্তু যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ‘রাতটা সাবধানে থাকবেন।’

মানিক বলল, ‘কেন বলুন তো?’

ভবানীখুড়ো লঠনটা হাতে নিয়ে বললেন, ‘বিদেশ-বিভূঁইয়ে সাবধানে থাকাই উচিত।’

ভবানীখুড়ো চলে যাচ্ছিলেন। কী মনে হল, বললাম, ‘আচ্ছা, দেওয়ালের ওই ছবিটা কার?’

ভবানীখুড়ো দাঁড়িয়ে পড়লেন। কাঁপা-কাঁপা মুখে ছবিটার দিকে তাকালেন। একটু সময় তাকিয়েই রইলেন। তারপর চোখ নামিয়ে শীতল গলায় শুধু বললেন, ‘ও হল টুসকি।’

বলে আর দাঁড়ালেন না। লঠন হাতে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

ভবানীখুড়োর আচরণটা অদ্ভুত ঠেকল। আমি মানিকের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে-ও অবাক হয়ে ভবানীখুড়োর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, ‘লোকটা অদ্ভুত ধরনের। ছবিটার কথা বলতে কেমন যেন হয়ে গেলেন।’

মানিক বলল, ‘এরকম জায়গায়, এরকম বাড়িতে অদ্ভুত মানুষ ছাড়া আর কাকে পাবি বল? বাদ দে তো। ওসব ভেবে কী লাভ? আমাদের দরকার রাতের মতো একটা আশ্রয়। পেয়ে গিয়েছি, ব্যস। সকাল হলেই তো চলে যাব।’

বাইরে তখন রাত আরও নিঝুম হয়ে এসেছে। মাঝে-মাঝে আকাশে মেঘের ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ঘরে মোমবাতির ক্ষীণ আলোর শিখা থরথর করে কাঁপছে। এখনই বুঝি নিভে যাবে। চারপাশে কোনো জনমানুষের সাড়া নেই। শুধু আমরা দু-জনেই যেন প্রেতপুরীতে জেগে আছি।

একটু পরেই আবার শুরু হল বৃষ্টি। সেইসঙ্গে হাওয়া। মোমবাতিটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। খানিক পরেই নিভে যাবে। হাতঘড়িতে সময় দেখলাম।

পনেরো মিনিট বাকি আছে দশটা বাজতে। গাঁ-গঞ্জের হিসাবে অনেক রাত। আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। সন্দের খাবার খেয়ে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ব্যাগ দুটো মাথার নীচে থাকল বালিশের মতো করে।

কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না। চোখেও ঘুম জড়িয়ে এসেছিল। মানিকের কথায় তন্দ্রা কেটে গেল।

‘বিকাশ, বিকাশ, দেখ! অদ্ভুত ব্যাপার!’

মোমবাতি তখন শেষ হয়ে নিভে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ। মনে হল, মানিক বিছানার উপর উঠে বসে আছে।

বললাম, ‘কী হয়েছে? কী দেখব?’

মানিক বলল, ‘দেওয়ালের ছবিটার দিকে দেখ। অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।’

ছবিটার দিকে তাকিয়েই ভয়ানক চমকে উঠলাম। এ কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার! অন্ধকার ঘরে আর কিছু দেখা না গেলেও ছবিটা কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এতটাই পরিষ্কার, যেন দিনের আলোয় ছবিটা দেখছি। তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই স্পষ্ট। চারধার অন্ধকার, শুধু ছবির জায়গায় অন্ধকার নেই। এ কেমন করে সম্ভব!

মানিক বরাবরই যথেষ্ট সাহসী ছেলে। কিন্তু সে-ও দেখলাম এমন অবিশ্বাস্য ঘটনায় যথেষ্ট ঘাবড়ে গিয়েছে। বলল, ‘ছবির দিকে তাকানোর দরকার নেই। আয়, দু-জনে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি। রাত কেটে যাবে এক সময়।’

তখনই দূরে কোথায় একটা কুকুর কান্নার মতো করে ডেকে উঠল। কিছুক্ষণ সেই ডাকটা একটানা চলতেই থাকল। তারপর আন্তে আন্তে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দের মধ্যে ডাকটা মিশে গেল এক সময়। ঘরের সামনে দিয়ে কী যেন একটা ছুটে গেল। শিয়াল-কুকুর হবে।

আমি আর মানিক পাশাপাশি শুয়ে ছিলাম। ঘুমনো তো যাবে না। চোখ বন্ধ করে কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া আর কী। যে দিকের দেওয়ালে ছবিটা, আমরা পাশ ফিরে তার উলটো দিকে মুখ রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলাম।

বাইরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। দুর্যোগের রাত আন্তে আন্তে গভীর হচ্ছে। এক অপার্থিব পরিবেশে আমরা বিনিদ্র হয়ে শুয়ে থাকলাম।

তখন অনেক রাত। মানিককে ~~ফিসফিস~~ ^{অস্বস্তিকৃত} করে বলতে শুনলাম, ‘ঘরের

মধ্যে কেউ আছে। নিশ্চয়ই আছে। হেঁটে চলে যাচ্ছে কোনো মহিলা। আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি।’

আমি কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম। প্রথমে কিছু না বুঝলেও একটু পরেই টের পেলাম। হ্যাঁ, আমরা দুজন ছাড়া আর-একজন কেউ আছে এই ঘরে। খসখস করে খুব ক্ষীণ একটা শব্দ হচ্ছে। শাড়ি পরে চললে যেমন শব্দ হয়, সেরকম। শুধু শব্দ নয়, অন্যরকম একটা গন্ধও ভাসছে এই ঘরে! যেন কোনো অজানা লোকের কাছ থেকে ভেসে আসছে গন্ধটা।

কী মনে হল, আমি ছবিটার দিকে তাকালাম। আর তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। কী আশ্চর্য, ছবিটা তো আর দেখা যাচ্ছে না। সব কিছুর মতো ছবিটাও অন্ধকার ঘরের দৃষ্টির অগোচর হয়ে আছে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে এল। তবে কি ওই ছবির সঙ্গে এই ঘরে কারও থাকার কোনো সম্পর্ক আছে!

বললাম, ‘মানিক, দেখ, দেখ, ছবিটা কিন্তু অন্ধকারে আর দেখা যাচ্ছে না।’

মানিক ছবিটার দিকে তাকাল। বুঝলাম, সে-ও ছবিটা দেখতে পাচ্ছে না। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ‘অদ্ভুত ব্যাপার তো! দাঁড়া টর্চ জ্বালিয়ে দেখি।’

তখনই খিলখিল করে মেয়েলি হাসির শব্দ শোনা গেল। কে যেন দৌড়ে গেল দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মানিকের টর্চ জ্বলে উঠল। দরজা খুলে যে এইমাত্র বাইরে গেল, তার শাড়ির আঁচলের প্রান্তটা নিমেষের জন্য দেখা গেল। অবিকল একই শাড়ি, ছবির মেয়েটা যে শাড়ি পরে আছে!

মানিকের টর্চের আলো এবার এসে পড়ল ছবিটার উপর। এ কী। ছবি কোথায়? একটা সাদা কাগজ শুধু ছবির ফ্রেমে আটকানো রয়েছে। কোনো ছবি নেই।

টর্চ নিভিয়ে আমরা দু-জনে ঘেঁষাঘেঁষি করে হিম হয়ে বিছানায় বসে রইলাম।

সারারাত অবশ্য আর কোনো ভৌতিক ব্যাপার ঘটল না।

ভোরের আলো ফুটতেই এক মুহূর্ত দেরি না করে ব্যাগ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম চৌধুরীবাড়ি থেকে। যাওয়ার সময় ভবানীখুড়োকে বলে যাওয়াও হল না। কাছেপিঠে কোথাও দেখলাম না তাঁকে। মনে হল, তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। কিন্তু তাঁর জন্য তো আর দেরি করা চলে না। সকালের ট্রেনটা ধরতেই হবে।

তখন আর বৃষ্টি নেই। যন্ত্রিণ্ডক আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। আধমাইল

রাস্তা হনহন করে হেঁটে সকাল-সকালই স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

স্টেশনমাস্টার স্টেশনেই ছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, ‘এই যে, আসুন, আসুন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের ট্রেন এসে যাবে। লাইন ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। বসুন, চা খান।’

টেবিলের উপর একটা বড়ো ফ্লাস্ক ছিল। সেখান থেকে দুটো কাপে চা ঢেলে আমাদের দিলেন। সকালে গরম গরম চা খেয়ে ভালোই লাগল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মানিক বলল, ‘চৌধুরীবাড়ির ব্যাপারসাপার কী বলুন তো? অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে দেখলাম কাল রাতে।’

স্টেশনমাস্টার বললেন, ‘বলব, বলব। বলব বলেই তো আপনাদের বসতে বললাম। আপনারা তো দিব্যি একটা রাত কাটিয়ে এলেন। কিন্তু রাতে থাকা তো দূরের কথা, দিনের বেলাতেও কেউ পা দেয় না ওই বাড়িতে।’

আমি বললাম, ‘কেন বলুন তো?’

‘সে অনেক কথা। যতটুকু জানি, বলছি।’

স্টেশনমাস্টার ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকে দিলেন। রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, ‘তা হলে শুনুন।’

স্টেশনমাস্টার যা বললেন, তা এরকম—

অনেক বছর আগে চৌধুরীরা ওই অঞ্চলের সম্পন্ন জোতদার ছিলেন। কিন্তু পর পর কয়েক বছর ভয়ানক অজন্মা হওয়ায় তাঁরা জমিজমা ছেড়ে চলে যান। থেকে গেলেন শুধু তাঁদের এক বংশধর ভবানী চৌধুরী, যাঁকে সবাই এখন ভবানীখুড়ো বলে চেনে। তিনি গেলেন না শুধু একটা কারণে, নিজের একমাত্র সন্তান আদরের কন্যা টুসকির জন্য। অকালে স্ত্রী গত হওয়ার পর ভবানীখুড়ো ওই মেয়েকে নিয়েই থাকতেন। হাসিখুশি, চঞ্চল। দেখতেও খুব সুন্দর ছিল টুসকি। তো, এই মেয়ের যখন বিয়ের বয়স হল, পাত্রের খোঁজখবর চলছে, এমন সময় একদিন বাড়ির বাগানে সাপে কামড়াল টুসকিকে। আর, তাতেই তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর এই আঘাতকে মেনে নিতে পারলেন না ভবানীখুড়ো। কোথাও গেলেন না। আদরের মেয়ের স্মৃতি আগলে পড়ে রইলেন এই বাড়িতে। কেমন যেন পাগল-পাগল হয়ে গেলেন মানুষটা। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করেন না। বাইরে বের হন না। বাড়ির মধ্যে প্রেতগ্রস্তের মতো গুম মেরে বসে থাকেন।

‘ঘটনা কি শুধু এই?’

মানিকের প্রশ্নে স্টেশনমাস্টার মাথা নাড়লেন, ‘না, ঘটনা শুধু এই নয়,

আর-একটু আছে। সেটাই আসল। নিশ্চয়ই দেখেছেন, টুসকির একটা ছবি আছে চৌধুরীবাড়ির একটা ঘরে। লোকে বলে, প্রত্যেক বছর আষাঢ় মাসের সাতাশ তারিখে সেই ছবি নাকি জীবন্ত হয়ে ওঠে। গভীর রাতে ছবি থেকে নেমে আসে টুসকি। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই রাতে নাকি কালঘুম নেমে আসে ভবানীখুড়োর চোখে। অনেক চেষ্টা করেও জেগে থাকতে পারেন না। অনেক বেলা পর্যন্ত নাকি অঘোরে ঘুমোন! শোনা কথা সব, সত্যি-মিথ্যে বলতে পারব না। তবে, ওই দিনই, সাতাশ আষাঢ় টুসকিকে সাপে কেটেছিল।’

চকিতে একটা কথা মনে এল। বললাম, ‘কাল বাংলা মাসের কত তারিখ ছিল?’

অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে স্টেশনমাস্টার বললেন, ‘সাতাশ। আষাঢ় মাসের সাতাশ তারিখ। নিন, তৈরি হয়ে নিন। আপনাদের ট্রেন এখনই এসে যাবে।’

[আনন্দমেলা, মার্চ ২০০৬]

পেতনি রহস্য ও কিটু লাহিড়ি

হিমালীশ গোস্বামী

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীকে একবার ভূত রহস্য সমাধান করতে হয়েছিল, কে জানত কিটু লাহিড়িকেও তেমনই এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে হবে? জড়িয়েই পড়েছিল বটে, তবে ভূত ঠিক নয়; কিটু লাহিড়ি জড়িয়ে পড়েছিল পেতনিরহস্যে! কিটুর দু-তিন সপ্তাহ সময়টা তেমন ভালো কাটছিল না। দু-তিন সপ্তাহ হল বাঘা কাকাও বাড়িতে নেই, তাঁর পুরোনো এক সঙ্গীর সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিখ্যাত পাহাড়ি জায়গা শিলং-এ গেছেন। সেখানে একমাস অন্তত থাকবেন। ওখানে ওঁর বন্ধু সদানন্দ মোড়ল একটা ছোটো স্কুল খুলেছেন, সেখানে নানারকম কাজকর্ম শেখানো হয়। ওখানকার বেকার ছেলেমেয়েরা যাতে কিছু শিখে পয়সা রোজগার করতে পারে এমনই উদ্দেশ্য। এগুলির মধ্যে আছে জামা-কাপড় ধোওয়া, ইস্তিরি করা ইত্যাদি। এ ছাড়া বিদ্যুতে চলে এমন সাধারণ যন্ত্রপাতি, যেমন— জল গরম করার হিটার, দরজার ঘন্টা, ইস্তিরি এমনকী রেডিয়ো, পাখা ইত্যাদি সারাই। সম্প্রতি সদানন্দ মোড়ল একটা রান্নার ক্লাসও খুলেছেন, সেখানে কমবয়সিরা শেখে নানারকম রান্না। পর্যটন বাড়ছে, হোটেল-রেস্তোরাঁ বাড়ছে— সেখানে অনেক লোকও নেওয়া হচ্ছে। কেমন করে রান্না করতে হয়, কেমন করে সার্ভ করতে হয়— এ-সব শিখলে আজকাল কাজের অভাব হয় না। এ ছাড়া বয়স্করা বিশেষ করে মেয়েরাও নতুন নতুন রান্না শিখছেন। এইসব শিখিয়ে বাঘা কাকার আয়ও হচ্ছে ভালোই। তবে উনি ওখানে স্থায়ীভাবে যাননি, কয়েক জনকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে তারা যাতে নিজেরা অন্যদের ট্রেনিং দিতে পারে এমন পরিকল্পনা করেছেন। এই সব কাজে বাঘা কাকা যখন শিলং-এ তখনই ব্যাপারটা ঘটল, তবে শিলং-এ নয়, কলকাতাতেই।

কিটু একা থাকলে একটা বড়ো ঝামেলা হয়, কেন না তখন তার সুপ্রিয়া-পিসি তার জন্য রোজ খাবার পাঠিয়ে দেবেনই। দু-একদিন অমন

খাদ্য কোনোমতে খেলেও তিনদিন পর তার মন আর পেট দুই-ই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এদিকে তার পিসতুতো ভাই মিহিরও নেই। এতদিন পরে তার কবিতা লেখার নেশা অনেকটা কেটে গেছে। আর তার বাবা তাকে একরকম জোর করেই একটা চাকরি জোগাড় করেও দিয়েছেন তাঁরই এক বন্ধুর প্রতিষ্ঠানে। জায়গাটা খুব দূরে নয়, চন্দননগরে। তবে সপ্তাহের মধ্যে পাঁচদিনই সেখানে থাকতে হয়। সেখানে যাবার আহ্বান সত্বেও কিটু সেখানে যেতে চায় না। তার কারণ, মিহিরকে অনেকরকম কাজ করতে হয়। অনেক সময় তাকে বাড়িতেও পাওয়া যায় না। আবার এ-ও হয় যে, মিহিরের অফিসের লোকজন এসে ঘন্টার পর ঘন্টা নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। একবার কিটু সেখানে গেলেও তার ভালো লাগেনি একেবারেই। তাই যখন তার পুরোনো এক বন্ধু বিনোদ গুপ্ত ভায়া যাদবপুরের মশা অধ্যুষিত এক জলার ধারে তাকে যেতে বলল তখন সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে, সুপ্রিয়া পিসিকে ফোন করে, দরজা-জানালা বন্ধ করে, বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে বিনোদের গাড়িতে উঠে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চলল। কোথায়?— না যাদবপুরে! কোথেকে?— না পার্ক সার্কাস থেকে।

বিনোদের বাড়িটি একেবারে জলার ধারে না হলেও দু-মিনিটের হাঁটা পথ। বেশ বিস্তৃত জল, জল ঘোলাটে সবুজ— মশার বাহার আছে। তবে ওই জল এমনই নোংরা যে মশারা পর্যন্ত ওই জলে ডিম পাড়ে না। যাদবপুরের মশাদের নার্সিং হোম ছোটো ছোটো গর্তের জল অথবা বাড়ির কাছাকাছি কোনো ভাঙা হাঁড়ি, ফেলে দেওয়া গাড়ির টায়ার। এ সবার মধ্যে বৃষ্টির জল জমে থাকায় এবং নিয়মিত মশা মারা বিষ না ছোটানোয় মশাদের ডিম পাড়ার খুব সুবিধা।

তবু শান্তি পেল কিটু। এ বাড়িতে বিনোদ আছে, আছে বিনোদের স্ত্রী সুদেষ্ণা এবং তাদের আট বছরের গৌরব। সুদেষ্ণা স্কুলে পড়ায়, সেই স্কুলেই পড়ে গৌরব। বাড়িতে কাজের লোক দুজন, তবে সর্বদার জন্য নয়— সেটার অনেক সুবিধে। কিন্তু সে সব কথা থাক। কিটু এখানে এসে শান্তি পেয়েছে। সে ঠিক করে যতদিন থাকা যায় থাকবে।

কিন্তু শান্তির দফা রফা হল সকাল আটটায়। টেলিফোনে সুপ্রিয়া পিসির সেই চাঞ্চল্যকর কণ্ঠস্বর— ওরে কিটু, আমাকে বাঁচা। আমার বড়ো বিপদ!!

কী হয়েছে, সুপ্রিয়া পিসি? তোমার কণ্ঠ এমন উত্তেজিত কেন?

সুপ্রিয়া পিসি প্রায় ঝংকার দিয়ে বলেন, ঝংকার দেব না তো কি? সকাল সাতটা থেকে এই এক ঘন্টা ধরে কেবলই ভাবছি দেওয়ালে এর

অবস্থান টিক টিক করে আর হাতের সাহায্যে চলে, দু-অক্ষরে— ভাবতে পারিস এমন বিপদের কথা?

সুপ্রিয়া পিসি কথামালা নামের এক ক্রস ওয়ার্ড করেন। এটা তাঁর নেশার মতো। কিটু এ ব্যাপারে একেবারে অসমর্থ তা নয়। সে সুপ্রিয়া পিসিকে সাহায্য করতে করতে দিব্যি পাকা হয়ে উঠেছে। সে খুব আশ্তে করে বলল, ঘড়িতে এখন ক-টা?

ঘড়িতে ক-টা জেনে কী হবে? এই তো সবে আটটা হল। তারপরই চিৎকার করে বলে চলেন, তুই একটা শয়তান! উত্তরটা হবে ঘড়ি, তাই না? দু-হাত দিয়ে চলে, টিক টিক করে, দেওয়ালে থাকে! বলেই ফোনটা রেখে দেন তিনি।

কিটু ভাবে সুপ্রিয়া পিসিকে ফোন নম্বরটা না দিলেই ভালো হত!

কিন্তু কিটুর শান্তির ফের ব্যাঘাত ঘটল দুপুর নাগাদ। ওর জন্য নির্দিষ্ট করা আলাদা ঘরে প্রচুর বই যেমন ছিল তেমনই ছিল টেলিভিশনও। কিটু ক্লিক করে সেটা চালু করতেই শুনতে পেল একজন ভারি উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন, যাদবপুরের এক বড়ো প্রোমোটর সুরেশ্বর সুরকে তাঁর বেহালার বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, তিনি যে ঘরে রাত্রে ছিলেন সে ঘর ছিল ভেতর থেকে বন্ধ। তাঁর দেহ দেখে পুলিশের অনুমান তিনি প্রবল আতঙ্কে মারা গেছেন অথবা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। যদিও ঘরে বিষের শিশি বা তেমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ময়না তদন্ত করলে তবেই মৃত্যুর আসল কারণটি জানা যেতে পারে। টিভির খবরে আরও জানা গেল সুর মহাশয় যাদবপুরের প্রোমোটর হলেও তাঁর বাড়ি বেহালায়। তিনি বিবাহিত হলেও তাঁর স্ত্রী সুরমা আলাদা থাকেন, তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না বলে প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন।

বিকেলে কিটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বই পড়তে পড়তে। এমন সময় শোনা গেল জনাকয়েক যুবক ‘জলা বোজানো চলবে না, চলবে না’ স্লোগান দিতে দিতে ঘুরছে। কিটু ভাবল, এ রাজ্যে জলাভূমি আর থাকবে কি না সন্দেহ।

বিকেলে কিটু একটু পাড়ায় ঘুরে এল— একেবারে যাদবপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত। বিকেলে চমৎকার জলখাবার আর চা খেয়ে গৌরবের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করল। কিটু বুঝল, ছেলেটি ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে। কেন না কিটু তাকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি সাঁতার কাট? উত্তরে গৌরব বলেছিল, না কাকু, আমি সুইম কাটি না।

যাই হোক, কিটুর দু-তিন দিন ভালোই কাটল। অবশ্য ইতিমধ্যে সুপ্রিয়া পিসি তাকে বার বার ফোন করে ক্রস ওয়ার্ডের ধাঁধার উত্তর জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে পঞ্চম দিন সকালের খবরের কাগজ পড়ে সে একেবারে হতভম্বই হয়ে গেল। রাত্রে তিনটি খুন হয়েছে। সেই সুর যেমন খুন হয়েছিলেন প্রায় তেমনই রহস্যজনকভাবে। একজন যাদবপুরেই— নাম জয়রাম সুকুল— অবাঙালি প্রোমোটর। অন্য দুজনই লিলুয়ার। একজনের নাম মহম্মদ হালিম, অন্য একজন ললিত ভণ্ড। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ঐরা প্রত্যেকেই যাদবপুরের বিশাল জলাভূমি ভরাট করছিলেন বে-আইনিভাবে। প্রত্যেকেই মারা গেছেন আশ্চর্য কোনো উপায়ে। কারও শরীরে বিষ পাওয়া যায়নি। আঘাতেরও চিহ্ন নেই।

কিটু ভাবতে লাগল। কিন্তু এর কোনো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তার মনে এল না। এই সময় বাঘা কাকা থাকলে বেশ হত। কিটুর অনেক জটিল সমস্যা বাঘা কাকা সমাধান করে দিয়েছেন। কিন্তু সে ভেবে আর এখন লাভ কী? সেদিন রাত্রে ডিনার-এর সময় বিনোদ কিটুকে বলল, তোর ঘুম কেমন হয়? কিটু বলল, বলতে নেই ঘুম ভালোই হয়। তবে মনে দুশ্চিন্তা থাকলে প্রায়ই জেগে উঠি, খানিক বই পড়ি, আবার ছটফট করে ঘুমিয়েও পড়ি। কেন প্রশ্ন করছিস?

এবারে সুদেষ্ণা বলল, কাল অমাবস্যা কি না, তাই একটু বলছি। প্রত্যেক অমাবস্যার রাত্রে বেশ জোরালো কণ্ঠে এখানে কিছু পেতনি হাসাহাসি করে, ঠাট্টা করে, রীতিমতো আসর বসায়। কেউ কেউ আবার গানও করে। তবে মানুষের কণ্ঠ নয় এবং সুরও যে খুব চমৎকার তাও নয়।

সে কি কথা? ভূত কি সত্যিই আছে নাকি? কিটু প্রশ্ন করে।

বিনোদ হেসে বলে, ভূত আছে নিশ্চয়। যদি নাও থাকে তবে পেতনি যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই পেতনি খুর কঠোর প্রকৃতির নয়। এ অঞ্চলের কোনো মানুষকে তারা এ পর্যন্ত মারেনি ধরেনি— এমনকী ভয়ও দেখায়নি। এই পেতনিদের মনে মায়াদয়াও আছে। এ অঞ্চলে এমনও হয়েছে দুরবস্থায় পড়ে কারো হয়তো খাওয়া জুটছে না, ওরা বুঝতে পেরে রাত্রে ভালো ভালো খাবার, চাল ডাল তেল এসব রেখে আসে। পেতনিদের দয়ামায়া আছে। তবে ওঝাদের ব্যাপারে ওরা খড়গহস্ত। দু-দুটো ওঝা যজ্ঞ করতে এসেছিল, ওরা তাদের উড়িয়ে নিয়ে একবার একজনকে আন্দামানে আর অন্যজনকে সুয়েজ-খালের কাছে একটা মালবাহী জাহাজে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। সেই থেকে এই অঞ্চলে একটি ওঝাও আসেনি। কে আসবে এমন পেতনির পাল্লায় পড়তে? ওঝারা সব ভূতের মন্ত্র জানে, কিন্তু

অরাজকতা এককুসিভ

পেতিনির মস্ত তাদের জানা নেই। আসলে পেতনিরা হাজার হলেও ভূতদের চেয়ে অনেক বেশি নরম স্বভাবের। ভূতেরা ভয় দেখায়— সুযোগ পেলেই দেখায়। কিন্তু পেতনিরা কাউকে ভয় দেখাতে চায় না এটা ঠিক। কিন্তু হলে কী হবে, মানুষেরা ভয় পায় ওদের কথা মনে হলেই। কাছাকাছি কোনো পেতনি এলে আরও ভয় পায়। ওই ভয় পাওয়া দেখে পেতনিরা অনেক সময় মজা পেয়ে হেসে ওঠে— আর ওদের হাসি তো আর মানুষের মতো কঠে হয় না, গলাটা কেমন ককর্শ আর খনখনে শোনায়। তারা হাসলে খলখল করে হাসে— মানুষেরা হাসে খিলখিল করে। ভূত বা পেতনি কেউই চেষ্টা করলেও খিলখিল করে হাসতে পারে না, পারে না হি-হি করে বা হো-হো করে হাসতেও।

এই সব যে পেতনিদেরই কাজ সে বিষয়ে কিটু নিশ্চিত হ'ল, যদিও সে এর আগে পেতনি বা ভূত বা দানো এ-সবে বিশ্বাসই করত না। সে ভূত-পেতনি এ-সব নিয়ে পড়েও ছিল কিছু কিছু। সে জানতে পেরেছে পৃথিবীতে একমাত্র বঙ্গদেশেই পেতনিরা থাকে। ভারতবর্ষে ভূত আছে প্রায় সমস্ত রাজ্যেই। সব প্রায় একইরকম। কিন্তু ইউরোপের ভূতেরা আলাদা। ইংরেজ ভূতরা আসলে মুণ্ডকাটা ভূত— তারা নিজেদের মুণ্ড এক হাতে করে ঘোরে। মুণ্ড স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে— নাকীসুরে নয় মোটেই। এ-দিকে ফরাসি ভূতরা অবশ্য নাকীসুরে কথা বলে। আবার জার্মানিতে পলটারজাইস্ট নামে এক ধরনের ভূত আছে— তারা গৃহস্থের ঘরে ঢুকে আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কেলেক্কারি করে— কিন্তু কাজটা সাবধানে করে, একটা আসবাবও ভাঙে না।

এর মধ্যে কিটু ফোন করে বাঘা কাকাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছে। উনি তো ভারি উত্তেজিত। বলেছেন, কালই এসে যাবেন— এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু কী সে সুযোগ সেটা অবশ্য তিনি বলেননি।

সেটা সেই অমাবস্যার রাত। মেঘ আকাশকে ঢেকে রাখায় অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত। ভূতদের ভারি প্রিয় এই জমাটবাঁধা অন্ধকার। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বই পড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল— কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসতে চায় না। কিটু কেবলই ছটফট করতে থাকে।

রাত তখন একটা বেজে গেছে। হঠাৎই কিটু জেগে উঠল। একটা ঠান্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে বইতে লাগল। ঘরে কেউ এসেছে বলে মনে হল। কিটু ভয়ে চিৎকার করতে গেল কিন্তু কিছুতেই গলা থেকে একটু আওয়াজও বার করতে পারল না। গলা শুকিয়ে গিয়েছে। টেবিলে গেলাসে জল ছিল, অন্ধকারে সেটা দেখতে পারল না। ~~পেতনি~~ বেড সুইচ জ্বালল— কিন্তু

আলো জ্বলল না। আন্দাজে টেবিলের ধারে গিয়ে গেলাসে একটু জোরেই হাত লেগে গেল আর সিলের গেলাসটি জল-সমেত পড়ে গেল মেঝেয়। কী করবে সে বুঝতে পারছে না— এমন সময় কে যেন ঘরের মধ্যে খলখল করে হেসে উঠল। কিটু বুঝে নিল, এই হল পেতনি। তার এমনিতে অনেক সাহস। কিন্তু সে তো দিনের বেলায়, সূর্যের আলোর স্পষ্টতায়। এই অন্ধকারে তার বড়ো অসহায় লাগল। সে বলতে গেল, তোমরা কে? বলতে ঠিক পারল না— কেমন একটা গোঙানির মতো আওয়াজ হল মাত্র। এর পর তার জ্ঞান সম্পূর্ণ হারাল না বটে, কিন্তু যেটুকু রইল তা কোনো কিছু মনে রাখার মতো যথেষ্ট নয়। যেন সে স্বপ্ন দেখছে— আবার কখনো মনে হচ্ছে— স্বপ্ন নয়, সত্যিই সব ঘটছে।

কিটু বেশ বুঝতে পারল তার ঘরে যারা এসেছে তারা কিছুতেই শরীরী নয়। এরা হচ্ছে যাদের বলা হয় তেনারা, তবে ভূত নয়— পেতনি। কিন্তু কিটু আচ্ছন্ন ছিল বলেই হয়তো তার আতঙ্ক হল না। সে যেন সহজভাবেই বলল, আপনারা কী চান?

এবার খলখল হাসি। তারপর একজন বেশ খোনা গলায় বলল, আমরা চাই যা তা হল আমাদের এই জলা থেকে হঠানো চলবে না। কিন্তু আমরা তোমার কাছে এসেছি তোমাকে নাচ দেখাতে। আমরা হচ্ছি— ভয় পেয়ো না— পেতনির দল। আগে ভালো মানুষের বউ ছিলাম, কেউ ভালো মানুষের মেয়েও ছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের শরীর নেই, কেবল মন আছে। এই মনের জোরে আমরা ছায়ারূপ ধরি। দিনের বেলায় কেউ দেখতে পায় না আমাদের, আমরা যেখানে-সেখানে যাই। রাতের বেলা কেউ কেউ দেখতে পায়, কেউ কেউ পায় না। তবে একটা কথা, রাতের বেলা আমাদের ছায়ামূর্তিতে শক্তি আসে। আমরা যেকোনো জিনিস যেকোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি— বিশেষ করে অমাবস্যার রাতগুলিতে। যাক সে কথা, আমরা এখানে এসেছি তোমাকে একটু নাচ দেখাব বলে। তোমার কাছে ঘুঙুর হবে?

এবার সত্যিই কিটু একেবারেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সে জ্ঞান ফিরে পেল পরদিন সন্ধ্যায় বাঘা কাকা আসার পর।

কিটু খুবই দুর্বল বোধ করছে। ওকে নিয়ে চারিদিকে খুব উত্তেজনা হচ্ছে। খবরের কাগজ, টি. ভির লোকও অনেক এসেছে। যাদবপুরের প্রেত রহস্য নিয়ে আলোচনা চলছে প্রায় সর্বত্র।

যাই হোক, বাঘা কাকা বললেন, আসল সমস্যা হল পুনর্বাসন। পেতনিদের পুনর্বাসন। কিটুবাবু ^{অরাজকতা প্রকট} যে সব পেতনির দেখা পেয়েছেন সে সব

ওঁর বিষম। মনটা দুর্বল ছিল, তাই রাতে খোয়াব দেখেছেন। উনি ভালো হয়ে উঠবেন দু-একদিনের মধ্যেই। ওই যে বলছিলাম, আসল ব্যাপার হল পুনর্বাসন। যাদবপুরের এই জলাটা প্রোমোটোরেরা বোজাবেই। প্রোমোটোর দশজন মরলে আবার দশজন গজাবে। তাতে সমস্যা কমবে না। এখানে পেতনিরা হাজার বছর ধরে আছেন। তাঁদের জন্য আমি বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করেছি— ওঁরা সম্মানের সঙ্গে সেখানে থাকবেন।

জায়গাটা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বাঘা কাকা বললেন, শিলং-এর কাছে একটা বড়ো লেক আছে— সেখানে আছে বড়ো বড়ো মাছ। সেখানে দেড় হাজার পেতনি থাকতে পারবেন। মেঘালয় সরকার ওঁদের দিয়ে ব্যাপক পরিবহণ-এর ব্যবস্থা করে দেবেন। পেতনিরা সেখানে রাতে চার-পাঁচ ঘণ্টা ডিউটি দিলেই দু-কেজি করে মাছ পাবেন। ওঁরা হাজার লক্ষ লক্ষ প্যাকেট এ ঠিকানা থেকে ও ঠিকানায়, এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এ দেশ থেকে অন্য দেশে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দেবেন।

বাঘা কাকা বললেন, এরকম চার-পাঁচ বছর চলার পর এই সব পেতনিদের আত্মাকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য একটা যজ্ঞ করা হবে, তখন ওঁরা অমৃতলোকে যাত্রা করবেন। এঁদের জায়গায় তখন অন্য পেতনিদের কাজে লাগানো হবে।

কয়েক দিন যাদবপুরে থাকার পর কিটু তার পার্ক সার্কাসের বাড়িতে ফিরে গেল। তার মন এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। সুপ্রিয়া পিসি তাকে দু-বার দেখে গেছেন। একদিনের ছুটি নিয়ে মিহিরও এসে ওকে সঙ্গ দিয়েছে। দু-চারদিন এরকম চলছে, সুপ্রিয়া পিসি তার জন্য রোজই নানারকম রান্না করে পাঠাচ্ছেন। বাঘা কাকার রান্নার কথা মনে পড়ে কিটুর কান্না পাচ্ছে, কিন্তু কিছুই তার আর করার নেই, অন্তত কয়েক মাস।

[শারদীয়া শুকতারা, ১৪১৪ (২০০৭)]

আঁধারগ্রামের আলো

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বহু বছর পর আজ বাসের মাথায় চড়েছে প্রবীর। বাধ্য হয়েই। স্কুল-কলেজবেলায় চড়ত। ফাঁকি দেওয়া যেত ভাড়া। যাত্রাটাও হত খোলামেলা, আরামের। তখন তাদের কষ্টের সংসার। ভাড়া বাঁচানো পয়সায় বই-খাতা কিনত। গ্রামের গরিবগুরবো মানুষ আর জিনিসপত্র সঙ্গে থাকা ব্যবসাদাররা এভাবেই যাতায়াত করে।

প্রবীর এদের মধ্যে কেউই নয়। গ্রামের ভাষায় সে এখন ‘বাবুমানুষ’। বি এ পাশ। সরকারি চাকরি করা ছেলে। তবু বাসের মাথায় উঠতে হয়েছে সঙ্গে বড়োসড়ো প্যাকিংবাক্স থাকার জন্যে। চাকরিটা সদ্য পেয়েছে, এক মাস হল। দু-দিনের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি ফিরছে আজ। চাকরির সন্ধানে এবং বিশেষ ধরনের পড়ালেখার জন্যে গত চার-পাঁচ বছর শহরেই থাকতে হয়েছে প্রবীরকে। কদাচিৎ এসেছে গ্রামে। জীবনে দাঁড়িয়ে যাওয়া প্রবীরের এবারের দেশের বাড়ি আসাটা অনেক বেশি আনন্দের। বাসের মাথায় হু-হু হাওয়ার মধ্যে সে যেন তাদের জগমোহনপুরের গন্ধ পাচ্ছে।

নীচে কনডাক্টর চেষ্টাচ্ছে, ‘কালিয়াশোল... কালিয়াশোল... এরপরই রথতলা।’ প্রবীরদের গ্রামে যাওয়ার স্টপ। প্যাকিংবাক্সটা নিজের পাশে টেনে নিয়ে নামার জন্য তৈরি হল প্রবীর।

খানিক পরেই এসে গেল রথতলা। কনডাক্টর বাসের পিছনে এসে বাক্সটা নামাতে সাহায্য করল। অশ্বখ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে ভ্যানরিকশার একটা এগিয়ে এল প্রবীরের কাছে। ভানুদা, চেনা রিকশাওলা। প্রবীরদের জগমোহনপুরেই বাড়ি।

বেশ দম লাগিয়ে রিকশায় বাক্সটা তুলল ভানু। বলল, ‘অনেকদিন পরে এলে বাড়ি। কী নিয়ে এলে এতে?’

রিকশার পাটাতনে বসে প্রবীর মজার গলায় জানতে চাইল, ‘তুমি আন্দাজ করো তো দেখি!’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

রিকশার সিটে বসল ভানু। প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, ‘মনে তো হচ্ছে টিভি।’

প্রবীর বলল, ‘টিভি চলবে কী করে, আমাদের গ্রামে কারেন্ট কই?’

লাল নুড়ি বিছানো রাস্তায় রিকশা চলছে গড়গড় করে। ভানু বলল, ‘ব্যাটারিতে চলবে। নবগ্রামে দুটো বাড়িতে যেমন চলে।’

প্রবীরদের গ্রামে কারও বাড়িতেই টিভি নেই। অতি উৎসাহীরা পাশে নবগ্রামের বাড়ি দুটোয় টিভি দেখতে যায়। সে বাড়ির লোক যথেষ্ট বিরক্ত হয়, প্রবীর তা জানে। তা হলে কি নিজেদের গ্রামের জন্য একটা টিভি কিনে আনলেই ভালো হত?

এখনও পাঁচ কিলোমিটার প্রবীরদের জগমোহনপুর। বাস যায় না। হাঁটা বা রিকশাই ভরসা। এতটা পথ, তাই কথা চালিয়ে গেল প্রবীর, ‘বাড়ির জন্য টিভি কিনে কী লাভ বলো ভানুদা? দেখার তো কেউ নেই!’

‘তা অবিশ্যি ঠিক। তা হলে আছে কী ওতে?’

‘এখন বলব না। পরে জানতে পারবো।’ বলে চুপ করে গেল প্রবীর। ভানুও আর কৌতূহল দেখাল না। একবার বাঁয়ে, পরে ডাইনে হেলে নির্দিষ্ট ছন্দে টেনে চলেছে রিকশা। রাস্তার দু-ধারে ধান, সবজির খেত। কখনো-বা জলা। রোদ মাথার উপর। শীতের শুরু বলে গরম তত লাগছে না।

প্রবীর বলে দিতেই পারত, বাস্তব কী আছে। কিন্তু সারপ্রাইজ দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারল না। পরশু দিন চাকরি জীবনের প্রথম মাইনে পেয়েছে প্রবীর। চাকরিটা পুলিশের। ওরা এখন পুলিশট্রেনিং কলেজে আছে। গতকাল বন্ধুরা মিলে বাড়ির জন্য বেরিয়েছিল বাজার করতে। সকলেই বাবা-মা, ভাই-বোনের জন্য কিছু-না-কিছু কিনল। প্রবীরের কাউকে কিনে দেওয়ার নেই। বাবা মারা গিয়েছেন, সে যখন কলেজে পড়ে। মা গেলেন প্রবীর চাকরিতে ঢোকার দু-মাস আগে। একটাই বোন, বিয়ে হয়ে চলে গিয়েছে দূরে, আশ্রয়। বাড়ি ফাঁকা। তবু বন্ধুদের সঙ্গে বাজারে গিয়ে প্রবীর যা কিনল, সবাই থা।

‘কী ঠিক করলে, বাড়ি-জমি রাখবে, না কি বেচে দেবে?’ রিকশা চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল ভানু।

একটু অবাক হয়ে প্রবীর বলল, ‘বিক্রি করব কেন? কোনো অসুবিধে তো হচ্ছে না।’

ভানু বলল, ‘না, আসলে গ্রাম থেকে যারা শহরে চাকরি করতে যায়, থেকে যায় পাকাপাকিভাবে। তোমার তো আবার পুলিশের চাকরি। কাঁহা কাঁহা মূল্যকে বদলি করে দেবে। তখন কি আর হুট বলতে আসতে পারবে?’

একটা সময় টানও কমে যাবে বাড়ির উপর। তুমি যদি বিক্রি না করো, বসত, চাষের জমি সব খাঁ খাঁ করবে।’

কথাটা খুব একটা ভুল বলেনি ভানুদা। নিজেদের বাড়ি-জমির জন্য বুকটা টনটন করে উঠল প্রবীরের। তবে একটা ব্যবস্থা সে রেখেছে। সেটাই খেয়াল করিয়ে দিল ভানুকে, ‘আমাদের জমি-বাড়ি তো সহদেবদা দেখছে, আমার চিন্তা কীসের?’

‘সহদেবের কথা আর বোলো না। ওর মতো বাউন্ডুলের হাতে কেউ সম্পত্তির ভার দেয়? কতক্ষণ থাকে তোমাদের ভিটেয়? সারা দিনমান ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-গ্রাম সে-গ্রাম। ও দেখবে তোমাদের চাষাবাদ?’

ভানুদার এই কথাটাও ফেলা যায় না। সত্যিই সহদেবদা গ্রামসেবায় সদাব্যস্ত। স্কুলছুট ছাত্রদের পৌঁছে দিয়ে আসছে স্কুলে। সরকারি সাহায্য নিয়ে আসছে হাসপাতালে। ডাক্তার, শিক্ষকরা লম্বা ছুটি নিলে পৌঁছে যাচ্ছে তাদের বাড়ি। মানুষের বিপদেআপদে সবসময় পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। মা যখন মারা গেলেন, খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল প্রবীর। শ্রাদ্ধের আগে একদিন সমস্যার কথা বলছিল সহদেবকে, ‘আমি শহরের দিকে একটা চাকরিবাকরি পেয়েই যাব। তখন এই ভিটে-জমির কী হবে সহদেবদা?’

উত্তরে বেশ জোর দিয়ে সহদেব বলেছিল, ‘কেন? আমি থাকব। আমিই দেখাশোনা করব তাদের জমি-বাড়ি। খামোকা বিক্রিটিক্রির কথা ভাবতে যাস না আবার! মনে রাখবি, এই জমির জল-হাওয়ায় তুই বড়ো হয়ে উঠেছিস। বাবা-মায়ের পায়ের ধুলো লেগে আছে এই মাটিতে। চাকরি যত দূরেই হোক, আসবি মাঝেমধ্যে ছুটি নিয়ে। নিজের গ্রাম, পৈতৃক ভিটেকে একেবারে ভুলে যাস না।’

প্রবীর হয়তো ভুলবে না। তাই তো প্রথম মাসের মাইনে মায়ের হাতে তুলে দিতে পারবে না জেনেও গ্রামে ফিরছে। কিন্তু বাড়ি-জমির দেখভাল সহদেবদা কতটা কী করছে, কে জানে!

ভ্যানরিকশা বোঁয়াইচণ্ডীর মোড়ে চলে এসেছে। বাঁ-দিকের রাস্তাটা চলে গিয়েছে সিধে প্রবীরদের পাড়ায়। মোড়ের সারের দোকান থেকে ভেসে এল নিমাই লাহার গলা, ‘আই প্রবীর, গাড়িটা দাঁড় করা, কথা আছে।’

ভানু রিকশা থামাল। দোকান থেকে বেরিয়ে নিমাই লাহা হত্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। বলল, ‘সহদেব গিয়েছে কালীগঞ্জে। স্বাস্থ্যশিবির না কী যেন হচ্ছে ওখানে। দোকানে বলে গেল, তুই আজ আসবি। দুপুরটা রৈঁধেবেড়ে খেয়ে নিতে বলেছে তোকে। সে ফিরবে রাতে।’

‘ঠিক আছে।’ মুখে বললেও প্রবীর একটু দমে গেল। সেই কোন ভোরে

পুলিশট্রেনিং কলেজ থেকে বেরিয়েছে। প্রথমে নৌকায় চেপে নদী পেরিয়ে ট্রেন। বর্ধমানে নেমে বাসের মাথায় দু-ঘণ্টা। ভেবেছিল, বাড়িতে গিয়ে দেখবে, গরম গরম ডাল-ভাত-তরকারি করে রেখেছে সহদেবদা। কিন্তু কোথায় কী! এখন নিজেকে গিয়ে সব করতে হবে।

রিকশা ফের চলতে শুরু করল। ভানু বলল, ‘কী বলেছিলাম, মিলে গেল তো? সহদেবের এমনই কাণ্ড। তুমি আর লোক পেলো না?’

ভানু কত কী বলে যাচ্ছে! প্রবীরের মন চলে গিয়েছে নিজের বাড়ির মাটির দালানে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর ডান পাশের শালখুঁটির টঙে একটা ফোকর। সেইখানেই থাকে বাড়ির চাবি। জানে শুধু প্রবীর আর সহদেব। চাবিটা সহদেবদা যদি জায়গামতো রাখতে ভুলে গিয়ে থাকে, রাত অবধি বাইরেই বসে থাকতে হবে।

আশঙ্কা বাড়ি ঢোকার আগেই দূর হল। মাইতিদের উঠোনে আসতেই দেখা গেল, প্রবীরদের খড়ের চারচালা মাটির বাড়ি।

দেখা যাচ্ছে দরজা খোলাই আছে। তা হলে কি ফিরে এল সহদেবদা?

‘নাও, মনে হচ্ছে বাবু আছেন।’ বলে উঠোনে এসে দু-বার হর্ন বাজিয়ে রিকশা থামাল ভানু।

ভিতরবাড়ি থেকে কেউ কিন্তু বের হল না। ভানু, প্রবীর মিলে প্যাকিংবাক্সটা দালানে ওঠাল।

ভানু বলল, ‘এত ভারী কেন? কী এনেছ বললে না তো?’

ভানুকে পয়সা মিটিয়ে প্রবীর বলল, ‘আর একবেলা পরে সবই জানতে পারবে। এখন বলে দিলে মজাটাই মাটি!’

রিকশা ঘুরিয়ে চলে গেল ভানু। দালানে পা ঝুলিয়ে বসল প্রবীর। আড়মোড়া ভাঙল। হাঁক দিল, ‘কোথায় গেলে গো সহদেবদা!’

কোনো সাড়া নেই। বাড়ির লাগোয়া গাছপালা থেকে ভেসে এল পাখির কিচিরমিচির। পুকুর বা মাঠে গিয়েছে মনে হচ্ছে। দালান থেকে নেমে পুকুরের দিকে এগোল প্রবীর। পুকুরঘাটে কাউকেই দেখা গেল না। পুকুরের পাশেই প্রবীরদের খেতজমি। মাঠ ভরে আছে ফলন্ত ধানগাছে। চাষের ব্যাপারে নজর রেখেছে সহদেবদা। ভানুদা অযথাই দোষ দিচ্ছিল। মাঠে কোনো চাষের লোক দেখা যাচ্ছে না। দেখার কথাও নয়। ফসল উঠে যাওয়ার পর কাজ তেমন থাকে না। জমির দিকে তাকিয়ে ফের একবার হাঁক পাড়ল প্রবীর, ‘সহদেবদা! ও সহদেবদা!’

‘সহদেবের ফিরতে রাত হবে।’

কানের পাশে কোনো এক মহিলার গলা। চমকে ঘাড় ফেরাল প্রবীর।

না, পাশে কেউ নেই, সাদা শাড়ি পরা এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন দূরে, দালানের উপর। উনিই বলেছেন কথাটা। গ্রামের দিকে ফাঁকা জায়গায় এরকমই হয়। দূর থেকে ভেসে আসা কথা কানের কাছে স্পষ্ট হয়ে বাজে। মহিলাকে প্রবীর চিনতে পারল না। সেটাই স্বাভাবিক, ইদানীং দেশের বাড়ি খুব কমই আসা হয়।

উঠোনে ফিরে এল প্রবীর। বৃদ্ধার হাতে গামছা, লুঙ্গি। প্রবীরের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, ‘যা, তেতেপুড়ে এয়েছিস। পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে আয়। আমি রেঁধে রেখেছি!’

বেশ একটা শান্তি নেমে এল প্রবীরের মনে। সহদেবদা তার মানে শেষ মুহূর্তে সব ব্যবস্থাই করে রেখে গিয়েছে। কেন না, নিমাই লাহা বলছিল প্রবীরকেই দুপুরের রান্নাবাড়া করতে হবে।

বৃদ্ধা মানুষটির হাত থেকে লুঙ্গি, গামছা নেওয়ার পর প্রবীরের দৃষ্টি হেঁচট খেল দালানে, প্যাকিংবাক্সটা কোথায় গেল?

প্রবীরের চিন্তিত মুখ দেখে বৃদ্ধা বললেন, ‘বাক্সটা আমি ঘরে তুলে রেখেছি।’

অবাক হল প্রবীর। বলল, ‘সে কী! অত ভারী বাক্স আপনি ঘরে নিয়ে গেলেন কী করে?’

‘আমরা গ্রামের মানুষ, এর চেয়েও ভারী জিনিস বওয়ার অভ্যেস আছে আমাদের।’ বললেন বৃদ্ধা।

কথা বাড়াল না প্রবীর। ঘরে ঢুকল প্যান্ট-জামা ছাড়তে। বাক্সটা যথেষ্ট ওজনদার। একা বইতে হিমশিম খেতে হয়েছে। দালানে তোলার সময় সাহায্য নিতে হয়েছে ভানুদার। বৃদ্ধা সেটা একা নিয়ে এলেন ভিতরে? ক্ষমতা আছে বলতে হবে! পুলিশ হিসেবে এ তো বৃদ্ধার কাছে হার হল প্রবীরের। লুঙ্গি পরে গামছা কাঁধে মাথা নীচু করে বৃদ্ধার সামনে দিয়ে দালান থেকে নেমে এল প্রবীর।

চান-টান করে এসে প্রবীর খেতে বসল। অনেক ক-টা পদ রান্না করেছেন মহিলা। রান্নার স্বাদও দারুণ। সামনে বসে থেকে খাওয়াচ্ছেন। ওঁর পরিচয়টা এখনও জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছে। হয়তো নিকটাত্মীয় কেউ। কথায় কথায় ঠিকই বেরিয়ে পড়বে।

প্রবীর বলল, ‘একটা বেলা আমি ভাতে-ভাত করে নিতে পারতাম। সহদেবদা কেন যে আবার আপনাকে কষ্ট দিল! তবে এত সুন্দর রান্না অনেদিন খাইনি!’

বৃদ্ধা মানুষটি বললেন, ‘তুই তখন থেকে আমায় “আপনি, আপনি” করে যাচ্ছিস কেন রে? চিনতে পারছিস না আমাকে?’

প্রবীরের মুখে অপরাধীর হাসি। বৃদ্ধা বললেন, ‘আমি হচ্ছি তোরা লতুমাসি। মাইলটাক দূরে ক্যানেলপাড়ে বাড়ি। যখন ছোটো ছিলা, হামেশাই আসতাম তোদের বাড়িতে। তোরা মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। আমার কোলে কত খেলা করেছিস তুই! মনে পড়ছে এবার?’

মোটাই পড়ছে না। তবু হাসিহাসি মুখ করে প্রবীর বলল, ‘ও হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আসলে অনেকদিন আগের কথা তো! বড়ো হওয়ার পর কিন্তু তোমাকে আমাদের এখানে আর দেখিনি।’

‘কী করে দেখবি? উপায় ছিল না আসার।’ বিমর্ষ গলায় বললেন লতুমাসি। কেন ছিল না, জানতে চাইল না প্রবীর। মনে হচ্ছে কোনো দুঃখের কাহিনি লুকিয়ে আছে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রবীর এবার কথা নিয়ে গেল অন্য প্রসঙ্গে। বলল, ‘দুপুরের খাওয়া-দাওয়া না-হয় আরাম করে হল। বিকেলের কাজের ব্যবস্থাটা সহদেবদা কী করে রেখেছে, কে জানে! যার জন্য আমার আসা।’

‘সেটাও হয়ে যাবে।’

লতুমাসির কথায় খাওয়া থেকে মুখ তুলল প্রবীর। বলল, ‘কাজটা কী জানেন? বলে গিয়েছে সহদেবদা?’

‘হ্যাঁ, সব ব্যবস্থাই সে করে গিয়েছে। বিকেলবেলা গ্রামের বিধবা বৃদ্ধারা আসবে। তখনই থান কাপড়গুলো দিয়ে দিস!’

মনে মনে আরও একবার সহদেবদাকে কৃতজ্ঞতা জানাল প্রবীর। কাজ গুছিয়ে রেখে গিয়েছে। আজ যদি শাড়িগুলো বিলি করা না যেত, ছুটি বাড়িতে হত একটা। নতুন চাকরির পক্ষে যা মোটেই ভালো কথা নয়। বড়োসাহেবরা ব্যাপারটা পছন্দ করেন না।

লতুমাসি বললেন, ‘তোরা মনটা কত বড়ো! চাকরির প্রথম মাইনে থেকে গ্রামের সমস্ত বিধবাকে একটা করে থান দিবি। অনেক অনেক আশীর্বাদ পাবি তাদের থেকে। তোরা আগে এ গ্রামের কত ছেলেই তো ভালো ভালো চাকরি পেয়েছে। শহরে গিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে তারা। ভুলেই গিয়েছে গ্রামের কথা। তোরা মা নেই, গ্রামে পরিবারের কেউই নেই। তবু আমাদের ভুলিসনি তুই!’

নিজের প্রশংসা সামনাসামনি শোনা বড়ো অস্বস্তিকর। লাজুক মুখে হাত-মুখ ধুতে উঠে গেল প্রবীর।

ঘরের চালে বসে দাঁড়কাক ডাকছে। যেন কথা বলছে প্রায়। খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রবীর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। মাথার পাশে জানলা। দেখা যাচ্ছে আদিগন্ত মাঠ, গাছ, পুকুর... সবই আছে, শুধু মানুষ নেই। বাড়ির উঠোনে আজ বিড়াল, কুকুরও দেখা গেল না। আগে যখনই এসেছে, রান্নার গন্ধে চলে এসেছে তারা। আজ যেন বড্ড নির্জন লাগছে নিজেদের ভিটেটা। একসময় এ বাড়িতেই কত হাঁকডাক। বসতটুকু বাদ দিয়েই চাষের জমি, বাবা চাষাবাদ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত। ঘর-সংসার সামলে মা, বোন সাহায্য করতেন বাবাকে। পাড়ার লোকের যাতায়াত লেগেই থাকত। এবার যেন গোটা গ্রামটা একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগল। সবাই কি শহরে চলে যাচ্ছে?

লতুমাসি বাড়ি ফিরে গেলেন খানিক আগে। বললেন, বিকেলে বৃদ্ধাদের নিয়ে আসবেন।

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, ‘কতজন হবে মনে হয়?’

মাসি জানতে চাইলেন, ‘শাড়ি ক-টা এনেছিস?’

প্রবীর বলল, ‘দেড়শো মতো। সহদেবদা এরকম হিসেবই দিয়েছে।’

লতুমাসি বললেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই হয়ে যাবে। তবে আমাকে তুই বাবা দুটো শাড়ি দিস।’

আবদারটাকে প্রশ্ন না দিতে চেয়ে প্রবীর বলল, ‘দুটো শাড়ি কি তুমিই নেবে? আমি যে মাথাপিছু একটা এনেছি।’

‘না রে, আমার চেনা একজন আছে, সে আসতে পারবে না।’

‘কেন পারবেন না আসতে? শরীর অসুস্থ?’

‘না, তার আসলে খুব লজ্জা!’ লজ্জাটা যে আসলে লতুমাসির, বুঝতে অসুবিধে হয়নি প্রবীরের। বেচারির বলতে সংকোচ হচ্ছে, ‘শাড়ি দুটো আমিই পরব’। আহা, পরুন! নিজের ঘরের কাজ ছেড়ে এসে প্রবীরের জন্য সকাল থেকে রান্নাবাড়া করছেন। প্রবীরের এখন প্রধান চিন্তা বিকেলের প্রোগ্রাম নিয়ে। দেড়শোজন বৃদ্ধাকে শাড়ি দিতে হবে। লতুমাসির মতো আর কেউ যদি দুটো শাড়ি চান, অথবা দেড়শোর বেশি ক্যান্ডিডেট চলে আসেন, কী করে সামলাবে প্রবীর? সহদেবদা থাকলে এসব নিয়ে ভাবতেই হত না।

মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে প্রবীরের। বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন। নিজের হাতে শাড়ি দিতেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিয়জনদের। গর্বে ডগমগ করত মায়ের মুখ।

শাড়ি দেওয়ার প্ল্যানটা মাথায় আসার পরই সহদেবকে ফোন করেছিল

প্রবীর। সহদেব খুবই উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, ‘দারুণ ভেবেছিস! তোর বাড়ির লোক না থাকলে কী হবে, আমাদের গ্রামের দিকে পাড়াপ্রতিবেশীরা তো একটা যৌথ পরিবারের মতোই থাকি। সেখানকার সব বিধবা বয়স্কা আমাদের আত্মীয়, গুরুজন।’

সেই গুরুজনদের মধ্যে একজন লতুমাসি। যাঁকে আজ চিনতেই পারল না প্রবীর। ব্যাপারটার জন্য প্রবীর এখনও মরমে মরে আছে।

বিকেলে লতুমাসি এসে ঘুম ভাঙালেন, ‘প্রবীর, এবার ওঠ রে। বেলা ফুরিয়ে এল। ওরা সব এসে পড়েছে উঠোনে।’

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল প্রবীর। ওরা কারা? বুঝতে একটু সময় লাগল। খেয়াল হল, গ্রামের বিধবা বৃদ্ধাদের কথা। জানলার বাইরে তাকাল। আলো একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে হয়তো অপেক্ষা করছেন বৃদ্ধারা। বিছানা থেকে নেমে এল প্রবীর। পাকশাল থেকে ভেসে এল লতুমাসির গলা, ‘চা করছি। খেয়ে নিয়ে বিলি করতে বসিস!’

ঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়াল প্রবীর। উঠোনে বৃদ্ধাদের ভিড় দেখে চমকে উঠল! দেড়শো ছাড়িয়ে যাবে না তো? ওঁরা ইতস্তত দাঁড়িয়ে-বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছেন। অনেকদিন পর একসঙ্গে হতে পেরেছেন সকলে। শাড়ির পেটিটা ফের বারান্দায় রাখা হয়েছে। পাশে জলচৌকি, যেখানে বসবে প্রবীর। বোঝাই যাচ্ছে এসব লতুমাসির কাজ। খুবই পরিপাটি স্বভাবের মহিলা। সহদেবদা উপযুক্ত মানুষই রেখে গিয়েছে। পাঁচ-ছ-জন বৃদ্ধা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন পেটিটা। দুজন আবার পেটির গায়ে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। নতুন শাড়ির গন্ধ পেতে চাইছেন, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে ওঁদের। কতদিন পর হয়তো নতুন থানকাপড়ের গন্ধ পাবেন। প্রবীরদের গ্রামটা যে বড়োই গরিব।

‘এই নে, চা ধর!’

লতুমাসি এসে দাঁড়ালেন পিছনে। মাসির হাত থেকে চা নিল প্রবীর।

থানকাপড় বিলি করছে প্রবীর। সকলেই সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন লাইনে। অনেকটা করে ঘোমটা টেনে রেখেছেন বৃদ্ধারা। গ্রামের মানুষদের সংকোচ একটু বেশি। দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন প্রবীরকে। লতুমাসির জন্য প্রবীর দুটো শাড়ি আলাদা সরিয়ে রেখেছে। সব শেষে দেবে। প্রবীরকে শাড়ি বিলি করতে সাহায্য করে যাচ্ছেন মাসি। আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধাদের সঙ্গে।

একসময় শেষ হল কাপড় বিলি। কম পড়েনি। সকলেই পেয়েছেন।

গোটা কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা হলেও, কোথায় যেন একটা ফাঁকা রয়ে গেল। বৃদ্ধারা চলে গিয়েছেন। উঠোন এখন ফাঁকা। শুধু একটা কাঠবিড়ালি কেমন যেন ভয় পেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে সেখানে। লতুমাসি আছেন এখনও।

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা মাসি, আমাদের উঠোনে এরকম একটা ব্যাপার হল, গ্রামের কেউ তো দেখতে এল না?’

লতুমাসি বললেন, ‘তা আসবে কেন? ওদের যে হিংসে হয়েছে! আমাদের তো সকলেই হেলাফেলা করে। আজ আমাদের সুখের দিন, সহ্য হবে কেন ওদের?’

প্রবীর হেসে ফেলল। তাদের গ্রামের লোকগুলো এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেল। সহদেবদা কোনো উন্নতি করে উঠতে পারেনি।

লতুমাসির হাতে থানকাপড় দুটো দিয়ে প্রবীর বলল, ‘তোমার সেই লাজুক বৃদ্ধাকে বোলো, শাড়ি নিতে আসতে না পারলেও আশীর্বাদটা যেন দূর থেকে করেন।’

‘তার আশীর্বাদ সবসময়ই তোর মাথার উপর আছে।’ বলে, শাড়ি দুটো নিয়ে উঠোনে নেমে গেলেন লতুমাসি। সন্কে হয়েই এসেছে প্রায়। একটু পরেই লতুমাসি মিলিয়ে গেলেন গাছপালা ঘেরা রাস্তার অন্ধকারে।

সন্কে গাঢ় হতে আরও একা হয়ে গেল প্রবীর। গাছে ফিরে আসা পাখিরা চঁচামেচি থামিয়েছে। ভিটে ঘিরে এখন ঝিঝির কোরাস। পুকুরধারে, ঝোপঝাড়ে জ্বলে উঠেছে জোনাকি। লম্প জ্বালিয়ে স্কুলবেলার বইখাতা ওলটাচ্ছে প্রবীর। একসময় যখন ভাবছে, রাতের রান্নাটা চাপিয়ে দেবে কি না, তখনই বাইরে সাইকেলের ঘন্টি। উঠোন থেকেই হাঁক পাড়ল সহদেব, ‘কী রে? খুব রেগে গিয়েছিস আমার উপর?’

উত্তর না দিয়ে সহদেবের জন্য অপেক্ষা করল প্রবীর। সাইকেল দালানে তুলে ঘরে এল সে। ফের বলল, ‘কিছু মনে করিস না ভাই! কালীগঞ্জে আমি না গেলে স্বাস্থ্য সচেতন ক্যাম্পটা করাই যেত না। সরকারি ডাক্তারদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না গ্রামের লোক!’

প্রবীর বলল, ‘না না, আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। তুমি তো সব ব্যবস্থাই করে গিয়েছিলে।’

সহদেব একটু থমকাল। বলল, ‘মানে?’

প্রবীর বলল, ‘লতুমাসি থাকায় আমার কোনো সমস্যাই হয়নি।’

‘কে লতুমাসি?’ কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইল সহদেব।

প্রবীর অবাক হয়ে বলল, ‘সে কী! নিজে ঠিক করে গিয়েছ তাকে,

এখন চিনতে পারছ না? দুপুরে রান্নাবান্না করে রাখলেন মাসি। বিকেলে...।’

‘দাঁড়া, দাঁড়া!’ বলে কথার মাঝে বাধা দিল সহদেব। বিছানায় এসে বসল। উদ্বিগ্ন আত্মহে জানতে চাইল, ‘এবার বল তো, ঘটনাটা কী? কে এসেছিল দুপুরে?’

বাড়ি ফেরা থেকে সঙ্গে অবধি যা-যা ঘটেছে, সবিস্তার সহদেবকে জানাল প্রবীর। কখনো চোখ বড়ো বড়ো, কখনো-বা চোখ ছোটো, ভ্রু কুঁচকে সহদেব শুনে গেল বৃত্তান্ত। তারপর কপালে হাত রেখে বসে রইল।

প্রবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কী হল তোমার! অমন করে বসে রইলে কেন?’

মাথা সোজা করল সহদেব। সন্দেহের গলায় জানতে চাইল, ‘এই লতুমাসি কোথায় থাকেন, কিছু বলেছেন?’

‘হ্যাঁ, বললেন তো ক্যানেলপাড়ে। আমার ছেলেবেলায় এ বাড়িতে নাকি আসতেন খুব।’

নীচের ঠোঁট উলটে দৃষ্টি চালার দিকে তুলে কী যেন ভাবতে বসল সহদেব। একটু পরে আশঙ্কিত গলায় বলল, ‘ক্যানেলপাড়ে চার ঘর মণ্ডলদের বাস। বিমল মণ্ডলের মা লতিকা মণ্ডল বহুদিন ধরে ভুগে বছর পাঁচেক হল মারা গিয়েছেন। ঠিকই, তোর মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি কী করে আসবেন?’

বুকটা ছমছম করে উঠল প্রবীরের। এতক্ষণে বাড়ির চারপাশের নির্জনতা, ছায়া-অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। শুকনো গলায় বলল, ‘এই রে, আরও যেসব বৃদ্ধা এসেছিলেন, তাঁরাও কি...?’

সহদেব বলল, ‘তাই তো মনে হচ্ছে। কেন না, কালীগঞ্জের কাজটা হঠাৎ পড়ে যেতে আমি গ্রামের সব বৃদ্ধাকেই বলে রেখেছিলাম, কাল সকালে দেওয়া হবে শাড়ি। এই তো, এখন আসার সময় বেশ কয়েক জন বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কাল দেওয়া হবে কি না?’

‘কী হবে তা হলে? আর শাড়ি পাব কোথায়? সব তো শেষ।’ হতাশ গলায় বলল প্রবীর।

সহদেব ঘাবড়াল না। বলল, ‘ও নিয়ে অত ভাবিস না। আমি ওদের বলে দেব, সামনের মাসে দেওয়া হবে। খরচা ডবল হবে তোর, এই যা! তবে আজকের ঘটনাটা পাঁচকান করিস না!’

‘কেন?’ বিষম কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল প্রবীর।

সহদেব বলল, ‘এমনিতে তো গ্রামে লোকজন থাকতে চায় না, আসতেও

অরাজকতা একত্রুসিত

চায় না। তারপর এই ভূতটুতের ঘটনা কানে গেলে আরও শুনশান হয়ে যাবে জায়গাটা।’

প্রবীর বলল, ‘কিন্তু এঁরা যে এ গ্রামেই আছেন, এসেও ছিলেন আমাদের উঠোনে, এটা তো সত্যি?’

‘হোক সত্যি। সব কিছুর অত হিসেব ধরলে চলে না। তুই সামনের মাসে মাইনে পেলে আবার থানকাপড় নিয়ে চলে আসবি। আমি এখন উঠি, রামার জোগাড় করতে হবে।’

সহদেব চলে গেল। প্রবীর জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকল। আকাশের ঢালে ফালি চাঁদ। স্নান আলো। বাঁশঝাড়ের ভিতরে টিমটিম করে জ্বলছে জোনাকি। আচমকা আসা হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে খেতভরা ধানগাছ। প্রবীরের চোখে ভেসে উঠছে দুপুরের দৃশ্য। কখনো তাঁদের অশরীরী মনে হয়নি। ঘোমটাটা একটু বেশি করে টেনে রেখেছিলেন, এই যা! তাঁদের অস্তিত্ব বোধহয় পশুপাখিরা টের পেয়ে থাকবে। দাঁড়কাকটা কি কিছু বলতে চাইছিল? কাঠবিড়ালিটা তো ভয়ে অস্থির। বিড়াল, কুকুর মাড়াল না চত্বর। শাড়িগুলো নিয়ে কোথায় গেলেন তাঁরা? লতুমাসি অত কথা বললেন, এতটুকু খোনা সুর শোনা যায়নি।

এইসব ভাবতে ভাবতেই প্রবীর দেখল, সাদা শাড়ি পরা কারা যেন পুকুর, খেত, মাঠের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল প্রবীরের। তবে ভয়ে কাবু হয়ে পড়ল না। বুঝতে পারল, ফিরে এসেছেন তাঁরা। নতুন শাড়িটা পরে এসে প্রবীরকে দেখাচ্ছেন। সাদা প্রজাপতির ডানা মনে হচ্ছে তাঁদের। লতুমাসিও আছেন নিশ্চয়ই ওখানে। কেন জানি প্রবীরের মন বলছে, ওঁদের মধ্যে আর-একজনও আছেন, লতুমাসির বান্ধবী, প্রবীরের মা। দুপুরে ছেলের সামনে আসতে লজ্জা পেয়েছিলেন।

মায়ের কথা মনে আসতে আর-একটা ব্যাপার খেয়াল হল। প্রবীর যখন স্কুলে পড়ে, মা বলতেন, ‘মন দিয়ে লেখাপড়া কর। গ্রাম আলো করতে হবে তোকে!’

সামনে ভেসে বেড়ানো সাদা শাড়িপরা বৃদ্ধাদের জন্য গ্রামটা বেশ আলোকিত মনে হচ্ছে আজ।

প্রবীর হাঁক দিল, ‘সহদেবদা, একটা জিনিস দেখে যাও। ও সহদেবদা!’

সহদেব এল। জিজ্ঞেস করল, ‘কী জিনিস?’

প্রবীর জানলার বাইরে আঙুল দেখিয়ে থমকে গেল। আর তো ওঁদের দেখা যাচ্ছে না! শুধুই জোনাকির আলো!

সহদেব বলল, ‘কী দেখাবি? ডাকলি কেন?’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

প্রবীর বুঝল, তাঁরাও চান না ভূতের ভয়ে গ্রামটা পরিত্যক্ত হয়ে যাক।
তাই উধাও হয়েছেন।

ওদিকে সহদেব অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল, ‘কী হল? কেন ডাকলি,
বলবি তো!’

একটু উদাস গলায় প্রবীর বলল, ‘দেখো, একফালি চাঁদের আলোতেও
কী সুন্দর দেখাচ্ছে আমাদের গ্রামটা!’

‘আমি তো রোজ দেখি। আজ তুই দেখ!’ বলে, তড়িঘড়ি পাকশালের
দিকে চলে গেল সহদেব।

[আনন্দমেলা, ২ মার্চ ২০০৮]

দেখা হবে মাঝরাতে

শুভমানস ঘোষ

সুপারভিউ টিভি কোম্পানির কলকাতা জোনের এজেন্ট হিসেবে গ্রাম বাংলায় ঘুরে বেড়াতে হয় সুমনকে, চষে বেড়াতে হয় এক শহর থেকে অন্য শহর, এক জেলা থেকে অন্য জেলা। এই রকমই ঘুরতে ঘুরতে সে অনেক দিন পরে এসেছে পানিপাতিনিতে।

পানিপাতিনি বাসস্ট্যান্ডের কয়েক হাত তফাতে মা জগদম্বা লজে বছর-কাবারি ঘর রাখা থাকে সুমনের, কোম্পানিই পেমেন্ট করে। কোম্পানির আরও অনেক এজেন্ট আছে। বছর-ভরই তাদের যাতায়াত চলে পানিপাতিনিতে।

জাতীয় সড়ককে মেরুদাঁড়ার মতো মাঝে রেখে গড়ে ওঠা ছোটো জনপদ পানিপাতিনি। ঠিক শহর না হলেও ভিডিয়ো পার্লার, ইন্টারনেট পার্লার, বিউটি পার্লার আর মোবাইল ফোন পরিষেবা পুরোপুরি ঢুকে গেছে পানিপাতিনিতে।

ক-দিন ধরে বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। হোটেলের কাউন্টারে গলায় মাফলার জড়িয়ে বসে ছিলেন হোটেলের মালিক শ্যামবাবু, সুমনকে দেখে খুশি হলেন, বললেন, আসুন সুমনভাই, আসুন। এবার অনেক দিন পরে যে!

শ্যামবাবুর বয়েস পঞ্চাশের আশেপাশে, গায়ের রং দু-পোঁচ কালো কম করে, মাথাখানা বিরাট, ফালা ফালা চোখমুখ, মুখভরতি দাড়ি-গোঁফ-দেখলেই মন আপনা-আপনি সন্ত্রমে ভরে ওঠে। আজ আবার কপালে লাল টিপ লাগিয়েছেন। হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি তিনি এখানে-সেখানে টুকটাক পূজা-আর্চাও করে থাকেন।

হুঁ, নিয়ার অ্যাবাউট এক বছর হবে। সুমন শ্যামবাবুকে নমস্কার করে জানতে চাইল, আপনারা কেমন আছেন শ্যামবাবু?

শ্যামবাবু চোখ বুজে নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, মা মহামায়ার আশীর্বাদে তা একরকম আছি। আপনার সব খবর ভালো তো ভাই?

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

সুমনের বয়েস বেশি নয়, চল্লিশের আশেপাশে। মাঝারি হাইট, গায়ের রং ফর্সার দিকে, মুখচোখ ভালো। কাঁধ বাঁকিয়ে বলল, ফাইন!

পানিপাতিনির কাজ একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সুমনের। পরের দিন আর বেরোল না, হোটেলে বসে ডিস্ট্রিবিউটরের ঘর থেকে কালেক্ট করে আনা তথ্যগুলো এক করে রিপোর্ট তৈরি করে ফেলল। তারপর সন্ধ্যার পরে জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘুরতে।

পানিপাতিনি জায়গাটা বেশ মনোরম। লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, দোকানপাট থাকলেও গ্যাঞ্জাম নেই। এখানকার চমচমের খুব সুনাম আছে। একটা দোকানে বড়ো দেখে খান পাঁচেক চমচম গপাগপ গিলে মন খুশ হয়ে গেল সুমনের।

হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে চলে এল ন-দিঘার মোড়ে। এখান থেকে মিনিট পাঁচ ডাকাতে কালীবাড়ি, তারপর মিনিট দুই হাঁটলেই ছায়াচিত্র সিনেমা হল। পানিপাতিনিতে এলে ছায়াচিত্র হলে নাইট শো-এ একটা করে ছবি বাঁধা সুমনের বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি যখন যেমন হয়।

জীবনে ছবি অনেক দেখেছে সুমন, তার উপর এখন টিভির দৌলতে ঘরে বসেই রিমোট টিপে যত খুশি ছবি দেখা যায়, তাই ছবি দেখাটা তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল, টাইম পাস। বাড়তি হল, সিনেমাহলের মালিক রবিবাবুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে আসা। টিভি আর সিনেমা নিজেরা ভাই ভাই না হলেও ভায়রাভাই তো বটেই। অতএব রবিবাবু বলতে গেলে তার লাইনেরই লোক।

কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে ছায়াচিত্র হলের সামনে পৌঁছে সুমন হতাশ হল। টিভির দাপটে সিনেমা ব্যাবসার হাল দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে সে জানে, তার জন্য রবিবাবু তাকে খোঁচা মেরে কথাও শোনান, কিন্তু তাই বলে এই অবস্থা?

সার্চলাইট, ডে-লাইট দূরের কথা, টিমটিম করে একটা লো-ভোল্টেজের বাতি জ্বলছে। তাতে হলের গায়ে লাগানো ছবির পোস্টারটাও ঠিক মতো পড়া যাচ্ছে না। লোকজনও আশেপাশে বিশেষ চোখে পড়ছিল না।

কাউন্টারে মুখ পর্যন্ত চাদরে ঢেকে একজন বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। লোকটাকে চিনতে পারল না সুমন। গেটে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সেও অপরিচিত। তার চেয়ে বড়ো কথা, গেটকিপারের পাশে রবিবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন, কীরকম কী টিকিট বিক্রি হল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করেন, আজ নেই।

রবিবাবু কই? রবিবাবু? সুমন জিজ্ঞেস করল।

গেটকিপার মুখ তুলে তাকাল সুমনের দিকে। এরও আপাদমস্তক ঢাকা চাদরে। বেশ রোগা, তবে চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। পালটা প্রশ্ন করল, কোন রবিবাবু?

হাউসের মালিক রবিবাবু। রবিরঞ্জন দাস।

উনি তো আজ আসেননি।

আসেননি?

নাহ। উনি ব্যস্ত আছেন কাজে।

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুধু ছবি হবে আজ, আড্ডাটা আর হবে না। ভারি রসিক মানুষ এই রবিবাবু। মুখ-চোখের নানান ভঙ্গি করে এক-একটা এমন মজার কথা বলেন হাসি চাপা দায়! ব্যাবসার এই দুরবস্থার মধ্যে কী করে এত হাসি খুঁজে পান কে জানে!

মনটা দমে গেল সুমনের। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গেল ছবির ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে।

বাংলা বই চলছে। স্টিল ফোটোগ্রাফ দেখে স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছিল ভূতের বই। কিন্তু অসম্ভব বোকা বোকা নাম, 'দেখা হবে মাঝরাতে'। বাংলা সিনেমার সাথে এই হাল! যাক গে, তার তো সময় কাটানো নিয়ে কথা।

সুমন এগিয়ে গেল টিকিটঘরের দিকে। ব্যালকনির একটা টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল হলে। গেটকিপার টিকিট ছিঁড়ে অর্ধেকটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, লাইটম্যান নেই, আপনি আপনার মতো জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ুন।

যাচ্ছিলে লাইটম্যান নেই। নাহ, এইভাবে বেশিদিন রবিবাবু টানতে পারবেন বলে মনে হয় না। যেকোনো দিন হাউসে তালা পড়বে!

দোতলার সিঁড়ির মুখে একটা জিরো পাওয়ার জ্বললেও ব্যালকনি পুরোপুরি অন্ধকার। অনেক কাল ধরেই এখানে সুমনের যাতায়াত, তাই লাইটের সুইচ খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না তার। আলো জ্বালিয়ে পিছনের দিকে ভালো জায়গা দেখে বসে পড়ল সে। সারি সারি সিট ফাঁকা পড়ে আছে, একটা লোক নেই, দেখতে দেখতে গা-টা হঠাৎ কীরকম হুমহুম করে উঠল তার।

মিনিট পনেরো কেটে গেল, ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেল, ব্যালকনির গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে এল কয়েক জন লোক, তারা নিজেদের মতো জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাদের মধ্যে একজন লুঙ্গিপরা লোকও দেখা যাচ্ছিল। সিটে বসে পা তুলে বেমালুম বিড়ি খেতে শুরু করল। ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটুকু কম্প্রোমাইজ না করলেই নয়।

দেখে গা জ্বলে যাচ্ছিল। কী আর করবে— সুমন চুপ করে রইল।

বই শুরু হয়ে গেল। গেট থেকে উপরে এসে ব্যালকনির লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে গেট টেনে চলে গেল গেটকিপার। কয়েকটা বোকা বোকা অ্যাডের পর পর্দায় রক্তপানরত হায়নার মুখ ভেসে উঠল। ব্যাকগ্রাউন্ডে শ্মশান, দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। নানান সাইজের মড়ার মাথা সটাসট নাচতে নাচতে ফুটিয়ে তুলছে বইয়ের টাইটেল, ‘দেখা হবে মাঝরাতে’।

বাহ, হেভি টেকনিক তো! নামটা যা-ই হোক, গল্পটা জমে যেতে পারে। সুমন পিঠ টান টান করে বসল।

গল্প শুরু হয়ে গেল। এক বয়স্কা ভদ্রমহিলার উপর ভূত ভর করেছে। ভদ্রমহিলার বাঁশির মতো সরু নাক, জোড়া ভুরু। বয়েস চলে গেলেও এখনও অসামান্য সুন্দরী। চোখ কপালে তুলে অপ্রকৃতিস্থের মতো তিনি সারা ঘর ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চিৎকার করে বলছেন, আমায় রক্ত দাও! আমি রক্ত খাব! বড্ড খিদে আমার! কতদিন না খেয়ে থাকব?

কে বলে বাংলা সিনেমার মান পড়ে গেছে! ভদ্রমহিলা দুর্দান্ত অ্যাক্টিং করছেন, এমন জীবন্ত যে রীতিমতো ভয় ভয় করে উঠল সুমনের। আচমকা সারা শরীর প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি দিয়ে উঠল ভদ্রমহিলার। আন্তে আন্তে চোখ দুটো নর্মাল হয়ে এল তাঁর, তারপর এদিকে-ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক যেন সুমনের চোখে এসে স্থির হয়ে গেল। ওরে বাবা রে, কী ভীষণ সে চোখের দৃষ্টি! সুমন সহ্য করতে পারল না, সরিয়ে নিল চোখ।

ভদ্রমহিলা খলখল করে হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতে বললেন, কী রে আমায় রক্ত দিবি নে? আমার সব রক্ত চেটেপুটে খেয়েছিস, আমায় রক্ত দিবি নে?

সিনেমার ছবি কখনো কথা বলে দর্শকের সঙ্গে! মাথাটা কীরকম ভাঁ ভাঁ করে উঠল সুমনের। আর তার পরে সে চোখের সামনে যা দেখল মাথাটাই খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগার হল তার।

সুমন দেখল, ভদ্রমহিলা সিনেমা হলের পর্দা থেকে সটান বেরিয়ে পা পা করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছেন। হাত নাড়িয়ে স্পষ্ট তাকে লক্ষ্য করেই যেন বলছেন, দাঁড়া, আমি আসছি! তোর শরীরে অনেক রক্ত! গরম গরম, টাটকা টাটকা রক্ত! আআফ! উসসস!

ভদ্রমহিলা জিব চাটতে শুরু করলেন। শুধু কথাই বলে না, পর্দা থেকে ছবির মানুষ নেমেও আসে? নাহ, এতটা বাড়াবাড়ি কিছুতেই সম্ভব নয়। নিখাত কিছু গোলমাল আছে এর মধ্যে। সিট থেকে তড়াক করে উঠে পড়ল সুমন; সঙ্গে সঙ্গে ব্যালকনির দর্শকরা সবলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে

হেসে উঠল।। সুমন চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, দর্শক কই, পাঁচটা সিটে স্রেফ পাঁচটা কঙ্কাল বসে আছে।

নাহ, যথেষ্ট হয়েছে! মাথায় থাকুক আমার সিনেমা, মাথায় থাকুক টাইম পাস, আত্নাদ করে সুমন ছড়মুড়িয়ে ব্যালকনির গেট ঠেলে ছুটল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ছুটছে ছুটছে। তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

দুই

কতক্ষণ ঠিক বলতে পারবে না, আস্তে আস্তে জ্ঞানটা ফিরে এল সুমনের। চোখ মেলে দেখল, সে শুয়ে আছে। তখনও বুকটা তার উঠছে-পড়ছে। আতঙ্কে গায়ের লোমগুলো খাড়া খাড়া হয়ে আছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে।

উঠবেন না সুমনভাই। উঠবেন না। ভারী গলায় কে যেন বলে উঠলেন, আর একটু শুয়ে থাকুন।

এই গলা সে চেনে। সুমন বাঁ-দিকে ঘাড়টা কাত করতেই দেখল, মা জগদম্বা লজের শ্যামবাবু। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা হালকা হয়ে এল তার। বলল, না না, ঠিক আছে। আমি কোথায় শ্যামবাবু?

শ্যামবাবু বললেন, মন্দিরে। সুমনের মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল। তাকিয়ে দেখল, ঠিক তাই। ডাকাতে কালীবাড়ি মন্দিরের নাটমন্দির এটা। দূরে টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তার সামনে চাদরে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একজন লোক।

এই লোকটা শ্যামবাবুর চেলা। একটু আগে এই পথ দিয়ে সুমন যখন আতঙ্কে পাগলের মতো ছুটছিল তখন সে-ই ছুটে গিয়ে তাকে ধরেছিল, তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে শ্যামবাবুও তার সঙ্গে হাত লাগান। শ্যামবাবু মন্দিরে তখন নিশীথ পূজায় বসেছিলেন। সুমন তারপরেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

শ্যামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, সুমনভাই? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন এই রাতবিরেতে? কে তাড়া করেছিল আপনাকে?

সুমন থরথর করে কেঁপে উঠল। শ্যামবাবু তাকে ভরসা দিয়ে বললেন, আপনি এখন মায়ের মন্দিরে, সম্পূর্ণ নির্ভয়ে সমস্ত খুলে বলুন।

আরও কিছুক্ষণ লাগল সুমনের নিজেকে সামলাতে। তারপর ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলতে গিলতে সমস্ত খুলে বললেন। শুনে শ্যামবাবু যেন আকাশ

থেকে পড়লেন, বললেন, করেছেন কী! ছায়াচিত্র হল তো মাস ছয়েকের ওপর বন্ধ, আপনি গিয়েছিলেন সেখানে বায়োস্কোপ দেখতে? যাওয়ার আগে আমাকে বলবেন তো!

ছায়াচিত্র বন্ধ! কী বলছেন আপনি? সুমন চৈঁচিয়ে উঠল।

সে খুব দুঃখজনক ঘটনা। শ্যামবাবু মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, জানেন তো সিনেমার ব্যাবসার হাল। ছায়াচিত্র হলের মালিক রবিবাবু হাউস চালাতে গিয়ে ধারদেনায় পুরো ডুবে গিয়ে ছিলেন। মহাজনদের জ্বালায় পানিপাতিনি থেকেই পালান তিনি। শোকে-দুঃখে বিছানা নেন তাঁর স্ত্রী। পরে সুইসাইড করে মারা যান। এ তল্লাটে তাঁর মতো সুন্দরী আর একটিও ছিল না। মরার পরও দেখতে গিয়ে চোখ ফেরাতে পারছিলুম না, বুঝলেন?

দাঁড়ান দাঁড়ান। সুমন হঠাৎ কীরকম উত্তেজিত হয়ে উঠল, ভদ্রমহিলার কি জোড়া ভুরু ছিল?

ঠিক ঠিক! শ্যামবাবু অবাক হলেন, আপনি কী করে জানলেন, সুমনভাই?

সুমন সিনেমার কথা বলল। শুনে শ্যামবাবুর চোখ গোল হয়ে গেল, কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন করে বললেন, জোর বাঁচান বেঁচেছেন আপনি। মা মহামায়াই আপনাকে রক্ষা করেছেন।

সুমন উঠে পড়ল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত দশটা বেজে গেছে। হোটেলের সারাদিনের হিসেব বুঝে নিয়ে এই সময় রোজই মন্দিরে চলে আসেন শ্যামবাবু। নিশীথ পূজো সেরে এখান থেকেই নিজের বাড়ি চলে যান। কিন্তু আজ আর বাড়ি না ফিরে সুমনকে হোটেলে পৌঁছে দিতে চললেন। সুমনও না করল না, এখনও ভয়ে চমকে চমকে উঠছে বুকটা তার।

ন-দিঘা মোড়ের দিকে স্টার্ট করার আগে শ্যামবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে বললেন, ওই আপনার ছায়াচিত্র হল। দেখতে পাচ্ছেন কিছু?

সুমন ভয়ে ভয়ে তাকাল। এখান থেকে ছোটো একটা মাঠ পেরিয়ে তারপর ছায়াচিত্র সিনেমা হল। কিন্তু কোথায় হল? চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। শ্যামবাবু ঠিকই বলেছেন। মা মহামায়ার কৃপা ছাড়া আজ বেঁচে ফিরতে হত না তাকে।

হোটেলে ফিরে মুখে কিছু রুচল না সুমনের। বড়ো একঘটি জল খেয়ে শ্যামবাবুকে গুডনাইট জানিয়ে তাড়াতাড়ি লেপ টেনে শুয়ে পড়ল। রাতটা কাটিয়ে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে পাল্লাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু সব হিসেব কি আর মানুষের ঠিকঠাক থাকে, না ঠিকঠাক হয়? মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল সুমনের। চোখ মেলে চেয়ে হাড় হিম হয়ে গেল তার। মশারি ঠেলে কালো একটা গোল অন্ধকার ঝুঁকে পড়েছে তার মুখের উপর। মাথায় উঠল ঘুম, লেপ ছুড়ে মশারি ছিঁড়ে নেমে পড়ল সে নীচে। চিৎকার করে বলল, কে কে?

চোঁচাবেন না, সুমনবাবু। অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলেন, লাইটটা জ্বালান আগে।

সুমন ছুটে গিয়ে লাইটটা জ্বালিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল। ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন রবিবাবু। ছায়াচিত্র হাউসের জলজ্যান্ত মালিক রবিবাবু! সেই মাঝারি হাইট, ফর্সা রং, চোখে হাই পাওয়ার রিমলেস চশমা, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

এ কী আপনি! আপনি এখানে কী করে এলেন? সুমন বলল, আপনি আমার ঘরে ঢুকলেন কী করে, অ্যাঁ?

বলছি। রবিবাবু বললেন, কিন্তু তার আগে বলুন, পালিয়ে এলেই কি বাঁচা যায়, সুমনবাবু? আমার স্ত্রীর হাত থেকে বেঁচেছেন, কিন্তু এবার যে আমার টার্ন! তার জন্যই তো কীরকম দেখা হয়ে গেল আমাদের মাঝরাতে! হা হা হা!

রক্ত জল হয়ে গেল সুমনের। কাঁপতে শুরু করল গলা, আ-আ-আপনি—
হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, শ্যামবাবু আপনাকে রং ইনফরমেশন দিয়েছেন, সুমনবাবু। হাসতে হাসতে নিজের স্টাইলেই কথা বলে চললেন রবিবাবু, আমি বাড়ি থেকে পালাই-টালাইনি, বুঝলেন? আমিও আমার মিসেসের মতো সুইসাইডই করেছিলাম। নদীতে ডেডবডি ভেসে গিয়েছিল বলে কেউ ট্রেস করতে পারেনি আমাকে। হা হা হা!

সুমন কাঁঠ হয়ে গেল। একবার বেঁচে ফিরেছে, কিন্তু এবার বড়ো কঠিন চক্রে পড়েছে। মাথার চুলগুলো একটা একটা করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল তার, আ-আ-আ—

কী আ আ করছেন তখন থেকে! গলা সাধছেন নাকি? হা হা হা।

সুমন চেয়ে রইল। হঠাৎ রবিবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন, গলা বদলে বললেন, শুনুন মশাই, আপনাকে একটু হেল্প করতে হবে।

আ-আ-মাকে?

রাইট। আপনার সঙ্গে একটা পুরোনো হিসেব চোকানোর আছে। এর জন্য আপনি পানিপাতিনিতে আসবেন বলে কবে থেকে হ্যাঁ করে বসে আছি, জানেন?

হিসেব?

এই তো এতক্ষণে গোটা শব্দ ফুটেছে! রবিবাবু বলে চললেন, যত নষ্টের গোড়া আপনারাই, আপনাদের টিভি কোম্পানিই আমাদের পথে বসিয়েছে, আমাদের এতদিনের সাধের ব্যবসা ডকে তুলে দিয়েছে, শেষ করে দিয়েছে আমাদের। কিন্তু আমরা একা শুধু শেষ হব কেন চাঁদু, আপনাকেও আমাদের পার্টনার হতে হবে, বুঝলেন? ব্যস, হিসেব সমান সমান!

রবিবাবু অটুহাসিতে ফেটে পড়লেন। সুমন চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হল, আর ভয় পাচ্ছে না সে। আসলে খুব বেশি ভয় পেলে মানুষের ভয়বোধটাই কীরকম অসাড় হয়ে যায়। সুমনেরও তাই হয়েছে।

কী সুমনবাবু, আমার প্রস্তাবটা পছন্দ হল না বুঝি? রবিবাবু বললেন, হাঁ করে কী দেখছেন বলুন তো আমার মুখের দিকে? আপনি আমার পার্টনার হলে দুজনে মিলে আমার হাউসে বসে প্রাণভরে আড্ডা মারব, হ্যাঁ?

সুমন চেয়ে রইল।

আরে কী ভাবছেন, মশাই? কীসের ধ্যান করছেন?

আসলে মাথা থেকে সব ভয়, সব টেনশন বেরিয়ে গেলে তখন আসল কথাটাই মনে পড়ে যায় মানুষের। সুমনেরও মনে পড়ল। মা মহামায়া! একবার না বলতেই বাঁচিয়েছ, আর একবার নয় বাঁচালে! মায়ের কাছে ছেলে কি এইটুকু আবদার করতে পারে না?

সুমনের চোখ জলে ভরে উঠল। সে মনপ্রাণ দিয়ে মাকে ডাকতে লাগল।

[শুকতারা, অগ্রহায়ণ ১৪১৫ (নভেম্বর ২০০৮)]

এক মুঠো ছাই

হর্ষ দত্ত

এত জোরে বৃষ্টি আর ঝড় কখনো দেখেছে কিনা শাস্ত্রত মনে করতে পারল না। কতক্ষণই-বা ঝড়-জল হল? বড়ো জোর আধঘণ্টা। কিন্তু তাতেই চতুর্দিক তছনছ। তপসিয়া জায়গাটা ভীষণ ঘিঞ্জি। ফলে ছোটো বিপর্যয় ঘটলে যেমন দেখতে লাগে, চারপাশে তাকিয়ে তেমনই মনে হচ্ছে। ঘণ্টাখানেক আগে শাস্ত্রত তপসিয়ায় এসেছে এক বিচিত্র উদ্দেশ্যে। গত মাসে মাকে ও একটা মাইক্রোওভেন কিনে দিয়েছে। অফ হোয়াইট রঙের মাঝারি মাপের ওভেনটা শুধু কাজেরই নয়, রান্নাঘরের শোভা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ গত পরশু বাড়িতে একটা চিঠি এল ওভেন কোম্পানির নয়ডা অফিস থেকে। চিঠির বক্তব্য, ‘আমাদের ব্র্যান্ডের ওভেন কেনার জন্য ধন্যবাদ। আপনার ক্যাশ মেমো নম্বরটি লটারিতে একটি গিফ্ট পেয়েছে। আপনি তপসিয়া রোডে অবস্থিত আমাদের পাবলিক রিলেশন অফিস থেকে উপহারটি দশদিনের মধ্যে সংগ্রহ করলে বাধিত হব।’

কিছু কিনলেই তৎক্ষণাৎ একটা বা দুটো ফ্রি, কোনো জিনিস উপহার পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে শাস্ত্রতর কোনো আগ্রহ নেই। ওর মতে, এসব ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করার ফন্দি। কিন্তু চিঠিটার কথা বলে-বলে দিদির মেয়ে বিনি ওকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ল। ফোন করে, বাড়িতে এসে, ওর একটাই কথা, ‘যাও না রূপমামা, ওঁরা কী দেবেন নিয়ে এসো না! নিশ্চয়ই ভালো কিছু পাবে। এত বড়ো কোম্পানি! কেউ আদর করে ডেকে কিছু দিলে নিতে হয়।’

বিনির কথা শুনে হাসি পেয়েছিল। তেরো বছরের মেয়ে, অথচ পাকা বুড়ির মতো কথা। হাসি চেপে নিমরাজি হয়েছে শাস্ত্রত, ‘ঠিক আছে, যাব। তবে সস্তা বাজে জিনিস যদি গছিয়ে দেয়, তা হলে তোদের বাড়িতে ফেলে দিয়ে আসব।’ বিনি তাতেই রাজি হয়েছে।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

পড়ন্ত বিকেলে শাশ্বত যখন তপসিয়ায় আসে, তখন আকাশে সামান্য মেঘ ছিল। কিন্তু সেই মেঘের আড়ালে প্রকৃতি যে এমন রুদ্ররূপ নিয়ে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে, ভাবতেই পারেনি! তার উপর ওভেন কোম্পানির পি আর অফিসে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। শাশ্বতকে ওঁরা খুব আনন্দের সঙ্গে জানিয়েছেন, আপনি আর আপনার কোনো সঙ্গী যদি আগামী পুজোয় গোয়া বেড়াতে যান, তা হলে আমাদের লিসবন টাচ রিসর্টে দু-রাত্রি ফ্রি থাকতে পারবেন, আর বুফে লাঞ্চ ও ডিনারে ফিফ্টি পারসেন্ট অফ। শাশ্বতের ইচ্ছে হচ্ছিল, পি আর পার্সোনেলদের মুখের উপর বলে, গোয়া যাতায়াতের ভাড়াটা কে দেবে? আপনাদের অফার তো সেই গাছে কাঁঠাল, গৌফে তেল মশাই!

‘এমন অফার নেব কী নেব না পরে জানাব’— এই বলে শাশ্বত ট্যাক্সি ধরার জন্য পার্ক সার্কাস-বাইপাস কানেক্টরের দিকে এগিয়ে আসছিল। তখনই ঝড়টা এল, তার একটু পরেই অব্যোরে বৃষ্টি। পড়িমরি করে ও একটা চায়ের দোকানের ছোট্ট শেডের তলায় এসে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু বেশ ভিজে গিয়েছে। তার উপর তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে কারেন্ট নেই, চারদিক অন্ধকার।

অকস্মাৎ যেমন এসেছিল, তেমনই ঝপ করে জল পড়া থেমে গেল। হাত, মুখ আর চশমার কাচ মুছে সামান্য এই শেডের তলা থেকে বেরোতে যাবে শাশ্বত, ওর চোখে পড়ল রাস্তার ওপারে একটু কোনাকুনি, একটা মস্ত দরজার উপর বিশাল সাইনবোর্ড। সম্ভবত গ্লোসাইন। এপাশ-ওপাশ থেকে ছিটকে আসা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় শাশ্বত দেখল, নীল প্লাস্টিকের উপর বেশ বড়োসড়ো সাদা অক্ষরে বাংলায় লেখা— ‘তপসিয়া হিন্দু কবরস্থান’। নীচে হিন্দিতে, তারও নীচে লেখা ইংরেজিতে। অবাক হয়ে গেল শাশ্বত। হিন্দুদের আবার কবর দেওয়া হয় নাকি! আশ্চর্য তো! এমন একটা সংস্কার প্রথার কথা ও জানতই না! সাইনবোর্ডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে শাশ্বত চা-ওয়ালাকে আলতো স্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘হিন্দুরা মারা গেলে কি এখানে কবর দেওয়া হয়? আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন?’

দোকানি শাশ্বতের দিকে এক বলক তাকালেন। তারপর একজন খদ্দেরের হাতে একটা চা-ভরতি ভাঁড় ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ছোটো-ছোটো হিন্দু শিশু মারা গেলে এখানে গোর দেয়। কভি-কভি কোই হিন্দু জাত, জাদা ওমরের আদমিও লিয়ে আসে।’

এমন একটা কবরস্থানের কথা শাশ্বতের জানাই ছিল না। তবে এটুকু

জানত, দুধের শিশু মারা গেলে তাদের দাহ করা হয় না। ওর বিশ্বয়াগ্ন মুখের দিকে এবার তাকিয়ে বিহারি চা-ওয়ালা বললেন, ‘কবরখানার ভিতরে যান, গেট খুলা। দেখবেন, কর্পোরেশনের লোক আছে। সব বলে দেবো।’

আর-একটু ডিটেলে জানার জন্য শাশ্বত বেরিয়াল থ্রাউন্ডের বিরাট দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হাট করে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। বিস্তীর্ণ জায়গা, শেষ দেখা যাচ্ছে না। মাঠের মতো জমির বুক চিরে এখার-ওখার সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা চলে গিয়েছে। দূরে-দূরে হয়তো গাছপালা, ঝোপঝাড় আছে। ওর মনে হল, ভিতরের আনাচেকানাচে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ধরনের আলোর টুকরো। হাঁটি-হাঁটি পা-পা শিশুদের মতো।

ভিতরে খানিকটা ঢুকে এসে কাউকে দেখতে পেল না শাশ্বত। বাঁ-হাতি একটা দোতলা ভাঙাচোরা বাড়ি। বাড়িটার একপাশে বৃষ্টির জল জমে আছে। হারিকেন জাতীয় কোনো আলো জ্বলছে একতলার। উঁকিঝুঁকি দিয়ে খানিকটা হতাশ হয়ে ঘাড় ঘোরাতেই চমকে গেল শাশ্বত। মাথার অর্ধেক ঘোমটা দেওয়া এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন ওর পিছনে। মুখটা খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। মহিলার শাড়ির রং ধূসর। গজের মতো কাপড়ে জড়ানো একটি শিশুকে পেটের কাছটায় দু-হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন।

শাশ্বত কিছু বলার আগেই হিমসুদ্ধ গলায় মহিলা অনুনয় করলেন, ‘কিছু সাহায্য করবেন? আমার মেয়ে খুব অসুস্থ।’

‘কী হয়েছে আপনার মেয়ের?’ শাশ্বত অবাকস্বরে জিজ্ঞেস করল।

ঠিক তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ চমকানোর মতো এক ঝলক নীল আলো ছুঁয়ে গেল মহিলার মুখ। শাশ্বত স্পষ্ট দেখল, বিষাদগ্রস্ত, রক্তশূন্য এক তরুণী অপলকে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই দৃষ্টিতে কোনো প্রাণ নেই, প্রাণের স্পর্শও নেই। শিশুটি ততোধিক নিষ্পন্দ। উত্তরের অপেক্ষা না-করে পার্স থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরল শাশ্বত। যেন তৃতীয় একটা হাত বের করে টাকাটা নিলেন ভদ্রমহিলা। তারপর কবরখানার দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। শাশ্বতর সারাটা শরীর কেমন যেন শিরশির করে উঠল।

২

খবরের কাগজের দু-নম্বর পাতায় যত রকমের সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা শাশ্বতর মায়ের একটা নেশা। সভা-সমাবেশ, দিনপঞ্জিকা, আবহাওয়া, আপনার আজকের দিনটি তো আছেই, সেইসঙ্গে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

স্মৃতির উদ্দেশে, শোকসংবাদ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কর্মখালি থেকে শুরু করে জ্যোতিষীদের নানা চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। মা শুধু পড়েন না, মর্মস্পর্শী বা অদ্ভুত কোনো কিছু যদি নাড়া দিয়ে যায়, তা হলে একে-তাকে বলেন। শাস্ততও বাদ যায় না। কোনো সন্দেহ নেই, বিজ্ঞাপনগুলো নানা তথ্য আর চমকের খনি। দেখতে শুরু করলে নেশা ধরে যায়।

দ্রুত চোখে বারো পাতার কাগজ উলটে-পালটে দেখে শাস্তত স্নান করতে গিয়েছিল। জামা-প্যান্ট পরে খাওয়ার টেবিলে এসে বসতেই মা বললেন, ‘দুর, সকাল বেলাতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী সাংঘাতিক একটা শোকসংবাদ বেরিয়েছে, পড়েছিস?’

কাগজটা খাওয়ার টেবিলে পড়ে আছে। শাস্তত হাতে তুলে নিল। শোকসংবাদ মানে সেই দু-নম্বর পৃষ্ঠা। একেবারে প্রথম কলমে উপর থেকে নীচের দিকে সারসার ফোটো, আর ফোটোর তলায় কয়েক ফোঁটা চোখের জলের মতো খবর। তিন আর চার নম্বর ফোটোটোর দিকে চোখ পড়তেই শাস্ততর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার জোগাড়! এ কী দেখছে চোখের সামনে! ইনি তো সেই ভদ্রমহিলা, যিনি সেদিন বেরিয়াল গ্রাউন্ডের সামনে ওর কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন! ফোটোর মুখটায় শুধু বিষমতাটুকু নেই। তা ছাড়া সব এক। সেই চোখ, নাক, কপাল, এমনকী মাথায় অর্ধেক ঘোমটা। ওঁর নীচের ফোটোটি একটি শিশুকন্যার। কী মিষ্টি দেখতে! চোখ ভরতি কাজল, ছোট্ট কপালে চাঁদের মতো গোল কালো টিপ! এই শিশুটিই কি সেদিন মহিলার কোলে ছিল? ওর মুখ সেদিন স্পষ্ট দেখতে পায়নি শাস্তত। তবু এতটুকু ভুল হচ্ছে না। মহিলার মুখটা যে-কোনো কারণেই হোক, ওর স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। আর ঘটনাটাও তো এই পরশু দিনের। কিন্তু এঁরা মারা গিয়েছেন কবে? ভদ্রমহিলার ফোটোর নীচে চার লাইনের একটি লেখা: ‘মা অদिति, পৃথাকে নিয়ে তুই পনেরো দিন আগে পরপারে চলে গিয়েছিস। আজ তোদের স্মরণ অনুষ্ঠান। যাদের চক্রান্তে তোরা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলি, তাদের কখনো ক্ষমা করিস না। ইতি বাবা, মা ও ভাইদা।’

মুহূর্তে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল শাস্ততর। যাঁরা পনেরো দিন আগে মারা গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে গত পরশু কী করে দেখা হল? এ হতে পারে না। ওর যুক্তিবাদী মন বিদ্রোহ করে উঠল। কিন্তু ফোটো দুটোর দিকে আবার তাকাতেই হিম হয়ে এল সারা শরীর। ভদ্রমহিলা যেন স্তব্ধ মুখে ওর দিকে তীব্র ব্যঞ্জে তাকিয়ে আছেন!

রান্নাঘরে মা ওর ভাতের থালা সাজাচ্ছেন। বেশ ভয়াবহ স্বরে শাস্তত ডাকল, ‘মা!’

ছেলের অস্বাভাবিক ডাকে খানিকটা অবাক হয়ে মা ওর সামনে এসে বললেন, ‘কী রে, মুখ শুকনো লাগছে কেন? শরীর খারাপ লাগছে?’

শাশ্বত ফোটো দুটোর দিকে আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি এই বিজ্ঞাপনটার কথা বলছিলে?’ নিজের গলার স্বর শাশ্বতর কানে কেমন যেন নিশ্বেজ শোনাল।

‘হ্যাঁ রে, এইটে। মা-মেয়ে দুজনে একই দিনে মারা গিয়েছে। আশ্চর্য! কীভাবে যে মারা গেল! এখানে তো কিছুই লেখেনি। আহা, মেয়েটা কী ফুটফুটে! একেবারে ফুলের মতো!’

‘জানো,’ শাশ্বত প্রায় ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, ‘পরশু হিন্দু বেরিয়াল গ্রাউন্ডের সামনে এই ভদ্রমহিলাকেই টাকা দিয়েছিলাম। তোমায় ঘটনাটা বলেছি...! হ্যাঁ, ঐকেই...!’

‘কী যা-তা বকছিস!’ মা দু-চোখ কপালে তুলে বললেন, ‘এরা তো পনেরো দিন আগে মারা গিয়েছে। পরশু এদের কী করে দেখবি?’

শাশ্বত ভয়ংকর জোর দিয়ে বলল, ‘না, আমার কোনো ভুল হচ্ছে না। মেমরিও ফেল করেনি।’

মা ঠোঁট উলটে বললেন, ‘কী জানি বাবা, যত সব অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড! মরা মানুষ তোর সামনে এসে সাহায্য চাইবে কোন দুঃখে? সে তো তখন সব দুঃখ-কষ্টের পার! নে, দুটি খেয়ে নে। আপিসে দেরি হয়ে যাবে। তখন আমার উপরে চেষ্টাবি।’

সামান্য ভাত-মাছের ঝোলটুকুও শাশ্বত তৃপ্তি করে খেতে পারল না। দু-তিন গ্রাস খাওয়ার পরই মনে হল, বমি উঠে আসছে। বাড়ি থেকে বেরনোর মুহূর্তে শাশ্বত মাকে বলল, ‘কাগজটা তোমার পড়া হয়ে গেলে গুছিয়ে রেখে দেবে তো। আমি ফিরে এসে আবার দেখব। কাউকে দেবে না।’

‘কাউকে দেবে না’ মানে শাশ্বত পাশের বাড়ির বিভূতিবাবুকে ইঙ্গিত করল। সন্তরোধ এই ভদ্রলোক একটু বেলার দিকে এসে কাগজটা পড়বেন বলে নিয়ে যান। কিন্তু প্রায়ই ওঁর ফেরত দেওয়ার কথা মনে থাকে না। খুব সংকোচের সঙ্গে মাকে চেয়ে নিতে হয়।

অফিসে ওর পাশে বসে কুস্তল। বেশ হুল্লোড়বাজ ছেলে। পাড়ার গলিতে ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে শবযাত্রা— সব আইটেমেই কুস্তলকে দেখতে পাওয়া যায়। ওকে ঘটনাটা বলে একটু হালকা হওয়ার চেষ্টা করবে ভেবেছিল শাশ্বত। কিন্তু টিফিন টাইমের আগে পর্যন্ত বলতেই পারল না। টিফিনের পর কুস্তলই হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে রে? আজ এত গভীর আর চুপচাপ হয়ে আছিস? এনি প্রবলেম?’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

প্রথমে মাথা ঝাঁকিয়ে শাস্বত বলল, ‘না কিছু হয়নি। ঠিক আছি।’ তারপর একটু ভেবে কুন্তলকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুই কি ভূত, আত্মা, স্পিরিট, গোস্ট— এসবে বিশ্বাস করিস?’

বেশ অবাক হয়ে গেল কুন্তল। বলল, ‘কেন বল তো?’

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শাস্বত হিন্দু কবরখানা থেকে আজকের খবরের কাগজ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা জানাল। হুল্লোড়বাজ হলেও কুন্তল ওর কোনো কথাই উড়িয়ে না দিয়ে বলল, ‘হয়তো ভদ্রমহিলার ফোটোটা আইডেন্টিক্যাল। এমন তো হতেই পারে।’

‘কিন্তু শিশুটি!’ শাস্বত চাপা আত্ননাদ করে উঠল যেন।

‘খটকাটা তো ওখানেই। যদিও তুই শিশুটির মুখ দেখতে পাসনি।’

‘সব শিশুর মুখই প্রায় একরকম। সুন্দর, নিষ্পাপ...।’

কুন্তল চিবুকে হাত ঘষল, ‘তা ঠিক। এটাকে একটা অকাল্ট এক্সপিরিয়েন্স বলে ভাবতে পারিস। এ ছাড়া আর কী হতে পারে? তবে ওই ভূত, আত্মা, অশরীরী— এসব পুরো ধাঙ্গা, বাজে কথা, আজগুবি ব্যাপার। ডোন্ট ওরি...!’

কথা বলতে-বলতে কুন্তল কম্পিউটারে চোখ রাখল। শাস্বত নিজেও কুন্তলের মতো ভাবতে চায়। মৃত্যুর পরে মানুষ শুধু নানা স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। পুড়িয়ে দেওয়া বা সমাধি দেওয়া দেহ পুনরায় দেখতে পাওয়াই অসম্ভব। কেন না, মানুষের সারা শরীর ওই প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে অজস্র যুক্তি সাজাতে থাকল শাস্বত। কিন্তু কিছুতেই ভদ্রমহিলার মুখটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না।

৩

অফিস থেকে বেরোতে আজ অস্বাভাবিক দেরি হয়ে গেল। একটা জরুরি ফাইল কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না শাস্বত। যে-কাবার্ডে ফাইলটা থাকার কথা, সেখানে গতকালই দেখেছিল। কারো ওটা নেওয়ার কথা নয়। খুঁজতে-খুঁজতে একসময় দিশেহারা লাগছিল। জরুরি ফাইল, হারিয়ে গেলে কোম্পানির ক্ষতি, সেইসঙ্গে ওর সম্মান ও চাকরি নিয়ে টানাটানি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফাইলটা পেয়েছে ওর টেবিলের নীচের ড্রয়ারে। অথচ ড্রয়ারগুলো খুঁজতে বাকি রাখেনি শাস্বত। ফাইলটা ড্রয়ারের মধ্যে দেখতে পেয়ে শাস্বতর মনে হয়েছিল, এইমাত্র ওর চোখে ধুলো দিয়ে যেন কেউ রেখে দিয়েছে! কুন্তল, আশিসদা, দাসবাবু এবং আরও কেউ-কেউ ওকে জিজ্ঞেস করছিল, ‘কী খুঁজছ? কী হারালে?’ কাউকেই স্পষ্ট করে বলতে পারেনি শাস্বত।

ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়েছিল। অথচ অস্পষ্টতা ওর স্বভাব নয়। আজ কেন যে এমন ব্যবহার করল? কে কী ভাবল কে জানে!

দেবির উপর দেবি যোগ হল মেট্রোয়। শোভাবাজার থেকে শ্যামবাজারের মধ্যবর্তী টানেলে হঠাৎ ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলেই যেখানে কারণ জানা যায় না, সেখানে সুড়ঙ্গের ভিতরে অথই পাথারে ভাসতে থাকার মতো অবস্থা। রাত হয়ে গেলেও নানা কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার ভিড় প্রতিটি কামরায়। যদিও প্রাণান্তকর পরিবেশ তৈরি হয়নি, তবে একটু পরেই গরম লাগতে শুরু করেছিল। সেইসঙ্গে অল্প-স্বল্প নিশ্বাসের কষ্ট। ভেস্টিবিউলের এন্ট্রির দিকে দাঁড়িয়ে ছিল শাস্বত। এখানে বেশ হাওয়া পাওয়া যায়, ধাক্কাধাক্কি কম। আচমকা ট্রেন বন্ধ হয়ে গিয়ে যদিও সব সুখই তখন হারিয়ে গিয়েছে। চোখ বুজে অসহায়ভাবে প্রহর গুনছিল শাস্বত। তখনই স্পষ্ট শুনতে পেল একটি শিশুর কান্না। এক বছর-দেড় বছরের বিনি ঠিক ওইভাবে কাঁদত। খিদে পেলে, শরীরে কোনো কষ্ট হলে কিংবা নিছক সাফোকেশনে।

শাস্বত ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করেছিল কোনখান থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ। নিশ্চয়ই গরমে শিশুটির খুব কষ্ট হচ্ছে। ফাঁক দিয়ে, পাশ দিয়ে, অন্য যাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে তাকিয়েও শাস্বত দেখতে পায়নি। ভেস্টিবিউলে অর্ধেক শরীর ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কাউকে খুঁজছেন?’

‘কই না তো!’ শাস্বত গভীর বিস্ময়ে বলেছিল, ‘একটা শিশু কোথায় কাঁদছে না! কোনখানে বলুন তো? সেটাই দেখতে চেষ্টা করছি!’

যুবকটি প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, ‘কেউ কাঁদছে না তো! আপনি বলছেন শিশুর কান্না! কিন্তু কোথায়? নাঃ...!’ কান পেতে শোনার চেষ্টা করেছিল তরুণটি। সামান্য পরে ওর দিকে সন্দেহ ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ওরই মধ্যে দু-বার ফোন করেছিল বিনি। কিন্তু কথা বলতে গেলেই লাইন কেটে গিয়েছে। বিনি বিরক্ত হয়ে এস এম এস পাঠিয়েছে। কিন্তু তাতেও সাম টেক্সট মিসিং। শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের পুরোটা আর তৃতীয় লাইনের অর্ধেক এসেছিল: ‘রূপমামা, ডু ইউ নো, হাউ মেনি বেরিয়াল গ্রাউন্ডস ইন ক্যালকাটা? ক্যান ইউ গিভ মি আ পিকচার... অফ...।’ আধখামচা এস এম এসটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাস্বত মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছে। সেই বেরিয়াল গ্রাউন্ড! কিন্তু বিনি হঠাৎ এসব জানতে

চাইছে কেন? কলকাতা সংক্রান্ত কোনো জেনারেল নলেজের প্রশ্ন? কিংবা
বিম্বি কি ওর দিদার কাছ থেকে কিছু শুনেছে? মা কি এরই মধ্যে ব্যাপারটা
পাঁচকান করে দিয়ে বসে আছেন?

এসব ভাবতে-ভাবতে শাশ্বত বাড়ি ফিরেছে প্রায় পৌনে দশটায়। দুর্ভোগ
আর দুর্ভোগ আজ সকাল থেকে ওর পিছু নিয়েছে। ওর দেরি হচ্ছে দেখে
চিন্তায় আকুল মা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। শাশ্বত বাড়ি ঢুকতেই গভীর
স্বস্তি পেয়েছেন। মা দেরির কারণ জিজ্ঞেস না করে বলেছেন, ‘জানিস,
বিভূতিবাবু খবরের কাগজটা নিতে এসেছিলেন। আমি দিইনি। ওটা তোর
আলমারিতে রেখে দিয়েছি।’

‘ভালো করেছ।’ ক্লান্ত স্বরে বলেছে শাশ্বত, ‘খুব খিদে পেয়েছে মা।
চা-টা আর খাব না। তুমি আমাকে রাতের খাবার দিয়ে দাও।’

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মা কিছু-একটা ভেবেছিলেন। তারপর নিঃশব্দে
ছেলের ইচ্ছে পূরণ করেছেন।

এই একটু আগে খেয়ে উঠেছে শাশ্বত। বিছানায় একটু গড়িয়ে নেওয়ার
জন্য ও শুয়ে পড়ল। ভাবল, একটু পরে খবরের কাগজটা দেখবে। কোথায়
যেন একটা ভুল হচ্ছে। ভুল থেকে যত সব ইলুশন, হ্যালুসিনেশন! মনটা
অকারণে চঞ্চল হয়ে আছে। কোনো মানে হয়! মঙ্গলগ্রহে প্রাণের চিহ্ন
খুঁজতে বিজ্ঞান যেখানে মরিয়া, সেখানে, সেই সময়ে বসে প্রাণহীনদের
নিয়ে শাশ্বত উলটোপালটা চিন্তা করছে।

সহসা ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। কখন
ঘুমিয়ে পড়েছিল শাশ্বত জানেই না। ঘরের আলো মনে হয় মা নিভিয়ে
দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কীসের শব্দ? একবার ছাদ থেকে কার্নিসে মাটিভর্তি
গাছের টব পড়ে যেতে এরকম শব্দ হয়েছিল। ওর ঘরের পশ্চিম দিকের
জানলা দিয়ে রাস্তার আলোর একটা ফালি ঢুকে আসে। আজ সেই আলোটা
নেই। তা হলে কি লোডশেডিং? তাই-বা কী করে হবে? ওই তো সিলিং
থেকে ঝুলতে থাকা পাখাটা বনবন করে ঘুরছে। রাস্তার আলোটা হয়তো
কোনো কারণে জ্বলছে না। বালিশের দু-পাশে হাত দিয়ে চশমাটা খুঁজল
শাশ্বত। শোওয়ার আগে আশপাশে কোথাও খুলে রেখেছিল। ঘুটঘুটে
অন্ধকারে খুঁজে পেল না।

তরাসে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করছে। বাথরুমে
গিয়ে চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে এলে হয়তো আরাম লাগবে। কনুইয়ের
উপর ভর দিয়ে শাশ্বত মাত্র অর্ধেক উঠেছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘরের
কাঠের আলমারির একটা পাল্লা ধড়াস খুলে গেল। কেউ যেন ভিতর থেকে
অরাজকতা এককুসিভ

ঠেলে খুলে দিল দরজাটা। শাশ্বত আর নড়তে পারল না। ন্যাপথলিনের হালকা গন্ধের সঙ্গে একটা ভয় যেন সারা ঘরে ছড়িয়ে গেল।

ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল শাশ্বত, ‘কে?’

কেউ সাড়া দিল না। পরক্ষণেই ওর মনে হল, কোনো মানুষ এসব করছে না। অন্য কেউ। কিন্তু কে সে? যা কিছু ঘটছে কোনোটাই স্বাভাবিক নয়। আলমারিটা বেশ পুরোনো, সেগুন কাঠের তৈরি। পাল্লাটা কি হাওয়ায় কাঁপছে? আরও একটা শব্দ পাচ্ছে শাশ্বত। খুব নির্জন জায়গায় ঝরাপাতা কিংবা টুকরো ছেঁড়া কাগজ হাওয়ার ধাক্কায় সরে-সরে গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমন!

দপ করে এক ঝলক আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। সেই ক্ষণিক আলোর ঝলকানিতে শাশ্বত স্পষ্ট দেখল মেঝেয় পড়ে আছে অগ্নিদগ্ধ একটি শিশু ও এক মহিলার দেহ। মহিলার আধপোড়া ডান হাতটা শিশুটিকে ছোঁয়ার জন্যে যেন নড়ছে! চিৎকার করে উঠল শাশ্বত। কিন্তু বুঝতে পারল, ওর মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। অচেতনের আবর্তে, তলিয়ে যেতে-যেতে শাশ্বত আবার প্রাণপণ আত্ননাদ করে উঠল।

৪

মা আর নন্দামাসির চোঁচামেচিতে শাশ্বতর ঘুম ভেঙে গেল। এ কী, ঘড়িতে ন-টা পাঁচ! এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল ও। কেউ ডাকেননি কেন? কখন তৈরি হবে, কখনই-বা অফিসে যাবে! সবকটা ইন্দ্রিয় সজাগ হতেই শাশ্বত বুঝতে পারল নন্দামাসি জোর দিয়ে বলছে, ‘আমার তিন কুড়ি বয়স হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু চোখের মাথা এখনও খাইনি গো বউদি! আমি স্পষ্ট দেখলুম, শাশ্বতর ঘর থেকে অরু বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল!’

‘তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নন্দা? কী উলটোপালটা বলছ? অরু কোথেকে আসবে? ও এল, অথচ আমি জানতে পারলাম না?’ মায়ের গলা আরও চড়ে গেল, ‘নেশা-ভাং করলে লোকজনের কথা এমন অদ্ভুত হয়ে যায়। তোমার চোখে কি ছানি পড়েছে? যত বাজে কথা!’

অরু ওর দিদির ডাকনাম। নন্দামাসি ওদের বাড়িতে বহুদিন ধরে কাজ করছে। যদিও ঠিকে কাজ, কিন্তু অনেকটা সময় এখানে থাকে। একটু নিটপিটে ধরনের, তবে কাজকর্ম ভীষণ পরিষ্কার। মায়ের সঙ্গে ওর খুব ভালো সম্পর্ক। কিন্তু আজ নন্দামাসির কথায় মা রেগে আগুন। বিষয়টাও বড়ো অদ্ভুত। নন্দামাসি দিদিকে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

যেতে দেখেছে। সত্যিই এ এক আজগুবি কল্পনা! না-জানিয়ে দিদি কক্ষনো বাপের বাড়ি আসে না। তা হলে? কাকে দেখল নন্দামাসি? দিদির মতো কে ওর ঘর থেকে বেরিয়েছে? শাস্বত ভেবে পেল না।

‘তা তো বলবেই। এই তো শতর খাটের তলায় ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখি, একটা লাল রঙের বল আর রূপোর ঝুমঝুমি পড়ে আছে। গিয়ে দ্যাখো না। ওগুলো শতর ঘরে কোথেকে এল? হয়তো বিন্নির ছেলেবেলার খেলনা। কোনো কারণে অরু নিয়ে এসে ভাইয়ের ঘরে রেখে গিয়েছে। শত ঘুমোচ্ছিল দেখে আমি জিজ্ঞেস করতে পারিনি। জিনিসগুলো সরিয়ে ঝাঁট দিয়েছি।’

শাস্বতর মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওর খাটের তলায় ঝুমঝুমি আর লাল বল! খাটের উপর থেকে শরীর ঝুকিয়ে দেখল শাস্বত। কিছুই নেই। শুধু বাড়িতে পরার হাওয়াই চটিটা এক কোণে পড়ে আছে। আশ্চর্য, নন্দামাসি কি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নীচ থেকে মাথা তুলতেই কাঠের আলমারিটার দিকে ওর চোখ চলে গেল। তৎক্ষণাৎ শাস্বতর চোখে ছবির মতো ভেসে উঠল কাল রাতের প্রতিটা মুহূর্ত। হাড় হিম করা এক-একটা দৃশ্য। দৃশ্য, নাকি স্বপ্ন! ও কি শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল? আলমারির দরজাটা এখন দিব্যি বন্ধ। খাট থেকে লাফিয়ে নেমে দুটো পাল্লা টেনে খুলে ফেলল শাস্বত। মা বলেছিলেন, কাগজটা আলমারির ভিতর রেখেছেন। কিন্তু কোথায়? কাগজটা তো নেই। তা হলে কি জামা-কাপড়ের ভাঁজের নীচে লুকিয়ে রাখা আছে। শাস্বত চেষ্টা করে ডাকল, ‘মা!’

‘কী হয়েছে বাবা!’ নন্দামাসিকে নিয়ে মা এরই মধ্যে ঘরে ঢুকে এসেছেন সম্ভবত লাল বল আর ঝুমঝুমি দেখতে।

‘কাগজটা কই? কোথায় রেখেছ?’ শাস্বতর নিজের কানেই নিজের কণ্ঠস্বর ভীষণ রুক্ষ শোনাল।

রীতিমতো চমকে গিয়ে মা বললেন, ‘ওই তো দু-নম্বর তাকটায় তোর গেঞ্জিগুলোর উপর রেখেছিলাম। সে কী রে, সত্যিই তো নেই! সর, সর, কোথাও ঢুকে গেল কি না দেখি!’

মা আলমারিটা আতিপাতি করে খুঁজছেন। এদিকে খাটের তলায় অর্ধেক ঢুকে নন্দামাসি হাউমাউ করে উঠল, ‘এ কী অলঙ্কারে, অনাছিষ্টি! আমি নিজের হাতে ঝুমঝুমিটা সরালুম গো! এখন তো দেখছি হাওয়া! হায় হায়, তোমাদের কাছে বেমালুম মিথ্যেবাদী হয়ে গেলুম!’

এদিকে মায়ের নাটক, ওদিকে নন্দামাসির। মেজাজ হারাল শাস্বত, ‘আমার ঘর থেকে সবাই এক্ষুনি বেরিয়ে যাও! যাও বলছি! মা, তুমি আমাকে ডাকোনি কেন? কাল রাতে ~~ভালো ঘুম~~ ^{আজকটা একটু ঘুম} হয়নি বলে উঠতে পারলাম

না, তুমিও জাগিয়ে দিলে না। অফিসটা ফালতু কামাই হয়ে গেল।’

খবরের কাগজটা খুঁজতে-খুঁজতে ব্যর্থ ক্লাস্ত মা ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বললেন, ‘আজ তো পয়লা মে। তোর অফিস বন্ধ, ছুটি। তাই ডাকিনি। অঘোরে ঘুমোচ্ছিলি!’

নিজের আচরণে লজ্জা পেল শাশ্বত। আজ যে পয়লা মে ভুলেই গিয়েছিল। ক-দিন ধরে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মাথা নীচু করে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে মা অনুচ্চ স্বরে বললেন, ‘কাগজটা ঠিক ওখানেই গুছিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু গেল কোথায়?’

চোখ মুছতে-মুছতে উঠে দাঁড়াল নন্দামাসি। ওর দুটো হাত ধরে বলল, ‘বিশ্বাস করো শতবাবু, অরুণ মতো ছিপছিপে, শাড়িপরা একটা মেয়েকে তোমার ঘর থেকে বেরোতে দেখেছি। ঝুমঝুমি আর লাল রঙের বলও...। আমি এতটুকু বাজে কথা বলছি না। এসব বলে আমার কী লাভ?’

‘মেয়েটির কোলে কি কোনো শিশু ছিল?’ নিজের মধ্যে হারিয়ে যেতে-যেতে আনমনে জিজ্ঞেস করল শাশ্বত।

চোখ বড়ো-বড়ো করে, একটু ভেবে নন্দামাসি বলল, ‘তা তো দেখিনি। আমি বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে বাসনের জল মুছছিলাম। মেয়েলোকটা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল, খুঁটিয়ে দেখতে পাইনি। মনে হল অরু, তাই অত মাথাও ঘামাইনি।’

নন্দামাসিকে আশ্বস্ত করে শাশ্বত বলল, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোথাও একটা গুগুগোল হচ্ছে। তাই এসব উলটোপালটা...। তুমি কাজে যাও।’

চোখে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু সর্বত্র একটা তছনছ অবস্থা। টয়লেট থেকে ঘুরে এসে মোবাইল অন করে শাশ্বত দেখল, লগবুকে কুস্তলের কল। রিং ব্যাক করল শাশ্বত, ‘কী রে, ফোন করেছিলি?’

‘হ্যাঁ শোন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তোর ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়র কথা মনে পড়ল। তিনি ওই কাগজেই কাজ করেন। ভদ্রলোক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আছেন। যাঁরা ওই ফোটোসহ শোকসংবাদটা দিয়েছেন, তাঁদের কোনো কনট্রাক্ট নম্বর যদি জানা যায়, এই আশা নিয়ে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তা ভদ্রলোক কাগজের ফাইল দেখে আমাকে স্পষ্ট বললেন, ‘ওইদিন ওরকম কোনো শোকসংবাদ বেরোয়নি।’

‘তার মানে?’ শাশ্বত চমকে গেল।

‘ইয়েস। তা ওঁকে আমি বললাম, “হয়তো অন্য কোনো এডিশনে বেরিয়েছে— লেট সিটি বা রিজিওনাল?” উনি বললেন, “ক্লাসিফায়েড অ্যাড

সব এডিশনেই প্রকাশিত হয়।” তুই তারিখটা ভুল বলেছিস ভেবে ওঁকে গত এক সপ্তাহের কাগজ দেখতে অনুরোধ করলাম। ভদ্রলোক আমার আবদারে বিরক্ত হননি, তবে একটু পরে বিস্ময় বারিয়ে বললেন, “এক সপ্তাহ কেন, গত এক মাসেও নেই।” কী ব্যাপার বল তো। আমি তো...!”

হাতের মুঠো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কানের উপর থেকে মোবাইলটা নামিয়ে আনল শাশ্বত। এই সব অবিশ্বাস্য, যুক্তিহীন ঘটনার পরম্পরাগুলো মেলাতে চেষ্টা করল। এক অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যে ঘটনাগুলো আবৃত হয়ে আছে। সব কিছুই কি তবে দৃষ্টিভ্রম? মায়াবী মিথ্যা! কোনো উত্তর খুঁজে পেল না শাশ্বত। সাঁড়াশির মতো যত রাজ্যের অস্বস্তি ওকে পিষে ধরল যেন!

দুপুরের মুখে হস্তদন্ত হয়ে এলেন বিভূতিবাবু। শাশ্বত দেখল, ওঁর হাতের মুঠোয় বাসি খবরের কাগজটা অল্প-অল্প কাঁপছে। প্রায় হাঁফাতে-হাঁফাতে ভদ্রলোক শাশ্বতকে বললেন, ‘দ্যাখো কী কাণ্ড, কাল তোমার মায়ের কাছ থেকে কাগজটা নিতে এসেছিলাম। তা তখন উনি কোনো কারণে দিতে পারেননি। আজ দেখছি, আমাদের লেটার বক্সে লম্বা করে এটা ঢুকিয়ে রাখা আছে। তোমাদের বাড়ি থেকেই কেউ নিশ্চয়ই রেখে এসেছে!’

বিস্ফারিত চোখে কাগজটার দিকে তাকিয়ে শাশ্বত বলল, ‘ওটা আপনি নিয়ে যান।’

সামান্য মুখ বিকৃত করে বিভূতিবাবু বললেন, ‘না ভাই, কোনো দরকার নেই। লেটার বক্সের তালা খুলে কাগজটা যখন বের করছি, মনে হল কারেন্ট খেলাম। তারপর এইটুকু রাস্তা আসছি, হঠাৎ মুখ খুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম! স্পষ্ট ফিল করলাম, কে যেন ধাক্কা মারল! পিছন ফিরে দেখি, কেউ নেই! এসব পরের দ্রব্য না বলে ছোঁয়ার শাস্তি! এই রইল তোমাদের কাগজ।’

দোমড়ানো-মোচড়ানো পাতাগুলো ওর সামনে নামিয়ে রেখে বিভূতিবাবু অজানা ভয়ে গা মুচড়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন।

শাশ্বতর মনে হল, খবরের কাগজটা নয়, ওর চোখের সামনে পড়ে আছে এক মুঠো মানুষ-পোড়া ছাই!

[আনন্দমেলা, ২০ মার্চ ২০১০]

প্রসাদবাবুর ভয়

প্রচৈত-গুপ্ত

একটাই ঘর। দোতলায় ছাদের উপর। ঘর খুব বড়ো। একজন কেন, পাঁচজন হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছাদটাও বড়ো। শহরের এ পাড়াটা বেশ নিরিবিলি। গাছপালা অনেক। এই বাড়ির চারপাশেও গাছ। ভিতরে একটা ছোটো মতো বাগান রয়েছে। তবে সে বাগানে ফুল-ফলের গাছ কিছুই নেই, শুধুই আগাছা। থাকার মধ্যে রয়েছে শুধু ঝাঁকড়া একটা নারকেল গাছ। গাছটা বাড়ির গা ঘেঁষে একেবারে ছাদ পর্যন্ত উঠে এসেছে। ছাদের ছোট পাঁচিল উপকে ডালপালা নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে ছাদের উপর। বাড়ি দেখে প্রসাদবাবুর মনটা ভালো হয়ে গেল। ভগ্নীপতি কিঙ্কর আর বোন ছন্দাকে মনে-মনে ধন্যবাদ জানালেন। এ বাড়িটায় না এলে মস্ত বোকামি হয়ে যেত। এমন চমৎকার ঘর, এমন চমৎকার ছাদ কোথায় পাওয়া যাবে! এর পরেও প্রসাদবাবুর মন হালকা খচখচ করে উঠল। কারণ কী?

কারণ, চুয়ান্ন বছরের প্রসাদবাবু একজন ভীতু মানুষ। অন্ধকার ঘর, খাটের তলার খুটখাট, দরজার ক্যাঁচকোঁচে তিনি চমকে ওঠেন। তাই ছাদ দেখেও একটু ঘাবড়ে গিয়েছেন। ছোটোদের ভূতের ভয় মানায়। কিন্তু বড়োরা ভূতে ভয় পেলে সেটা বিরাট একটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার হয়। আমাদের এই প্রসাদবাবুর বেলাতেও তাই হয়েছে। সবাই তার ভূতের ভয় নিয়ে মজা করে। হয়তো কোনো একদিন অফিসে ফাইল নিয়ে ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে গিয়েছেন। সেখানে কাজ করেন শিশিরবাবু। তিনি ফাইল সরিয়ে নীচু গলায় বলেন, ‘হিসেব-টিসেব পরে হবে দাদা। আগে বলুন, কাল রাতে ওরা কেউ এসেছিল নাকি?’

প্রসাদবাবু অবাক হয়ে বলেন, ‘কারা? রাতে কারা আসবে?’

শিশিরবাবু ঝুঁকে পড়েন, আরও গলা নামিয়ে বলেন, ‘আরে বাবা,

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

রাতবিরেতে আপনার কাছে যারা আসে তাদের কথা বলছি। ওই যে লম্বা-লম্বা হাত, উলটো দিকে গোড়ালি... কেউ এসেছিল নাকি?’

প্রসাদবাবু শুকনো হেসে বললেন, ‘ঠাট্টা করছেন?’

শিশিরবাবু হেসে ফেলেন। বলেন, ‘না, না। ঠাট্টা করব কেন? ভূত খুব সিরিয়াস একটা বিষয়। সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কখনো ঠাট্টা করা যায়? আমার ছোটো ছেলেটা ক্লাস ফাইভে পড়ছে। সেও ঠিক আপনার মতো। ভূত নিয়ে হাসিঠাট্টা একেবারে সহ্য করতে পারে না। হা হা!’ অফিসের বাইরেও একই কাণ্ড। পাড়াতেও অনেকে তার ভয়ের কথা জানে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরছিলেন প্রসাদবাবু। গলির মোড়ে জটলা করে দাঁড়িয়েছিল পাড়ার ছেলেরা। প্রসাদবাবুকে দেখে চুপ করে গেল। পল্টু গম্ভীর গলায় বলল, ‘প্রসাদবাবু নাকি?’

প্রসাদবাবু থমকে গেলেন। বললেন, ‘কিছু বলবে পল্টু?’

পল্টু সিরিয়াস গলায় বলল, ‘না তেমন কিছু নয়, আপনাকে একটু সাবধান করে দিচ্ছিলাম।’

‘সাবধান! কীসের জন্য? গোলমাল-টোলমাল কিছু হয়েছে না কি?’

পল্টু গলা গম্ভীর করে বলল, ‘না, এখনও হয়নি। তবে হতে পারে। আজ অমাবস্যা কিনা। ভূতদের ফেভারিট তিথি। এ জন্যই আপনাকে বলছিলাম যে সাবধানে থাকবেন কাকু।’

ছেলেরা সবাই হেসে উঠল। প্রসাদবাবু মাথা নামিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

শুধু বাইরের লোক নয়, নিজের লোকেরাও প্রসাদবাবুকে ছাড়ে না। আসানসোল থেকে বিচ্ছু ভাগনে ফোন করে বলে, ‘মামা, নেট সার্চ করে দেখলাম, জাপানে একটা দারুণ জিনিস বেরিয়েছে। ঘোস্ট লক। ভূত ঠেকাতে তালা। জানলা-দরজায় লাগালে ঘরে ভূত ঢুকতে পারবে না। যদি বলো তো একটা অর্ডার দিই।’

প্রসাদবাবুর রাগ হয়। ইচ্ছে করে ভাগনেকে একটা ধমক দিতে। কিন্তু পারেন না। কারণ, দোষ তো আর অন্য কারও নয়, দোষ তাঁর নিজের। বড়ো বয়সে ভূতে ভয় পেলে সকলেই রসিকতা করবে। ব্যাপারটাও বিচ্ছিরি। বয়সকালের নানা অসুখ আছে। বাত, দাঁত ব্যথা, কান কটকট। সেসবের ওষুধ আছে। ভূতের ভয় কাটানোর কোনো ওষুধ নেই। প্রসাদবাবু রোজই মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেন, আর নয়, এবার মনে জোর এনে ভয়ের অসুখ সারাবেন। কিন্তু পারছেন না। কী লজ্জার কথা!

প্রসাদবাবুর পুরো নাম প্রসাদরঞ্জন প্রামাণিক। সহজ, সরল, ছা-পোষা মানুষ। কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই শহরে ছোটোখাটো একটা

চাকরি করেন। ঠিক সময়ে অফিসে আসেন। টিফিনের সময়ে অফিসের নীচে নেমে ফুটপাথের দোকান থেকে টোস্ট আর কলা কিনে টিফিন সারেন। সহকর্মীরা বলেন, ‘ও প্রসাদদা, পাউরুটি-কলা ছেড়ে একদিন অন্য কিছু হবে নাকি? একটা ফিশফ্রাই বলি?’

প্রসাদবাবু অল্প হেসে দু-পাশে মাথা নাড়েন। বলেন, ‘না ভাই, আমার এই পাউরুটিই ভালো।’

প্রসাদবাবু সাধারণ খাবার পছন্দ করেন, সাধারণভাবে থাকেন। যাকে বলে ‘সিম্পল লিভিং’। বিয়ে-থা করেননি। নিজের লোক বলতে, বোন-ভগ্নীপতি। তারা থাকে আসানসোলে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রসাদবাবু ‘সুখে আছি’ নামের একটা মেসবাড়িতে ছিলেন। স্টেশনের ঠিক পাশেই। বাড়িটা অতি পুরোনো। মেসের মালিক ‘সারাচ্ছি, সারাব’ করেছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করেননি। একদিন সকালে ‘সুখে আছি’তে একটা কাণ্ড ঘটল। খাওয়ার ঘরে সবাই খেতে বসেছে। অফিস যাওয়ার তাড়া। হঠাৎ ছাদ থেকে ঝিরঝির করে বালি, সুরকি ইত্যাদি ডাল, মাছের ঝালের উপর ঝরে পড়তে লাগল। মেসের মালিক চিৎকার করে উঠলেন, ‘ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!’ খাওয়া-টাওয়া ফেলে সবাই ছুটল বাড়ির বাইরে। দু-একজন ভাতের থালাও হাতে নিয়ে ছুটল। একটু পরেই বোঝা গেল, ভূমিকম্প-টুমিকম্প বাজে কথা। পুরোনো মেসবাড়ি এবার ভিতর থেকেও ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। চুন-সুরকি ফেলে ওয়ার্নিং দিচ্ছে। এর পর মাথায় ইট-পাথর, লোহা-লকড় ফেলবে। এর পরই ‘সুখে আছি’ মেস খালি করে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। কাজ শেষ হতে সময় লাগবে। বছরখানেকও লাগতে পারে। যাঁরা মেসে ছিলেন, তাঁরা নিজেদের মতো ব্যবস্থা করে নিলেন। এই ছোটো শহরে আর দ্বিতীয় মেস নেই। কেউ গেলেন আশেপাশের আত্মীয়ের বাড়িতে। কেউ দলবেঁধে বাড়ি ভাড়া করলেন। কেউ আবার হোটেল ঘর নিলেন। প্রসাদবাবুও তাই করলেন। আপিসের কাছাকাছি একটা হোটেলে উঠলেন। কিন্তু খরচে পোষাতে পারলেন না। তার উপর হোটেলের খাওয়াও তাঁর একেবারে সহ্য হল না। সারাদিন ঢেকুর উঠতে শুরু করল।

এরকম সময় আসানসোলে বসে এই বাড়িটার ব্যবস্থা করে দিল কিঙ্কর আর ছন্দা। বাড়ির মালিক আসানসোলে চাকরি করেন। পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকেন। এক বছর হল বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। অনেকদিন ধরে নিজের একজন পছন্দসই ভাড়াটে খুঁজছিলেন। ছাদের ঘরে থাকবেন। বয়স্ক মানুষ, যিনি ভাড়া থাকবেন, অথচ পুরোপুরি ভাড়াটে হবেন না।

বাড়িটা একটু দেখভালও করবেন। ছেলেপিলেরা পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকলে ধমক দেবেন, ভবঘুরেরা বারান্দায় উঠে আস্তানা গাড়তে চাইলে তেড়ে যাবেন, রোববার করে লোক ডেকে বাগানের আগাছা কাটবেন। প্রস্তাবটা লুফে নিল কিঙ্কর। কারণ ভাড়া অতি যৎসামান্য। কিঙ্কর প্রসাদবাবুকে টেলিফোনে সব বলল। প্রসাদবাবু বললেন, ‘বাড়ি দেখভাল করতে হবে মানে? এটা আমার পছন্দ নয় কিঙ্কর। উটকো ঝামেলা!’

কিঙ্কর বিরক্ত গলায় বলল, ‘চুপ করুন! বাড়ি দেখভাল মানে কী আর লাঠি হাতে রাত জেগে পাহারা? একটু-আধটু হাঁকডাক দিলেই হবে। বাড়ির মালিক ভয় পাচ্ছে, খালি বাড়ি দেখে এরপর চোর-ডাকাত দরজা, জানলা খুলে নিয়ে না-যায়। এজন্যই একজনকে চাইছে। বছরখানেক আগে ওই বাড়িতে কী যেন একটা গোলমাল হয়েছিল। তারপর থেকে বাড়ি বন্ধ।’

প্রসাদবাবু ঢোক গিলে বললেন, ‘কী গোলমাল?’

কিঙ্কর আরও বিরক্ত হয়ে বলল, ‘আমি জানি না। আপনি বোনের সঙ্গে কথা বলুন।’

ছন্দা টেলিফোন ধরে দাদার উপর রাগ দেখাল। বলল, ‘কী গোলমাল জেনে তোমার কী হবে দাদা?’

প্রসাদবাবু মিনমিন করে বললেন, ‘চুরিটুরি নয় তো?’

‘চুরি, ডাকাতি, খুন যাই হোক, তোমার কী? কিছু না। তোমার সস্তায় বাড়ি চাই। ব্যস! সব গোলমাল মিটে গেল। এই সপ্তাহেই মালপত্র নিয়ে ওখানে চলে যাবে। ওই ঘর কিন্তু মোটেও ফাঁকা থাকবে না, এই বলে দিচ্ছি। দেখবে, তোমার পুরোনো মেসেরই কেউ ডবল ভাড়া দিয়ে নিয়ে নিয়েছে। তখন মাথা চাপড়াতে হবে। আজই তোমার ভগ্নীপতি বাড়ির মালিককে একমাসের অ্যাডভান্স ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন। পরশুর মধ্যেই লোক মারফত তোমার কাছে চাবি চলে যাচ্ছে। শুনেছি নিরিবিলি জায়গা। ছাদের উপর ঘর বলে রোদ-হাওয়া ফ্রি। কোনো ঝামেলা নেই। তুমি মেসবাড়ির অঙ্ককার ছোটো-ছোটো ঘরে থাকতে বলেই তোমার ওইসব ভূতটুতের ভয়। খোলামেলা জায়গায় থাকবে, আজীবনে ভয় পালাবে। তা ছাড়া খাওয়া নিয়ে চিন্তা নেই। ওই বাড়িতে একসময় কাজ করত বীণার মা, সে তোমার রান্নাবান্না করে দেবে। আমি বলে রাখব।’

প্রসাদবাবু বললেন, ‘বাড়িতে গেলাম না, তার আগেই রান্নার লোক ঠিক করে ফেললি।’

ছন্দা কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। বলল, ‘তুমি অত

অরাজকতা এককুসিভ

ভেবো না। আমি নিজে গিয়ে তোমার নতুন বাড়ি গুছিয়ে দিয়ে আসব। ওকে ছুটি নিতে বলেছি।’

প্রসাদবাবু বুঝলেন আর কোনো উপায় নেই। বোন-ভগ্নীপতির ঠিক করে দেওয়া বাড়িতে উঠতেই হবে। বেচারিরা অতদূর থেকে বাড়ি ঝুঁজে দিয়েছে এটাও একটা কথা। দিন-তিনেক পর এক ভোরবেলা মালপত্র নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে এলেন প্রসাদবাবু। এসে দেখলেন, সত্যি অসুবিধে কিছুই নেই। একতলা বাড়ি। নীচটা বড়ো-বড়ো তালা দিয়ে বন্ধ। পাশ দিয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে লোহার সিঁড়ি। উঠে গেলে ছাদ, একপাশে ঘর। ঘর দেখে প্রসাদবাবু চমকে উঠলেন। ঘর তো বিরাট! হেসেখেলে গড়াগড়ি দিয়ে থাকতে পারবেন। ঘরের কোণে খাট। খাটের মাথার কাছে জানলা। জানলা খুলতেই ছাদ। সেটাও বড়ো। ভোরের নরম রোদ পড়েছে। নারকেল গাছটা ঝুঁকে আছে শান্ত ভঙ্গিতে। একটু-একটু দুলছে। বাঃ! অল্পক্ষণের মধ্যেই মনের খচখচানি দূর হয়ে গেল প্রসাদবাবুর। তিনি মনে-মনে ঠিক করলেন, এবার বদলে যাবেন। ভূতটুতের ছেলেমানুষি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবেন একদম। সবাই চমকে যাবে। হাসিঠাট্টা বন্ধ হয়ে যাবে। আজ সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে মাদুর পেতে ছাদটায় খানিকক্ষণ বসে থাকলে কেমন হয়?

বেলা একটু বাড়তেই এগারো-বারো বছরের একটা মেয়ে এসে হাজির হল। মিষ্টি দেখতে। গায়ে একটা ফুলকাটা ফ্রক। ঘাড়ের দু-পাশে দুটো বিনুনি ঝুলছে। তাতে লাল রঙের দুটো সস্তার ফিতে। কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ। প্রসাদবাবু বললেন, ‘তুই কে?’

মেয়েটা হাসি-হাসি মুখে বলল, ‘আমি বীণা।’

প্রসাদবাবু বললেন, ‘বীণা কে?’

মেয়েটা ফিক করে হেসে বলল, ‘বীণার মায়ের মেয়ে।’

প্রসাদবাবুর এবার মনে পড়ে গেল। বীণার মা মানে যে মহিলা তার রান্না করবে। প্রসাদবাবু বললেন, ‘তোর মা কোথায়?’

বীণা বলল, ‘মায়ের জ্বর হয়েছে। আমায় বললে, তুই গিয়ে রান্না করে দিয়ে আয়, নইলে নতুন মানুষ, বিপদে পড়বে।’

প্রসাদবাবু অবাক হয়ে বললেন, ‘তুই কী রান্না করবি? এইটুকু মেয়ে।’

বীণা হেসে বলল, ‘এইটুকু মেয়ে বলে এইটুকু-এইটুকু রান্না পারব। ভাত, ডাল, আলুভাজা। চলবে?’

প্রসাদবাবু মেয়েটার কথা শুনে মজা পেলেন। বললেন, ‘ডাল-ভাতে খুব হবে। তুই বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারিস তো বীণা!’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

‘শুধিয়ে রান্নাও করতে পারি। হি হি।’

প্রসাদবাবুও হাসলেন। বললেন, ‘তুই কথায়-কথায় হাসিস কেন?’

বীণা একমুখ হেসে বলল, ‘মনে হয় হাসির রোগ আছে।’

প্রসাদবাবু চোখ পাকিয়ে তাকালেন। বীণা রান্নাঘরে ছুটে পালাল। রান্নাঘর পাশেই। বীণা ছুটে যাওয়ার সময় একটা ঝামঝাম আওয়াজ পেলেন প্রসাদবাবু। মেয়েটা ঘুড়ুর পরেছে নাকি? কই চোখে পড়ল না তো। কে জানে, ছোটো মেয়েরা ছোটোছুটি করলে বোধ হয় এরকম ঘুড়ুরের আওয়াজ হয়। প্রসাদবাবু হেসে ফেললেন। অফিস যেতে হবে। খানিক পরে খবরের কাগজ রেখে স্নানে গেলেন। এ বাড়িতে জলের সমস্যা নেই। সময় নিয়ে স্নান করা গেল। ‘সুখে আছি’ মেসে জলের টানাটানি ছিল। মাথাপিছু এক বালতি পাওয়া যেত। খেতে বসলেন প্রসাদবাবু। বীণা রান্না খারাপ করেছে। সবেতেই গাদাখানেক চিনি। ছোটো মেয়ে কতটা আর পারবে। খাওয়া শেষে প্রসাদবাবুকে মুখ ধোওয়ার জল এগিয়ে দিল বীণা। বলল, ‘রান্না ঠিক হয়েছে?’

প্রসাদবাবু বললেন, ‘ঠিক আছে।’

‘রাতের রুটি করতে কখন আসবি?’ বীণা বলল, ‘আমি আর আসব না। রাতের রুটি-তরকারি করে গেলাম। কাল থেকে মা আসবে। বীণার মা। হি হি।’

বীণার হাসি শুনে প্রসাদবাবুর ভালো লাগল। তবু বললেন, ‘ফাজিল মেয়ে আবার হাসে! চড় খাবি এবার। ঠিক আছে, তুইও মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে মাঝেমাঝে চলে আসিস।’

‘কী জানি, মা আমাকে আসতে দেবে কি না। মনে হয় না দেবে।’

প্রসাদবাবু বললেন, ‘আমি বলে দেব।’

প্রসাদবাবু অফিস যাওয়ার জন্য বেরিয়ে ঘরে তালা দিলেন। বীণা দাঁড়িয়ে ছিল ছাদের এক কোণে। প্রসাদবাবু বললেন, ‘কী রে, বাড়ি যাবি না?’

‘আমি একটু থাকব এখানে? এই বেশি না, খানিকক্ষণ।’ দু-আঙুল ফাঁক করে ‘খানিকক্ষণ’ সময়টা দেখাল বীণা।

প্রসাদবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘থাকবি? কী করবি?’

বীণা আবদারের ঢঙে বলল, ‘ছাদে খেলব।’

‘বাড়ি গিয়ে খেল।’

বিনুনি ঝাঁকিয়ে বীণা বলল, ‘মা খেলতে দেবে না, কাজে পাঠিয়ে দেবে।’

এমনিতেই মেয়েটাকে খুব পছন্দ হয়েছে প্রসাদবাবুর, এখন মনটা আরও

অরাজকতা এককুসিভ

নরম হয়ে গেল। আহা রে! ছোটো মেয়ে। কাজকর্ম করে খেলতে চাইছে। হেসে বললেন, ‘সে না হয় থাকবি। কিন্তু খেলবি কার সঙ্গে? একা?’

বীণা উৎসাহ নিয়ে বলল, ‘একাই খেলব। ছক কেটে একা-দোকা খেলব। আর ওই যে গাছটা আছে, নারকেল গাছটা, ওর সঙ্গেও খেলব। দ্যাখো না, আমার সঙ্গে একবার খেলবে বলে একেবারে ছাদে উঠে এসেছে। হি হি। আমরা হাত ধরাধরি করে নাচব, লাফাব। দুজনে আগেও খেলেছি।’

এগিয়ে গিয়ে গাছের পাতাগুলো ধরে নাড়া দিল বীণা। ডালপালা দুলে উঠল। সাড়া দিল। প্রসাদবাবু মনে-মনে বললেন, ‘পাগল মেয়ে।’ মুখে বললেন, ‘ঠিক আছে, খেল। আমি চললাম। তুই যখন যাবি সিঁড়ির মুখের গ্রিলের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে যাবি, আর তোর মা কাল যেন তাড়াতাড়ি আসে। দেরি হলে অফিসে লেট হয়ে যাবে।’

লোহার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার সময় প্রসাদবাবু গুনগুন করে গান করতে লাগলেন। কত বছর পর যে তিনি নিজের মনে গান করলেন।

অফিসের কাউকে নতুন বাড়ির কথা ভাঙলেন না প্রসাদবাবু। তিনি ঠিক করেছেন, রবিবার সন্ধ্যাবেলা অফিস আর ‘সুখে আছি’ মেসের কয়েক জনকে ডাকবেন। ছাদে বসে গল্পগুজব হবে। সঙ্গে চা আর একটা করে ফিশ ফ্রাই? একটু খরচ হয়ে যাবে ঠিকই। তা হোক। চমৎকার বাড়ি দেখাতে একটু খরচ করতে হয়। বীণার মাকে বলতে হবে, মেয়েটাকে যেন সেদিন সঙ্গে নিয়ে আসে। সবাইকে চা দেবে। অফিস থেকে বেরনোর সময় ভগ্নীপতিকে একটা ফোন করতে গেলেন প্রসাদবাবু। বাড়িটার জন্য একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ফোন পাওয়া গেল না। ঠিক আছে কালই হবে। তাড়াহড়োর কিছু নেই। বরং একটা রাত কাটুক।

বাড়ি ফিরে প্রসাদবাবুর মন আরও ভালো হয়ে গেল। ছাদটা একেবারে ঝকঝক করছে। বোঝাই যাচ্ছে, বীণার কাজ। খেলা শেষে ঝাঁট দিয়ে গিয়েছে। একপাশে ইট দিয়ে আঁকা একা-দোকা খেলার অস্পষ্ট ছক। প্রসাদবাবু মুচকি হাসলেন। নিজের হাতে চা বানিয়ে এনে ছাদে মাদুর পেতে বসলেন। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। ঘরে ফেরা পাখির কিচিরমিচির ডাক। ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নামল। আকাশ ভরা তারা। মস্তবড়ো একটা চাঁদ। নারকেল গাছের পাতায় হাওয়া লেগে ফিসফিস করে আওয়াজ হচ্ছে। বেশ লাগছে। এভাবে আকাশ, গাছপালা, পাখি অনেকদিন দেখা হয়নি। না, কিঙ্কর আর ছন্দা কাজটা ভালো করেছে। প্রসাদবাবু হাত বাড়িয়ে নারকেল গাছের পাতা ছুলেন। পাতার দল হাওয়ায় সরসর করে সরে গেল, ফিরে এলও আবার। যেন প্রসাদবাবুর সঙ্গে খেলতে চাইছে। অনেক রাত পর্যন্ত ছাদেই বসে রইলেন

প্রসাদবাবু। নিজেই অবাক হয়ে গেলেন প্রসাদবাবু, কই ভয়টয় কিছু করছে না তো। ভয় সব পালিয়েছে না কি? নিশ্চয় পালিয়েছে। ছন্দা ঠিকই বলেছে, এতদিন অন্ধকার ঘুপচি ঘরে থাকতে-থাকতে মনের ভিতরেও অন্ধকার বাসা বেঁধেছিল। এই খোলামেলা পরিবেশ তাকে মুক্ত করেছে। প্রসাদবাবু মনে-মনে হেসে উঠলেন।

না, ভয় পালায়নি। ভয় ফিরে এলও অনেক রাতে। তবে সেটা প্রসাদবাবুর পরিচিত ভয় নয়। অপরিচিত ভয়। অনেক তীব্র। হাড় হিম হয়ে যায়। রাত তখন ক-টা? একটা? নাকি দুটো?

নতুন বাড়িতে সাধারণত প্রথম দিন ঘুম আসতে দেরি হয়। এই বাড়িতে প্রসাদবাবু কিন্তু বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙল এক ধরনের অস্বস্তিতে। প্রসাদবাবু বুঝতে পারলেন, অস্বস্তি নয়, আওয়াজ। হালকা একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে। বাম-বাম...। আওয়াজটা আসছে থেমে-থেমে। কে যেন ঘুঙুর পায়ে হাঁটছে। হাঁটছে না লাফাচ্ছে। কে লাফাচ্ছে? কোথায় লাফাচ্ছে? গলা শুকিয়ে গেল প্রসাদবাবুর। তিনি চোখ খুললেন। ঘর অন্ধকার। অন্ধকার কেন। ঘর অন্ধকার থাকার কথা নয়। রাতে আলো জ্বলে শুয়ে ছিলেন। নতুন জায়গায় তিনি ঝুঁকি নেননি। চোর-ডাকাত থাকতে পারে। আলো দেখলে ভয় পাবে। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন প্রসাদবাবু। আলো কে নেভাল? লোডশেডিং? হতে পারে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে না। প্রসাদবাবু বুঝলেন বাম-বাম আওয়াজটা আসছে ছাদ থেকে। কখনো জোরে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে। শরীরের অস্বস্তিটা এবার ভয়ের চেহারা নিল। অন্য কোনো সময়ে এর ছিটেফোঁটা ভয় পেলেও প্রসাদবাবু চাদর মুড়ি দিয়েছেন, আজ কিন্তু উঠে বসলেন। একবার ছাদে গিয়ে দেখলে কেমন হয়? কথাটা ভাবতেই প্রসাদবাবুর মন একসঙ্গে দুটো উত্তর দিল। একবার বলল, ‘কিছু হয়নি। সব মনের ভুল। নিজে গিয়ে দেখে এসো। ভয় পেলে চলবে না। ভয়ের দিন তোমাকে শেষ করতে হবে।’ তারপরেই বলল, ‘যেয়ো না, যেয়ো না, বাইরে বিপদ আছে।’

দোনামোনার মধ্যেই খাট থেকে নামলেন প্রসাদবাবু। অন্ধকারে টলতে-টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পা দুটোকে মনে হচ্ছে পাথর। কাঁপা হাতে দরজার ছিটকিনি খুলতে অনেকটা সময় গেল। খোলা দরজা দিয়ে কয়েক পা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। নির্জন, অন্ধকার ছাদ। আকাশে চাঁদ নেই, অসংখ্য তারা। ছাদ জুড়ে নরম আলো পড়েছে কুয়াশার মতো। সেই আলো সাদা আর নীলে মেশা। বেশ লাগছে দেখতে। মনে সাহস এনে চারপাশে ভালো করে তাকালেন প্রসাদবাবু। না, কেউ নেই। ঘুঙুরের

আওয়াজটাও আর শোনা যাচ্ছে না। দূরে বড়ো রাস্তা দিয়ে ট্রাক চলে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। নিশ্চিত হলেন প্রসাদবাবু। নিজের মনেই পিঠ চাপড়ালেন। ভাগ্যিস চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেননি। তা হলে ভয়টা বেড়ে যেত। কাল সকালেই এই চমৎকার বাড়ি ছেড়ে পালাতেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের ঘরে ঢুকতে গেলেন প্রসাদবাবু, আর তখনই চোখ পড়ল নারকেল গাছটার দিকে। নিমেষে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শরীরের মধ্যে দিয়ে। ওটা কী! গাছ তো নয়, অন্য কিছু। একটা মানুষ যেন। ঝাপসা চুল। হাসছে। অন্ধকারের চোখ-মুখ। অন্ধকারের হাসি। ডালপাতাগুলো লম্বা হাতের মতো বাড়িয়ে রেখেছে। পেতে রেখেছে ছাদের উপর। হাওয়ায় দুলছে তারা। আওয়াজ হচ্ছে খসখস-খসখস...। খামচে ধরার আগে বাঁধানো ছাদে যেন নখ শানাচ্ছে। চোখের পাতা ফেলতে পারছেন না প্রসাদবাবু। তাকে কে যেন মাথার ভিতরে বলছে, ‘চলে যাও, পালিয়ে যাও। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ফ্যালো এখনই।’ কণ্ঠস্বরটা বাচ্চা মেয়ের মতো। চেনা, কিন্তু চিনতে পারছেন না প্রসাদবাবু। তিনি বুঝতে পারছেন, এখনই ঘরে ঢুকে যাওয়া দরকার। খুব দরকার।

কিন্তু পারছেন না। নারকেল গাছের ডালপাতা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তারপর হাত ধরে টান দিল। তিনি সম্পূর্ণ নিজের অনিচ্ছায় এগিয়ে যেতে লাগলেন ছাদের কিনারার দিকে। আর কয়েক পা গেলেই ছাদের ছোট্ট পাঁচিল। পাঁচিল উপকালেই...

জ্ঞান হারানোর আগে প্রসাদবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন, গাছটা বাচ্চা একটা মেয়ের গলায় হেসে উঠল। গলাটা এবার চিনতে পারলেন প্রসাদবাবু। ছোট্ট মেয়ে বীণা।

পরদিন সকালে ছাদের ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল প্রসাদবাবুকে। পেল আসানসোল থেকে আসা প্রসাদবাবুর বোন ছন্দা আর ভগ্নীপতি কিঙ্কর। তারা প্রসাদবাবুকে না জানিয়ে কাল রাতে ট্রেনে উঠেছিল। পরিকল্পনাটা কিঙ্করের। একেবারে বাড়িতে হাজির হয়ে প্রসাদবাবুকে চমকে দেবে। এই কারণে দু-দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে। ছন্দার কাজও আছে। দাদার জন্য বাড়িটা একটু গুছিয়ে দিয়ে যাবে। রান্নার একজন লোক চাই। খুঁজতে হবে। বীণার মা থাকলে কোনো চিন্তা ছিল না। কিন্তু এ শহরের পাট চুকিয়ে সে চলে গিয়েছে। এক বছর আগে পর্যন্ত এ বাড়িতে বন্ধ দরজা খুলে ঝাড়পোঁছ করতে আসত। সঙ্গে তার বারো বছরের মেয়েটাও থাকত। ছাদে খেলত। একদিন খেলতে-খেলতে এই বাড়ির ছাদ থেকেই পড়ে মারা যায় বেচারি! তার মা তখন একতলায় ছিল। বাড়ির মালিকের

কাছে ছন্দা শুনেছে, বীণা মেয়েটা ছিল ভারি সুন্দর। কথায়-কথায় হাসত।
বায়না করায় একজোড়া ঘুঙুর কিনে দিয়েছিল তার মা। মেয়েটা সেই ঘুঙুর
পরে লাফিয়ে বেড়াত। আওয়াজ হত ঝম-ঝম। বীণা যে কী করে ছাদ
থেকে পাঁচিল টপকে পড়ল তা নিয়ে রহস্য রয়ে গিয়েছে। কেউ যেন হাত
ধরে টান দিয়েছিল। নইলে পাঁচিল টপকাবে কেন? যদিও এসব কথা
প্রসাদবাবুকে বলেনি তার বোন। একেই তিনি ভীতু মানুষ...

কিঙ্কর ডাক্তার ডাকতে ছুটল।

[আনন্দমেলা, ২০ মার্চ ২০১১]

স্নেহ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়েছিল অবনী। কম দূরের পথ তো নয়। হাওড়া থেকে ট্রেনে চাপলে পাক্কা সওয়া ঘণ্টা লাগবে বাগনান, সেখান থেকে বাস কিংবা অটোয় মানকুর ঘাট আরও চল্লিশ মিনিট। তারপর ভুটভুটিতে হটুগঞ্জ আরও কম সে কম আধা ঘণ্টা। পিসিঠান্মার বাড়ি পৌঁছানো কি মুখের কথা? অথচ না গেলেও তো নয়। সকালেই ফোন এসেছিল, পিসিঠান্মার আবার নাকি শরীর খারাপ। ইদানীং মাঝে-মাঝেই ভুগছেন বাবার এই একমাত্র পিসিটি। ভোগারই কথা অবিশ্যি। বয়স তো নেহাত কম নয়, আশি পেরিয়েছেন বহুদিন। অবনীর বাবা অনেকবার তাঁকে কলকাতায় নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি শ্বশুরবাড়ির ভিটে ছেড়ে নড়লে তো। কী যে জেদ! আত্মীয়স্বজন নেই, ছেলেপুলে নেই, একটিমাত্র কাজের মেয়ের ভরসায় হটুগঞ্জেই পড়ে আছেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

এবার মনে হয় অসুখটা বেশ গুরুতর। সকালে হটুগঞ্জ থেকে যে লোকটি ফোনে খবর দিল, তার গলা শুনে তো অবনীর বাবা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অবনীকে বললেন, ‘কী করি বল তো? আমিই চলে যাব?’

এম এ পাশ করার পর নতুন চাকরিতে ঢুকে অবনী এখন যথেষ্ট হেঁকড়। গ্রাম্ভারী মুখে বলল, ‘না, না, তোমার শরীরস্বাস্থ্য ভালো নয়। ঘঙ ঘঙ কাশছ, এখন সিজন চেঞ্জের টাইম...।’

‘কিন্তু কাউকে তো একটা যেতেই হবে রে। অসুস্থ মানুষটার খোঁজ তো নিতেই হবে।’

‘কেন, আমি আছি। আমি যাব। অফিস করে আজ আর বাড়ি ফিরব না। সোজা চলে যাব হটুগঞ্জ।’

‘তুই পারবি?’

‘আমি কি আর কচিখোকা আছি নাকি? তুমি আমার উপর ভরসা রাখো। তেমন বুঝলে অ্যান্ডুলেন্স ভাড়া করে সোজা কলকাতায় নিয়ে চলে আসব।’

‘গুড ডিসিশন। আর সেই সময় পিসিকে বলে দিবি, তাঁর আর হটুগঞ্জে থাকা চলবে না। এখন থেকে তিনি এই একমাত্র ভাইপোটির বাড়িতেই অবস্থান করবেন।’

পাঁচটায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে অবনী ভেবেছিল আটটা নাগাদ ঢুকে যাবে হটুগঞ্জ। কিন্তু কপাল খারাপ। কোথায় যেন ওভারহেডে তার ছিঁড়েছে, ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ। ঘণ্টাখানেক পর যাও বা চালু হল ট্রেন, তাও চলে টিকিস-টিকিস করে। ভিড়ে ঠাসা গাড়ি বাগনান পৌঁছোতেই আটটা বাজিয়ে দিল। অটোয় এক মাইল লম্বা লাইন, অগত্যা বাসই ভরসা। মানকুর ঘাটে, রূপনারায়ণের পারে, অবনী যখন নামল, শেষ ভুটভুটি তখন ছাড়ব ছাড়ব করছে। সেই ভুটভুটি হটুগঞ্জে ভিড়ল প্রায় সাড়ে দশটায়। হটুগঞ্জে তখন নিশুতি রাত।

বাজারহাট বন্ধ। দোকানে ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে। রিকশা, ভ্যানরিকশা, কিচ্ছু নেই। অবনীর সঙ্গে আর তিন-চারজন যাত্রী নেমেছিল, তারাও চলে গেল যে-যার মতো। একটু যেন ফাঁপরে পড়ল অবনী। জায়গাটা তার অপরিচিত নয়, এখানে সে এসেছে বেশ কয়েক বার। সেই ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু বাড়ির দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে পিসিঠান্মার কাছে যাবে, এই ভাবনায় টগবগ ফুটছিল উৎসাহে। এখন পথশ্রম আর চারদিকের হালহকিকত দেখে একটু যেন দমে গিয়েছে।

দু-চার মিনিট ঝুম দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে উজ্জীবিত করল অবনী। পিসিঠান্মার কুসুমপুর গ্রাম তো মোটে দু-কিলোমিটার রাস্তা, পথটাও তার মুখস্থ, পয়দল মেরে দিলেই তো হয়।

বাস, ভাবামাত্র হনটন শুরু। গঞ্জ মতো জায়গাটা পেরিয়ে অবনী মেঠো রাস্তা ধরল। শুক্লপক্ষের রাত, আজ বোধ হয় দশমী-একাদশী হবে, দিব্যি একটা চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। অম্মান মাস, এখনও তেমন ঠান্ডা পড়েনি, মিহি হিমের আমেজটা বেশ লাগে। দু-পাশে ধানখেত, পুরো ধান কাটা হয়নি, হালকা কুয়াশামাখা মাঠঘাটও যে এখন কী অপরূপ! মনে হয় কে যেন ফিনফিনে রূপোলি চাদর বিছিয়ে দিয়েছে চরাচরে।

হেলেদুলে হাঁটতে-হাঁটতে খোশমেজাজে গুনগুন গান ধরেছিল অবনী। হঠাৎই তার মনে পড়ল, সে যাচ্ছে তার অসুস্থ পিসিঠান্মাকে দেখতে। এই সময় এমন খুশি-খুশি থাকাটা কি তার শোভা প্রায়? হয়তো সেই মানুষটার

এখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, হয়তো যন্ত্রণায় ককাচ্ছেন... অবনী কোথায় তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পৌঁছোবে তা নয়, সে কিনা প্রকৃতির শোভায় বিভোর। ছিঃ!

অবনী দু-পায়ের গতি বাড়াল। বাঁ-দিকে পুকুর আর প্রকাণ্ড বট গাছটা পেরিয়ে চলে এসেছে কুসুমপুর। রাস্তা শুনশান, জনপ্রাণীর দর্শন নেই। বড়ো ফুটবল মাঠখানা পেরিয়ে পিসিঠান্মার বাড়ির দোরগোড়ায় এসে থামল অবনী।

একতলা পাকাবাড়ি। বেঁটে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে উঠানের কোণটায় একটা দারুণ পেয়ারা গাছ আছে। অবনী জানে।

গলা উঁচিয়ে ‘পিসিঠান্মা’ বলে ডাকতে গিয়েও অবনী নিজেকে সংযত করল। কড়া নাড়ল দরজার।

কীমাশ্চর্যম! মুহূর্তে সদর খুলে গিয়েছে। এবং সামনে স্বয়ং পিসিঠান্মা! হাতে একটা টিমটিমে লঠন।

একগাল হেসে পিসিঠান্মা বললেন, ‘এসে গিয়েছিস তা হলে? জানতাম তুইই আসবি।’

অবনী অবাক মুখে বলল, ‘তুমি না অসুস্থ? তুমি উঠে এলে কেন?’

‘কে আর দরজা খুলবে বল? সরস্বতী বাড়ি গিয়েছে যে।’

‘কী কাণ্ড! তোমার অসুখের মধ্যেও সে বাড়ি চলে গেল?’

‘কোথায় অসুখ। আমি তো দিব্যি আছি।’

‘কিন্তু সকালে কুসুমপুর থেকে ফোন গেল যে?’

‘না হলে কি তোদের কারও দর্শন মিলত?’

‘তাই বলো’, অবনী হাসল, ‘তুমি ভারি দুষ্ট হয়েছ তো?’

স্বর্ণকুমারী হাসলেন যেন। বললেন, ‘আয় ভিতরে আয়।’

উঠোন পেরিয়ে চওড়া বারান্দায় উঠল অবনী। স্বর্ণকুমারীর পিছু-পিছু। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে জুতো ছাড়তে ছাড়তে বলল, ‘লঠন নিয়ে ঘুরছ কেন? কারেন্ট নেই?’

‘তাই তো দেখছি,’ সামান্য কুঁজো হয়ে হেঁটে বাঁ-দিকে বড়ো ঘরটায় ঢুকলেন স্বর্ণকুমারী। বললেন, ‘এটা আজ তোর ঘর। গরম তো নেই, ফ্যান না চললে তোর নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না?’

‘একটুও না।’

‘এখন কী খাবি বল? নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে?’

এতক্ষণ ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধই ছিল না অবনীর। স্বর্ণকুমারীর প্রশ্নে টের পেল, পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। সেই কখন ট্রেনে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি খেয়েছিল, তারপর তো আর কিছুই যায়নি পাকস্থলীতে। তবু এই বৃদ্ধা

অরাজকতা এককুসিড

মহিলা এত রাতে তার খাওয়া নিয়ে উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, সেটাও তো ভালো দেখায় না।

অবনী তাড়াতাড়ি বলল, ‘ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না পিসিঠান্মা। মুড়িটুড়ি গোছের কিছু থাকলে দাও, খেয়ে শুয়ে পড়ি।’

‘তা বললে হয়? কদিন পর এলি...।’

‘তো? তাই বলে এই রাতবিরেতে তুমি রাঁধতে বসবে?’

‘দূর বোকা, রান্না তো আমার করাই আছে। ভাত, মুগের ডাল, বাঁধাকপির তরকারি, আলুপোস্ত, বড়ির ঝোল, ফুলকপির ডালনা... নতুন গুড়ের পায়েস পর্যন্ত বানিয়ে রেখেছি। তুই শুধু কোনটা কোনটা খাবি বল?’

খাবারের তালিকা শুনে অবনীর জিভে জল আসার জোগাড়। প্রতিটি পদই তার খুব প্রিয় কিনা। নিরামিষ এই রান্নাগুলো পিসিঠান্মার হাতে খোলেও দারুণ। একবার খেলে পাক্কা এক বছর মুখে লেগে থাকে।

তবু বিস্মিত গলায় অবনী বলল, ‘তুমি একা হাতে এত কিছু রेंধেছ?’

‘আমার অসুবিধে হয়নি। এখন তুই তৃপ্তি করে খেলে পরিশ্রম সার্থক হয়।’

‘বলছ? তা হলে চেটেপুটে খাব।’

‘খুব ভালো। যা, উঠোনের টিউবওয়েলটায় হাতমুখ ধুয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ভাত-টাত বাড়ি।’

গুটিগুটি পায়ে লঠন হাতে হেঁশেলে গেলেন স্বর্ণকুমারী। প্যান্টশার্ট ছেড়ে ব্যাগে রাখা পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে নিল অবনী। জলের ছোঁয়ায় তরতাজা হয়ে সটান পিসিঠান্মার রান্নাঘরে। সেখানে এক এলাহি আয়োজন। বাহারি ফুলকাটা আসন পেতে দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। কাঁসার থালায় ফুরফুরে ভাত। থালা ঘিরে সার-সার বাটি।

হাসতে হাসতে অবনী বলল, ‘এ যে রয়্যাল ডিনার পিসিঠান্মা!’

স্বর্ণকুমারী লাজুক মুখে বললেন, ‘কবে আবার অসিস, আমার রাঁধার ক্ষমতা থাকে না-থাকে...।’

ভাতে হাত দিয়ে ফের চমক। অবনী বলে উঠল, ‘কিন্তু এ তো রীতিমতো গরম গো! ভাত কি এক্ষুনি নামিয়েছ?’

‘শীতের রাতে ঠান্ডা ঠান্ডা দেওয়া যায় নাকি?... একটু ঘি দিই পাতে?’

‘ওফ, তুমি তো কিছুই বাকি রাখলে না! দাও।’

খাওয়া শুরু করল অবনী। ঘি-ভাতের পর ডাল, আলুপোস্ত, বাঁধাকপির তরকারি একের-পর-এক উপুড় হচ্ছে পাতে। মুখে তুলেই মুহূর্মুহ তারিফ বাজছে অবনীর গলায়।

খেতে খেতে অবনী বলল, ‘নাহ, বাবা যা বলেছেন সেটাই করতে হবে।’

অরাজকতা এককুসিভ

‘কী রে? আমায় কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছে, তাই না?’

‘ঠিক ধরেছ। তুমি এখানে থাকলে আমাদের বহুত সমস্যা। প্রথমত, তোমার শরীর খারাপ হলে আমরা হুটহাট ছুটে আসতে পারি না। সেকেন্ডলি, তুমি কীভাবে আছ তাই নিয়ে আমাদের টেনশন হয়...’

‘আর ভাবিস না। আমি ভালো আছি, ভালো থাকব।’

‘ওইসব বলে আমাদের কাটাতে পারবে না। তুমি কলকাতায় না থাকলে এমন বিউটিফুল রান্নাগুলো যে আমরা মিস করি।’

‘সেই জন্যে তো আজ অনেক কিছু রঁধে খাইয়ে দিলাম। আর হয়তো কোনোদিনই রান্নাঘরে ঢুকব না।’

‘তা হোক। তুমি রাঁধো না-রাঁধো, আমাদের সঙ্গে থাকবে চলো। বাবা তোমার জন্য কতটা উতলা থাকেন জানো? বার বার বলেন, ‘আমার একমাত্র পিসিটা গাঁয়ের বাড়িতে একা-একা কাটাচ্ছে, আমরা তার সেবাযত্ন করার সুযোগ পাচ্ছি না, ভাবলেই আমার কান্না পায়।’

‘তোরা বড্ড ভালো রে অবনী। আমাকে নিয়ে তোরা খুব চিন্তাভাবনা করিস।’

‘করিই তো,’ সাপটে-সুপটে নতুন গুড়ের পায়েস শেষ করছিল অবনী। ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, ‘সুতরাং আর কোনো ওজর আপত্তি নয়। কালই তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ। ফরএভার।’

‘আর এ বাড়িটার কী হবে?’

‘তালাবন্ধ পড়ে থাকবে। তোমার পড়শিদের বলে দেব, তারা ওয়াচ রাখবে। তোমার ঘরে এমন কিছু তো সোনাদানা নেই...’

‘তা বললে হয় রে সোনা? কত স্মৃতি আছে এখানে। সেগুলোই তো আমার মণিমুক্তো হিরেজহরত। সেই কত বছর আগে তোর পিসদাদুর সঙ্গে এ বাড়িতে পা রেখেছিলাম। তখন ছিল মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। তারপর আস্তে আস্তে দালানকোঠা হল, কর্তামশাই এখানে দেহ রাখলেন। তাঁকে ফেলে, এই ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাব না রে,’ স্বর্ণকুমারী মাথা নাড়লেন, ‘তার চেয়ে এখানেই থাকি। তাদের ওখানেও মাঝে যাব।’

‘আমরা না নিয়ে গেলে যাবে কী করে? ভ্যানরিকশা, ভুটভুটি, অটো, বাস... পারবে এই বয়সে একা একা?’

‘তা হলে নয় উড়েই চলে যাব। ইচ্ছে থাকলে মানুষ কী না পারে।’

নাহ, এই অশীতিপর মহিলাকে বাগে আনা অবনীর কন্মো নয়। উঠে আঁচিয়ে অবনী ঘরে ফিরল। ^{অবনী}তখনই মনে হল, পিসিঠান্মার খবরটা তো

বাড়িতে জানানো উচিত। এত রাতে ফোন করবে? থাক গে, না হয় কাল সকালে...। উঁহ, বাবা-মা নিশ্চয়ই চিন্তায় আছেন...।’

দোনামোনা করতে করতে মোবাইল ফোনখানা বের করল অবনী। ধুস, টাওয়ার নেই! কোনো মানে হয়!

স্তিমিত লণ্ঠন হাতে দরজায় এসেছেন স্বর্ণকুমারী। নরম স্বরে বললেন, ‘আর জেগে থাকিস না সোনা। আজ এত ধকল গেল, কাল সকালে আবার তোর ছোট্টাছুটি আছে...। মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়।’

সত্যি, আর যেন শরীর চলছিল না অবনীর। বালিসে মাথা রাখতেই ডুবে গিয়েছে গাঢ় নিদ্রায়।

ঘুম ভাঙল কাকভোরে। বাইরে বেরিয়ে আড়মোড়া ভাঙছে, চোখ গেল পাশের ঘরগুলোয়। কী কাণ্ড, তালা ঝুলছে! পিসিঠান্মা কি ভোরবেলাতেই খুটখুট করে বেরিয়ে গেল? ইস, ঠান্ডা লেগে যাবে না?

ভাবতে ভাবতেই অবনী বাড়ির বাইরে এসেছে। তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। হঠাৎ এক প্রবীণ ভদ্রলোকের আবির্ভাব। অবনীর মুখচেনা। স্থানীয় স্কুলের মাস্টারমশাই। থাকেন পাশের বাড়িতেই।

অবাক মুখে ভদ্রলোক বললেন, ‘তুমি এসে গিয়েছ?’

‘হ্যাঁ। কেন?’

‘আমরা কাল রাতে কলকাতায় ফোন করলাম, তোমার বাবা বললেন, তুমি রওনা দিয়েছ... সেই মতো রাত এগারোটা অবধি এ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে...। কখন এলে?’

‘আরও রাতে। দেরি হয়ে গেল।’

‘যাক গে যাক, চলো।’

‘কোথায়?’

‘হাসপাতালে। রাতভর মাসিমার বডিটা ওখানে পড়ে আছে, এবার তো সৎকারের কাজটা সেরে ফেলতে হয়।’

‘মাসিমা মানে?’

‘স্বর্ণকুমারী দেবী। তোমার পিসিঠাকুরমা। কাল সকাল থেকে ওঁর শ্বাসকষ্টটা খুব বেড়েছিল, তোমাদের খবর দেওয়ার পর ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। অনেক চেষ্টা করেছিলেন ডাক্তার। ফেরানো গেল না। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ উনি...। তোমার বাবাকে আমি ডিটেল বলেছি। উনি তোমাকে মোবাইলে জানাননি?’

‘না মানে...আমার ফোনের টাওয়ারটা...।’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

বলেই এক ছুটে ঘরে গিয়েছে অবনী। মোবাইল অন করে বিস্ফারিত চোখে দেখল, টাওয়ার এসে গিয়েছে!

অবনী থতমত মুখে বলল, ‘কিন্তু কাল আমি... আমার সঙ্গে পিসিঠান্মার...।’

‘মন খারাপ কোরো না,’ ভদ্রলোক অবনীর পিঠে হাত রাখলেন, ‘তোমার পিসিঠাকুরমা খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। ইদানীং তো প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুতে তাঁর এক ধরনের মুক্তি হল বলতে পার।’

অবনীর গলায় আর কোনো স্বর ফুটল না। পা দু-খানা যেন গাঁথে যাচ্ছে মাটির মধ্যে। কাল রাত্তিরে যা যা ঘটল, তা কি সত্যি নয়? কিন্তু পেটটা গজগজ করছে কেন? মনে হল, বড়ির ঝোলের একটা ঢেকুরও উঠল যেন। পায়েসের স্বাদটাও স্মরণে এল অবনীর...।

সব মিথ্যে? সব? কী করে হয়? এ যেন প্রহেলিকা।

.....

[আনন্দমেলা, ৫ মার্চ ২০১৩]

.....

মেদিনীপুরের বাড়ি

শতদল

ভূতের ভয় বলে যে কথা আছে সেটা কোথায় খাটে? মানে কাদের বেলায় খাটে? যারা জানে ভূত নামক বস্তুটি আছে, যারা মনে করে ভূত ক্ষতি করে, যাদের ধারণা ভূত দেখতে কদাকার এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী, সাধারণত তাদেরই ভয় করে। কিন্তু ভূত যে কুরূপ, ক্ষতিকারী, অসীম ক্ষমতালী এসব তথ্য মানুষ জানল কোথা থেকে? ভূতের কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া নেই, নেই কোনো স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, কোনো অভিধান বা বংশতালিকা, গবেষণাগারেও পরীক্ষা করে দেখার উপায় নেই। তবে কি করে মানুষের ভূত-চিন্তা এল? তাদের চেহারা এবং প্রকৃতিই-বা মানুষ জানল কী করে? আমি ব্যাপারটা চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, ভূত আছে কি নেই তা জানার আগেই দুষ্ট বা দুরন্ত ছেলেকে শান্ত করতে ‘ঐ জুজু ধরল’ বলে তাকে ভয় দেখানো হয়। তখনই তাকে বলে দেওয়া হয় জুজুকে কেমন দেখতে, সে কী পারে না পারে ইত্যাদি। ব্যস, শিশুমনে একটা ছবি এঁকে নিল। এই জুজুর ভয়ই পরবর্তী জীবনে তার ভূতের ভয়ে পরিণত হল। তাহলে দেখা যাচ্ছে অন্য লোকে ভূতের ভয় ঢুকিয়ে দেয়। বড়ো হয়ে কেউ কেউ সে ভয় কাটিয়ে ওঠে, কেউ পারে না। আমার নিজের কথা বলি— ছেলেবেলায় প্রথমে আমারও ভূতের ভয় ছিল। সেই ভয় ওই ছেলেবেলাতেই কী করে কাটিয়ে উঠেছিলাম সে-কথা বলি— একটু যখন বড়ো হয়েছি হঠাৎ একদিন মনে হল, নিত্যা ভূতের ভয় পুষে রাখার কোনো মানে হয় না। এম্পার-ওম্পার যাহোক একটা হয়ে যাক। এইরকম ভাব মনে উদয় হওয়ার পর থেকে যখন যেখানে ভূতের ভয় লেগেছে বা গা ছমছম করেছে অমনি চেষ্টা করেছি ভূত দেখার। সাধারণত ভয় করলে লোকে আশ্রয় চেষ্টা করে যেন ভূত না দেখতে হয়। আমি কিন্তু ঠিক উলটোটাই করেছিলাম। ভেবেছিলাম ভূত দেখে প্রথমবার ভয় পেলেও বার কয়েক দেখলে অভ্যস্ত চোখে আর ভয় লাগবে না। বলাবাহুল্য, কোনো

অরাজকতা এককুসিদ্ধ

বারেই ভূতের দেখা পাইনি। ফলে সাহস বেড়ে গেল বা ভয় কেটে গেল, যাহোক হল একটা-কিছু। এবারে অন্য লোকের কথায় আসি— ভূত দেখেছেন অথচ ভয় করেন না এমন অনেকে আছেন। আমার পিতৃদেব এবং ছোড়দা বারকয়েক ভূত দেখেছেন, কিন্তু ভূতে ভয় ছিল না। যাঁদের বিশ্বাস করা যায় তাঁদের ওপর নির্ভর করা যায়। বিশ্বাসযোগ্য জনের কাছ থেকেই লোকে শিক্ষা নেয়। তাঁরা যা-ই বলুন সবই বিশ্বাস করতে হয়। ভূত সম্পর্কে আমি বাবা ও ছোড়দাকে বেশ অভিজ্ঞ মনে করতাম। তাঁদের কাছ থেকে জেনেশুনেই আমার সে-বিষয়ে জ্ঞান বেড়েছে। ভূত আছে বিশ্বাস করি এবং সেইসঙ্গে এও বিশ্বাস করি যে, ওপরওলা যেমন মানুষের ক্ষমতা বেঁধে দিয়েছেন তেমনি তিনি ভূতের বেলাতেও করেছেন। অর্থাৎ ইচ্ছেমতো মানুষ সব কিছু করতে পারে না, ভূতও ইচ্ছেমতো সব কিছু করতে পারে না। আমাদের গ্রামের মণীন্দ্র তর্ক করে বলেছিল— না রে! তুই জানিস না, ওরা ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই করতে পারে।

তাই শুনে আমাদের গ্রামে সদ্য ঘটে যাওয়া খুনের ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন— অবনীদা স্ত্রী-ছেলেমেয়েকে ভালোবাসতেন কি না?

মণীন্দ্র উত্তরে বলেছিল— যথেষ্ট ভালোবাসতেন।

আমার প্রশ্ন— সংসারে তিনিই একমাত্র উপার্জন করার লোক ছিলেন কি না?

মণীন্দ্রের জবাব— হ্যাঁ।

আমার ফের প্রশ্ন— অবনীদা খুন হওয়াতে সংসারটা ভেসে গেল একথা সত্যি কি না?

মণীন্দ্র জোর দিয়ে বলল— তা তো গেলই। তার সঙ্গে ভূতের ক্ষমতার কী সম্বন্ধ?

আমি বলেছিলাম— আছে হে আছে। তার আগে আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও। অবনীদার খুনি কি এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েছে?

মণীন্দ্রের জবাব সঙ্গে সঙ্গে— না।

আমি বলেছিলাম— তবেই দ্যাখো, যে খুনের মতো জঘন্যতম অপরাধ করল, যে একটা সুন্দর সংসারকে ভাসিয়ে দিল, নিরপরাধ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অনাথ করে দিল, সে এখনও ধরাই পড়ল না, শাস্তিই পেল না। অথচ অবনীদা ইহলোক ছেড়ে প্রেতযোনী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো জানতে পারলেন কে খুনি। পারতেন না তাকে ধরিয়ে দিতে? আরও উদাহরণ আছে, আমরা তো খবরে পড়েছি খুন করে লেপকম্বল চাপা দিয়ে মৃতকে সাতদিন ধরে বাড়িতেই লুকিয়ে রেখে দিবি সকলে খাওয়া-দাওয়া করেছে,

অরাজকতা এককুসিভ

স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা করে গেছে। কিম্বা স্ত্রীকে খুন করে মৃতদেহ পাচার করতে না-পেরে সেটা মাটিতে পুঁতে রেখে আসামি দিনের-পর-দিন তার ওপর বিছানা পেতে শুয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে কই কোনো সময়েই তো প্রেতাত্মা খুনিকে ভয়ও দেখায় না, ধরিয়েও দেয় না? আমার এইরকম সব মোক্ষম উদাহরণের সামনে মণীন্দ্র কাবু হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে একমত হয়েছিল যে ভূতের ক্ষমতাও সীমিত। আর সীমিত বলেই জ্ঞানী ব্যক্তির ভূতকে ভয় করেন না। বাড়িতে নিশ্চিত ভূত আছে জেনেও তাঁরা নির্ভয়ে থাকেন। এইরকম একটা ঘটনা বলব বলেই এত ভগিতা করতে হল। তার মানে মোটেই এই নয় যে সবাই আমার ঘটনা বিশ্বাস করুন। চন্দ্র-সূর্যের মতোই ধ্রুব সত্যি যে, কোনো ক্ষেত্রেই শতকরা একশোভাগ লোককে একদিকে আনা যায় না।

বাংলা ১৩৫০ সালে দেশজুড়ে প্রবল দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ভারতের শাসনকর্তা তখন ব্রিটিশ। পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা। কবে যে যুদ্ধ শেষ হবে কেউ জানে না। ইংরেজের শত্রুপক্ষের একজন হল জাপান। আমি তখন নিতান্তই শিশু। কিন্তু তবু আমার বেশ মনে আছে— দেখতাম আকাশে লাল লাল জাপানি এরোপ্লেন। সর্বদা আতঙ্ক এই বুঝি বোম্বিং শুরু হল! ছোটোদের মুখে তখন একটা ছড়া ঘুরত। আমারও সেটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ছড়াটা এইরকম—

সা রে গা মা পা ধা নি
বোম ফেলেছে জাপানি
বোমার ভেতর কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ!

আমি খুব ছোটো হলেও সেই সময়ের সব ব্যাপার মনে আছে। দেশে সমস্ত জিনিসের হাহাকার— চাল নেই, কয়লা নেই, চিনি নেই, নুন নেই, কেরোসিন নেই, পেট্রোল নেই, আরও কত কিছু নেই। কেবল নেই আর নেই। সব রেখে দেওয়া হয়েছে মিলিটারির জন্যে। জনসাধারণের দাম তখন কুকুর-বেড়ালের থেকে বেশি নয়। তারা থাকল বা না থাকল কিছু যায়-আসে না। মিলিটারি এবং তাদের পরিবারই তখন সব। তাদের সুযোগ-সুবিধে দিতে হবে, ঠিক রাখতে হবে। তাদের আরামে না রাখলে লড়বে কে? বাজারে সামান্য যা-কিছু পাওয়া যেত বিশেষত খাদ্যদ্রব্য, তার এত দাম যে সাধারণের নাগালের বাইরে। ব্ল্যাক মার্কেট বা ‘কালোবাজার’ কথাটার জন্ম সেই সময়ে। যুদ্ধের সময়ে কালোবাজারি এক একটা টাকার কুমির হয়ে গেল। জনকয়েক মানুষের লোভ কীভাবে বিরাট সংখ্যক মানুষকে বিপন্ন করে দিল, বিপন্ন

অরাজকতা একত্রকুসিত

বললে ভুল হয়, ধ্বংস করে ছাড়ল ১৩৫০ সালের মঘন্তর তার জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রকৃতির ওপর কারুর হাত নেই। প্রাকৃতিক কারণে দুর্ভিক্ষকে তাই মুখ বুঁজে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। সেখানে কারুকে দোষ দেওয়ার নেই, দুঃখ নেই। কিন্তু অতি স্বার্থপর লোকের সৃষ্টি কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে যখন হাজার হাজার মানুষ মরে যায় তখন শিশু-বৃদ্ধ-স্ত্রীলোকের স্তুপাকার শবের দিকে তাকিয়ে দায়ী সেই মানুষ-পিশাচগুলোর ওপর অন্তর থেকে অভিশাপ আসে— ভগবান, প্রত্যেক জন্মে ওদের আবর্জনার কীট করে পাঠিও। যাই হোক, অন্য প্রসঙ্গে না গিয়ে যা বলছিলাম—

আমরা সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে মেদিনীপুর শহরে। সবে কলকাতা থেকে এসেছি। বাবা ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। শালবনীতে এরোড্রোম তৈরি হচ্ছে। বাবাকে সেইজন্যে আসতে হয়েছে। তিনি যেখানেই পোস্টেড হতেন আমাদের সপরিবারে সেখানে নিয়ে যেতেন। কোয়ার্টার পাওয়া গেলে ভালো কথা, না গেলে বাড়ি ভাড়া করা হত। শালবনীর জঙ্গল সাফ করে ‘এয়ার বেস’ তৈরি হচ্ছে। সেখানে ফ্যামিলি কোয়ার্টারের কোনো প্রশ্ন নেই। কাছাকাছি সব থেকে বড়ো শহর মেদিনীপুরে বাড়িভাড়া করা হল। কলকাতা থেকে আমরা মেদিনীপুরে চলে এলাম। প্রথম দর্শনেই আমাদের সকলেরই বাড়িটাকে ভালো লাগল। লাল রঙের একতলা বাড়ি। বিরাট বাগান আছে পেছন দিকে, কুয়ো আছে বাগানে। ওই পাড়াতে এটাই সব থেকে বড়ো ও সুদৃশ্য বাড়ি। আমরা খুশি হলে হবে কি? পাড়ার লোক খুশি হতে দেবে না। কেউ কেউ এসে শুরু করলেন— আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

দাদা বললেন— কলকাতা।

তাদের জবাব— তাই।

বুঝতে না পেরে হয়তো দাদা জিজ্ঞাসা করলেন— তাই মানে?

তাদের জবাব— স্থানীয় লোক হলে এ-বাড়িতে কখনোই আসতেন না। জেনে-শুনে কি লোকে বিপদে পড়ে?

দাদা অবাক হয়ে বলেন— কী বলছেন বুঝতে পারছি না তো?

তাদের উত্তর— থাকুন না, জানতে পারবেন।

দাদা তবু বলেন— যদি সে-রকম কিছু ব্যাপার থাকে বলে দিলে তো আমরা সাবধান হই!

পড়শীরা যেন কত দরদী! বললেন— না দাদা, আপনাদের সঙ্গে তো ছোটো ছেলেমেয়ে রয়েছে, বলে আর ভয় পাওয়াতে চাইছি না।

আমরা আসার দু-পাঁচ দিন পর থেকেই প্রতিবেশিনী মেয়ে-বউদের অনেকে মা আর দিদিদের সঙ্গে আলাপ করতে বাড়িতে আসতে লাগলেন। খোদ

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

কলকাতায় বাস করে হয়তো এখন আমরা ধারণা করতে পারি না পাড়ায় নতুন পরিবার এলে যেচে গিয়ে আলাপ করা। মেলামেশার ধরন-ধারণ এখন পালটে গেছে। বাইরে ছোটো শহরে বা গ্রামে-গঞ্জে কিন্তু এখনও এ-রীতি আছে। যাই হোক, আলাপ-পরিচয় পর্ব শেষ হলে প্রায় সব প্রতিবেশিনীই বলে গেলেন— বাড়িটায় বাতাস আছে। ছোটো ছেলেমেয়েদের সাবধানে রাখবেন। সাধারণত যারা জানে না তারা মনে করবে ভালোই তো, বাড়ি গুমোট নয় বাতাস আছে। কিন্তু যারা জানে বাতাসের মানেরটা এখানে কী, চোখ গোল গোল হয়ে যাবে। এ হল ভূতের বাতাস। সোজা কথায় বাড়িটায় ভূত আছে। তাই কেউ ভাড়া নেয় না। বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। বাড়ির মধ্যে আমি সব থেকে ছোটো। আমার ওপরে দুজন দিদি। দিদি হলেও ছোটো ছোটো মেয়ে তারা। তার ওপরে দুই দাদা। তাঁরা যথেষ্ট বড়ো। অন্তত আমাদের মতো চট করে ভয় পাওয়ার বয়স নয়। বাড়িটায় যে ভূত আছে আমরা তিন ভাইবোন জানতাম না। আমি তো জানতাম না। আমার ওপরের দিদি দুজনও নিশ্চিত জানত না। যদি জানত তাহলে এক সময়ে নির্ঘাত প্রকাশ করে ফেলত। কারণ, আমাদের বয়সের তফাত খুব বেশি ছিল না এবং তিনজনে বাড়িতে সকল সময়ে খেলার সঙ্গী ছিলাম। ছেলেমানুষ আমরা পাছে ভয় পাই, তাই বড়োরা সাবধান থাকতেন। ওই বাড়ি ছাড়ার পর ব্যাপারটা শুনেছিলাম। তখনই শুনেছিলাম পাড়ার লোকরা আলাপ-পরিচয় করার সময়েই জানিয়েছিল ভূত আছে।

আমাদের ছোড়দা ভাইবোনদের পড়াতেন। কেউ পড়া না করলে বা পর পর ক-টা ভুল করলে হয় একবেলা খাওয়া বন্ধ, নয়তো অন্ধকার ঘরে (সে সময়ে সব বাড়িতে ইলেকট্রিক ছিল না। হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলত) দু-ঘণ্টা বন্দি করে রাখা হত। এ বিধান ছোড়দার। অন্য দাদা ঠিক এ রকম শাস্তি দিতেন না। একবেলা খেতে না-পাওয়া বা সন্কেবেলা একলা অন্ধকার ঘরে বন্দি থাকা কোনোটাই আমার সহ্য হবে না। তাই মরি কি বাঁচি করে ছোড়দার পড়াটা ঠিক করে রাখতাম। সবচেয়ে বেশি শাস্তি পেত আমার এক দিদি। তার পড়া প্রায়ই মুখস্থ হত না। খাওয়া বন্ধের শাস্তি দিলে মা রাগ করতেন। তাই অন্ধকার ঘরে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রাখার শাস্তিটাই জুটত তার কপালে। সে-দিদির ভয়-ডর বলে কিছু ছিল না, ওই ছেলেবেলাতেও দুরন্ত ডাকাবুকো ছিল। কাজেই একলা অন্ধকার ঘরে বন্দি থাকাটা দিদি গ্রাহ্যই করত না। ভয়-ডর ছিল না বলে ওই দিদির একটা ডাকনাম ছিল ‘বোম্বটে’। ওকে বাড়ির বারান্দার শেষ প্রান্তের একটা ঘরে কিছুক্ষণ বন্দি রাখা হত। বাড়িটায় ইলেকট্রিক ছিল না। আমাদের সব ঘরে

কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলত। কিন্তু ওই ঘরটা যেহেতু আমাদের ব্যবহার করার বিশেষ দরকার হত না, পড়েই থাকত, সেই জন্যে আলোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। জিনিসপত্রও বিশেষ কিছু রাখা হত না। ফাঁকা অন্ধকার ঘরটা শান্তি-ঘর হিসেবে চমৎকার! দিদিকে প্রায়ই বন্দি থাকতে হত সেখানে। মা কিন্তু ব্যাপারটাকে খুব অসন্তোষের চোখে দেখতেন। মাঝে মাঝে দেখতাম দাদাকে আড়ালে বকা-ঝকা করতেন। আমাদের সামনে বকতেন না কখনোই, পাছে আমাদের দাদাকে ভয় করা চলে যায়। আড়ালে বকার সময়ে দু-একবার আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে যখন জানতে পেরেছিলাম বাড়িটায় অশরীরীর চলাফেরা আছে তখন বুঝেছিলাম মার বকার কারণ। অবশ্য পাড়ার লোকের কাছে দাদাও তো শুনেছিলেন এ-কথা, তবুও কেন যে একটা ছোটো মেয়েকে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতেন বুঝি না। আসলে এই দাদা খুব ডানপিটে ছিলেন, কিছুতে ভয়ডর ছিল না। কাজেই ভূতের ভয় গ্রাহ্য করতেন না। সবাইকে সেইরকম মনে করতেন। এই সব লোকের কাছে ভূত জন্ম। যারা ভয় পাত্তাই দেয় না তাদের কাছে ভূত একেবারে কেঁচো। দিদি বাড়িটায় ভয় আছে জানত না। কাজেই কোনো সময়েই ওর ভয় করত না। তবে আমরা ছোটোরা যখন খেলতাম বা গল্পটল্প করতাম তখন কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ওই দিদি বলত, জানিস, আমাকে ছোড়দা ঘরে বন্দি করে রেখে দেওয়ার সময়ে এক একবার মনে হয় ঘরের এক কোণে একটা বউ বসে আছে! আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, তোর সঙ্গে খেলবে বলে বসে থাকে। দিদির এই ‘মনে হওয়া’র কথাটা একবার মা শুনতে পেয়েছিলেন। ব্যস! সত্যিকারের বকুনি সেদিন দিয়েছিলেন ছোড়দাকে। তারপর থেকে অন্ধকার ঘরে বন্দি থাকার শাস্তিটা উঠে গেল।

প্রকৃত ঘটনাটা কীভাবে কখন আমি জানলাম এবারে তা বলি— বাবা বদলি হয়ে যাচ্ছেন শিবগঞ্জ বলে একটা জায়গায়। আমরা সবাই মেদিনীপুর থেকে শিবগঞ্জ চলে যাচ্ছি। শেষ রাত্তিরে গাড়ি। শীতকালের ভোর চারটে শেষ রাত্তির ছাড়া আর কী? তখন ঘোড়ার গাড়ির খুব চল। সাধারণের যান হিসেবে ঘোড়ার গাড়িকে লোকে বেশ পছন্দ করত। ভাড়ার মোটরগাড়িও পাওয়া যেত, কিন্তু ঠিক এখনকার ট্যাক্সির পর্যায়ে পড়ত না। ফুরনে যেত তারা। তা ছাড়া তাদের মিটারও ছিল না। মিটারের চল তখনও হয়নি। ঘোড়ার গাড়ি বলে রাখা হয়েছিল। ঠিক সময়ে এসে গেল। আমাদের জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শেষ। এ-ঘর থেকে জিনিসগুলো এনে একটা ঘরে সব জড়ো করা হচ্ছে। বাবা শিবগঞ্জে আগেই চলে গেছেন অফিসের লোকের সঙ্গে। আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন দুই দাদা। হুঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার

খেলনার ছোট লাল রঙের মোটরগাড়িটা পাশের ঘরে জানলার কপাটের পেছনে রেখেছিলাম, তোলা হয়নি তো সেটা! একছুটে এসে হাজির হলাম সেই ঘরে। সে-ঘরে মোমবাতিটা ছোটো হয়ে জ্বলছিল তখনও। কাজেই জানলার কপাটের পেছন থেকে মোটরটা খুঁজে নিতে অসুবিধে হল না। ভাগ্যিস শেষ সময়ে মনে পড়েছিল! সব খেলনার মধ্যে আমার প্রিয় খেলনা মোটর। তখন জার্মানি ও জাপানি খেলনায় বাজার ভরতি ছিল। সে-সব খেলনার কী বাহার, আহা! এই টিনের লাল মোটরটা ছিল জাপানি, আমার বেজায় আদরের। এটাকে ভুলে ফেলে গেলে দারুণ কষ্ট হত। এই ঘরের পাশের ঘরটাই শাস্তি-ঘর। খেলনা নিয়ে চলে আসবার সময়ে শুনতে পেলাম মেয়েলি গলার কান্না। ভাবলাম যাবার মুখে দিদিদের কেউ হয়তো অন্যায় কিছু করেছে তাই শাস্তি-ঘরে আটক থেকে কাঁদছে। গ্রাহ্য না করে আবার আগের ঘরে চলে এলাম। ঢোকান সজে সজে মার কী বকুনি!— কেন কারুকে কিছু না বলে গিয়েছিলে? কোথায় গিয়েছিলে? দেখলাম ছোড়দাও আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আছেন। ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম— আমাকেও অন্ধকার শাস্তি-ঘরে পুরে না দেয়। মাকে বললাম, কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম। সেইসঙ্গে এও বললাম, দিদি শাস্তি-ঘরে কাঁদছে। একজন দিদিকেই বার বার শাস্তি-ঘরে যেতে হত। কিন্তু কোনোদিন তাকে কাঁদতে শুনিনি। মাকে তাই কান্নার খবরটা দিলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু খবরটা দিয়ে বোকা হয়ে গেলাম। মা ধমকে বললেন— কাঁদুক গো! ওই তো দিদিরা! দেখলাম দুই দিদিই ঘরে রয়েছে। কে কাঁদছে তা হলে? ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। মা আর ছোড়দা গম্ভীর হয়ে একবার মুখ চাওয়াচায়াি করলেন। এমন সময়ে ছাদে একটা শব্দ শুনলাম। বাস টেনে নিয়ে গেলে যেমন শব্দ হয় সেইরকম। ছোড়দা হাতঘড়ি দেখে মাকে বললেন— সময়টা একই। এর মানেটা তখন বুঝতে পারিনি। পরে পেরেছিলাম। যথাসময়ে বলব। শব্দটা শুনে আমার মনে হয়েছিল হয়তো ছাদের কোনো জিনিস ঘোড়ার গাড়িওলাকে দিয়ে আর এক দাদা নামাবার ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার গাড়িওলাদের নিয়ে দাদাকে সদর দরজার দিক থেকে আসতে দেখলাম। দাদা এসে বললেন— চলো চলো সব, আর দেরি কারো না। সঙ্গে লোকদের বললেন— সামান উঠাও।

আমরা গাড়িতে এসে বসলাম। মালপত্রের তোলার পর গাড়ি ছাড়বে, এমন সময়ে একজন দিদি বলল— আরে! ট্রেনে জল খাওয়া হবে বলে যে গেলাসটা বার করে রেখেছিলাম সেটা যে ঘরেই পড়ে রইল! থামাও, থামাও গাড়ি।

মা তীব্র আপত্তি করে বললেন— থাক গো। একবার যখন সবাই দুগ্গা

অরাজকতা এতকুসিভ

দুগ্গা বলে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছি আর গেলাস আনতে যেতে হবে না।

তখন তো প্লাসটিক বা স্টেনলেস স্টিল বাসনের চল হয়নি, গেলাসটা ছিল কাঁসার। কাঁসার বাসনের দাম চিরকাল। তবুও মা আনতে দিলেন না।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির গলি ছাড়িয়ে বাঁক নেওয়া পর্যন্ত মা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সমানে ফেলে আসা বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলেন। ছোড়দা মাকে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িটার জন্যে মন কেমন করছে?

মা যেন চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন— না রে! দেখছিলাম। দাদা জিজ্ঞাসা করলেন— কী দেখছিলে বলো তো?

মা বললেন— দেখছিলাম..., এখন সকলের সামনে বলতে মানা নেই, একটা ঘোমটা মাথায় দেওয়া বউ ছাদ থেকে ঝুঁকে দেখছিল। মুখটা ঘোমটার জন্যে দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবুও বোঝা যাচ্ছিল, যতক্ষণ দেখতে পেলাম, আমাদের চলে যাওয়ার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আছে।

ছোড়দা আক্ষেপ করে বললেন— ইস্! আমাকে একটু বললে না? একবারও দেখতে পেলাম না পেতনিটাকে। কেবল শব্দই শুনে গেলাম!

আমরা তিন ভাইবোন সেই প্রথম ঘোড়ার গাড়িতে জানতে পারলাম বাড়িটায় পেতনি ছিল। তখন আমার কাছে সব পরিস্কার হয়ে গেল— কেন অন্ধকার ঘরটায় বন্দি থাকার সময়ে দিদির মনে হত ঘরে আর একটা বউও আছে, কেন অন্ধকার ঘরে আটক থাকার শাস্তি দিলে দাদাকে মা বকাবকি করতেন, কেন ছাদে বাস্প টানার শব্দ শুনে মা আর ছোড়দা মুখ চাওয়াচায়াি করেছিলেন, আর কেনই-বা ছাদে ওই শব্দ শুনে ছোড়দা মাকে বলেছিলেন ‘সময়টা একই’। অর্থাৎ প্রত্যেকদিন শেষ রাতে ঠিক ওই সময়ে ছাদে ওই আওয়াজটা মা ও ছোড়দা শুনতেন।

মা-র কাছে পরে শুনেছিলাম যে, ওই বাড়ির মালিক ছিল একটা বউ। তাকে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। শেষদিকে সে একাই থাকত ওই বাড়িতে। সে নাকি ওই শাস্তি-ঘরেই মরে পড়ে ছিল তিন-চার দিন ধরে। কেউ জানতে পারেনি। শেষে পচা গন্ধ পেয়ে পাড়ার লোকেরা এসে দরজা ভেঙে ঢুকে বউটার মৃতদেহ দেখতে পায়। আমাদের আগে আরও অনেকে ভাড়া এসেছে ওই বাড়িতে। কিন্তু কেউই নাকি তিন-চার দিনের বেশি টিকতে পারেনি। ভয় পেয়ে পালিয়েছে। আমরাই কেবল এক-দেড় মাস কাটিয়ে গেলাম।

[নিশুতি রাতের মহাত্মা (নিউ বেঙ্গল প্রেস), ২০১৪ পুনর্মুদ্রণ (প্রথম প্রকাশকাল অজ্ঞাত)]

জ্ঞান হারালেন অর্চিতা সেন

সৈয়দ রেজাউল করিম

কলিংবেলের আওয়াজ শুনে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন অর্চিতা সেন। দরজা খোলা ঠিক হবে কিনা চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভর দুপুরবেলা বাড়িতে কেউ নেই। চোর-ডাকাতের ছড়াছড়ি। কে কোন বেশে এসে গলা টিপে সব কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে চলে যাবে তার ঠিক নেই। তা ছাড়া আশপাশে জানাশোনা কেউ নেই। থাকলেও কলকাতার কেউ কারো খোঁজখবর রাখে না। সবাই আপন আপন ধান্দায় ঘোরে। দরজা খুলে মিছিমিছি বিপদে পড়া ঠিক হবে না।

‘খোলো খোলো দ্বার, দুয়ারে তোমার’ মধুর শব্দে আবার কলিং বেজে উঠল। আর তাতেই আরও চঞ্চল হয়ে উঠল অর্চিতা সেনের মন। বুকের ধুকধুকনি গেল বেড়ে। আর ঠিকসময় বুদ্ধিটা হঠাৎ চলে এল মাথায়। দেরি না করে দরজার গুপ্ত ছিদ্রে চোখ রাখলে। দেখতে পেলেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তান্ত্রিকবাবা। গলায় সেই পরিচিত রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে গেরুয়া পোশাক। হাতে কুমণ্ডলু। মাথায় চুলের জটা।

তান্ত্রিক বাবাকে ছেলেবেলা থেকে চেনেন অর্চিতা সেন। গতকাল রাত্রে তাকে খবর পাঠিয়েছিলেন অর্চিতা সেন নিজেই। তাই আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দরজাটা খুলে দিলেন। সাথে সাথে ভক্তিভরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন অর্চিতা সেন।

তার মাথায় হাত রেখে তান্ত্রিকবাবা বললেন— ‘তোমাদের মঙ্গল হোক মা। তা হঠাৎ করে এরকম জরুরি তলব কেন মা?’

—‘বলছি বাবা। আপনি আগে একটু স্থিত হয়ে বসুন।’

একথা বলে তান্ত্রিকবাবাকে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন অর্চিতা সেন। তারপর কিচেনরুমে ঢুকে প্লেটে করে গোটাচারেক মিষ্টি, চারখানা লুচি, একবাটি ঘুঘনি ও একগ্লাস জল এনে তান্ত্রিক বাবার সামনে রেখে বললেন— ‘নিন বাবা! এগুলো খেয়ে নিন।’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

তান্ত্রিকবাবা বললেন— ‘এগুলো আবার করতে গেলি কেন মা। জরুরি তলব কেন, সেটা আগে শুনি।’

—‘বলছি বাবা। আপনি খেতে শুরু করুন। সেই সাতসকালে বার হয়েছেন, পেটে কিছু পড়েছে কি না-পড়েছে।’

তান্ত্রিকবাবা আর দেরি করলেন না, খেতে শুরু করলেন। অর্চিতা সেন শুরু করলেন তার কাহানি।

গাঁয়ে বেশ ভালো ছিলাম বাবা। ভূতে ধরলো, গাঁয়ের সব জমিজমা বেচে দিয়ে কলকাতায় কবরডাঙায় এই বাড়িটা কেনার পর। মনে অনেক আশা ছিল। চোখে অনেক স্বপ্ন ছিল। ছেলেকে একটা ভালো স্কুলে পড়াব। হাতের কাছে বাঙ্গুর হাসপাতাল, টালিগঞ্জ মেট্রো রেল। বিনয়ের অফিসটাও কাছাকাছি। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের দিন কাটবে। কিন্তু সে আশায় আমার ছাই পড়ল।

তান্ত্রিকবাবা বললেন— ‘কেন পড়ল সেটাই তো জানতে চাইছি মা।’

—‘আমি তা নিজেই জানি না বাবা। তবে বুঝতে পারছি এ বাড়িতে আর আমরা বেশিদিন থাকতে পারব না।’

—‘কেন, কোনো চোরডাকাত, খুনি গুন্ডা, রকবাজ, দাঙ্গাবাজেরা তোদের পিছনে লেগেছে না কি?’

—‘না বাবা। সেরকম কিছু নয়।’

—‘তাহলে?’ বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলে তান্ত্রিকবাবা জানতে চাইলেন।

প্রত্যুত্তরে অর্চিতা সেন যা জানালেন তার মর্মাখ কতকটা এরকম—

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাজার করে বাড়িতে ফিরে দরজার তালা খুলবেন, এমন সময় শুনতে পেলেন খুটখাট আওয়াজ। প্রথমে ভাবলেন বোধহয় ইঁদুর-টিদুর হবে। পরমুহূর্তে ভাবলেন কোনো চোর-টোর ঢোকেনি তো? কিন্তু দরজার তালা তো বন্ধ। তাহলে কি কোনো জানালা-টানালা ভেঙে...।

মনে অদম্য সাহস ছিল অর্চিতা সেনের। ছেলেবেলা থেকে একটু ডানপিটে স্বভাবের ছিলেন বলে, সব কিছু ভয়ডর উপেক্ষা করে দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। ঘর ছিল অন্ধকার। দরজার পাশেই ছিল সুইচ বোর্ড। খুট করে আলো জ্বালতেই দেখতে পেলেন এক মহিলা ত্রস্ত পদে রান্না ঘরে ঢুকে পড়ল। এই অবস্থা, এই পরিস্থিতিতে কোনো মহিলা পড়লে সাথে সাথে জ্ঞান হারাতেন, কিন্তু অর্চিতা সেন, অর্চিতা সেনই। একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেও সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। মহিলা বলেই বোধহয় মনে একটু বেশি সাহস হল তাঁর। সোজা গিয়ে ঢুকলেন রান্না ঘরে। সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। আর আলো জ্বলেই

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। কোথায় গেল সেই মহিলা! ত্রস্তপদে এঘর-সেঘর খুঁজে বেড়ালেন। ঘরের দরজা, জানালা, খিল সব কিছু পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু কোথাও কোনো অসঙ্গতির লক্ষ্য গোচর হল না তার। আর তার পরেই শুরু হল যত অবাস্তব ভাবনাচিন্তা।

এটা তার মনের ভুল, এটা ইলিউশন, এটা দড়ি দেখে সাপ ভাবার মতো এরকম অনেক ভাবনাই ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যখন একদিন, দু-দিন, তিনদিন, পর পর সাত-আটটা দিন ঘটল তখন সত্যই চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। সত্যই কি মেয়েটি অশরীরী? সত্যই কি ভূতপেতনি বলে তাহলে কিছু আছে? মনের মধ্যে এসব কিছু হলেও ঘুণাক্ষরে তা ছেলে ও স্বামীকে জানালেন না তিনি। সেদিন বাবার শরীর খারাপ শুনে ছেলে ও স্বামীকে রেখে গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন অর্চিতা সেন। তিনদিন পর কলকাতায় ফিরলেন তিনি। দিনটা ছিল রবিবার। স্বভাবতই ছুটির দিন। ছেলে ও স্বামী দুজনেই বাড়িতে ছিল। বাবার সুস্থতার খবর দিয়ে একসময় ছেলের কাছে অর্চিতা সেন জানতে চাইলেন— ‘হ্যাঁরে বাবা! এই ক-দিন রান্না করে খেতে তোদের কষ্ট হয়নি তো?’

বিকাশ বলল— ‘কষ্ট হবে কেন মা। বিন্দাস ছিলাম এ ক-টা দিন। তুমি চলে গেলে, আর জয়া মাসি এসে হাজির হল। রান্নাবান্না করে আমাদেরকে খাওয়ালো। তুমি হাজির হলে, আর জয়া মাসি চলে গেল।’

ছেলের কথা শুনে তাজ্জব বনে গেল অর্চিতা সেন। একী কথা বলছে বিকাশ! সে কি তার কাটা ঘায়ে নুনের ছোটা দিতে এই কথাগুলো বলল। বড়ো বিমর্ষ বোধ করলেন অর্চিতা সেন। স্বামীর দিকে অসহায়ের মতো মুখ তুলে তাকাতেই বিনয় সেন বললেন— ‘তুমি জয়ার কথা ভুললে কি হবে, সে কিন্তু আমাদের কথা ভুলতে পারেনি।’

স্বামী ও ছেলের কথা শুনে আরও ধসে পড়ে গেলেন অর্চিতা সেন। বাবা-ছেলে মিলে তাকে কি পাগল বানাতে চাইছে। হ্যাঁ, রাগের মাথায় সেদিন জয়াকে তিনি বলেছিলেন— যা, তোর আর কাজে আসতে হবে না। কিন্তু সে তো আজ ছ-মাস আগের কথা। সেটা তো গাঁয়ের বাড়ির কথা। সেই থেকে জয়া তো তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। সে তো দিনকয়েক আগে...।

‘সেকথা আমি জানি অর্চিতা। দিন পনেরো আগে তোমাদের জয়া বসু মারা গেছে। বুঝতে পারছি সে এখন তোমাদের সংসারে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু গাঁ ছেড়ে সে এখন কলকাতায় এসে উঠেছে কেন?’ মাথা চুলকাতে চুলকাতে তান্ত্রিকবাবা বললেন।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

অর্চিতা সেন বললেন— ‘সে-কথা আমি কী করে বলব বাবা?’

তান্ত্রিকবাবা গুম হয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর একসময় বললেন, ‘তোমার জানার কথা। যজ্ঞ করে এ ভূত আমি বিদেয় করতে পারি; কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে অধরা থেকে যাবে। তবে যদি...।’

—‘তবে যদি’ ‘কী বাবা?’ সাগ্রহে জানতে চাইলেন অর্চিতা সেন।

—‘তবে যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে প্লানচেটে জয়াকে ডেকে আমি তা জানতে পারি।’

—‘আমি রাজি তান্ত্রিকবাবা! তবে আমার একটা বিনীত নিবেদন, জয়া যেন আমাদের সামনে আর না আসে কখনো।’

তান্ত্রিকবাবা বললেন— ‘সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।’

সেইমতো সেদিন রাতে অর্চিতা সেনকে নিয়ে এক নির্জন কক্ষে বসলেন। জয়া বসুর আত্মা এসে হজির হল তাদের সামনে। তান্ত্রিকবাবা শুধালেন— ‘জয়া, তুমি হঠাৎ গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এলে কেন?’

—‘কী করবো বাবা! গাঁয়ে কাজ কোথায়? খাবো কী? ছেলেপুলে মানুষ করবে কে? তাই অর্চিতাদির বাড়িতে কাজে এসেছি।’

—‘কেন, সরকার তো আজকাল চালডাল লেখাপড়া সব দিচ্ছে।

—ওই ভিক্ষের পয়সায় দু-চারদিন চলে, কিন্তু বইখাতা কিনে মাস্টার পুষে শিক্ষে দেওয়া যায় না।

অর্চিতা সেন বললেন— ঠিক আছে, তোর ছেলে দুটোর পড়াশুনার খরচ আমি বহন করব। দয়া করে তুই...।

—আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি দিদি? বরং তোমার উপকার করেছি। তোমার ছেলে ও বরের জন্য রান্নাবান্না করে দিয়েছি। তোমার অবর্তমানে তোমার ঘরদোর সব গুছিয়ে দিয়েছি।

—‘আর তোকে করতে হবে না।’ তান্ত্রিক জোর দিয়ে বললেন— ‘অর্চিতা যখন চাইছে না তখন আর তোকে আসতে হবে না। তবে কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলিস। আমি অর্চিতার মতো ছেলে দুটোর জন্য কিছু-একটা ব্যবস্থা করে দেব। একদম চিন্তা করতে হবে না।’

—তাহলে আমি আসি। একথা বলে সাঁই সাঁই করে জয়ার আত্মা কোথায় যে চলে গেল কে জানে! তার ঝাপটায় জ্ঞান হারালেন অর্চিতা সেন।

জ্ঞান ফিরলে কী বলতে পারে সে ভাবনায় ব্রতী হলেন তান্ত্রিকবাবা।

সুন্দরবনের শিখা

প্রবীর জানা

ছোটবেলায় আমার খুব ভূতের ভয় ছিল। বিশেষ করে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে ঘরের বাইরের দিকে তাকালে মনে হত দূরের গাছের জটলায় কেউ যেন হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। অন্ধকারে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে খুব ভয় পেতাম। মার শাড়ির আঁচল বা কারো হাত না ধরে একা একা রাত্রে চলাফেরা করতে সাহস হত না।

যখন খুব ছোটো ছিলাম, তখন ভূত সম্বন্ধে মনের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। থাকতাম গ্রামের বাড়িতে। বাড়ির তিনদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ, একদিকে খাল। গ্রামের যেখানে-সেখানে বাঁশ, কেয়া, বাবলা প্রভৃতি গাছের ঝোপ। গ্রামের পূর্বদিকে কিছুটা হাঁটলেই হুগলি নদী। সন্দের অন্ধকারে শেয়াল, বনবিড়াল, খটাস বা কখনো কখনো হায়েনার দাপাদাপি প্রায়ই চোখে পড়ত। সে সময় বসন্ত, কলেরা যেমন মহামারীরূপে দেখা দিত, তেমনি ঝড়-বন্যায়ও অনেক মানুষের মৃত্যু হত। তাই যখনই কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটত তখন লোকে ব্যাপারটিকে বলত ভৌতিক। অর্থাৎ ভূতের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকে রেহাই পাওয়ার এটাই ছিল সহজ পথ। ভূত সম্বন্ধে শুধু সেকালে নয়, এখনও মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত বিশ্বাস আছে। পরবর্তী সময়ে মন থেকে ভূতের ভয় বিদায় নিতে লাগল বয়স বাড়ার সাথে সাথে।

আমি তখন থাকি কলকাতার বাড়িতে। একবার শিখা এল আমাদের বাড়িতে সুন্দরবনের ভাসা গুড়গুড়িয়া নামক গ্রাম থেকে। সেখানে অনেক জমিজমা আছে তাদের। তার কাছে শুনেছিলাম যে তারা লাটদার। সে ডায়মন্ড হারবারে একটি কলেজে পড়াশুনো করে। তারা আমাদের আত্মীয়। তার বাড়ির অনেকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের বাড়িতে এলেও শিখা এর আগে আসেনি। একটু চাপা গায়ের রং, কোমর পর্যন্ত দীর্ঘ মাথার চুল,

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

খুব হাসি-খুশি ছিল সে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিখা আসার পরে বাড়ির পরিবেশটাই যেন বদলে গেল। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, হইছল্লোড়ের মধ্যে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল।

বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় দেখলাম শিখাকে খুব গম্ভীর হয়ে যেতে।

আমি তাকে বললাম— শিখা, মনে হচ্ছে তোমার মন ভালো নেই। বাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করছ। শুধু রাত্রিটা এখানে থাকছ, ভোরে তো চলে যাবে। সোজা দৃষ্টিতে সে তাকাতে পারল না আমার দিকে। তার দু-চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

সে বলল— আমি চলে গেলে বুঝি তুমি খুশি হবে, আমার কথা তোমার মনে পড়বে না?

সেদিন আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি।

দীর্ঘ বছর কেটে গেছে, শিখার সাথে দেখা হয়নি আমার। আমিও তার কোনো খোঁজ রাখিনি। না রাখাই স্বাভাবিক। বাস্তব জীবনের স্রোতে কল্পনার ফানুস এইভাবেই বিলীন হয়ে যায়। বাস্তবের সাথে কল্পনার এখানেই ফারাক। একবার শিখার দাদা এসেছিল আমাদের বাড়িতে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, —শিখা এখন কী করছে?

সে বলল— সুন্দরবনের একটি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করে। স্কুলটি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

আমি বললাম— সুন্দরবনের কোথায়?

—ধামাখালিতে এসে লঞ্চে নদী পেরিয়ে অপর পারে গেলে সন্দেশখালি। সেখান থেকে আরও কয়েক কিলোমিটার অটো, ট্রেকার বা ভ্যানরিকশায় গেলে শিখাদের স্কুলে পৌঁছানো যাবে।

আমি বললাম— একবার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় গেছলাম লঞ্চে। নদীর দুই তীরে গামা, হেতাল, গরান, কেওড়া আরও কত সবুজ সবুজ গাছপালা বাতাসে দুলতে দুলতে যেন হাতছানি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। গেছলাম একটি সাহিত্যসভায় যোগ দিতে। ফেরার সময় একজন কবি আমাকে এক বোতল মধু উপহার দিয়েছিলেন। কলকাতা শহরে দাম দিলেও খাঁটি মধু সহজে পাওয়া যায় না। একদিন সেখানে ছিলাম গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া, জ্যাস্ত জ্যাস্ত মাছ দেখে মনে হচ্ছিল সেখানের লোকেরা খুব সুখে আছেন।

শিখার দাদা কিছু সময় চুপ থেকে বলল— সেখানে দু-চারদিন থাকলে বুঝতে পারতে লোকে কেমন ভয়ে ভয়ে থাকে।

অরাজকতা এককুসিদ্ধ

—ভয়ের কথা বলছ কেন? লোকজন কম বাস করেন বলে কি চোর-ডাকাতির ভয়?

—চোর-ডাকাতির থেকে বেশি হিংস্র বাঘ, কুমির, সাপ প্রভৃতি। এখানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। ঘরে-বাইরে সর্বত্র সাপের উপদ্রব।

সেবার পুজোর ছুটিতে কলকাতার বাড়ি থেকে সকলে চলে গেল গ্রামের বাড়িতে। কলকাতায় পুজো দেখব বলে আমি একা থেকে গেলাম। সপ্তমীর রাত্রি। দেওয়াল ঘড়িতে একটা বাজল ঢং ঢং শব্দে। আমি চিলেকোঠার তিনতলার ঘরে চেয়ারে বসে পুজো ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছি। ঘরের দরজা আলত ভেজানো। এক ঝটিকা ঠান্ডা হাওয়ায় দরজার পাল্লা খুলে গেল। দেখলাম শিখা ধীর পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের আলোর জ্যোতি হঠাৎ কমে গেল। কখনো কখনো সিস্কল ফেজ হলে এরূপ হয়ে থাকে। আমি বললাম,

—শিখা, হঠাৎ তুমি! কলকাতায় পুজো দেখতে এসেছ বুঝি, একা না সাথে অন্য কেউ আছে?

সে আমার দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। আমি যেখানে চেয়ারে বসে আছি তার পাশে খাটে বিছানা পাতা। শিখা এগিয়ে গিয়ে খাটে বসল মাথা নীচু করে। স্বল্প আলোয় দেখলাম তার শরীরের রং যেন নীলাভ হয়ে গেছে। যখন আমাদের বাড়িতে সে এসেছিল তার গায়ের রং চাপা হলেও লাভণ্যের ঘাটতি ছিল না। সে ছিল খুব হাসি-খুশি। আজ যেন ক্লান্ত। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, অবিন্যস্ত মাথার চুল, তার পরনের শাড়িটা দুমড়ানো, মোচড়ানো, ঠোঁট যেন রক্তের মতো লাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুব ক্লান্ত।

সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

আমি আবার বললাম— তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করব কি? দুধ-মুড়ি আছে খেতে পার। চা করে আনব?

সে ঝিমঝিম থাকল যেন ঘুমে ঢলছে। কিছু সময় পরে চাপা গলায় বলল,

—কথা দিয়েছিলাম তোমাকে ভুলে যাব না। তুমি বলেছিলে, সুন্দরবনে যাবে আমার সাথে দেখা করতে। তুমি তো কথা রাখনি। আমি এসেছি দেখা করতে।

—তুমি হঠাৎ আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—তোমাকে আগের মতো প্রাণচঞ্চল মনে হচ্ছে না যেন।

চোখের পাতা অল্প খুলে তাকাল সে আমার দিকে। তারপর ভাঙা

ভাঙা গলায় বলল, প্রাণ থাকলে তো চঞ্চলতা প্রকাশ পাবে!

আমি হেসে বললাম— প্রাণ না থাকলে এখানে এলে কী করে, ভূত হয়ে নাকি?

‘ভূত’ শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে শিখার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকল, যেন আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরিয়ে আসছে।

ভাবলাম, ভূতের সাথে তুলনা করায় হয়তো সে রেগে গেছে। হাসতে হাসতে বললাম, ভালোবাস বলেই তো সামান্য কথায় দাদার ওপর রাগ-অভিমান করছ! ভাই-বোনে এসব হয়েই থাকে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শিখা বলল— তুমি ভালোবাস না ছাই, তুমি...।

শিখা ঘুমে অচেতন্য হয়ে বিছানার কোলে ঢলে পড়ল। ঘরের আলো অস্পষ্ট হতে হতে নিভে গেল। আমি বাধ্য হয়ে দোতলার ঘরে ঘুমাতে চলে এলাম।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে দেখি শিখা সেখানে নেই। বাড়ির চারদিকে উঁচু প্রাচীর। গেটে তালা দেওয়া। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে কোথাও দেখলাম না। বিস্মিত হলাম এজন্য যে গেটে তালা দেওয়া সত্ত্বেও কী করে সে বাইরে চলে গেল!

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ছিল পঞ্চায়েত ভোট। সরকারি কর্মচারী হওয়ায় আমার ভোটের ডিউটি পড়ল সুন্দরবনের গ্রামে একটি স্কুলে। গ্রামটির নাম হুঁকাহারানি। ভোটের বুথ সেই স্কুলে। আমার কাজ প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করা। সবুজ অরণ্য, খাল-বিল, নদীর শোভা আমার মনকে খুবই আকৃষ্ট করল। শুনেছি শিখার বাড়ি এসব অঞ্চলে কোথাও হবে। তাই তার কথাও বার বার মনে পড়ছিল। ভোটের আগের দিন আমরা, যারা ভোটের দায়িত্ব প্রাপ্ত, সন্ধ্যায় হাজির হয়েছিলাম নির্দিষ্ট স্কুলে। এখানে এসে খুবই ভালো লাগছিল। শহরের জনঅরণ্য, গাড়ি-বাড়ির একঘেয়েমি থেকে গ্রামের নির্জনতা, রূপসী পল্লীর হাতছানি আমার খুব ভালো লাগছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পরে বুঝতে পারলাম বাস্তব আর কল্পনা অনেক সময় এক হয় না। সাইকেল ম্যাসেঞ্জার এসে বললেন, স্যার, এখানের পরিবেশ ভালো নয়। ভোটের সময় প্রায়ই গুণ্ডাগোল হয়। রাত বাড়ার সাথে সাথে কাছাকাছি অঞ্চল থেকে বোমের শব্দ ভেসে আসতে থাকল। আমি সাইকেল ম্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথাও কি পুজো হচ্ছে, বোমের শব্দ ভেসে আসছে?

অরাজিকতা এক্সক্লুসিভ

সাইকেল ম্যাসেঞ্জার হাসতে হাসতে বললেন, কাল যে ভোট পূজো হবে তার প্রস্তুতি চলছে।

—মানে!

—এখন থেকে বিভিন্ন দলের লোকেরা নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। আগে অনেকবার ভোটের সময় এখানে গগুগোল হয়েছে বুথের বাইরে। বুথের ভেতরে এসে কেউ গগুগোল করতে সাহস করেনি।

ভোটের দিন সকাল থেকে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় শান্তিতে কাটল বলা যায়। বুথের সীমানার মধ্যে কোনো গগুগোল হয়নি। ভোট পূর্বের পরের কাজ শেষ করে ঘড়িতে দেখলাম তখন রাত প্রায় আটটা। যেখান থেকে ভোটের মালপত্র নিয়ে রওনা হয়েছিলাম, সেখানে সিল করা ব্যালট বাক্স এবং অন্যান্য জিনিসপত্র জমা দিলে তবে আমাদের ছুটি। এখানে দূরে যাতায়াতের মাধ্যম নৌকো। শুধু আমরা নয়, আরও কয়েকটি বুথের ভোটকর্মী, মালপত্র, পুলিশ জড়ো হয়েছে একটি নদীর পাড়ে। জ্বলছে হারিকেনের অস্পষ্ট আলো। আমরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছি। মালপত্র নৌকোয় তোলা হচ্ছে। আমাদের থেকে কয়েকগজ দূরের ঝোপের আড়ালে ব্লাস্ট করল পর পর দুটো বোম। আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম ভয়ে।

আমি নদীর তীর বরাবর দৌড়াতে দৌড়াতে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে থামলাম। নদীর লোনা জলের ঢেউয়ে জ্বলে উঠছে ফসফরাসের আলো মাঝে মাঝে। তাকিয়ে দেখলাম, কেউ আমার দিকে এগিয়ে আসছে, তার ছায়া নদীর জলে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে। যতই ভাবছি কোন দিকে দৌড়াব ততই আমার পা দুটো যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভয়ে। শুনতে পেলাম, গাছের আড়াল থেকে কেউ বলছে,

—আশিসদা, ভয় পেয়ো না, আমি তো আছি।

মনে হল এই গলা তো আমার চেনা, খুব ভালো করে চিনি। একজনই আমাকে এত মিষ্টি গলায় দাদা বলে ডাকে। আমি হতবাক এই গলার স্বর শুনে। রাতের অন্ধকারে সে এখানে কেন এল! মনের ভুল নয়তো? শুনেছি, বনজঙ্গলে নাকি ভূত-পেত অশরীরী আত্মার অবাধ বিচরণ রাতের অন্ধকারে! হয়তো এরূপ কোনো শক্তি বিপদে ফেলার জন্য অভয়বাণী শোনাচ্ছে। যখন এসব ভাবছি তখন এক নারীমূর্তি আমার সামনে হাজির হয়ে বলল,

—আমি থাকতে তোমার শরীর ছোঁয়ার হিম্মত কারো নেই। যারা ব্যালট বাক্স ছিনতাই করতে এসেছিল তারা পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছ। আমার পিছু পিছু আসো, তোমাকে লোকজনের কাছে পৌঁছে দিই।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম— শিখা, তুমি এখানে! আমি বিপদে পড়েছি যে তা তুমি জানলে কী করে?

শিখা ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলল— দাদা বিপদে পড়লে বোনের জানতে পারা তো স্বাভাবিক ব্যাপার!

নদীর ঢেউয়ে জেগে ওঠা ফসফরাসের আলো ঢেউ খেলে যাচ্ছে শিখার চোখ-মুখ সারা শরীরে। তার চোখ থেকে যেন আগুনের হলকা ছিটকে বেরিয়ে আসছে। সেই আলোয় তাকে অনুসরণ করা সহজ হচ্ছিল। কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় শিখাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা কঙ্কাল লম্বা লম্বা পা ফেলে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছে আমার সামনে।

ফিরে এলাম যেখানে ভোটের মালপত্র ফেলে পালিয়ে গেছলাম সেখানে। বহু পুলিশ ও র‍্যাফ এসে গেছে। তারা পাহারা দিয়ে ব্যালট বাক্স প্রভৃতি নৌকায় করে পৌঁছে দিল নির্দিষ্ট স্থানে। এরপর যখন ভোটের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলাম তখন প্রায় সকাল হয়ে আসছে। শিখার সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া আমার মনে হয় মিশ্রিত চিন্তার সৃষ্টি করল। দূরের অন্ধকারের দিকে তাকালেই মনে হতে থাকল, কেউ যেন ঘোরাফেরা করছে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, ভোরের আগে এখান থেকে চলে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

অনেকেই সেখানে অপেক্ষা করছেন। আমি বিশাল প্যাণ্ডেলের একপ্রান্তে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করছি। এমন সময় একজন লোক আমার সামনে এসে বললেন,

—আপনাদের বুথে নাকি গণ্ডগোল হয়েছিল শুনলাম।

আমি লোকটির মুখের দিকে তাকালাম। মনে হল কোনো ভোটকর্মী হয়তো হবেন। তাঁর শরীরে অস্বাভাবিকতার কোনো চিহ্ন আমার চোখে ধরা পড়ল না। আসলে এক অজানা ভয় তখন আমাকে তাড়া করছে, বিনা কারণে মনে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে।

—আমি বললাম, বুথে নয় নৌকায় মালপত্র তোলার সময়। আপনি গণ্ডগোলের খবর জানলেন কী করে?

—আপনি তো আচ্ছা মানুষ মশায়! এখানের সকলে জানে, শুধু আমি একা নয়।

—আপনি নিশ্চয় ইলেকশন ডিউটি করতে এসেছেন?

—ঠিক বলেছেন। আমি যেখানে গেছলাম সেখানের পরিবেশ খুবই ভালো। সকলে সতর্ক ছিল, কোনো গণ্ডগোল না হয় যেন।

—আপনি কি রাজ্য না কেন্দ্রীয় সরকারের...।

—হাই স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক। আমার নাম গোবিন্দপ্রসাদ কর।

—আপনি থাকেন কোথায়?

—ভাসা গুড়গুড়িয়ায় গ্রামের বাড়ি আছে। আমার কর্মস্থল রায়দিঘিতে হওয়ায় থাকি সেখানে স্কুল হোস্টেলে।

—ভাসা গুড়গুড়িয়ায় আমার আত্মীয় বাড়ি আছে। শিখা নামে তাদের একটি মেয়ে সন্দেশখালিতে মাস্টারি করে।

শিখার কথা বলতে লোকটি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছু সময় পরে ভারাক্রান্ত গলায় বললেন,

—আপনি মনে হয় শিখা সামন্তের কথা বলছেন?

—ঠিক বলেছেন। আপনি তাকে কি চেনেন?

—চিনব না কেন, আমার বাড়ির কাছেই সামন্তদের বাড়ি। শিখা তো এখন নেই।

—নেই মানে?

—আপনার আত্মীয়, অথচ তার খবর রাখেননি!

—শিখারা আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় হয়। একসময় তারা আমার কলকাতার বাড়িতে আসত। দীর্ঘদিন তাদের সাথে যোগাযোগ নেই।

—সে দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন রাত্রি প্রায় একটার সময় ধামাখালি গ্রামীণ হাসপাতালে সাপের কামড়ে মারা গেছে। তখনও ভোরের আলো ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি। শিখা হেঁটে আসছিল অটোরিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে স্কুল হোস্টেল থেকে বেরিয়ে। স্কুলে পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। অটোতে এসে সন্দেশখালি নদী পেরিয়ে ধামাখালি হয়ে ভাসা গুড়গুড়িয়া আর তার আসা হল না। সারাদিন চলল যমের সাথে তার বাঁচার লড়াই। শেষপর্যন্ত সে হার মানল। ডেডবডি গ্রামে আনা হয়েছিল। নীল হয়ে গেছিল বিষে। কী ভালো মেয়ে ছিল সে! সারা গ্রামের মানুষ আছড়ে পড়েছিল ডেডবডির কাছে। সকলের চোখে জল।

আমি বললাম— গোবিন্দবাবু, আপনি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ভূত, আত্মা— এসবে কি বিশ্বাস করেন?

—এমন প্রশ্ন কেন করছেন?

শিখার মৃত্যুর দিন আমাদের কলকাতার বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে ঠিক রাত্রি একটায় এবং আজ সন্ধ্যায় নদীর নির্জন তীরে তার সাথে আমার দেখা করার ঘটনা খুলে বললাম গোবিন্দবাবুকে।

গোবিন্দবাবু বললেন— আগে ভাবতাম ভূত, আত্মা বলে কিছু নেই। এসব মানুষের অলীক ধারণামাত্র।

পি. টি. আই ২০১৪ সালের ৮ অক্টোবর
অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

একটি খবর প্রকাশ করে। তারপরে আমার মনে হয়েছে আত্মার অস্তিত্ব স্বাভাবিক ব্যাপার। লন্ডনের সাদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার পনেরোটি হাসপাতালে পরীক্ষা চালিয়েছেন প্রায় দু-হাজার রোগীর ওপর, যাদের প্রায় মৃত বলা যেতে পারে। হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কুড়ি থেকে ত্রিশ সেকেন্ড পর্যন্ত মস্তিষ্ক কাজ করতে পারে। এই রোগীদের প্রাথমিকভাবে ‘মৃত’ বলে ঘোষণা করা হয়। কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে এইসব রোগীদের হৃদযন্ত্র সচল করা হয় ত্রিশ সেকেন্ডের অনেক পরে। সাদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিজ্ঞানী, নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত ড. শ্যাম পারনিয়া জানিয়েছেন, একজন রোগীর আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল, যার বয়স সাতান্ন বছর এবং তিনি একজন সমাজকর্মী। দি টেলিগ্রাম পত্রিকার প্রতিবেদনে জানা গেছে তিন মিনিট পরে কৃত্রিম উপায়ে এই রোগীর শ্বাসযন্ত্র কার্যকরী করা হয়। ডাক্তার জানিয়েছেন, রোগী সংজ্ঞাহীন থাকলেও হৃৎকর্মে বর্ণনা করেছেন সেদিন ঠিক ঠিক কী ঘটেছিল, ডাক্তার ও সেবিকার কী ভূমিকা ছিল। এমনকি কোন যন্ত্রে ঠিক কী ধরনের আওয়াজ হচ্ছিল। মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে তিনি দেহ ছেড়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থেকে এসব দেখছিলেন। দু-হাজার ষাট জন হৃদরোগীর তথ্য থেকে জানা গেছে, তাঁদের এক ধরনের চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রতি তিনজনের একজন বলেছেন, তাঁদের সময়ের ধারণাটা বদলে গিয়ে কারো মনে হচ্ছে দ্রুত কারো মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে সময় কাটছে। কেউ দেখছেন উজ্জ্বল আলো, কারো মনে হয়েছিল সূর্যের আলো ঝলকাচ্ছে।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই মৃত্যুর পরে শিখা যে আপনার সাথে দেখা করেছে তা ভুল নয়।

আমার বার বার মনে হচ্ছিল— সে সত্যি আমাকে ভালোবাসে, মৃত্যুর পরেও।

[ছুটির ছুটি (নির্মল বুক এজেন্সী), ২০১৫]

ননীবালাদের পিকনিক

শ্যামল দত্তচৌধুরী

নতুন বাড়িতে যেদিন এসেছিলাম সেই রাতেরই ঘটনা। দিদি আর আমি একই ঘরে শুয়েছি। লাগোয়া একটা ছোট ঘর আছে। দিদির ইচ্ছে ওটাকে পড়ার ঘর করবে, আমাকে ঢুকতে দেবে না। দিদি খুব গার্ডিয়ানি ফলায় আমার উপর।

রাতে দুজনে ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ দুম করে খুলে গেল পাশের ঘরের দরজাটা। বাতাসের ঝাপটা নেই, কিছু না, যতবারই দরজাটা ভেজানো হয় বার বার সশব্দে খুলে যায়। ওই ঘরে খুটখাট আওয়াজ, পদশব্দ। দীর্ঘনিশ্বাস। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিল। দিদির ভরডর নেই। একবার সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে ঘরটা ঘুরে দেখে এল। আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললাম, ‘কী দেখলি রে?’

‘কিছু না,’ গম্ভীর গলায় দিদির উত্তর, ‘ইঁদুর-টিঁদুর হবে।’

মফস্সলে একটা পুরোনো একতলা বাড়ি কিনে বাবা ধীরে-ধীরে বাসযোগ্য করে নিয়েছেন। অবশেষে শুভদিন দেখে ঠান্মাকে নিয়ে সতীনাথ নস্কর লেনের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে আমরা চলে এসেছি এখানে। কিন্তু প্রথম রাতেই ওই কাণ্ড! দিদি ভুরু কুঁচকে বলল, ‘কাউকে বলবি না যেন।’

দিদি পড়ে ক্লাস নাইনে, আমি ফাইভে। একই স্কুলে। এই বাড়ি থেকে আমাদের স্কুল অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছে। আমরা দুই বোনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ি সকালে সাতটার মধ্যে।

দিদি ওর পড়ার টেবিল আর বই, খাতাপত্র সাজিয়ে নিয়েছে পাশের ছোটো ঘরটায়। সেই রাতেও ওই ঘরে চলাফেরার শব্দ, নানারকম আওয়াজ। সকালে দেখা গেল দিদির বই, খাতা, রিপোর্ট বুক সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আছে। দিদি বলল, ‘নাহ সুমি, এবার অ্যাকশন নিতে হবে। সাহস বেড়ে যাচ্ছে...’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

আমি বললাম, ‘কার? আমার ভয় করছে রে দিদি, কী হবে?’

‘চুপ, কেউ যেন জানতে না পারে।’

দিদির কথা অমান্য করব অত সাহস আমার নেই। আমার ভয় মনে-মনেই চেপে রাখলাম। বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার সময় দিদি আমাকে চুপিচুপি বলল, ‘প্রিয়াঙ্কা বলেছে ওই ঘরটায় আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’

জলখাবার খেয়ে দিদি পাশের ঘরটায় গিয়ে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগল, ‘এই ঘর আমার। আমি এখানেই থাকব, লেখাপড়া করব। আমি ছাড়া এই ঘরে কারও রাইট নেই। কেউ ফালতু বিরক্ত করার চেষ্টা করলে আমি কিন্তু সহ্য করব না। আমি পুলিশের ডি এস পি রামানুজ পালকে চিনি। খুব কড়া লোক, মনে থাকে যেন।’

রামানুজ পাল আসলে প্রিয়াঙ্কার বড়োমামার নাম। প্রিয়াঙ্কা দিদিকে বলেছে, সাধারণ মানুষের মতোই পুলিশকে ভূতেরাও নাকি ভয় পায়।

দিদির সাহস আছে বটে। কিছুতেই ঘরটার দখল ছাড়ল না। আমাকে একলা ফেলে পাশের ঘরটায় রাতে বিছানা করে ঘুমোল। তারপর ধীরে-ধীরে উৎপাত কমে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে আমাদের চোখের সামনেই একটা বাচ্চা মেয়ে দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসে উলটো দিকের দেওয়ালে প্রবেশ করতে। তার বয়স আট-ন বছর। আগেকার দিনের মেয়েদের মতো ওর পরনে ডুরে খাটো শাড়ি, আঁচল গুঁজে রাখে কোমরে। গোলগাল অবয়ব, যদিও অস্পষ্ট। দেখতে লাগে যেন পাকা গিনি। কখনো তার দুর্বল ক্ষীণস্বর শুনতে পেতাম। সে আমাকে ‘সুমি’ নামে ধরে ডাকত আর কেন জানি না, দিদিকে ডাকত ‘মা’। দিদি ওর নাম দিয়েছিল ননীবালা। মেয়েটা আমাদের আর বিরক্ত করত না। একলা-একলা ঘরের মধ্যে খেলে বেড়াত। ওকে আমরা আমাদেরই একজন বলে মেনে নিয়েছিলাম।

তারপর কেটে গিয়েছে আঠারোটা বছর। ঠান্মা পরলোকে। বাবার হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক, তার চার বছর পরে মা-ও চলে গেলেন। দিদি এখন কলেজে পড়ায়। বছরদুয়েক আগে অনুপদাকে বিয়ে করেছে। আমি এস এস সি পাশ করে স্কুলে পড়াই। ননীবালার কিন্তু বয়স বাড়েনি। এখনও সেই ডুরে শাড়ি পরে ঘরে একাদোকা খেলে।

একবার দিদি আর অনুপদা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাড়ি বিক্রি করে দেবে। শহরের কাছাকাছি ফ্ল্যাট কিনবে। অনুপদার অফিস বেশ দূর হয়ে যাচ্ছিল। যাতায়াতে খুব কষ্ট। তারপর দালালরা যাওয়া-আসা শুরু করল। মাঝেসাঝে খরিদদার নিয়ে আসে। তখন এক নতুন উপদ্রব শুরু হল।

অরাজকতা প্রকট হইল

এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এসেছেন বাড়ি দেখতে। দিদি তখন ছিল না বাড়িতে। অনুপদা তাদের নিয়ে ঘরগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখাচ্ছিল। রান্নাঘরে ঢুকতেই মেঝেয় চাপ-চাপ টাটকা রক্ত, একটা বাচ্চা মেয়ের রক্তমাখা পায়ের ছাপ চলে গিয়েছে শোবার ঘর পর্যন্ত। মহিলা আঁতকে উঠেছেন, ‘ওরে বাবা, এসব কী?’

তারপর স্বামীর হাত ধরে টানতে-টানতে একদম বাড়ির বাইরে। অনুপদা কিছুই বুঝতে পারেনি। এত রক্ত হঠাৎ এল কোথা থেকে। আমি গিয়েছিলাম পাড়ায় টুকিদের বাড়িতে। বাড়ি ফিরে দেখলাম অনুপদা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা মুখ করে বারান্দায় বসে আছে।

অনুপদা ননীবালার কথা জানে না। দিদি আর আমি বহু বছর ননীবালার সঙ্গে বাস করে ওকে আমাদের ফ্যামিলির একজন ভাবি। বিশেষ করে, মা-বাবা চলে যাওয়ার পরে ননীবালাই ছিল আমাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। দিদি অনুপদাকে কখনো ননীবালার কথা বলেনি। হয়তো ওকে যদি অনুপদা আমাদের মতো মেনে নিতে না পারে, সেই ভয়ে। তাই ব্যাপারস্যাপার কী ঘটছে অনুপদা কিছু বুঝতে পারছিল না।

দিদি আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, ‘এই বাড়িতে অন্য লোক এসে থাকে বোধ হয় পছন্দ নয় ননীবালার। ও চায় না আমরা চলে যাই। তুই রাতে ওকে একটু বুঝিয়ে বলিস তো সুমি।’

রাতে অনেকবার ওকে ডাকাডাকি করলাম। ননীবালা এল না সামনে। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি। আচমকা ঘুম ভাঙল জোরে একটা আওয়াজে। পাশের ছোটো ঘরটা আজকাল বন্ধই পড়ে থাকে। সপাটে দরজা খুলে গেল। ননীবালা এসেছে। মেয়ের অভিমান হয়েছিল বোধ হয়। হওয়াই স্বাভাবিক, ওকে না জানিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম যে!

আদর করে ডাকলাম, ‘ননীবালা, আমার কাছে আয় রে। তোর সঙ্গে কথা আছে।’

পাশের ঘরে হঠাৎ যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ধূপধাপ জিনিস পড়ছে, ভাঙছে। আমি সুইচ জ্বালতেই টিউবলাইট দু-বার দপদপ করে ভেঙে পড়ল ঝামঝাম শব্দে। আমি বললাম, ‘ও ননীবালা, একটু শান্ত হ প্লিজ। বোঝার চেষ্টা কর।’

কিন্তু কে শোনে আমার কথা। সমস্ত রাত লগুভগু করে একসময় ননীবালা কোথায় চলে গেল। দিদিকে বললাম, ‘খুব রেগে গিয়েছে ও। আমার কোনো কথা কানে তুলছে না।’

পরদিন অনুপদা বলে গিয়েছে দেরি হবে ফিরতে। দিদি এল আমার

ঘরে, তারপর শুরু হল সাধ্যসাধনা। ননীবালাকে ডেকে-ডেকে হয়রান। অনেকক্ষণ পরে ননীবালার হঠাৎ দেওয়াল ফুঁড়ে আবির্ভাব। কোমরে গাঁজা ডুরে শাড়ির আঁচল। মুখ আবছা, কিন্তু থমথমে। দিদি বলল, ‘তুই রাগ করেছিস? এই বাড়ি বিক্রি করে আমরা চলে যাব ভেবেছিলাম। তোর বুঝি মত নেই?’

ননীবালা কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, ‘মা...’

দিদি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘বেশ। তুই যখন চাস না, তখন থাক। অনুপকে আমি বুঝিয়ে বলব। আর দুষ্টুমি করবি না তো?’

বাড়ি বেচে নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাওয়া আর হল না আমাদের। ননীবালা আবার আগের মতো লক্ষ্মী মেয়ে। ঘরে যাওয়া-আসা করে, নিজের মনে খেলে। দিদি আর অনুপদা চার বছরের জন্য যাবে আমেরিকা। আমি দিদিকে বললাম, ‘যাও তোমরা, এমন সুযোগ ক-জন পায়? ননীবালা আর আমি আছি, কোনো চিন্তা কোরো না।’ একদিন ওরা চলে গেল।

দিদি নিয়মিত আমাকে ফোন করে। মানদাদি সকাল-সকাল কাজ সেরে চলে যায়। আবার আসে বিকেলে। এই বাড়িতে নাকি তার গা ছমছম করে। কখনো-সখনো ননীবালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসু সুরে বলে, ‘মা?’

আমি বলি, ‘দিদি বেড়াতে গিয়েছে, আসবে ক-দিন পরে। তোর ভয় কী, আমি তো আছি।’ বাতাসে মিলিয়ে যায় ননীবালা।

ওকে বলেছি, ‘কক্ষনও মানদাদির সামনে আসিস না যেন। ও কাজ ছেড়ে চলে গেলে আমার কী হবে বল তো?’

ননীবালা বুঝদার মেয়ে। সমস্যাটা তক্ষুনি বুঝে গিয়েছিল।

একটা পুরোনো বাড়িতে আমি একলা মেয়ে থাকি। সঙ্গে আবার একফালি জমি। শনির দৃষ্টি এড়িয়ে কি থাকা যায়? স্টেশন রোডের এক প্রোমোটার লালুবাবু একদিন উপস্থিত। তার সঙ্গে দুজন শাগরেদ। আমার বন্ধু টুকির কাকা তাদের একজন। ওরকম চেহারার লোক দেখলে আমার কেমন ভয়-ভয় করে।

দিদি-অনুপদার সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছু বলতে পারব না। এইসব কারণ দেখিয়ে সময় চাইলাম। ওরা নিজেরাই এঘর-ওঘর ঘুরে দেখতে লাগল। অচেনা কেউ আমার ঘরে ঢুকলে আমার ভালো লাগে না, তবু ভয়ে আপত্তি জানাতে পারলাম না। ভাগ্যিস মানদাদি গ্যাঁট হয়ে সারাক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

লালুবাবু বলে গেল, ‘এক মাস সময় দিলাম। আবার আসব।’

অরাজকতা এককুসিভ

রাতে ফোনে সব শুনে দিদি, অনুপদা দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

প্রথমবার লোকগুলো এসেছিল দিনের বেলা। এবার এল রাতে। মানদাদি চলে যাওয়ার পরে। দরজার বাইরে লালুবাবুর গলা, ‘দোরটা যে একবার খুলতে হবে দিদিভাই, দরকারি কথা আছে।’

ভিতর থেকে আমি যথাসাধ্য দৃঢ়স্বরে বললাম, ‘আসছে রবিবার সকালের দিকে আসুন। তখন দিদির ফোন আসবে।’

লালুবাবুর গলা কঠিন হল, ‘দরজা খোল, নইলে ভাঙতে হবে!’

দরজা একটুখানি ফাঁক করতেই ওরা ঠেলে ঢুকে পড়ল। টুকির কাকা বলল, ‘টাইম ইজ আপ। ভালো দর পাচ্ছিঁস সুমি, বাড়ি খালি করে দে।’

লালুবাবুর অন্য চেলাটার হাতে ভোজালি চকচক করছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

কোনো রকমে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, ‘এই বাড়িতে আমি একা থাকি না, একটা ছোটো বোন আছে আমার। ও বাড়ি বিক্রি করতে চায় না।’

টুকির কাকা ধমকে উঠল, ‘মিথ্যে কথা! তোর ছোটো বোন! ডাক তাকে, এন্সুনি ডাক।’

আমি অসহায় গলায় ডাকলাম, ‘ননীবালা, ওরে ননীবালা, এদিকে একবার আয় তো। এরা বাড়ি কিনতে এসেছে।’

লোকগুলো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ একজন আঁক করে উঠল। ডাইনিং টেবিলের নীচে ননীবালা রান্নাবাটি খেলছে। যেন রীতিমতো চডুইভাতি। ওরই বয়সি আরও সাতটা মেয়ে, কেউ লম্বা ফ্রক, কেউ শাড়ি পরেছে। ননীবালাকে ঘিরে রান্নার জোগাড় চলছে। আর খিলখিল করে হাসছে সকলে...

আমি নিজেই অবাক। ওদের তো আগে কখনো দেখিনি। ননীবালা ওর সখীদের ডেকে এনেছে নাকি? ওরা ছোটোছুটি করে লুকোচুরি খেলছে ঘরে। লালুবাবুর দল পায়ে-পায়ে পিছু হটছিল। হঠাৎ ঘরের ছাদ থেকে ওদের মাথায় টপটপ রক্ত পড়তে লাগল। ওরা উর্ধ্বশ্বাসে দে দৌড়!

রাতে দিদির ফোন এসেছিল। হাসতে-হাসতে বলে দিলাম, ‘আমার ননীবালা থাকতে কাকে ভয়? তোরা চিন্তা করিস না রে দিদি...’

[আনন্দমেলা, ৫ নভেম্বর ২০১৫]

ছায়াবৃত্তা

সঞ্জীব কুমার দে

কাশীনাথবাবুর বাড়ি কাগজ দিতে গিয়ে সমীর আবিষ্কার করল, যে কাগজটি কাশীনাথবাবু নেন সেটির আর একটিও তার কাছে অবশিষ্ট নেই। অথচ আরও একটি বাড়িতে এই দৈনিক পত্রিকাটির ডেলিভারি বাকি।

এমন তো হওয়ার কথা নয়! সব বাড়িতে বিলি করার আগেই পত্রিকাটির সমস্ত কপি ফুরিয়ে গেল? নিয়মিত গ্রাহক ছাড়া বাড়তি একটি কপিও বিক্রি করে না সে। করে না— মানে, করার সময় নেই তার। সকাল সাতটার মধ্যে এই কাগজ বিলির কাজটা শেষ করে ঠিক আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয় তাকে, বড়োবাজারের একটা দোকানের কাজে। শুধু শ'খানেক খবরের কাগজের বিক্রি থেকে পাওয়া কমিশনে এই বাজারে সংসার চলে কারও? তাও তার দ্বারা কাগজ সরাসরি বিক্রি নয়।

হাওড়া ডিস্ট্রিবিউশান সেন্টার থেকে ফণীদার কোটায় কাগজ তুলে, ফণীদার ঠিক করে দেওয়া গ্রাহকদেরই কাগজ বিলি করে সমীর। সঙ্গে কিছু সাময়িক পত্রপত্রিকাও। বিনিময়ে ফণীদার কাছ থেকে সামান্য কিছু মাসোহারা পায় সে। তাড়াহুড়ো করে কাগজ বিলি করেই তাকে দৌড়তে হয় বড়োবাজারে। এই জন্যই দৈনিক বাড়তি কাগজ বিক্রির কোনো দায়িত্ব নেয় না সে।

ফণীদা দীর্ঘদিন আছেন এই লাইনে। অনেকটা অঞ্চল বিস্তৃত তাঁর এই ব্যাবসা। তাই গ্রাহক সংখ্যাও প্রচুর। নিজে সবার কাছে পৌঁছাতে পারেন না বলে পাঁচ-পাঁচজন সহকারী নিযুক্ত করেছেন তিনি। সমীর সেই সহকারীদেরই একজন।

এই পরিস্থিতিতে পড়ে সমীর তার মোবাইল থেকে মিস কল দিল ফণীদাকে। আধ মিনিটের মধ্যেই ফোন এল ফণীদার, ‘কী ব্যাপার রে!’

‘ভোরের খবর আমাকে ক-টা দিয়েছ?’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

‘যেমন দিই! কেন রে? কী হয়েছে?’

‘এখনও দত্তবাবু বাকি। কিন্তু ভোরের খবর শেষ। কম হচ্ছে একটা।’

‘না, তা তো হবার কথা নয়। অন্য কোনো কাগজ কি বেশি গিয়েছে একটা?’

‘সেটা এখন তো বলতে পারছি না। একেবারে শেষে বুঝতে পারব।’

‘তুই এখন রানিংয়ে কারও কাছ থেকে নিয়ে কাজ চালিয়ে দে।’

‘সে চালিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।’

‘ওকে।’

ফোন কেটে আবার সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দেয় সমীর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার ফণীদার ফোন। কণ্ঠে উদ্বেগ, ‘তুই কি রেবামাসিমার বাড়ি কাগজ দিয়েছিস সমীর?’

‘হ্যাঁ, দিয়েছি তো!’

‘ওহো! ওটাই তোকে বলতে ভুলে গেছি! ওটা বাদ দিয়ে ঠিক হিসাবেই ভোরের খবর দিয়েছি তোকে। তুই তো চারদিন ছিলিস না, তাই জানিস না। রেবামাসিমা মারা গেছেন।’

অজান্তেই হ্যাণ্ডেলের ব্রেকে চাপ পড়ে সাইকেল দাঁড়িয়ে যায় সমীরের। অক্ষুটে গলা থেকে বের হয়ে আসে, ‘মারা গেছেন?’

‘হ্যাঁ রে, আর কে আছে ওনার বাড়িতে যে কাগজ পড়বে? বাড়ি তো সেদিন থেকেই তালাবন্ধ। একমাত্র ছেলে, সে তো এখন রাশিয়ায়। শুনেছি তার ফিরতে ফিরতে এখনও সপ্তাহখানেক। তাই মৃতদেহ এখনও দাহ হয়নি। কলকাতায় মৃতদেহ রাখার কোনো এক ঠান্ডাঘরে রেখে দিয়ে এসেছেন আত্মীয়রা।’

সমীর বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্ন করে, ‘গেট তালাবন্ধ ছিল? আমি কি তবে খেয়াল করিনি?’ বলতে বলতেই মনে করার চেষ্টা করে— জানালা খোলা ছিল কিনা? নইলে কী করে কাগজ দিল সে?

সমীর ভাবল, সাইকেল ঘুরিয়ে একবার রেবামাসিমার বাড়ি যাবে। কিন্তু এখন সে যে দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে যাওয়া-আসায় অনেকটাই সময় নষ্ট হবে তার। আর গিয়েই-বা কী লাভ? মানুষটাই তো নেই!

মেসোমশাইয়ের মৃত্যুটাও মনে আছে সমীরের। তারপর থেকেই রেবামাসিমা একা হয়ে যান। সবসময়ই তাঁকে মনে হত বিষণ্ণ, শ্লান। কিন্তু ভোরে, কাগজ দেওয়ার সময় মুখোমুখি হয়ে গেলে-কী সুন্দর করে হাসতেন। নবকল্লোল, শুকতারা কবে বেরোচ্ছে তার খোঁজ করতেন।

মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমীরের। রেবামাসিমা তার নিজের কেউ

নন। কাগজ বিলি করতে গিয়ে এই বছর আড়াই যাবৎ তাঁর সঙ্গে পরিচয়। বিজয়ার পর কাগজ দিতে গেলে সমস্ত গ্রাহকদের মধ্যে একমাত্র এই রেবামাসিমাই জোর করে দাঁড় করাতেন। একটি প্লেটে দুটো মিষ্টি আর এক গ্লাস জল তাঁর হাতের কাছেই মজুত রাখতেন। ব্যস্ততার সময়, বসার ফুরসত না থাকায় গেটে দাঁড়িয়ে একরকম প্রায় গিলে নিয়ে কয়েক চুমুক জল খেয়ে তবেই অব্যাহতি মিলত তার। সমীরণ পা ছুঁয়ে প্রণাম করত রেবামাসিমাকে। সেই রেবামাসিমা প্রয়াত।

কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লেও অবশিষ্ট কাগজগুলি রোজকার বাড়িগুলোতে পৌঁছোবার তাগিদে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল সমীর।

ভোরে উঠে আবার একই ব্যস্ততা। অভ্যাসগত সেই দৌড়! অতি অল্প সময়ের মধ্যে একশো ছ-টা বাড়িতে কাগজ পৌঁছানোর দায়িত্ব তার। একটি যে তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, তা আজও মনে পড়ল না সমীরের।

মনে পড়ল আরও দুটি বাড়িতে কাগজ বিলি করে ফেলার পর। রেবামাসিমার বিষয়টা মাথা থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল সমীরের। গতকাল না-হয় জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন ফণীদা। কিন্তু আজ? আজ তো তার নিজেরই ভুল। কিন্তু আশ্চর্য। সেখানে গিয়েও কেন মনে পড়ল না তার? ফণীদা জানিয়েছেন— বাড়ি তালাবন্ধ। কেউ নেই। সে তো জানালা পথেই কাগজ দিয়ে এসেছে এতদিন। জানালা বন্ধ থাকলে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা মনে পড়ে যেত। তা যখন হয়নি, তখন নিশ্চয় জানালা খোলাই আছে রেবামাসিমার।

আজ আর ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল না সমীরের। রেবামাসিমার বাড়ি থেকে অল্প দূরত্বই অতিক্রম করে এসেছে সে। আজ সাইকেল ঘুরিয়ে রেবামাসিমার বাড়ির দিকেই ফিরে চলল সে।

রেবামাসিমার বাড়িটা খুবই নিরিবিলি জায়গায়। পাশাপাশি যে ক-টা বাড়ি— সকলেরই বেশ অনেকটা করে জমি, অনেকের আবার দেওয়াল ঘেরা। শহরের অন্য স্থানগুলোর মতো পাড়াটা ঘিঞ্জি নয়। বেশ কিছু গাছগাছড়াও আছে এদিকটায়। রেবামাসিমাদের বাড়ি সিমেন্ট-ঢালাই রাস্তার গা ঘেঁষে। বাড়ির পিছন দিকটায় বাগান।

সমীর যখন ফিরে এল— তখনও জনশূন্য গলিপথ। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে রোদের ঝিকিমিকি দেখা দিয়েছে ঠিকই, হয়তো মানুষজনের ঘুমও ভেঙেছে, কিন্তু দোর খোলেনি তখনও কার-ও।

সমীর সাইকেল রেখে ভালো করে দেখল বাড়িটাকে। সত্যিই তালাবন্ধ সদর। যে জানালা পথে কাগজ দিয়ে থাকত সে, মানে যে জানালা পথে

মাসিমার দেখা মিলত— সেটাও যে বন্ধ এখন। তবু সমীর হাত দিয়ে ঠেলে দেখল। নাঃ, ভেতর থেকে বন্ধ!

আশ্চর্য! আজও তো এই জানালা পথেই কাগজ দিয়েছে সে, এবং একটু আগেই! জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে গেল সমীরের। নিশ্চিত হল সে। হ্যাঁ, জানালা তখন দু-হাট করে খোলা ছিল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সমীর। ব্যাপারটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না তার!

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল জানে না সমীর। সম্মিত ফিরল মহিলা কণ্ঠে, ‘এখানে কি কাউকে খুঁজছ বাবা?’

কণ্ঠ অনুসরণ করে পিছন ফিরল সমীর। রেবামাসিমার বাড়ির বিপরীত বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে একজন প্রবীণা। জল ভরা একটি ছোটো বালতি হাতে। ভোরে সদর দরজায় জল ঢালতে এসে সমীরের গতিবিধি লক্ষ করে দাঁড়িয়ে গেছেন সম্ভবত।

সমীর একবার ‘হ্যাঁ’ একবার ‘না’ দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করেও আসল কথাটা বলতে পারল না।

প্রসঙ্গ বদলালেন ভদ্রমহিলা, ‘তোমাকে তো আমি চিনি। রেবার বাড়ির কাগজ দাও তো তুমি? তুমি তো ফণীর লোক?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’ সমীর এবার কথার খেঁই খুঁজে পায়। ‘ঠিকই ধরেছেন।’

‘আর কাকে কাগজ দেবে বাবা! সে তো চলে গেছে সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।’

‘আমি সেই সময় কয়েক দিন ছিলাম না মাসিমা। পরে এসে জেনেছি। কিন্তু জানা সত্ত্বেও ভুল করে দু-দিন কাগজ দিয়ে ফেলেছি।’

‘এমন ভুল কয়েক দিন সবারই হবে। আবার ধীরে ধীরে সবটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমিও তো গতকাল বিকালে গল্প করব বলে, বেরিয়ে এসে ওর দরজার তালা দেখে, কোথাও গেছে বলে ফিরে গেলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে কী একটা প্রসঙ্গে কথা উঠতেই মনে পড়ল— সে তো আর বেঁচে নেই!’

সমীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করে, ‘আচ্ছা, ওনার বাড়ির ভেতর তবে কে আছে?’

‘কে আর থাকবে? ওর মারা যাবার দিন থেকেই তালাবন্ধ। আমাদের কাছে ওর এক আত্মীয়ের ফোন নম্বর ছিল। তাকে জানাই। তিনিই অন্য আত্মীয়দের জানান। ছেলেকে খবর দেন। আত্মীয়রা অনেকেই সেদিন এসেছিলেন। তবে কেউ এই বাড়িতে রাত কাটাননি। ওর ছেলে ফিরলে

হয়তো আবার সবাই আসবেন। তবে এখন তো তালাবন্ধ। চাবি অবশ্য আমাদের কাছেই।’

‘আপনারা কি একটু আগে বাড়িটার তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছিলেন? মানে— আমি বলতে চাইছি ওই জানালাটা খুলেছিলেন?’

‘না বাবা। কে যাবে ওই বাড়ির তালা খুলতে?’ ভদ্রমহিলার কণ্ঠে আতঙ্ক প্রকাশ পায়। ‘চারদিন আগে যার মৃত্যু হয়েছে, জানো এখনও তার সৎকারই হয়নি। কলকাতার কোনো এক ঠান্ডাঘরে তাকে রাখা আছে। দেহ না হয় রাখা আছে, আত্মাকে কি নিয়ে যেতে পেরেছে বাবা? সৎকার না হলে কি আত্মা মুক্তি পায়? রেবা ওই বাড়িতেই রয়ে গেছে তবে—’

এমন মন্তব্যের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না সমীর। সে এবারে সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে যায়। ঘামতে থাকে।

কথাবার্তা চলতে চলতেই এ বাড়ি-সে বাড়ি থেকে একজন-দুজন করে লোক বের হতে হতে জমা হয়ে যায় প্রায় ছ-সাতজন।

নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে পরস্পরেই প্রশ্ন ভদ্রমহিলার, ‘জানালা খোলার কথা কী জানতে চাইছিলে বাবা?’

‘আজ একটু আগেও আমি কাগজ দিয়ে গেছি ওই জানালা দিয়ে।’ আঙুল দিয়ে জানালাটা দেখায় সমীর। ‘তখনও জানালাটা ছিল খোলা! কিছুটা গিয়েই ভুল করেছি বুঝতে পেরে আমি আবার ফিরে এসে দেখি জানালাটা বন্ধ! আমি ঠেলা দিয়েও দেখলাম, ভেতর থেকে বন্ধ। তাই জিজ্ঞাসা করছি।’

‘সে কী!’ জমায়েতে গুঞ্জন ওঠে। একে অপরের মুখের দিকে দেখতে থাকে।

‘কী বলছো তুমি হে ছোকরা?’ এবার এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। ‘জানালা তখন খোলা ছিল? তুমি নিশ্চিত?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু আজ নয়, গতকাল সকালেও খোলা জানালা-পথে কাগজ দিয়ে গেছি আমি।’ সমীর জানায়।

‘অসম্ভব!’ বলে ওঠেন আরও একজন। ‘তা কী করে হয়?’

প্রথমের সেই বৃদ্ধা এবার বলে ওঠেন, ‘না না, বাড়িটা তো তবে একবার খুলে দেখতে হয়। যদি কেউ ঢুকে বসে থাকে? চুরি-টুরি হয়ে গেলে, যেহেতু চাবি আমাদের কাছে, তাই দায় তো আমাদের ওপরই বর্তাবে।’

ভদ্রমহিলার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল এক কিশোর। বছর তেরো-চোদ্দো মতো বয়স। ভদ্রমহিলা তাকে নির্দেশ করলেন, ‘যা তো। ওদের বাড়ির চাবিটা নিয়ে আয়।’

কিশোর ভেতরে যেতেই বৃদ্ধা পরিচয় দিলেন, ‘এ হল বিটু। আমার ছেলের ছেলে, নাতি। ওকে ভীষণ স্নেহ করত রেবা। রেবার সারাদিনের সমস্ত ফাইফরমাশ ওই খেটে দিত। রেবার মৃত্যুতে খুব কষ্ট পেয়েছে বেচারী।’

চাবি আসার পর সকলেই কিন্তু ভেতরে যেতে সম্মত হলেন না। বিটুও না। যাঁরা গেলেন তাঁদের সঙ্গে সামিল হল সমীরও।

বাড়ি চতুর্দিক দিয়ে বন্ধ। সব ঠিকঠাক। নিশ্চিন্দ নিরাপত্তা। কোনো ভ্রুটি নেই।

তবে সমীরের নির্দেশ করা জানালার সেই ঘরটিতে প্রবেশ করা গেল না। সেই দরজায় লাগানো রয়েছে একটি পৃথক তাল। যেটির চাবি এদের কাছে নেই। জানা গেল, এই ঘরটিতেই মৃত্যু হয়েছে রেবামাসিমার।

সমীরের এতক্ষণের চেষ্টা বিফলেই গেল।

এরপর কেটে গিয়েছে আরও চার-চারটে দিন। আর ভুল হয়নি সমীরের। রেবা মাসিমাদের পাড়ায় আর কোনো গ্রাহক না থাকায় ওই তল্লাটে আর পা রাখেনি সমীর। তবে প্রতিদিন সকালে সবচেয়ে নিকটস্থ গ্রাহকের বাড়ি কাগজ পৌঁছে পরের জনের বাড়ি সাইকেল ছোটানোর পথে তার বার বার ইচ্ছে হয়েছে একবার অঙ্গুত রেবামাসিমার বাড়ি টুঁ মারে। কাছে যেতে না পারে, দূর থেকে তো জানালাটাকে লক্ষ করা যেতে পারে যে সেটা আবার খুলছে কিনা?

ইচ্ছে হলেও কিন্তু সাহসে কুলোয়নি সমীরের। যদি এরপরও জানালাটা খোলা দেখে! দেখলে রহস্য তো জটিল থেকে জটিলতর-ই হয়ে উঠবে, সে রহস্যের কিনারা হবে কি?

আবার যদি জানালা বন্ধই থাকে, আর সে সামনে ঘোরাঘুরি করতে যায়, তবে তো সেদিনের সেই লোকজনেরা তাকে চেপে ধরতেও পারে যে— তোমার কাগজ বিলির পর্ব তো শেষ, এখনও তোমার এত আগ্রহ কেন হে বাছা?

এইসব নানারকম ভাবনা-চিন্তা করে রোজই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছে সমীর।

আজ রবিবার। কাগজ বিলিতে সপ্তাহের আর ছ-টা দিনের মতো অতটা ছটোপুটি আজ থাকে না। আশু-ধীরে একটু বেলা করে কাগজ দিলেও আজ কেউ অসন্তুষ্ট হন না। রবিবার বড়োবাজার বন্ধ থাকে বলে সমীরেরও আজ বিশেষ ব্যস্ততা নেই।

রবিবারের এই কাগজ বিলি পর্বের প্রায় মাঝখানেই ব্যস্ত জমজমাট বাজার এলাকার একটি চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পড়ে সমীর, এক

ভাঁড় চা নিয়ে। উদ্দেশ্য দুটি। এক, একটু বিশ্রাম নেওয়া। দুই, রবিবার কিছু বাড়তি কাগজ বিক্রি করে কিছু নগদ পয়সা তোলা। কাগজের সাইকেল দাঁড়ানো দেখলে একটা-দুটো কাগজ বাড়তি কিনে ফেলা এখনও বহু মানুষের অভ্যাস।

চায়ের ভাঁড়ে একটা-দুটো চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ সমীরের লক্ষ পড়ল এক কিশোরের দিকে। ফুটপাথ ধরে ধীর ও সতর্ক পায়ে এগিয়ে আসছে কিশোর। চিনতে এক মুহূর্তও সময় লাগল না সমীরের— এই কিশোর সেই বিটু!

তাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাবার সময় বিটুকে নাম ধরে ডেকে ফেলল সমীর।

বিটু থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্নকর্তাকে দেখে চিনতে পারল তৎক্ষণাৎ।

‘কেমন আছো বিটু?’ সমীর চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কথার উত্তর না দিয়ে অস্ফুটে কিছু-একটা বলে বিটু। সমীরের বোধগম্য হয় না।

‘একা একা কোথায় যাচ্ছ এদিকে?’ ভাঁড়টা ড্রামে ছুড়ে দিয়ে সমীর সাইকেলের স্ট্যান্ড ওঠায়।

এবারও বিটু কী বলতে চাইল সমীর বুঝল না। বিটুর ঠোঁট দুটো কোনো শব্দ না তুলে যেন শুধুই কেঁপে গেল কয়েক বার।

সমীর বুঝল বিটু ছেলেটি নিশ্চিত কোনো সমস্যায় রয়েছে। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছে না তাকে।

সমীর সাইকেল নিয়ে এগোতে এগোতে বিটুকেও তার সঙ্গে এগোবার ইঙ্গিত করল।

দু-চার পা এগিয়ে সমীরই প্রথম কথা শুরু করে, ‘তোমরা সেদিন বিশ্বাস করলে না, কিন্তু জানো, দু-দিন ভোরেই জানালাটা খোলা ছিল। আমি নিজে ওই জানালা দিয়ে কাগজ দিয়েছি।’

‘কে বলল, বিশ্বাস করিনি?’ এবার বিটুর উচ্চারণ স্পষ্ট। ‘আমি জানি রেবাদিদা মাঝে মাঝেই ওই জানালাটা খুলে দেন। তুমি বলার আরও আগে থেকেই আমি জানি। আমি দেখেছি।’

‘মানে!’ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সমীর। ‘তুমি দেখেছ মানে— মৃত্যুর পরে দেখেছ?’

‘হ্যাঁ।’ শব্দ গলায় উত্তর দেয় বিটু। ‘রেবাদিদা শুধু জানালা খুলেই দেন না, মাঝে মাঝে জানালায় এসেও দাঁড়ান।’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

‘জানালায় এসে দাঁড়ান!’ সমীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে। ‘তুমি তাকে জানালায় দাঁড়াতে দেখেছ?’

‘হ্যাঁ, রোজ দেখি। রোজ।’ বিটুর কণ্ঠস্বর আবার কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। ‘খুব ভোরে একবার তিনি জানালা খুলে দাঁড়ান। তোমার জন্য। আমি জানি। ওই সময় তুমি কাগজ দাও, ম্যাগাজিন দাও। ছটোপাটি না করে নিরালায় একটু অপেক্ষা করলে তুমিও দেখতে পাবে।’

সমীর হতবাক হয়ে বিটুকে দেখে। এতটুকু ছেলে, কিন্তু অদ্ভুত দৃঢ়তায় কী অবিশ্বাস্য সব কথা বলছে!

বিটু বলে চলে, ‘একটু বেলায় দিকে দাঁড়ান লতিকামাসির জন্য। দিদার রোজকার কাজের মেয়ে। এখন আসে না যে!’

একটু সময় নীরবতা। তারপর আবার বলে বিটু, ‘রাতের বেলায় অনেকক্ষণ দাঁড়ান রেবাদিদা, ছেলের ফোনের জন্য। খোলা জানালায় রাতের বাতাসে ভেসে কথা পরিষ্কার শোনা যায় বলে আমি এসব জানি। তাই অপেক্ষায় থাকি। দেখতে পাই।’

‘তুমি ভয় পাও না?’ সমীর অবিশ্বাসী। কোনো ঘোরের প্রভাবে বিটু এসব বলছে কিনা, সে বাজিয়ে দেখতে চাইছে।

‘পাই তো! মৃত্যুর পরও একটা মানুষ থেকে গেছে ওই বাড়ির মধ্যে। ভয় তো পাওয়ারই কথা।’ প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শুনতে লাগছে বিটুর কথা। সেই জন্যই তো ওই বাড়িটায় আর আমি ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু রেবাদিদার কথা ভাবো! মানুষটা কত একা! একদম একা!’

‘আর তো একা থাকবেন না তিনি। তাঁর ছেলে তো আসছেন!’ সমীর বলে।

‘সে তো আসছে মায়ের শেষ কাজটুকু করতে। বাবা মারা যাবার পরও এসেছিল। কাজ শেষ করে আবার কাজের জায়গায়! রাশিয়ায়। তখন?’

অকাট্য উক্তি বিটুর। সমীর বোঝে, বয়সের চেয়েও বাস্তব-বোধে ছেলেটি অনেক এগিয়ে। ওর কথাগুলিকে কোনোমতেই তাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত হবে না।

সমীর আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফেরত যাবার চেষ্টা করে, ‘সেদিন শুনেছিলাম রেবামাসিমা তোমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁর সমস্ত ফাইফরমাশ খেটে দিতে তুমি। সেই তোমার জন্য কখন অপেক্ষা করে থাকেন তিনি? সেটা তো বললে না!’

‘সারাক্ষণ!’ আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে বিটু। ‘আমার জন্য সারাক্ষণ ছুটফুট করেন তিনি। ওই জানলার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি বুঝতে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

পারি। কিন্তু পাছে আমি ভয় পাই— তাই আমার জন্য তিনি সরাসরি জানালা খোলেন না। পাছে আমার স্কুলে, কোচিংয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়— এই ভেবে বন্ধ জানালার ওই পাশে তিনি অপেক্ষা করেন। আমাকে লক্ষ করেন। কিন্তু রেবাদিদা তো জানেন না যে দূর থেকে, আড়াল রেখে আমিও তাঁকে দেখি। জানালার খোলা, বন্ধেরও নজরদারি করি!’

বিটুর সঙ্গে যত কথা বলে ততই তাকে ভালো লাগতে থাকে সমীরের। প্রসঙ্গ পালটে প্রশ্ন করে সমীর আবার, ‘এখন তুমি কোথায় চললে বিটুবাবু?’

‘যাচ্ছি রেবাদিদার চশমার ডেলিভারি নিতে।’

সমীর হতবাক।

বিটু ব্যাপারটা খোলসা করে, ‘ক-দিন আগে চোখ দেখিয়ে নতুন চশমা গড়তে দিয়েছিলেন রেবাদিদা। বলেছিলেন, কয়েক দিন পর থেকেই পুজোসংখ্যা পত্রিকাগুলি বেরুতে শুরু করবে। তার আগে চশমাটা পালটানো দরকার।’ দিদার সঙ্গে দোকানে এসেছিলাম আমি। পুরো পেমেন্ট করা আছে। রসিদও আমারই কাছে। গত কয়েক দিন ধরে ভেবেছি— চশমাটা নিয়ে আর কী হবে? আজ সকালে ভাবলাম— রেবাদিদার আকাঙ্ক্ষার জিনিস, ফেলে রেখে লাভ কী? নিয়েই যাই!’

‘এটা নিয়ে কী করবে তুমি?’ সমীর জানতে চায়।

‘রেবাদিদার জানালার কাছে রেখে দেব। দেখি, তিনি এটা নেন কিনা!’

সমীর রোমাঞ্চিত, ‘চশমার দোকান কতদূর?’

‘এই তো— কাছেই! এসে গেছি প্রায়!’

‘চলো, তোমার সঙ্গে তবে আমিও যাই।’

চশমা নিয়ে ফেরত আসার পথে সমীর জানতে চায়, ‘তুমি এটা কখন রেবামাসিমার জানালায় রাখবে?’

একটু ভেবে নিয়ে বিটু জানায়, ‘আজ সন্ধ্যায় আমার অঙ্কের কোচিং রয়েছে। ফেরার সময় বেশ অন্ধকার হয়ে যাবে। আর কালভার্ট পেরোবার পর আমাদের পাড়াটা তো গাছগাছালির ছায়ায় আরও অন্ধকার। নিব্ব্বুম। কারো নজরে পড়বে না। তখনই রাখব। এই ধরো রাত সাড়ে আটটা নাগাদ।’

‘ওই সময় যদি আমি তোমার সঙ্গে থাকি, কেমন হয়?’ সমীর জানতে চায়।

‘বাঃ, তবে তো খুব ভালো হয়! আমিও সাহস পাই।’

‘ওই সময় কি রেবামাসিমাকে দেখতে পাব?’

‘পেতেও পার। তবে একটু সময় নিয়ে রেখো হাতে।’

অরাজকতা এককুসিভ

‘বেশ। তবে আমি কোন জায়গাটায় তোমার সঙ্গে দেখা করব?’

‘আমাদের পাড়ায় ঢোকার আগে ওই যে কালভার্টটার কথা বললাম, সেখানে।’ বিটু জানায়। ‘তবে সিওর এসো কিন্তু। বাবা ফেরার সময় আমাকে কোচিং থেকে নিতে আসেন। তাঁকে তবে আজ আসতে নিষেধ করব। আর এরপর যদি তুমি না আসো, আমি একটু বিপদে পড়ে যাব।’

সমীর একটু থমকায়। তারপর বলে, ‘সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমার কোনো ফোন নম্বর আমাকে দাও! আমি না আসতে পারলে জানিয়ে দেব।’

‘তবে তোমাকে সন্ধ্যা ছ-টার আগে জানাতে হবে। আমি বেরোবার আগে।’ বিটু জানায়। ‘মোবাইলটা কিন্তু আমার নয়। আমি সঙ্গে নিয়ে বেরোইও না।’

দুজনের ফোন নম্বর বিনিময় হয়।

কথামতো ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় দুজনের সাক্ষাৎ হল। বাক্সসমেত চশমা বিটুর নির্দেশমতো সমীর সন্তর্পণে তুলে দিল রেবামাসিমার ঘরের সেই বন্ধ জানালার পাল্লা দুটির একটু নীচে। সিমেন্টের বিটে।

তারপর সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে গিয়ে একজনের উন্মুক্ত বাগানের একগুচ্ছ ঘন পল্লবিত গাছের ছায়ায় দুজনে অপেক্ষায় বসে।

মিনিট পাঁচেক কাটতে-না-কাটতেই বিটু উঠে পড়ে, ‘আমি বাড়িতে ঢুকে বইয়ের ব্যাগটা রেখে বুঝিয়ে আসি— আমি ফিরেছি। নইলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে।’

শরতের শুক্লপক্ষের নির্মল আকাশে তখন অপরূপ চন্দ্রিমা। সমীর পলকহীন চেয়ে ওই বন্ধ-জানালায়।

একটু পরে ফিরে এল বিটু। হাতে মোবাইল। জানাল, ‘এটা আমার দিদার ফোন। বাড়িতেই থাকে। কোনো প্রয়োজন পড়লে রেবাদিদা এই নম্বরে ফোন করে ডাকতেন আমাকে।’

আবার অপেক্ষা। মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে দুজনে। কই, জানালা খুলছে না তো!

হঠাৎ বিটুর মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। মৃতদেহ ঠান্ডাঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় রেবাদিদার হাতের চুড়ি, কানের রিং, গলার চেন খুলে রাখতে দেখেছে আত্মীয়দের। মোবাইলটা কারও হাতে দেখেনি তো! নিশ্চয় সেটা ঘরের মধ্যেই কোথাও রয়ে গেছে। ফোন করে দেখলে একবার কেমন হয়?

ডায়াল করল বিটু। স্ক্রিনে দেখল ডায়ালিং। কিন্তু রিং হচ্ছে না। অথবা হয়তো রিং হচ্ছে, বিটু শুনতে পাচ্ছে না। দু-বার ডায়ালিংয়ের পুরো সময় পার হয়ে যাওয়ার পর বিটু চেষ্টা ছেড়ে দিল।

এইসময় হঠাৎ সমীর খামচে ধরল বিটুর কাঁধ। বিটু তার দিকে তাকাতেই সে চোখের ইশারায় বিটুকে কিছু লক্ষ করতে নির্দেশ দিল।

জানালায় দিকে দৃষ্টি পড়ল বিটুর। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে দুটি পাল্লা। গাছের পাতার ফাঁক গলে কোমল জ্যোৎস্না পাতার দোল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলে দুলে উঠছে জানালাপথে। ভেতর থেকে কি কোনো একটা হাত এগিয়ে এসে তুলে নিল চশমাটা? নাকি চোখে তার ভুল!

হঠাৎ টুং টুং শব্দ তুলে একটা মেসেজ ঢুকল বিটুর মোবাইলে। বিটু পড়ল মেসেজটা। তারপর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সমীরের হাতে তুলে দিল মোবাইলটা। সমীর পড়ল। লেখা আছে— থ্যাঙ্ক ইউ। প্রেরক কে? লেখা রয়েছে বিটুর রেবাদিদার নাম।

বিস্ময়ের তখনও বাকি অনেকটাই। হালকা আলো আর আঁধারিতে খুব আবছা আবছা একটা চেহারা ফুটে উঠতে লাগল যেন ওদের চোখের সামনে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে হতে দেখা গেল রেবামাসিমার অবয়ব। জানালায় এসে তিনি যেন দেখা দিলেন বিটুদেরই। চোখে চশমা।

দিন পনেরো পরের এক ভোরবেলা। ধীরে ধীরে, চুপিচুপি, দুরুদুরু বুকে কালভার্ট পেরিয়ে বিটুদের পাড়ায় এসে পৌঁছোল সমীর। সাইকেলের সামনে-পিছনে স্তূপাকার খবরের কাগজ। দু-পাশে হ্যান্ডেল থেকে ঝোলানো দুটি ব্যাগে সদ্য প্রকাশিত গোটা বিশেক পূজাবার্ষিকী।

রেবামাসিমার মৃতদেহের সৎকার হয়ে গেছে বারোদিন আগে। সংক্ষেপে পারলৌকিক কাজকর্ম সেরে সাতদিনের মধ্যেই রাশিয়ায় ফিরে গেছে তাঁর কর্মব্যস্ত একমাত্র ছেলে। সৎকার-পর্বে উপস্থিত ছিল সমীরও। মৃতদেহ কলকাতার ঠান্ডাঘর থেকে সরাসরি শ্মশানে না নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য এনে রাখা হয়েছিল রেবামাসিমার সেই ঘরে। বন্ধঘরের দরজা খুলে আবিষ্কৃত হয়েছিল সমীরের ভুল করে দিয়ে যাওয়া পর পর দু-দিনের সেই খবরের কাগজ দুটি।

রেবামাসিমার বালিশের তলা থেকে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মোবাইল ফোনটি। চার্জহীন, বন্ধ অবস্থায়। একটা ছোট টেবিলের ওপর দেখা গিয়েছিল মাসিমার নতুন চশমাটি।

বিটুর সঙ্গে এ ব্যাপারে সমীরের শুধু অর্থবহ দৃষ্টি বিনিময়ই হয়েছিল, অন্য কাউকে তারা এ-বিষয়ে কিছু জানাতে চায়নি।

খবরের কাগজ দুটির প্রসঙ্গও চাপা পড়ে গিয়েছিল সেদিনের শোকের আবহে। তাই এ ব্যাপারেও সমীর কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

বিটুর সঙ্গে চশমা দিতে এসে সেদিন বাগানের যে গাছতলায় রেবামাসিমাকে দেখবে বলে অপেক্ষা করছিল সে, আজ সেখানে এসে সমীর সাইকেলটা দাঁড় করায়। গতকাল সকালেই তাকে ফোনে খবর দিয়েছে বিটু— দীর্ঘ বিরতির পর রেবাদিদাকে আবার দেখা যাচ্ছে।

আজ তাই এখনও কোথাও কাগজ না দিয়ে, সবার প্রথমে, এত ভোরে সে এসে উপস্থিত হয়েছে এখানে।

ব্যাগ থেকে একটা পূজাসংখ্যা শুকতারা আর একটা নবকল্লোল বের করল সমীর। লোকে জানলে পাগল বলবে। বলুক। দু-কপি ম্যাগাজিন নষ্ট হল বলে ভাবতে পারে অনেকে। ভাবুক। দেব-দেবীকে পূজা নিবেদন করে কত ফুল, ফল, অন্ন, খাদ্য তো নষ্ট করে কতজন! সে-ও পরম পূজনীয়া একজনকে নয় নিবেদন করলই দু-কপি ম্যাগাজিন! পুস্তক-প্রেমী, সাহিত্যপ্রেমী, একনিষ্ঠ পাঠিকা রেবামাসিমা তার কাছে একান্তই পূজনীয়া। পূজাসংখ্যাগুলি পড়ার অভিলাষে তৈরি তাঁর নতুন চশমা পূজাসংখ্যা না পেলে যে বৃথাই হয়ে যায়!

খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রপত্রিকা বিলির কাজ না করে অন্য কাজও সকালে করতে পারত সমীর। পয়সাও হয়তো বেশি রোজগার হত তার। কিন্তু এ কাজকে সে ভালোবাসে। আর ভালোবাসে এমন কিছু মানুষের জন্যই। যাঁদের সংখ্যা কমতে থাকলে সমাজের, সংসারের অনিবার্য ক্ষয়।

ম্যাগাজিন দুটো বন্ধ জানালার নীচে সিমেন্টের বিটের ওপর রেখে আর অপেক্ষা করল না সমীর। রেবামাসিমা আছেন কিনা, আজ সেই প্রমাণ পেতে আসেনি সে। এসেছিল প্রণাম জানাতে।

সাইকেলে চড়ে দ্রুত প্যাডেল করে বেরিয়ে গেল সমীর।

[শারদীয়া শুকতারা, ১৪২৪ (২০১৭)]

পুতুলবাড়ির গুনাই বিবি

দীপ মুখোপাধ্যায়

সকালের গুলতানিতে মেজকা বলল, তোরা কি গুনাই বিবির নাম শুনেছিস? অবশ্য শোনার কথা না। গুনাই বিবি বরিশালের লোককাহিনিভিত্তিক একটি নাটকের মূল চরিত্র। শব্দাবলি গ্রুপের উপস্থাপনায় নাটকটা আমি দেখেছি।

গবলু ফুট কাটল, লোককাহিনির গল্প কি সবটাই মনগড়া? গুনাই বিবি নামে সত্যিকারের কেউ ছিল বুঝি?

—কল্পকাহিনি কি না বলতে পারব না। তবে বরিশালের প্রত্যন্ত গ্রামের নটপরিবার এই পালাটা করতে চেয়েছিলেন। কোনো অজানা কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। তবে অতি উৎসাহী নটদের এক পূর্বপুরুষ অখ্যাত কোনো শিল্পীকে দিয়ে গুনাই বিবির কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করান। এরাই কিন্তু বিখ্যাত নট কোম্পানির আদি পুরুষ।

বকুল বলল, যাত্রা-ফাত্রা কেউ দ্যাখে নাকি? যতসব গৈঁয়ো ব্যাপার। কিন্তু গুনাই বিবির মধ্যে রহস্যের গন্ধ আছে।

—তা তো আছেই। তবে সেই রহস্য ঢোকার আগে নটদের কথায় ফিরে আসি। বাংলা যাত্রাপালায় নটরা খুবই নাম করেছিল। ওদের দলের নামই নট কোম্পানি। বৈকুণ্ঠ নট থেকে মাখনলাল নট মানে সাফল্যের ইতিহাস। ওরা বরিশাল থেকে কলকাতা চলে আসার সময় অনেক লোকপুতুল নিয়ে আসেন। তার মধ্যে গুনাই বিবিও ছিল।

গবলু রসিকতা করল, কলকাতায় নিশ্চয় নটদের বাড়ি রয়েছে? গুনাই বিবির সঙ্গে দেখা করে আসা যায় না?

—অবশ্যই যায়। আমরা আজই উত্তর কলকাতার সেই দেড়শো বছরের

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

পুরোনো বাড়িটা দেখতে যাব। গুনাই বিবির পুতুলটা নিয়ে বরিশালে একটি জনশ্রুতি ছিল। সেই অনামী শিল্পী পুতুল বানানোর সময় এক মহিলার আত্মা অতিপ্রাকৃত শক্তি নিয়ে পুতুলটার ভেতর ঢুকে পড়ে। নটরা ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দেননি। কেউ কেউ গভীর রাতে পুতুলটার উচ্চস্বরে গান শুনেছেন। এই অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ অশুভ আত্মার আছর বলে অনেকের ধারণা।

—বলছ কী মেজকা? বকুল চোখ গোল গোল করল। আমরা তাহলে একটা ভূতুড়ে বাড়িতে গুনাই বিবির খোঁজে যাচ্ছি। অ্যানাবেলা নামের ভূত-পুতুলকে নিয়ে অবশ্য আমি একটা সিনেমা দেখেছি। তুই দেখিসনি গবলু?

গবলু সায় দিল। আমিও দেখেছি। মনে নেই? ওয়ারেন নামের মহিলা তাকে কাচের শো-কেসে বন্দি রাখত।

গবলু আর বকুল ততক্ষণে রেডি হয়ে নিয়েছে। ওদের গন্তব্য আহিরিটোলা-কুমারটুলির কাছে হারাচন্দ্র মল্লিক লেনের একটি পোড়ো বাড়ির খোঁজে; যেটা শোভাবাজার লঞ্চঘাট থেকে হাঁটাপথ। কাছেই সার্কুলার ট্রেনের লাইন।

কাউকে জিজ্ঞেস না করেই ওরা বাড়িটা খুঁজে পেল। বাইরে থেকে অভিনব কিছু মনে হল না। লাল ইট আর চুন-সুরকির গাঁথুনিতে পুরোনো কলকাতার আর পাঁচটা বাড়ির মতোই। বোঝা গেল ঘরগুলো বেশ বড়ো বড়ো। বাড়ির মাথায় দুটো পেলাময় কংক্রিটের স্ট্যাচু শোভাবর্ধন করছে। মূল ফটকের সামনে ঝুলছে একটি নোটিশ।

বকুল পড়তে লাগল— অযথা গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছড়াবেন না। ভূত-সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যে।

গবলু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, মেজকা, এই বাড়িতে সত্যিই ভূত আছে? থাকুক বা না-থাকুক আমরা ভেতরে ঢুকবই!

মেজকা বলল, বাড়িটার নাম পুতুলবাড়ি। শুনেছি ভেতরে শ্বেতপাথরের অনেক পুতুল দিয়ে সাজানো। রাত্রি হলে পুতুলরা নাকি ঘুরে বেড়ায়। কখনো কান্না কখনো-বা খিলখিল করে অদ্ভুত হাসির শব্দে কেঁপে ওঠে জানলা-দরজা।

তখন শেষ বিকেল হলেও পুতুলবাড়ির ঘরগুলোয় রাত্রি নেমেছে। টিমটিম করে জ্বলছে একটা আলো। এক সিল্যুয়েট ছায়ামূর্তি ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, তোমরা কেন ভেতরে ঢুকেছ? শান্তিতে থাকতেও দেবে না!

বকুল দেখল একজন কোঁচকানো চামড়ার বুড়ি-মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে। সে বলল, আমরা ভূত খুঁজতে এসেছি।

—ভূত? বুড়ির গলা খনখন করে উঠল। আমাকে দেখে কি ভূত মনে হচ্ছে? যত গাঁজাখুরি গালগল্প।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

এক প্রবীণ ভদ্রলোক অন্ধকার ফুঁড়ে দেখা দিলেন। বললেন, আমরা কেউ ভূত-টুত নই। এখানে একটা দর্জির কারখানা রয়েছে। তা ছাড়া বাড়িটা দীর্ঘদিন ধরেই গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খবরের কাগজগুলো এই বাড়ি নিয়ে অকারণ গুজব ছড়িয়েছে। আপনাদের মতো ভূতের খোঁজে এখানে বহু মানুষ আসেন। বুঝুন কারবার।

মেজকা ধৈর্য ধরে ভদ্রলোকের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, তবে আপনারা দোতলায় ওঠেন না কেন?

—আরে মশাই উঠব কী? তাকিয়ে দেখুন না সিঁড়িটা কেমন নড়বড়ে। তা ছাড়া দোতলা থেকে প্রায়ই চাঙাডি খসে পড়ে। একবার তো সেই দুর্ঘটনায় একজন মারাও গেছিল। লোকে শুধুমুখু বলেছিল ওটা ভূতের কারসাজি। মেজকা ভদ্রলোককে নরম গলায় বলল, আমরা ভূতের খোঁজে আসিনি। এটা একটা হেরিটেজ বাড়ি। পুরোনো স্থাপত্যে আমাদের উৎসাহ। কিছুক্ষণের জন্য যদি দেখার অনুমতি দিতেন খুব কৃতজ্ঞ থাকতাম।

ভদ্রলোকের রাগ হয়তো কিছুটা গলল। তবু সাবধানতা দেখালেন। আপনারা নিজের দায়িত্বে যেতে পারেন। ওপরে কিন্তু ইলেকট্রিক নেই। ইঁদুর কিংবা তেঁতুলে বিছেরও স্বর্গরাজ্য। মাকড়সারাও চারদিকে জাল বিছিয়ে।

মেজকা আশ্বাস দিল, আমাদের সঙ্গে টর্চ রয়েছে। তা ছাড়া আমার ভাইপো-ভাইবিরাত্তো খুব সাহসী। বেশিক্ষণ তো আর থাকব না ওপরে! কীরে গবলু-বকুল? ভয়ে বুক ধড়ফড় করবে না তো? আমার পেছন পেছন চলে আয়।

পা টিপে টিপে ওরা উঠে পড়ল ওপরের হলঘরে। অসহ্য গন্ধে নাকচাপা দিল সবাই। মেজকার জোরালো টর্চের আলোয় চোখে পড়ল ঘরময় ছড়ানো রয়েছে অজস্র পাথর পুতুলের বিকৃত দেহ আর ভাঙা হাত-পায়ের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যেন সেই পুতুলের টুকরোগুলো তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে চলেছে। কয়েকটা পুতুলের ভাঙা মুণ্ড দেওয়ালের আড়াল থেকে ওদের নজরে রাখছে। সত্যিই গা হিম হয়ে যাওয়ার জোগাড়! চোখের পলক পড়ে না কারুর। বকুলের গলা শুকিয়ে আসছিল। তবু সাহস করে বলল, রাতে এরাই কি আতঙ্ক ছড়াতে জেগে ওঠে?

মেজকা বলল, পুতুল দেখেই তাদের এই অবস্থা। আসল ভূত দেখলে তো ভিরমি খাবি। আরে! তাকিয়ে দ্যাখ একটা পুতুল এখনও অক্ষত আছে। মুখে হিজাব পরা। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে এক ঢাল চুল। গলায় একটা বিছে হার। কী অপূর্ব পাথর খোদাই কাজ! চোখের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে পুতুলটা কিছু-একটা যেন বলতে চাইছে।

ভাঙা জানলা দিয়ে তখন ভেসে আসছে গঙ্গার জোলো বাতাস। পুতুলটার চোখ দুটো থেকে টুপটুপ কয়েক ফোঁটা জল গড়াল। এবার যেন ঠোঁট নড়ে উঠল। গান শোনা গেল, কহছেন দেহি এ্যাহন মুই অ্যালহা অ্যালহা কি হরি?

গবলু আর বকুল ঠাহর করতে পারে না ওরা ঠিক দেখছে নাকি মনের ভুল। থমথমে পরিবেশে বোধবুদ্ধি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে ওদের। হঠাৎ ফ্লাশগানের আলোর মতো ঝলকানি টুকরো টুকরো হয়ে ঘরটাতে ভেঙে পড়ল।

গবলু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এই পুতুলটাই হয়তো গুনাই বিবি। এখানে বন্দিদশার কষ্টে নিশ্চয় কাঁদছে।

মেজকা গম্ভীর হয়ে বলল, আকাশের বিদ্যুৎ চমকানিতেই তোরা চমকে গেছিস। খসখস শব্দে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এই বুঝি গুনাই বিবি তোদের কাছে চলে এল। আরে, তোদের সঙ্গে গুনাই বিবির তো কোনো শত্রুতা নেই!

বকুল বলল, তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। বরিশালের ভাষায় যে গানটা গুনলাম সেটাও কি কানের ভুল?

—গঙ্গার ঘাটে কোনো বাউল-ফকির গেয়ে থাকতে পারে। সেটাই হাওয়ায় ভেসে ঘরে ঢুকছে। আর তোরা ভাবছিস গুনাই বিবির গলা। বরিশালে গুনাই বিবি পালা থাকলেও আত্মার ব্যাপারটা বানানো গল্পও হতে পারে। হয়তো গ্রামবাসী চাননি পুতুলমূর্তিটা নটুবাবুরা গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে নিয়ে যান। তাই এই মনগড়া কাহিনি ফাঁদা।

বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। থেকে থেকে দমকা হাওয়া ঝাপটা মারছে জানলায়। গবলু আর বকুল দু-জনেরই গা বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। মুখে কোনো আওয়াজ নেই। একটা সাদা কাপড় দেখে গবলুর মনে হল এক বুড়ি মহিলা তাকে চিবিয়ে খাবার জন্য এগিয়ে আসছে। একটু পরেই হাড় চেবানোর মটমট শব্দ শোনা যাবে।

বকুলও মেজকার সব কথা বিশ্বাস করেনি। তার শরীরেও খেলা করছে ভয়ের শিহরন। ভাঙা পুতুলগুলো একটু পরেই নিরেট ভূত হয়ে উঠবে। এমনি এমনি কি আর এই বাড়ির দোতলায় ওঠার নিষেধাজ্ঞা?

হঠাৎ একটা বিকট শব্দে সবাই চমকে উঠল। এমনকী মেজকাও। টর্চের আলোয় দেখা গেল, গুনাই বিবির পুতুল মূর্তিটা হাওয়ার দাপটে মাটিতে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছে। হাত, পা, মাথা— সব ছড়িয়ে গেল ঘরের মেঝেতে। ঠিক যেখানে কাটা লাশের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আরও পুতুল মূর্তি।

মেজকা বলল, আহা, এত উচ্চমানের শিল্পকর্ম চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে গেল! দু-চোখ ফেটে জল আসছে।

গবলু বলল, গুনাই বিবির ভেতর বন্দি আত্মাটা দমবন্ধ ঘর থেকে এতদিন পর মুক্তি পেল। কী বল বকুল?

—ঠিক বলেছিস। এবার সে পুতুলের শরীর থেকে বেরিয়ে নিজের দেশ বরিশালে চলে যাবে। উড়ে বেড়াবে নদীর তীরে। মেজকা যে কীর্তনখোলা নদীর কথা বলে ঠিক সেখানে। কী তাই তো মেজকা?

মেজকাও হতভম্ব। পুতুলবাড়িতে পূর্ণাঙ্গ গুনাই বিবির পুতুলমূর্তি দেখতে পারে সেটা স্বপ্নেও ভাবেনি। সবার মুখে শুনেছে দোতলায় কিছুই নেই। সব লোপাট হয়ে গিয়েছে। আবাসিক ভদ্রলোকও একই কথা জানিয়েছিলেন। তবে যা দেখা গেল সবই কি মনের ভুল? গবলু আর বকুলকে কিন্তু এই নিয়ে কিছুই বলা চলবে না।

[ছুটির সুবাস (নির্মল বুক এজেন্সী), ২০১৮]

পেতনির নাতজামাই

উজ্জ্বলকুমার দাস

এক গাবগাছে এক বুড়ি পেতনি ও তার নাতনি বসবাস করত। বুড়ি পেতনি ভাবল নাতনির বিয়ে দিতে হবে।

বুড়ি পেতনি একজন ঘটক ভূতকে বলল, ‘ভাই, একটা ভালো ভূত জোগাড় করে দাও না। আমার নাতনির বিয়ে দেব।’

ঘটক ভূত বলল, ‘আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে। আমার সন্ধানে অনেক ভালো ভালো ভূত পাত্র আছে— উমদো ভূত, জামদা ভূত, কত...! এক-একটা ভূতকে এক-একদিন তোমার কাছে ধরে নিয়ে আসব। তোমার নাতনি যাকে পছন্দ করবে, তার সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেব।’

ঘটক ভূত পেতনি বুড়িকে এই কথা বলে বিদায় নিল।

পেতনিরা দেখতে এমনিতেই খুব বিশী হয়। এই বুড়ি পেতনিকেও দেখতে দারুণ বিশী। তবে পেতনি বুড়ির কিছু সম্পত্তি আছে। তা ছাড়া গাবগাছটাও বেশ বিরাট। যে নাতনিকে বিয়ে করবে ভবিষ্যতে সে গাবগাছটাও পাবে।

গাবগাছের মালিকানা আর ঘটকের মুখে বুড়ির সম্পত্তির কথা শুনে উমদো ভূত পেতনি বুড়ির নাতনিকে বিয়ে করতে রাজি হল।

কারণ উমদো ভূতের কোনো আস্তানা ছিল না বলে সে রাস্তাঘাটে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত।

ঘটক ভূতের মুখে আস্তানা আর বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে উমদো ভূত মনের আনন্দে নাচতে লাগল।

অমাবস্যার রাতে ঘটক ভূতকে সঙ্গে করে উমদো ভূত পেতনি বুড়ির নাতনিকে দেখতে এল।

বুড়ি ঘটক আর ভাবী নাতজামাইকে আদর যত্ন করে বসাল। ভূত পেতনির প্রিয় খাদ্য পচা বাসি কাঁচা মাছ খেতে দিল। উমদো ভূত আর ঘটক ভূত মনের আনন্দে তা পেট ভরে খেয়ে নিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘটক ভূত বলল, ‘খাওয়া-দাওয়া তো ভালোই হল। এবার কনে দেখে নিয়ে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করা যাক।’

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

উমদো ভূত বলল, ‘সে তো বটেই।’

বুড়ি পেতনির নাতনি ছাই মাটি মেখে ভীষণরকম সেজে এল। কনের চেহারা দেখে ঘটক ভূত ভিরমি খেয়ে পড়ল, উমদো ভূত যা খেয়েছিল কনের এমন বিশ্রী চেহারা দেখে বমি করে ফেলল।

উমদো ভূতের এরকম অবস্থা দেখে পেতনি জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে বাবা?’

উমদো ভূত বলল, ‘কিছু না— মাথা ঘুরছিল তাই। হাওয়ায় একটু ঘুরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।’

উমদো ভূত ঘুরে আসার নাম করে বাইরে এসে সেই যে ছুট লাগাল আর সে ফিরে এল না।

বুড়ি পেতনি আর নাতনি জল ছিটিয়ে দিয়ে ঘটক ভূতের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ঘটক বলল, ‘উমদো ভূত বাবাজি কোথায়?’

বুড়ি পেতনি বলল, ‘তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল তাই সে একটু হাওয়া খেতে বাইরে গেছে।’

ঘটক ভূত আসল রহস্যটা বুঝতে পারল। তাই সে আর কথা বাড়াল না।

বুড়ি পেতনি জিজ্ঞেস করল, ‘ভাবী নাতজামাইয়ের হঠাৎ করে মাথা ঘুরল কেন?’

ঘটক বলল, ‘আপনার নাতনির সুন্দর চেহারা দেখেই বোধহয়— যাই, উমদো ভূতকে ডেকে নিয়ে এসে বিয়ের ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে ফেলি।’

উমদো ভূতকে ডাকার অজুহাতে ঘটক ভূতও সেখান থেকে মানে মানে সরে পড়ল, আর গাবগাছের কাছাকাছি গেল না।

ঘটক ভূত আর উমদো ভূতের মুখে বুড়ি পেতনির নাতনির রূপের কথা শুনে কোনো ভূতই আর বুড়ি পেতনির নাতনিকে বিয়ে করতে রাজি হল না।

এদিকে বুড়ির নাতনিরও বিয়ে করবার ভীষণ শখ। মহা সমস্যা। কিছুতেই আর পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও দু-একটা ভূত মাঝে মাঝে এ পথ দিয়ে চলাচল করত— তারাও বুড়ির নাতনির ভয়ে এখন আর এ পথে আসে না।

বুড়ি পেতনি এখন কী করে। নাতনির বিয়ে দেওয়া দরকার। এদিকে বুড়ির বয়স হয়েছে কখন মরবে কে জানে? এদিকে নাতনিটার একটা হিল্লো করতে না পারলে বুড়ি মরেও যে কোনো সুখ পাবে না।

এদিকে নাতনি এক বিষম পণ করল, তার নাকি দু-মাসের মধ্যে বিয়ে না হলে, সে আত্মহত্যা করবে। বুড়ি পেতনি পড়ল মহা চিন্তায়।

বুড়ি নাতনিকে বলল, ‘আমি তো চেষ্টার কোনো ক্রটি করছি না। কিন্তু কোনো ভূত পাত্রই যে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না।’

বুড়ি পেতনির নাতনি মুখ বেঁকিয়ে বলল, ‘ভূত ছাড়া কী এ জগতে আর কোনো পাত্র নেই? আমাকে মানুষ পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে দাও। আমি ওই ভূতদের বিয়েই করব না।’

বুড়ি পেতনি বলল, ‘গাবগাহের পেতনির নাতজামাই হওয়ার জন্য মানুষের বয়েই গেছে! ঘটক ভূতকে আরও বেশি লোভ দেখিয়ে উমদো ভূতটাকে যদি কোনোরকমে বাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই নিশ্চিত। একবার বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

বুড়ি পেতনির নাতনি বলল, ‘আমি বাপু ওইসব উমদো সুমদো ভূতকে বিয়ে করব না। আমি মানুষকেই বিয়ে করব, এই আমার শেষ কথা, নইলে আত্মহত্যা করব সেও ভালো।’

নাতনিকে বুড়ি পেতনি খুব ভালোবাসত। জগতে ওই নাতনি ছাড়া বুড়ি পেতনির আর কেউ নেই। নাতনি গৌ ধরেছে মানুষ বিয়ে করবে। কিন্তু কোনো মানুষ কি তার নাতজামাই হতে রাজি হবে? মানুষ আর ভূত পেতনি তো এক কথা নয়।

বুড়ি পেতনি নাতনিকে বুঝিয়ে বলতে লাগল ‘বল না নাতনি, মানুষ বিয়ে করা কি সম্ভব? ওরা এক জাত, আর আমরা এক জাত।’

নাতনি বলল, ‘ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। মানুষের রূপ ধরে তুমি আর আমি ওদের পাড়ায় বসবাস করব। টাকার লোভেই হোক আর ছদ্মবেশের ফলেই হোক দু-একটা মানুষ বর জুটে যাবেই।’

বুড়ি পেতনি বলল, ‘সব কথাই বুঝলাম। মানুষের রূপ ধরে ওদের পাড়ায় বসবাস করে তোর না-হয় একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা গেল— কিন্তু বাপু, আমি তো আর মানুষের খাবার খেয়ে বাঁচতে পারব না।’

‘তা কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ও আমি আমাদের খাবারই খাব।’

‘যদি ধরা পড়ে যাই?’

‘আগে বিয়েটা তো হয়ে যাক।’

নাতনিকে সুখী করার জন্য বুড়ি পেতনি আর তার নাতনি মানুষের রূপ ধরে আদুল গাঁয়ের চাষিপাড়ায় এসে উপস্থিত হল।

চাষিরা সরল লোক। বুড়ি পেতনি আর নাতনিকে মানুষ বলেই তারা মনে করল।

পেতনিদের পক্ষে টাকাপয়সা জোগাড় করা অসম্ভব নয়।

বুড়ি পেতনি গ্রামের প্রান্তে টাকার বিনিময়ে পেয়ে গেল একটা কুঁড়েঘর।

বুড়ি পেতনি আর তার নাতনি সেই কুঁড়েঘরে মনের সুখে মানুষ সেজে বসবাস করতে লাগল আর নাতজামাই খুঁজতে লাগল।

সেই গ্রামে রাজীব নামে এক চাষি ছিল। তার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। ছেলেবেলাতেই তার বাবা-মা মারা যায়।

জমিজমা যা ছিল আত্মীয়স্বজনরা সব কিছু ঠকিয়ে নেয়। এতদিন ওর এক আত্মীয় দু-বেলা দু-মুঠো ভাতের বিনিময়ে তাকে খাটিয়ে নিত।

রাজীব একদিন খেতের কাজ শেষ করে বাড়ি এল, খিদের জ্বালায় তখন তার পেট জ্বলছিল।

সে বলল, ‘আজ আর কিছু পারব না।’

বাড়ির কর্তা বলল, ‘বেরিয়ে যাও তবে। আমার বাড়িতে আর তোমার কোনো খাওয়া জুটবে না।’

রাজীব আর কী করে!

সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির দাওয়াতে মনমরা হয়ে বসে রইল।

পাশের বাড়িতেই বুড়ি পেতনি আর তার নাতনির আস্তানা।

বুড়ি পেতনি রাজীবের এই অবস্থার সুযোগ নিতে ভুলল না। বলল, ‘আমার নাতনিকে বিয়ে করলে তোমার আর কোনো দুঃখ থাকবে না। জমিজমাও পাবে অনেক।’

রাজীব অনেক ভেবে-চিন্তে বুড়ি পেতনির কথায় রাজি হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর এক শুভদিন দেখে বুড়ি পেতনির নাতনির সঙ্গে রাজীবের বিয়ে হয়ে গেল।

গাঁয়ের মুরুব্বি আর মাতব্বরদের পেট পুরে খাওয়ানো হল। নাতনির বাবার নাম গোত্র ইত্যাদি নিয়ে কিছু গোলমাল সৃষ্টি হলেও টাকার লোভ দেখিয়ে বুড়ি পেতনি সকলের মুখ বন্ধ করে দিল।

রাজীব পেতনিদের বাড়িতে উঠে এল। বুড়ি পেতনি নাতজামাইকে বেশ আদর যত্ন করতে লাগল।

রাজীব প্রথমে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু দু-দিন যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারল যে এদের আচার ব্যবহার ঠিক মানুষের মতো নয়। হাবভাব কথাবার্তা চলার ধরনও স্বাভাবিক নয়।

ওদের মুখেও পচা গন্ধ। এত দুর্গন্ধ যে, এক ঘরে থাকা পর্যন্ত যায় না। বুড়ি পেতনি নাতজামাইকে কিছু জমিজমাও দিল।

এদিকে রাজীব দিন দিন ^{অরাজকতা এককুসিত} ভাবনা-চিন্তায় শুকিয়ে যেতে লাগল। সে

পুষবার জন্য কতকগুলো মুরগি আর ছাগল হাট থেকে কিনে এনেছিল।
একটা ঘরে ছাগল আর মুরগিগুলো শিকল দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল।

একদিন ভোরে সে দরজা খুলে দেখে দুটো ছাগল আর চারটে মুরগি নেই।
সে তার দিদি-শাশুড়ি আর বউকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার দুটো
ছাগল আর চারটে মুরগি গেল কোথায়?’

বুড়ি পেতনি বলল, ‘আমি তো কিছু জানি না বাবা।’

বউ বলল, ‘বোধহয় শেয়ালে নিয়ে গেছে।’ রাজীব বলল, ‘শেয়াল তো
আর শেকল খুলতে পারে না।’

‘আমি জানি না, বাপু।’

কয়েক দিন পরে দেখা গেল যে আর একটা ছাগলও নেই, একটা
মুরগিও নেই। রাজীব কিছুই বুঝতে পারল না। আর একদিন রাজীব হাট
থেকে অনেক মাছ আনল।

পেতনি বউ বলল, ‘আমি আজ এত রাতে মাছ রাঁধতে পারব না।
কাল সকালে যা হয় করা যাবে।’

পরদিন ভোরে দেখা গেল কাঁচা মাছও একটাও নেই। বুড়ি পেতনি
আর তার নাতনির মুখে কাঁচা মাছের গন্ধ।

রাজীবের মনে খুব সন্দেহ হল, কিন্তু সে মুখে কিছু বলল না। পরদিন
হাট থেকে সে আবার অনেকগুলো ছাগল আর মুরগি কিনে নিয়ে এল।

একটা ঘরে বেশ ভালো করে ছাগল আর মুরগিগুলোকে বন্ধ করে রাখল।

সে রাতে সে আর ঘুমাল না। খাটের উপর চুপচাপ চোখ বুজে
পড়ে রইল।

মাঝরাতে সে শুনতে পেল দিদি-শাশুড়ি বাইরে থেকে তার বউকে
ডাকছে— ‘নাতনি ও নাতনি ওঠ, নাতজামাই নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘুমিয়েছে।
এবার উঠে আয় আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, আর তো সহ্য হচ্ছে না।’

বুড়ি পেতনির ডাক শুনে পাশ থেকে তার বউ দরজা খুলে বেরিয়ে
গেল। একটু পরে ছাগল ও মুরগির ডাক আর বুড়ি পেতনি ও তার
নাতনির অটুহাসি শোনা গেল।

রাজীব বিছানা থেকে উঠে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ছাগল-মুরগির ঘরের
দিকে তাকিয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

বুড়ি পেতনি আর তার নাতনি তাদের আসল পেতনি রূপ ধারণ করে
এক-একটা ছাগল আর মুরগি ধরে ধরে রক্ত চুষে খাচ্ছে। সে কী ভীষণ
চেহারা! সে চেহারা দেখলে অনেক সাহসী বীরও ভয় পেয়ে যাবে।

বুড়ি পেতনি আর তার নাতনি যখন ছাগল ও মুরগির রক্ত খেতে ব্যস্ত
অরাজকতা এককুসিত

রাজীব সেই অবস্থায় বাইরে থেকে দরজার খিল বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগল— ‘কে কোথায় আছ— বাঁচাও! আমি পেতনির পাল্লায় পড়েছি!’

মাঝরাতে রাজীবের এই ধরনের চিৎকার শুনে গ্রামের মুরকিবরা লাঠি সড়কি নিয়ে ছুটে এল।

দু-একজন ওঝাও এল। রাজীব গ্রামের লোকদের কাছে সব কথা খুলে বলল।

গ্রামের মুরকি বলল, ‘আমার আগে থেকেই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল।’

এদিকে বুড়ি পেতনি ঘরের ভেতর থেকে খোনা সুরে চিৎকার করে বলতে লাগল ‘নাঁতজামাই দরজা খুলে দেঁ নইলে তোঁর রক্ত চুষে খাঁব। এঁতদিন খেতুম— শুধু নাঁতনির মুখ চেঁয়ে তোঁর রক্ত চুষতে পঁারিনি— নাঁতজামাই তোঁ বঁটে।’

বাইরে থেকে গ্রামের বুড়ো ওঝা চেঁচিয়ে উঠল, ‘বল তোরা কোথাকার পেতনি? এই গ্রামে আসার আগে কোথায় ছিলি?’

বুড়ি পেতনি খোনা গলায় বলল, ‘আঁমরা ভুঁচণ্ডী মাঁঠের ওঁধারের গাঁব গাঁছের পেঁতনি, নাঁতনিটার মানুষ বিঁয়ে কঁরার শঁখ হঁয়েছিল, তাঁই আঁমরা এঁই গাঁয়ে এঁসে বাঁসা বেঁধেছি।’

ওঝা তখন বন্ধ ঘরের চারপাশে মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিতে লাগল।

গ্রামের মোড়ল বলল, ‘পেতনিদের ছাড়া হবে না, দাও ঘরে আগুন লাগিয়ে।’

গাঁয়ের লোকেরা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল।

সবাই ভাবল বুড়ি পেতনি আর তার নাতনি পুড়ে মারা গেছে।

ওঝা বলল, ‘পেতনিদের পুড়িয়ে কখনোই মারা যায় না, ওরা আবার গাবগাছে ফিরে গেছে। আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি। পেতনিরা আর এ বাড়ির আশপাশে আসতে পারবে না। রাজীব বাবাজি, তুমি কিন্তু আর গাবগাছের কাছে যেও না, হাজার হলেও তুমি নাতজামাই তো!’

সেই থেকে গাঁয়ের লোকেরা রাজীবকে পেতনির নাতজামাই বলে ডাকতে লাগল। পেতনির দেওয়া জমিজমা চাষ করে রাজীবের আর কোনো অভাব রইল না। কিন্তু ‘পেতনির নাতজামাই’ এই বদনামটা আর তার কোনোদিনই ঘুচল না।

[ছুটির সুবাস (নির্মল বুক এজেন্সী), ২০১৮]

হানাবাড়ির বেগম

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গল্পটি আমার বাবার জ্যাঠামশায়ের মুখে শোনা। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ আমলের ডাকাবুকো পুলিশ কর্তা। নাম বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। আমরা ডাকতাম, বিশু দাদু। চাকরির খাতিরে ভারতের নানা জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। তাই অভিজ্ঞতার ঝুলি উপচে উঠত ছোটো-বড়ো নানা গল্পে। তাঁর বাড়ি ছিল ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট রোডে। তখন তাঁর অবসর জীবন চলছিল। ছাদের এক পাশে ছিল তাঁর নিজস্ব মস্ত ঘর। নানা ধরনের মানুষজন আসতেন তাঁর কাছে। কেন না তিনি ছিলেন খুব আড্ডাবাজ মানুষ। গল্প বলতেন একেবারে নাটকের অভিনেতার স্টাইলে। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল বাঘ আর ভূত। তিনি বলতেন এই দুটি বিষয়ে গল্প বলে রাতের পর রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। তিনি গল্প বানাতেন না। যেখানে যেমন অভিজ্ঞতা চাকরি জীবনে লাভ করেছিলেন মুখে মুখে তাই টানা বলে যেতেন।

আমি তখন খুবই ছোটো। বোধহয় ক্লাস থ্রি কিংবা ফোর-এ পড়ি। বিজয়ার প্রণাম সারতে বাবা, মা আর ছোটো বোনের সঙ্গে দাদুর বাড়ি গেছিলাম। দিনটা ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। দাদুর লাইব্রেরি ঘরে সেদিন বেশ ভিড়। আমাদের আরও অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন দাদুকে প্রমাণ করতে। চা শরবত আর জলখাবারের পর সকলেই একটু উশখুশ করতে লাগল। যেন কোথাও কিছু-একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে অথচ সেটা সংকোচবশত মুখে কেউ বলতে পারছে না। ছোটোদের মধ্যে জড়তা বা সংকোচের ব্যাপারটা কম থাকে। তাই আমাদের মধ্যে যারা একটু বড়ো তাদের কেউ কেউ বলেছিল, দাদু একটা ভূতের গল্প বলুন না। ছোটো করে নয়, বেশ বড়ো গল্প চাই। দাদু হেসে বললেন, বটে। ভয় পাবি না তো? আমরা সমস্বরে সবাই না না করে উঠলাম। দাদু বললেন, বেশ। ঠিক আছে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

তাহলে সবাই মিলে একটা কাজ করো। ওই শতরঞ্জি ক-খানা ছাদে বিছিয়ে বস সবাই। আমি আসছি।

ছাদ তখন জোছনায় ভাসছে। কলকাতায় সেই সময় এমন আলোর মাত্রা ছাড়া দাপাদাপি ছিল না। আর আলো কম ছিল বলেই পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার বানভাসি হত সর্বত্র। মস্ত ছাদের চারপাশে টবের ওপর নানান ফুলগাছ। বিস্তর সাদা ফুল চাঁদের টুকরো হয়ে লেগেছিল গাছের পাতায় পাতায়। মাঝখানে দুটি শতরঞ্জির ওপর আমরা সকলে। একটু দূরে দাদু বসে একা একটি আরাম কেদারায়।

প্রায় ষাট বছর আগেকার সেই সন্ধ্যাবেলা আজও চোখ বুজলে দেখতে পাই। চাঁদের আলোয় আমরা সবাই সাদা কালো ফিল্মে তোলা গ্রুপ ছবি হয়ে বসে আছি। মাথার ওপর থেকে নেমে আসছে হলুদ জ্যোৎস্না ধারা। সেই ধারায় আমরা ভিজছিলাম সকলে। বাতাসে ছিল হেমন্তের চিঠি। সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে দাদুর গল্পের জন্য। দাদু চুপ করে থেকে যেন পরিবেশ তৈরি করছিলেন তাঁর গল্পের জন্য।

একটু পরে গলাখাঁকারি দিয়ে দাদু বলেছিলেন, আজ ছোটোরা যখন দলে ভারী তখন ওদের পছন্দের গল্পই হোক। ভূত-ফুত কোনোদিন মানিনি। আজও মানি না। কিন্তু অত বছর আগেকার সেই ঘটনাটা মনে করলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। গল্পটা চলাকালীন কারও যদি অসহ্য মনে হয়, তো বল। গল্প বলা থামিয়ে দেব।

আমি তখন রাঁচির ডি.এস.পি। ক-দিন হল বদলি হয়ে এসেছি পাটনা থেকে। মস্তবড়ো জুরিসডিকশন। তখনও কিছুই দেখাশোনা হয়নি। সেদিন একটা ডাকাতি মামলার ফাইল নিয়ে বসেছি। এমন সময় টেলিগ্রাফে খবর এল, আমাকে ল্যান্সার্ড সাহেব তাঁর হাজারিবাগ অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই ল্যান্সার্ড ছিলেন ইম্পিরিয়াল পোলিস সার্ভিসের ডেপুটি কমিশনার। ভারি হৃদয়বান মানুষ। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। হয়তো নতুন কোনো কাজের ভার আমাকে দেওয়ার জন্যই ডেকে পাঠিয়েছেন। এমনটাই ভাবলাম আমি। আমার ড্রাইভার ছিল রমজান। যেমন ওস্তাদ ড্রাইভার তেমনি পাকা রাঁধুনি। তখন ওর সঙ্গে সদ্য পরিচিত হয়েছি অবশ্য। ওকে ডেকে গাড়ি বার করতে বললাম।

তখন কি আপনারা অ্যামবাসাডার চড়তেন? আমার এক খুড়তুতো ভাই জিজ্ঞেস করল। দাদু হেসে বললেন অ্যামবাসাডার তো এল, স্বাধীনতার পর। হিন্দুস্থান মোটরস তৈরি করত এই গাড়ি। সেই সময় দেশে কোনো মোটর গাড়ির কারখানাই ছিল না। আমাদের জন্য সরকার আমেরিকার

অরাজকতা এককুসিত

উইলস কোম্পানির জিপ আনত জাহাজে করে। দারুণ শক্তপোক্ত গাড়ি। স্পিড উঠত ঘণ্টায় আশি মাইলের মতো। গাড়ি চলত পেট্রোলে। রমজান গাড়িও খুব টিপটিপ রাখত। তা ও এসে জানাল, দেড়শো মাইল রাস্তা যেতে তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে যাবে। তখন বাজে প্রায় বিকেল পাঁচটা।

কোয়ার্টার্সে গিয়ে ইউনিফর্ম পরে ট্রাভেল ব্যাগ, টর্চ লাইট আর চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী মাউজার সি নাইনটি সিক্স পিস্তল নিয়ে গাড়ির সওয়ার হলাম পনেরো মিনিটের মধ্যে। রমজান গাড়ি ছাড়ার সময় জানাল, দুটো রাস্তা আছে হাজারিবাগ পৌঁছোতে। একটা ওরমানজি, রামগড়, কুজু হয়ে আর একটা কাঁকে এবং পত্রার্ত হয়ে। রমজান জানিয়েছিল সে পত্রাতুর পথ ধরবে। কেন না এ পথটা অপেক্ষাকৃত ছোটো তাই কম সময় লাগবে। মনে রাখতে হবে ওই সময়ের পথঘাট এখনকার মতো চমৎকার ছিল না। আর রাস্তা রাতের বেলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার, কেন না ল্যাম্পপোস্টই বসেনি। তবে আজও মনে আছে সেই রাতটাও আজকের মতোই পূর্ণচন্দ্রের ছিল।

গাড়ি ছাড়ার আধঘণ্টা কিংবা এক ঘণ্টা পর রমজান বলল, এ ক্যয়া অজীব চিজ হো রহা হ্যায়। যো রাস্তা, পকড়না থা ও বদল হো গয়া। হামলোগ ওরমানজি অউর কুজু কা রাস্তা পর আ পৌঁছা। খোদা মালুম, ইয়ে গড়বড়ি ক্যায়সে হো গয়া। আমি বললাম এ রাস্তায় অসুবিধে কী? তার উত্তরে রমজান জানিয়েছিল, ঘুরপথ তো বটেই এবং রাস্তার অবস্থাও ভালো নয়।

পশ্চিম আকাশে ততক্ষণে লাল রং ধরেছে। রাস্তা খুবই নির্জন। জনপদ চোখেই পড়ছে না। জঙ্গল দু-দিকেই। কখনো-সখনো দু-একটা গ্রাম দূরে দূরে। আমি প্রকৃতি ভালোবাসি, তাই লং-ড্রাইভ সারাজীবন খুব এনজয় করেছি। কিন্তু সেদিন বার বার ঘড়ি দেখছি। সাহেবের ডিনারের আগে না পৌঁছালে কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

তখনও চারপাশে অস্তুরাগের ছবি। পশ্চিম আকাশ ডিমের কুসুমের মতো রক্ত ধরেছে। পাখিরা ধীরে ধীরে ঘরমুখো হবার কথা ভাবছে। হঠাৎ গাড়িটা ঝপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সমস্ত যান্ত্রিক শব্দ একেবারে বন্ধ। রমজান কয়েক বার চাবি-টারি ঘোরালো বটে কিন্তু গাড়ি স্পিকটি নট। রমজান লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে, তারপর বনেট খুলে অনেকক্ষণ ধরে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করল। কিন্তু গাড়ি স্তব্ধ হয়েই রইল। রমজান কপাল চাপড়ে হিন্দিতে যা বলল, তার সহজ বাংলা হল, গাড়ির সব কিছু ঠিকঠাক দেখেই বেরিয়েছি। খারাপ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবু দেখি একবার বনেট খুলে।

রমজান গাড়ি থেকে নামতেই আমিও নামলাম। সময়টা সম্ভবত ছিল বসন্তকাল। সারা দিন ভ্যাপসা গরম থাকার পর ভারি সুন্দর ফুরফুরে

অরাজকতা এককুসিত

হাওয়া বইছে। বহু দূরে দূরে গ্রামের বাড়ি ঘর। পাহাড়ের একটা হালকা আভাসও যেন দেখা যাচ্ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম গাড়ি ঠিক হবেই। কিন্তু মিনিট দশেক পর রমজান জানাল, তার বিশ বছরের চাকরি জীবনে এমনটা কখনো ঘটেনি। সে বুঝতেই পারছে না গাড়ি কেন চলছে না। যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে।

রমজান মাঝরাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। আমাকে সে বলল, যদি হাজারিবাগের দিকে গাড়ি পাই তবে তো হয়েই গেল। নইলে আমি রাঁচি গিয়ে মেকানিক নিয়ে আসছি। কিন্তু কোনো দিকেই গাড়ির আসা-যাওয়া দেখা গেল না। রমজান বলল, স্যার চলুন আপনার একটা ব্যবস্থা করি আগে। তারপর আমি দেখছি বাকিটা। এই না বলে সে আমার ট্রাভেল ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। দেখেছিলাম একটি লোক তাড়াহুড়ো করে গেটটি তালা বন্ধ করছে। রমজান দূর থেকেই চেষ্টা। আমাদের ইউনিফরমে দেখেই সে একটা সেলাম করল তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

লোকটি নাম বাগীশ্বর। সরকারি কেয়ারটেকার। এই বাড়িতে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ডিউটি করে, তবে বিকেল বিকেল সে বাড়ি ফিরে যায়। কারণ হিসেবে, সে জানিয়েছিল তার বাড়ি বেশ দূর এবং পথে বাঘের উৎপাত আছে। রমজান তাকে দিয়ে গেট খোলাল এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঘরে ঢুকল। বাগীশ্বরকে বললাম স্নানের জলের ব্যবস্থা করতে। রান্নাবান্নার ব্যাপারে সে প্রথমেই জানিয়েছিল উনুন ধরাবার কাঠ বা কয়লা কিছুই নেই। কেন না এ বাড়িতে কেউ থাকতে আসে না। আর এ বাড়িতে জিনের উৎপাত আছে এবং এর আগে দু-জন পুলিশের লোক নাকি এখানে রাত কাটানোর কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেছে। এবং তারাও নাকি একইভাবে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদেরও গাড়ি খারাপ হয়ে গেছিল।

রমজান আমাকে বলল, লোকটা মিথ্যে বলছে ভয় দেখাতে। আসলে ওর ছুটি দরকার। আমি বললাম হাজারিবাগের দিকে গাড়ি পেলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল, না হলে আমি একাই এখানে রাত কাটিয়ে দেব। পুলিশের চাকরিতে তো আর কম মড়া ঘাঁটিনি। মর্গে বসেও একা রাত কাটিয়েছি। কাজেই ওসব জিন-ফিনকে আমি মোটেই ভয় পাই না। রমজান বলল, স্যার আমি গাড়ির কাছে ফিরে যাচ্ছি। যদি ব্যবস্থা কিছু হয় আপনার কাছে ফের আসছি। আপনি সাবধানে থাকবেন।

রমজান চলে যেতেই ঘরটা দেখি। পেছায় হল ঘর। তবে দেওয়ালে বড়ো বড়ো ফাটল এবং ছাদ থেকে জল টুঁইয়ে পড়ার দাগ সর্বত্র। তবে বিছানা, এবং আসবাবপত্র পরিষ্কার। আলো-টালোর কোনো ব্যবস্থা নেই।

ঘরের মেঝে লাল রঙের, তবে সেও ফুটিফাটা। কিন্তু প্রত্যহ পরিষ্কার করা হয়। মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। কখনো এভাবে পোড়োবাড়িতে এর আগে রাত কাটাইনি। তাই নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আনন্দে মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছিল। বাইরের বিরাট বারান্দায় একটি রংচটা আরামকেদারা এবং তার সামনে গোল পাথরের টেবিল। সেখানেই আরাম করে বসি। বাগীশ্বর কুয়ো থেকে জল তুলে ভরছে বাথরুমের বাথটবে। সেই শব্দটাই মনে হচ্ছিল পৃথিবীর একমাত্র শব্দ। বাইরে পাখির ডাকাডাকি বন্ধ। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। একটু পরেই বাগীশ্বর এসে সেলাম করে জানান, সে এবার যাবে। আর কাল দিনের আলো ফুটলেই চলে আসবে। চানের এবং খাবার জল সে তুলে রেখে গেল।

খুব সুন্দর ঠান্ডা বাতাসে তন্দ্রা এসে গেছিল। চটকাটা ভাঙল একটা অদ্ভুত কারণে। আমার ঘাড়ের ওপর কে যেন শ্বাস ফেলল অস্ফুট মেয়েলি গলায় শব্দ করে। আমি সোজা হয়ে বসতেই আবার সব স্বাভাবিক। ততক্ষণে পূর্ব আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় জঙ্গলভরা সেই ভাঙাচোরা ডাকবাংলোটাকে দেখে আমার হঠাৎ মনে হল, এখানে থাকাটা হয়তো ঠিক হয়নি। ঠিক করলাম, ভালো করে স্নান সেরে পোশাক বদলে রাতের সামান্য খাবার যা সঙ্গে আছে তা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ব। যদি তার মধ্যে গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যায় তা হলে তো আর চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই।

কিন্তু চিন্তার ব্যাপার আবারও ঘটল। ফের কানের ওপর কারোর নিশ্বাস ফেলার অনুভূতি এবং হালকা নিমতেলের গন্ধ। ওই অঞ্চলের মানুষরা সেইসময় গায়ে নিমতেল মাখত। আমি বারান্দা থেকে ঘরে চলে এলাম। টেবিলে রাখা ছিল পাঁচ সেলের হাতি মারা টর্চ আর মাউজার রিভলবার। জার্মানি থেকে তখন পুলিশদের জন্য সরকার আনাত। রিভলবারটা হাতে নিতেই মনে জোর আসে। ঘরের মেঝেতে তখন চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বাইরে বিদ্যুটে রকমের ঝাঁঝের ডাক। ঘরেও ঝাঁঝের আস্তানা ছিল। কাছে-পিঠে কোথাও একটা তক্ষক থেকে থেকে ডেকে উঠছিল।

আমি বিছানায় বসেছিলাম। মিনিট দশেক পর আমার মনে হতে লাগল এই ঘরে আমি একা নই। অত্যন্ত কাছে কেউ একজন আমার সঙ্গী হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। টর্চ জ্বালাতেই সব অবশ্য ভ্যানিশ। যেই না টর্চ নিভিয়েছি অমনি আবার। এবার নিশ্বাসের সঙ্গে নারী কণ্ঠের ফোঁপানি। রিভলবারটা তাক করে টর্চ জ্বালাই। কোথায় কে? হঠাৎ কুকুরের ভয়ংকর চিংকারে আমি চমকে উঠি। সম্ভবত ফাঁকা বারান্দায় কুকুরটা আশ্রয় নিয়ে

অরাজকতা এককুসিত

থাকবে। তার চিংকারটা ছিল প্রবল আতঙ্কের। কেঁউ কেঁউ করতে করতে সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। শুনেছিলাম মানুষ যা দেখতে পায় না ওরা পায়। বিশেষ করে অশরীরীদের। তবে কি?

দাদু গল্পের মাঝপথে একটু জিরোতে দম নেয়। ছাদ থমথমে হয়ে আছে। ছোটো-বড়ো সকলের মুখে-চোখে একটা কী হয় কী হয় ভাব! আমরা তো প্রায় জড়াজড়ি করে বসে আছি। কাছে খুব জোর একটা টিকটিকি ডেকে উঠতেই দাদু বলেছিলেন, সে রাতেও কানের কাছে বিকট স্বরে এমন টিকটিকি ডাকছিল। মনটাকে শান্ত করতে স্থির করলাম, পুলিশের উর্দি ছেড়ে বাথটাবে নেমে আরাম করে স্নান করব। পোশাক ছেড়ে একটি তোয়ালে পরে হাতে টর্চ নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। বাথটাবটার দিকে আন্দাজ করে টর্চ মারতেই আমার হৃদপিণ্ড একেবারে জেনারেটরের মতো শব্দ করে চলতে শুরু করল। আমার হাত-পা তখন পুতুলের মতো স্থির।

কেন? কেন? কী হয়েছিল বাথটাবে? জানতে চাইল আমাদের কেউ কেউ।

দেখলাম বাথটাবের স্বচ্ছ জলে একজন দেহাতি মহিলার দেহ ভাসছে! তার চোখ খোলা এবং মাছের মতো স্থির চোখে সে আমাকেই দেখছে। আমি ভীতু নই। টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হলাম মহিলা মৃত নইলে ভেসে উঠত না। তবে কি কেউ ওকে মেরে রেখে গেছে এখানে? আমি দ্রুত ঘরে ফিরি এবং রিভলবার নিয়ে ফের বাথরুমের দিকে যাই। পুলিশ হিসেবে মৃতদেহ প্রথম দেখা মানেই আমার সরকারি দায়িত্বভার নেওয়া শুরু।

বাথরুমে ঢুকে ফের টর্চের ফোকাস ফেলি বাথটাবের ওপর এবং কনকনে বরফের উপস্থিতি টের পাই আমার মেরুদণ্ড বরাবর। দেখলাম বাথটাবে রয়েছে টলটলে টাটকা জল। মৃতদেহের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। মনকে বোঝালাম নিশ্চয়ই কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণে চোখের ভুল হয়ে থাকবে। কাজেই ঠিক করলাম এইবার এই জলেই স্নান করে মনের অস্বস্তি দূর করব। তাই ভেবে ঘরে যাই টর্চটা রাখতে। এবং মেঝেতে টর্চের আলো ফেলতেই আমার পুলিশি সাহস এক লহমায় উবে যায়। দেখি ঘরের মেঝেতে মেয়েলি পায়ের জল ছাপ। কে যেন এইমাত্র জল পায়ের সারা ঘর হেঁটে বেড়িয়েছে। আমি আর দেরি না করে ইউনিফর্ম পরি। তারপর কাঁধের ব্যাগ, টর্চ আর রিভলবার নিয়ে বেরতে যেতেই দেখি বিছানায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। আর সেই আলো গায়ে মেখে পড়ে আছে বাথটাবের সেই দেহাতি মহিলার মৃতদেহ। মাথাটা আমার দিকে ঘোরানো।

পরের দিন যখন জ্ঞান এল আমি তখন রাঁচি হাসপাতালে। ল্যান্সার্ড সাহেব স্বয়ং তখন ওখানে। হাসপাতালের বড়ো ডাক্তারকে তিনি নির্দেশ

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

দিয়েছিলেন, যে কোনোভাবে আমাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। কেন না ওই একই পরিস্থিতিতে গত পাঁচ বছরে দুজন অফিসারের মৃত্যু হয়েছিল প্রবল জ্বরে। ডাক্তারদের মতামত ছিল খুব আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় দুজনের শরীরেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার গ্রন্থিটি স্রেফ কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

আমি অবশ্য সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। তারপর ওই জায়গায় গিয়ে তদন্তও শুরু করেছিলাম, বাতুলো থেকে মাইল দূরে থাকত ওই যুবতী। ওর নাম ছিল বেগম। একদিন সে ওই গ্রাম থেকে বেপাত্তা হয়ে যায়। কয়েক দিন পর বেগমের লাশ উদ্ধার হয় বাংলোর বাথরুম থেকে। পুলিশের কাছে সে খবর পৌঁছায়নি। তাই মামলাও হয়নি। গ্রামের লোক বলেছিল বেগমকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছিল কেউ। সে ঘটনাও ঘটেছিল বছর দশেক আগে। অনুসন্ধান করে বেরল বেগমের এক সতীন ছিল, যার নাম মনুয়া। ওই মনুয়াই তার স্বামীর সম্পত্তির লোভে ভাড়া করা খুনি দিয়ে বেগমকে খুন করায়। তারপর এতগুলি বছর কেটে যাওয়ার পর সে বেশ নিশ্চিন্তে সংসার গুছিয়ে করছিল। আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার পর মনুয়ার ফাঁসি হয়ে যায়। আর আমিও গয়ার প্রেতশিলায় গিয়ে বেগমকে পিণ্ডদান করে আসি। এই দুটি কাজ করে আমার খুব শান্তি হয়েছিল মনে।

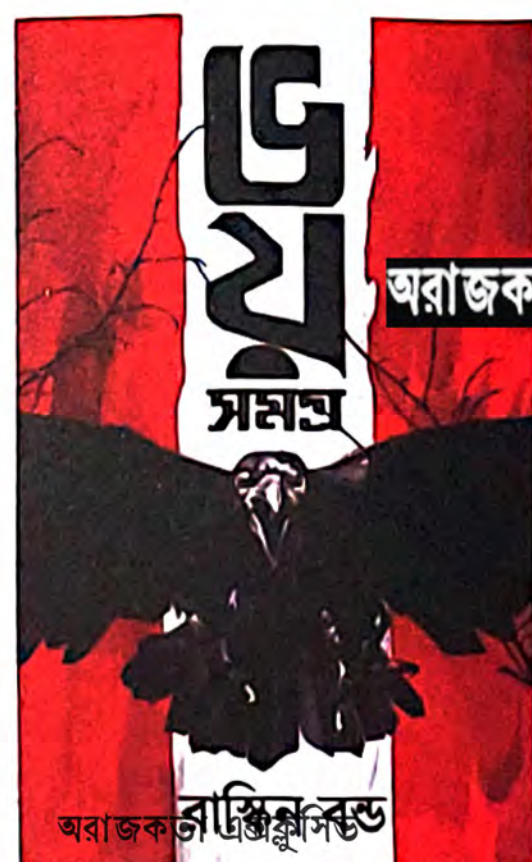
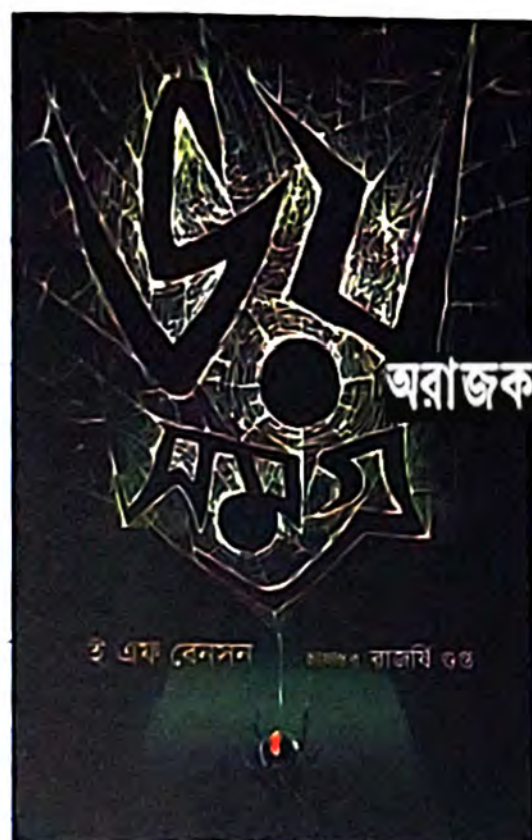
বেগমকে আর দেখা যায়নি?

আমি ফের এক রাত কাটিয়েছিলাম ওই বাংলোয়। একেবারে একা। সে রাতেও চাঁদ ছিল। ওই বাথটাবের তোলা জলে আরামের স্নানও সেয়েছিলাম। কিন্তু বেগম আর দেখা দেয়নি। সে যে বিচারের আশাতেই পুলিশের লোককে নিয়ে আসত ওই বাংলোয় তা নিয়ে সেই সময়কার খবরের কাগজে লেখাও হয়েছিল বিস্তর।

দাদু বেগমকে না দেখলে কী হবে। আমরা ছোটোরা সেই গল্প শোনার পর রাতে ছাদে বাথরুমে কিংবা বিছানায় কাল্পনিক বেগমকে দেখে যে চোঁচিয়ে উঠতাম সে-কথা আজও মনে আছে।

[ছুটির জোয়ার (নির্মল বুক এজেন্সী), ২০১৯]

‘বুক ফার্ম’ প্রকাশিত ‘ভয় সমগ্র’ সিরিজ :



গত প্রায় দেড়শো বছরে
বাংলা ভাষায় দিকপাল সব সাহিত্যিকরা
নানান ধরনের ভৌতিক রচনা লিখেছেন।
তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়, তারাশঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে
আরম্ভ করে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মনোজ সেন,
মানবেন্দ্র পাল, মঞ্জিল সেন সকলেই আছেন।
এই গ্রন্থে শুধুমাত্র ^{অরাজকতা এন্ড কুসিভ}সেহসব রচনা রাখা হয়েছে যা
কোনো নারী অশরীরীকে কেন্দ্র করে লেখা অর্থাৎ
সহজ ভাষায় যাদের আমরা পেত্তি, শাঁকচুন্নি,
^{অরাজকতা এন্ড কুসিভ}ডাইনি ইত্যাদি নামে উল্লেখ করে থাকি।
‘পেত্তি সমগ্র’ হল মহিলা ভূতের গল্প সংকলন।
এই ধরনের কোনো গ্রন্থ বাংলা বইবাজারে আগে
কখনো প্রকাশিত হয়েছে কি না জানা নেই।
আর, দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থের বহু রচনা অগ্রস্থিত ও
^{অরাজকতা এন্ড কুসিভ}যেগুলো ইতিপূর্বে গ্রন্থিত সেগুলোও কিঞ্চিৎ
দুপ্রাপ্য কারণ তা এক সময় কোনো-না-কোনো
গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও আজ সেসব গ্রন্থ
দীর্ঘদিন ধরে বাজারজাত না-হয়ে রয়েছে।

